প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৬৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার মল্লিক
এ. বি. প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

বাবা

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

প্রীতিভাজন শ্রীদীপক চন্দ্রের উৎসাহে বছর চারেক আগে এই সংকলন-গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলাম। এক প্রকাশকেব সাহায্য পাওয়া যাবে এমন আশাও তখন ছিল। সেই আশায ভর কবে আমাব সহৃদয় অধ্যাপক ও বন্ধুদেব অনেকের লেখা সংগ্রহ কবে যখন সংকলনেব কাজ প্রায সম্পূর্ণ করেছি, তখন সেই প্রকাশকের উৎসাহ চলে গেল। জন্মশতবর্ষের হুজুগ নয, স্থির মস্তিষ্কে নানা দিক থেকে তাবাশঙ্করের বিচিত্র রচনাব মূল্যায়ন-চেষ্টাব সংকলন বলেই বোধহয ব্যবসাযিক দৃষ্টিতে এই সংকলন-প্রকাশেব কোনো দাম রইল না।

বছর দুযেক আপেক্ষাব পব সহকর্মী অনুজপ্রতিম বন্ধু শ্রীমানস মজুমদারের উৎসাহে এই সংকলন শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো। সেইদিক থেকে দীপক ও মানসেব কাছে আমাব কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড এই সংকলনটির প্রকাশেব দায়িত্ব নিযে আমাকে যতটা অনুগৃহীত করেছেন, তাবাশঙ্করেব প্রতি শ্রদ্ধা জানিযেছেন তাব চেযে অনেক বেশি। বিশেষ কবে শ্রীরবীন্দ্রনারাযণ ভট্টাচার্য্য মহাশযেব সহৃদয আনুকূল্য ও প্রেরণার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায হবে।

সংকলনের মধ্যে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা বা দোষ-ত্রুটি হয়তো থেকে গেল। সে-সম্পর্কে সহৃদয পাঠক নিঃসংকোচে বিস্তাবিত জানাতে পাবেন। কারণ তারাশঙ্করেব প্রতি শ্রদ্ধাভাজন পাঠকবাই এই সংকলনের সবচেযে যোগ্য সমালোচক।

আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক, অগ্রজতুল্য বন্ধু এবং প্রীতিভাজন যে-সব বন্ধুরা এই সংকলনে লেখা পাঠিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সঙ্গে তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অম্লান শুভেচ্ছার কথাও স্মরণ করি।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

সূচীপত্র

তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও তাঁর সাফল্য

দীপেন্দু চক্রবর্তী

তারাশঙ্করেব ভাষায় যাঁবা 'ফরাসী ধরনে হাসেন, বিলিতি ধরনে কাশেন, রুশীয ধবনে টেবিলে কিল মেরে কথা বলেন'[১] সেইসব বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবিগণ, তা তাঁরা কল্লোল বা নব-কল্লোল যে-কোনো গোষ্ঠীরই হোন না কেন, তারাশঙ্করকে তাচ্ছিল্য করে এসেছেন বা এখনও করেন। অন্যদিকে মেকী বামপন্থী লেখকদের কাছে, যাঁরা গোর্কি বা লু স্থন হবাব চেষ্টা না ক'রে এলিয়ট বা কামু হবার চেষ্টায ব্যস্ত, তারাশঙ্কব প্রতিক্রিযাশীল বলে একেবারেই অচ্ছুত। মাঝখানে আমাদের দেশীয ঐতিহ্যে অন্যতম ধাবা অনুসাবে তিনি কাবো কারো কাছে 'গণদেবতা তারাশঙ্কব'[২] বা 'এক সংস্কৃত সম্রাট'[৩] বা 'তিনি ছিলেন আমার ছেলেবেলার রাজা। পবে এই রাজা দেবতা হযেছিলেন'।[৪] বস্তুত এই তিনটে মনোভাবের কোনটিই তারাশঙ্করকে চিনতে সাহায্য করে না। তাঁকে চিনতে হলে তাঁর লেখক-চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রযোজন, এবং তার জন্য তাঁর সমাজচেতনার দিকে ভালো করে তাকানো দবকাব।

'না পডিযা উপন্যাস কন্‌তিনাতাল'[৫] তারাশঙ্কর এমন কিছু লিখে গেছেন যে, ঐ কন্‌তিনাতাল বা ইংরিজি ঔপন্যাসিকদের সঙ্গেই তাঁব তুলনা বারবার মনে আসে। ফরাসী সাহিত্যেব অধ্যাপক পিযেব ফাল্লোঁ তাঁকে প্রায বাংলাব বাল্‌জাক বলে বর্ণনা করেছেন।[৬] বাংলা সাহিত্যের যাঁরা বোদলেয়র, এলিয়ট, কামু তাঁরা তারাশঙ্করেব এ ধরনেব মূল্যায়নে যদি অখুশি হন তবে তা তাঁদের বিদেশী সাহিত্যিকদের সঙ্গে একচেটিযা আত্মীয়তাবোধের জন্য। বস্তুতঃ তারাশঙ্কবের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকদের তুলনায় প্রাযশঃই অতিরঞ্জন ও আতিশয্যের লক্ষণ থাকলেও এই তুলনা দেবার তাগিদটাই তাঁব এক ধরনেব সাফল্য প্রমাণ করে। তারাশঙ্করকে নিয়ে যে কোনো আলোচনাই শুরু হওয়া উচিত তাঁর এই সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়ে, কিন্তু এই সাফল্যের প্রকৃতি-বিচার ও সীমানা-নির্ধারণ, যা সাহিত্য বিচারের মূল লক্ষ্য, তা-আজও তেমন গুরুত্ব পেল না। আপাততঃ যতটুকু আলোচনা হয়েছে তাঁকে নিয়ে, তা প্রায় সবটুকুই পরীক্ষার কতিপয় গতানুগতিক প্রশ্নের গণ্ডিতে আবদ্ধ, কারণ তারাশঙ্কর কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, তারাশঙ্কর

এখন ছাত্র-পাঠ্য লেখক, অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দী। তারাশঙ্করের যে-কয়েকটি দিক আমাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসে তা হলো—তাঁর আঞ্চলিকতা, যে-প্রসঙ্গে হার্ডির নাম-উল্লেখ এখন একটি অবশ্য পালনীয় নিয়ম হিসেবে গণ্য হয়, তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, যার তুলনা পিয়ের ফালোঁর মতে বালজাক; তাঁর অধ্যাত্মবাদী দর্শন, যার সঙ্গে অনেকেই টলস্টয়ের ভাবধারার সাদৃশ্য দেখতে পান, যেমন পেয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়ে আসছে, এবং তা সবচেয়ে আপত্তিজনক, কারণ 'আঞ্চলিকতা' বলে যে ধারণাটি গড়ে উঠেছে তা সাহিত্য-বিচারের মূলে আঘাত দেয়। এটা একটি ভৌগোলিক ধারণা, সাহিত্যিক নয়। সব সাহিত্যই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে—সব সাহিত্যই একটি বিশেষ মাটিতে মূলীভূত। যাকে আমরা মহান্ সাহিত্য বলে মানি, তা সার্বজনীন হয় এই আঞ্চলিক চরিত্রকে আশ্রয় করেই, তাকে অস্বীকার করে নয়। 'আঞ্চলিক' কথাটির মধ্যে একটা ভৌগোলিক সংকীর্ণতার ইঙ্গিত থাকে, যা কখনই সাহিত্য-বিচারের মুখ্য বিষয় না, কারণ যে কোনো ঔপন্যাসিক বা লেখকের ভৌগোলিক পরিধি শেষ বিচারে সীমাবদ্ধ। যদি বলা হয় যে, 'আঞ্চলিক' আসলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতাকে বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয় তবে তাতেও আপত্তি উঠতে পারে সঙ্গত কারণে—দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা লেখকের চারিত্রিক ত্রুটি, 'আঞ্চলিক' কথাটি কি ঠিক তাই বোঝায়? তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে প্রথম অর্থেই 'আঞ্চলিক' লেবেলটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে বলে মনে হয়, তবে প্রায়শঃই দ্বিতীয় অর্থটিও এসে পড়ে। যেন ভাবটা এই যে, রাঢের জীবন নিয়ে যে সাহিত্য তা একটি বিশেষ অঞ্চলের, এবং কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল নিয়ে যে সাহিত্য তা সকলের। অথচ কে না জানে, ভারতবর্ষ গ্রাম-প্রধান দেশ, নাগরিক সভ্যতা এখনও এখানে 'সকলের' হয়ে উঠতে অনেক যুগ লাগবে। গ্রামপ্রধান দেশে নাগরিক সংস্কৃতিকে সার্বজনীন বলে ভেবে নেওয়ার মতো আত্মপ্রবঞ্চনা আর হয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনার প্রতিষ্ঠাতা, বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কল্লোল গোষ্ঠী, এবং আজও তার খাঁচায় বন্দী আমাদের বুদ্ধি-জীবীরা। তা না হলে প্রেমেন্দ্র মিত্র কি করে গ্রাম-ভিত্তিক সাহিত্যকে একটি বিশেষ ধরনের সাহিত্য (যেন মঙ্গলগ্রহের সাহিত্য) হিসেবে দেখেন এবং কি করেই বা এমন মন্তব্য করেন: 'বাংলা দেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে রাঢ দেশের স্থান আছে ও থাকবে। কিন্তু সাহিত্যে তাকে অবিনশ্বরতা দিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর।'[৭] শ্রীমিত্রের মন্তব্যে এমন একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায় যা রীতিমত

অবজ্ঞাসূচক—রাঢ় দেশের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য বাংলাদেশের মানচিত্রের দিকে আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অর্থ, তাকে একটি অচেনা বিভুঁই বলে ধরে নেওয়া, যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী একজন বিদেশী পর্যটকের পক্ষেই স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন হার্ডি ওয়েসেক্স্ উপন্যাসগুলি লিখছিলেন তখন ইংলণ্ডে ব্যাপক শিল্পপ্রসার হয়েছে। তাই দ্রুত হারিয়ে-যাওয়া প্রাচীন গ্রামীণ জীবনযাত্রা তখনকার ইংরেজ পাঠকদের চোখে 'আঞ্চলিক' বলে মনে হবার সঙ্গত কারণ ছিল এবং এখন শিল্পোন্নত আধুনিক ইংলণ্ডে হার্ডির আঞ্চলিকতা নিয়ে আলোচনা হয়তো আরো বেশী স্বাভাবিক। কিন্তু তবু হার্ডির 'আঞ্চলিকতা' নিয়ে ঘন ঘন মাথা ঘামানোর ঘটনা ইংরেজি উপন্যাস-আলোচনায় বড় একটা দেখা যায় না, তাঁর জীবনদর্শন, লেখনরীতি ইত্যাদি বিষয়ই বেশী গুরুত্ব পায়। মজার ব্যাপার ঘটেছে বাংলাসাহিত্য সমালোচনায়—এখানে তারাশঙ্কর এবং তাঁর সঙ্গে হার্ডিও আঞ্চলিক সাহিত্যের সাধক হিসেবেই স্বীকৃত হয়ে আসছেন, যাঁরা এই লেবেলটির ভক্ত তাঁরা ভুলে যান যে, শিল্পে অনুন্নত আয়র্ল্যাণ্ডে নাট্যকার সিং (Synge) গ্রামের মানুষদের নিয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাকে আঞ্চলিক বলে তফশিলীভুক্ত জাতে স্থান দেবার সামান্যতম ইচ্ছেও নেই আধুনিক আইরিশ সমালোচকদের। পার্ল বার্কের 'গুড আর্থ', জয়েস্ ক্যারীর 'মিঃ জিম্সন', ফর্স্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'—এসব বিখ্যাত উপন্যাসগুলি একটি বিশেষ জায়গাকে আশ্রয় করে আছে বলে কি তাদের 'আঞ্চলিক সাহিত্য' এই শ্রেণীতে ফেলা যায়? বস্তুত, 'আঞ্চলিক' এই লেবেলটি নিতান্তই অকেজো সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে, এবং যেহেতু আমাদের দেশে নাগরিক সভ্যতাই 'আঞ্চলিক', তাই গ্রামজীবন-ভিত্তিক সাহিত্যকে 'আঞ্চলিক' বলা সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে কৌতুককর।

সব সাহিত্যিকেরই নিজস্ব একটি ভূগোল থাকে, কিন্তু তাঁদের মঞ্চমাত্র, তার ওপর তাঁদের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাঁদের প্রতিভা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তা সত্য। একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে তিনি লিখেছেন (সব সময় অবশ্যই নয়। মন্বন্তর, মহানগরী, সপ্তপদী, ১৯৭১ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি কলকাতার পটভূমিকায় লিখিত), কারণ তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যেই কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, যেমনটি দেখা যায় সেইসব লেখকের মধ্যে, যাঁরা কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত চেনা-মহলের বাইরে সচরাচর যান না। যেমন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এটা তাঁর সাহিত্যের, যেমন আর পাঁচজন সাহিত্যিকের,

শারীরিক বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়—শেষেরটি নির্ভর করে লেখকের জীবনদর্শনের ওপর এবং লেখক তারাশঙ্করের সার্বিক চরিত্র ধরা পড়বে তাঁর জীবনদর্শনের বিশ্লেষণে, বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চল তিনি বেছে নিয়েছিলেন সে প্রশ্নের উত্তরে তা মিলবে না।

তারাশঙ্করের মানসিকতা ও তাঁর চরিত্রগুলির আচরণের মূলে রাঢ় অঞ্চলের জলবায়ু ও সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ভূমিকা যে-কোনো লেখকের বিকাশের পক্ষে স্থানীয় উপাদানের যতটুকু ভূমিকা ঠিক ততটুকুই। উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন এলাকা, এমন কি, কলকাতার আশে-পাশেও জল-মাটি-হাওয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সামাজিক বৈশিষ্ট্য তো অবশ্যই। কিন্তু আমরা যখন এই সব অঞ্চলের লেখকদের নিয়ে আলোচনা করি, তখন এই স্থানীয় ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিকে ততটা নজর দিই না, যতটা দিই তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে। প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে, যেমন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবংশ ও বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলে যতটা প্রকট এমনটি বাংলার অন্য কোনো অংশে দেখা যায়নি। কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়, উত্তরবঙ্গে চা ও কাঠের ব্যবসা ও দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক শিল্পাঞ্চল থাকা সত্ত্বেও এ দুটি অঞ্চলের খুব কম লেখকই জমিদারতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্ব নিয়ে তারাশঙ্করের মতো এতটা মাথা ঘামিয়েছেন। আসল কারণ হলো, খুব কম লেখকই একই সঙ্গে জমিদার ও বণিকতন্ত্রের ভাগীদার হবার সুযোগ পেয়েছেন। পৈতৃক জমিদারী ও শ্বশুরকুলের ব্যবসা, যার সঙ্গে, অল্প সময়ের জন্য হলেও, তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন—এই দুটি উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত, এবং ব্যক্তিগত বলেই তিনি কখনই তা ভুলে থাকতে পারেননি। তিনি নিজেই বলেছেন : 'সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।'[৮] এবং শ্বশুরকুল আমার কলিয়ারির মালিক। তাঁরা পড়ো জমিদারের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট।'[৯] শ্বশুরকুলের চাপে কিছুদিন কয়লার ব্যবসায় তিনি নিজেকে জড়িত করলেও এই ব্যবসায়ী শ্বশুরকুলকে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেননি (যার ছায়া পাওয়া যায় ধাত্রী-দেবতায় ব্যবসায়ী শ্বশুরের প্রতি শিবুর অবজ্ঞাসূচক উদাসীনতার মধ্যে) কোনদিন। বস্তুতঃ এই কারণেই

তারাশঙ্করের উপন্যাসে শ্রেণীসংঘর্ষের ব্যক্তিগত দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে, শ্রেণীগত দিকটি নয়।

নিজের পারিবারিক অভিজ্ঞতা যেমন তাঁকে লেখক হিসেবে এক ধবনের সততা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তাকেই একমাত্র সম্বল ও জ্ঞানের সীমানা হিসেবে মেনে নেওযায় তাঁর কাল-চেতনা অস্বচ্ছ ও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। 'আমার কালের কথা' বলতে গিযে তিনি পারিবারিক কথাকেই প্রাধান্য দিযেছেন, তাঁর পিতাকে দেখেছেন সেকাল হিসেবে, মাতার ভেতরে দেখেছেন একাল। নিজেব পিতামাতা-শ্বশুর-মাতুল ইত্যাদি ব্যক্তি যে-কোনো লেখকের কাছেই বিভিন্ন যুগের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা দেয, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পারিবারিক জগৎটাব মধ্যে সমগ্র-কালচেতনা অর্জন করা দুঃসাধ্য। তারাশঙ্কব ঠিক তাই করতে চেযেছিলেন। কাহাব-বাউবী-বাউল-ডোম-বেদে ইত্যাদি গরীব মানুষের সঙ্গে তাঁব পবিচয গর্ব করার মত, কিন্তু তাঁর কাল-চেতনার উৎস এই মানুষগুলো নয, তার উৎস তাঁর নিজেব পারিবাবিক জগৎটুকু, এমন কি স্ব-শ্রেণী অর্থাৎ জমিদার-শ্রেণীর সামগ্রিক জগৎটাও নয। তাঁর সমাজচেতনার গঠনকার্যে তাঁব পারিবারিক সম্পর্কগুলোব ভূমিকা অগ্রগণ্য। ব্যক্তিগত পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তব শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিবর্তমান ইতিহাসের পটভূমিকায় উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেও তাঁব দৃষ্টিভঙ্গী শেষ পর্যন্ত ঐ পারিবারিক সম্পর্কেব মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, যার প্রমাণ তাঁর অসংখ্য উপন্যাসে মা, বাবা, পিসীমার আবির্ভাব,—শুধু চরিত্র হিসেবে নয়, আদর্শ হিসেবে। 'ধনীর নয়, দবিদ্রেব নয, জমিদারেব নয, প্রজার নয, মহিমময মানুষের'[১০]—তাঁর পৈতৃক চরিত্রের এই মূল্যাযন তাঁর সমাজচেতনার মূল উৎস। বস্তুতঃ, তারাশঙ্কবের সমাজচেতনার এই দিকটি নিতান্তই ব্যক্তিগত, আঞ্চলিক নয। বীরভূমের রুক্ষ মাটি, কৃষি ও কযলাব বিবোধ, নানান জাতেব উপস্থিতি ইত্যাদিকে আঞ্চলিক উপাদান বলা যেতে পাবে, কিন্তু পারিবারিক দিকটিকে নয়। তারাশঙ্করের আলোচকেবা আত্মজীবনীমূলক উপাদান খুঁজে বেডান নিতান্তই জীবনীকা.বর অনুসন্ধিৎসা মেটানোব জন্যে। অথচ এগুলো যে তাঁর জীবনদর্শনের চবিত্রগঠনে প্রধান নিয়ামক শক্তি সেটার ওপর তেমন গুরুত্ব দেন না। দিলে 'আঞ্চলিকতা' নিযে হৈচৈ টা এতদিনে থেমে যেত এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

বীরভূমেব সঙ্গে চব্বিশ পরগনার যে পার্থক্য তা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক, কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণের চেহারাটা একই। কাহারদের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের

নীচুশ্রেণীর মানুষদের আচরণগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে শোষিত মানুষ হিসেবে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তেমনি জমিদার—সে যে কোনো জেলারই হোক—একই ভাষায় কথা বলে, একই রকম জীবন যাপন করে, একই-ভাবে শোষণ করে। তারাশঙ্করের মূল উপজীব্য বিষয় এই জমিদার শ্রেণী এবং এখানেই তাঁর পারিবারিক জগৎটির গুরুত্ব। তিনি জমিদারের পুত্র, নিজে জমিদার, আত্মীয়স্বজন জমিদার বংশীয়, কিন্তু তাই বলে তিনি জমিদার শ্রেণীকে একটি শ্রেণী হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন দুটি জাত হিসেবে—একটি শোষক জমিদার, অন্যটি জনতার সেবক ও অভিভাবক। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয়টি তারাশঙ্করের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই আদর্শরূপ। সমাজসেবা, যা তাঁর উপন্যাসের জমিদার বা জমিদারি-সমর্থক নায়কের প্রবৃত্তিবিশেষ, তাঁর নিজের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, এবং এই ব্যক্তিগত, পারিবারিক আচার আচরণকে তিনি বিজ্ঞানীর চোখে দেখা তো দূরের কথা, ভারতীয় সনাতন সেবা-ধর্মের একটি মহান ধারা হিসেবে দেখেছেন। আসল কথা, তাঁর কাল-চেতনা তাঁর পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, তা পুরোপুরি রাঢ় দেশের চেতনাও নয়, আবার সর্বভারতীয় জমিদার-শ্রেণীর চেতনাও নয়। এ কারণেই তাঁর চেতনা আর এক জমিদার সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-জগৎ আবার তারাশঙ্করের চেয়ে সংকীর্ণ, অর্থাৎ ভৌগোলিক আয়তনে ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে তারাশঙ্করের জগৎ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বা কাল-চেতনার দিক থেকে তা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। এর কারণ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগৎকে ঠাকুরবাড়ির কতিপয় ব্যক্তির রঙ্গমঞ্চ হিসেবে দেখেননি, তারাশঙ্কর কিন্তু ঠিক তাই করেছেন—পারিবারিক ঘটনাগুলিকে বৃহত্তর সমাজের গতি-প্রকৃতির আলোয় বিচার না করে বৃহত্তর সমাজকে পারিবারিক 'বংশগত ঐতিহ্য মহিমা'র আলোয় বিচার করেছেন। 'গোরা' এবং 'ধাত্রী-দেবতা'র তুলনা করলেই এই পার্থক্যটি চোখে পড়বে। 'জলসাঘরে'র অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথ 'জলসাঘরে'র লেখকের চেয়ে অনেক গুণ বেশী কাল-সচেতন ছিলেন, যার প্রমাণ তাঁর 'ঠাকুর্দার' গল্পটি।

বলা হয়ে থাকে যে, তারাশঙ্করের জগৎটা মহাকাব্যের মত বিশাল ও জনবহুল। কথাটি ঠিক, চসার সম্বন্ধে ড্রাইডেন যা বলেছিলেন তা তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—এই হল ঈশ্বরের প্রাচুর্য (**Here is God's plenty**)। কিন্তু

মহাকবির দৃষ্টিপথের যে বিশালতা, যার পরিচয় টলস্টয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, তারাশঙ্করের মধ্যে তা অনুপস্থিত। তাঁর চরিত্রগুলি যে-রকম নানান টাইপে বিন্যস্ত, তাতে মনে হয়, তিনি একটিমাত্র উপন্যাসকে বহু-তে রূপান্তরিত করে চলেছেন—যেমন খারাপ জমিদার ('কালিন্দীর' প্রথম পর্যায়ে ইন্দ্ররায়, 'চৈতালী ঘূর্ণী'র প্রায়-অদৃশ্য জমিদারী, 'পঞ্চগ্রামের' নতুন জমিদার শ্রীহরি ঘোষ, 'হাঁসুলী বাঁকে'র ঘোষ বংশ, কঙ্কনার জমিদার ইত্যাদি), ভালো জমিদার ('ধাত্রীদেবতা'র জমিদার পরিবার, 'গণদেবতা'র জমিদার, 'সন্দীপন পাঠশালা'র রত্নহাটার জমিদার, 'জলসাঘর' ও রায়বাড়ির জমিদার প্রভৃতি), জনবিরোধী ব্যবসায়ী ('কালিন্দী'র বিমলবাবু, 'মন্বন্তরে'র মজুতদার, 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথের শ্বশুর, 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে' মুসলমান ব্যবসায়ী, 'জলসাঘরে'র মহিম), আদর্শ মাতৃরূপ('ধাত্রী-দেবতা'র মা-পিসীমা, 'সন্দীপন পাঠশালা'র বামীমা, 'কালিন্দী'রে সুনীতি, 'কালরাত্রি'তে অংশুমানের মা, 'সুতপার তপস্যা'য় সুব্রতর মা), রাজনৈতিক কর্মী ('ধাত্রী দেবতা'র সুশীল-পূর্ণ, 'সন্দীপন পাঠশালা'র ধীরাবাবু, 'আরোগ্যনিকেতনে'র কিশোরবাবু, 'গণদেবতা'র যতীন, 'পঞ্চগ্রামে'র বিশ্বনাথ, 'কালান্তরে'র কপিলদেব-বিজয়, 'মন্বন্তরে'র বিজয়দা, 'গুরুদক্ষিণা'র ব্রজবিহারী ও শিবনাথ, 'চৈতালী ঘূর্ণী'র শিবকালী-সুরেন), স্থিতপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ প্রফেট (ন্যায়রত্ন, গোঁসাইবাবা), এবং সর্বোপরি আদর্শবাদী, গরীবের ত্রাণকর্তা, জননায়ক ('ধাত্রীদেবতা'র শিবু, 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে'র দেবু, 'কালিন্দী'র অহীন, 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম)।

টাইপ-চরিত্র সব মহৎ ঔপন্যাসিকের লেখাতেই পাওয়া যাবে, কিন্তু তারাশঙ্করের এই চরিত্রগুলি যে-রকম বারে বারে উপস্থিত হয়, তাতে মনে হয়, তিনি একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন—এই গণ্ডিটি হলো তাঁর পারিবারিক জগৎ। ভালো মন্দ ইত্যাদি ভেদাভেদ থেকেই টাইপ-চরিত্রের সৃষ্টি এবং তারাশঙ্করের ন্যায়-অন্যায়বোধ তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি নয়, তা তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'ছোট জমিদার বংশে আমার জন্ম—আবার কংগ্রেসকর্মী, এবং আমার মা দিয়েছিলেন এক বিচিত্র ন্যায়-অন্যায়বোধের ধারণা, তাই গ্রামে গ্রামে কখনও খাজনা আদায় উপলক্ষে, কখনও সেবাধর্ম উপলক্ষে, ঘুরবার সময় গ্রামের অবস্থা আমার চোখে বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল'[১১]—তাঁর এই উক্তিতেই পারিবারিক মূল্য-বোধের প্রভাব তাঁর ওপর কেমন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। পারিবারিক মূল্যবোধকে কোন লেখকই তাঁর বিকাশের গোড়ার দিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন

না। কিন্তু মুশ্‌কিল হলো, তারাশঙ্কর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওখানেই থেমে থাকলেন, এগোলেন না, যার প্রমাণ মিলবে '১৯৭১' গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ 'সুতপার তপস্যা'য, যেখানে আধুনিক দাম্পত্য-জীবনের সমস্যাকে মাতৃভক্তির দোহাই দিযে তুচ্ছ করা হযেছে। 'ধাত্রীদেবতা'য স্ত্রীর প্রতি শিবুর আচরণ এবং তাঁর মাতৃপূজায় তারাশঙ্করের এই পারিবারিক মূল্যবোধের প্রথম প্রকাশ, 'সুতপার তপস্যা'য তার চরম পরিণতি, যেখানে মা ও স্ত্রীকে প্রায শুভ ও অশুভের প্রতীকে পরিণত হতে দেখা যায।

উপন্যাসে মাতা-পিতা ইত্যাদির চরিত্র আঁকতে গিযে নিজের মাতা-পিতা-আত্মীয়ের সঙ্গে তাদের একাত্ম করে দেখাটা যদি এক-আধবার হয তবে তা অস্বাভাবিক নয, কিন্তু যদি তা বারবারই ঘটে তবে বুঝতে হবে, এটা এক ধরনের মানসিক সংকীর্ণতা, কল্পনাশক্তির পরাজয। ব্যক্তিগত পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে যদি কল্পনাশক্তির সাহায্যে নতুন নতুন গড়ন না দেওযা যায তবে সে-অভিজ্ঞতা লেখককে বেশীদূর নিযে যেতে পারে না। তারাশঙ্করও তাই বেশীদূর যেতে পারেননি, স্বল্পায়ু বিকাশের পর তিনি এই পুনরাবৃত্তির চাকায নিজেকে বেঁধে নিযেছিলেন। তাঁর বহুপ্রশংসিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্তূপাকারে সাজানো আছে তাঁর উপন্যাসের প্রতিটি পাতায, যেন অব্যবহৃত কাঁচা মাল। তারাশঙ্কর যে তার যথোচিত ব্যবহার করতে পারেননি তার কারণ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি ও আত্মসমীক্ষার অভাব ছিল। চরিত্র-বিশ্লেষণে, সমাজ-দর্শনে তাঁর মনোভাব কখনই নির্দয গবেষকের মতো নয, বরং স্নেহান্ধ আত্মীযের মতো এবং তাই তাঁর চরিত্র-চিত্রণ ভক্তি-প্রেম-বিদ্বেষ ইত্যাদি ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা আদ্যন্ত প্রভাবিত। নিজের পরিচিত পারিবারিক জগৎকে তিনি বিজ্ঞানীর মতো সময ও সমাজের পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেননি, বরং এক অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধের আধার হিসেবে দেখেছেন। অথচ এটাই আশ্চর্যের, তারাশঙ্কর তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে বারবার ইতিহাসের কথা বলেছেন, জমিদার-পরিবারের ইতিহাস, গোটা গ্রামের ইতিহাস, বিভিন্ন লোকাচারের ইতিহাস, কখনো কথক হিসেবে, কখনো বিশেষ কোনো বৃদ্ধ চরিত্রের মুখে, যেমন ন্যায়রত্নের মুখে পৌরাণিক কাহিনী ('গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম') বা লেখকের নিজের মুখে নানান লোকাচারের কাহিনী ('কালান্তর')। কালান্তর-এ একটা বটগাছেরও ইতিহাস গুরুত্ব পেযেছে, কিন্তু ইতিহাস বলতে তারাশঙ্কর শুধু তথ্য সংগ্রহ মনে করেন, এবং এই তথ্যগুলো তাঁর উপন্যাসকে একধরনের

তথ্যচিত্রের চেহারা দান করে, কখনই এই তথ্যগুলো বিশেষ কোনো ইতিহাস-চেতনার জন্ম দেয় না, যেমন দিয়েছিল টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস'-এ। বস্তুতঃ টলস্টয়ের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা তাঁর সমাজচেতনা বুঝতে যত বেশী সাহায্য করে, হার্ডির তুলনা ততটা নয়। হার্ডির সঙ্গে তারাশঙ্করের মিল একটি জায়গায়—দুজনেই একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পটভূমিকাকে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু হার্ডির যেমন একটি সুসংহত জীবনদর্শন ছিল, তারাশঙ্করের তা ছিল না; আবার হার্ডির নৈরাশ্যবাদী নিয়তিবাদের সঙ্গে তারাশঙ্করের আধ্যাত্মিক কল্যাণচেতনার মৌলিক পার্থক্য প্রথমেই নজরে পড়ে। অন্যদিকে টলস্টয়ের সঙ্গে তারাশঙ্করের অনেক ক্ষেত্রেই মিল—দু'জনেই অভিজাত ভূস্বামী, দু'জনেই অধ্যাত্মবাদ ও অহিংসায় বিশ্বাসী, দুজনেই চাষীদের জীবনকে সহানুভূতির চোখে দেখেছেন, এবং সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এই সাদৃশ্য তারাশঙ্কর ও টলস্টয়ের তুলনামূলক বিচারের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু খানিকটা এগোলেই বোঝা যায় যে, এখানে পার্থক্যটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারাশঙ্করের যথাযথ বিকাশ হলে বাংলাসাহিত্যের টলস্টয় হতে পারতেন তিনি। কিন্তু তিনি যে তা হননি সেটাই ঘটনা, তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অনেকেরই আক্ষেপ—'কেন সে চেষ্টা করলেন না তিনি ?'[১২] তারাশঙ্কর টলস্টয়ের মতো আমৃত্যু চিন্তার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিসাধনে ব্রতী হননি, এবং চিন্তা ও জীবনযাপনের মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনতে সচেষ্ট হননি। গভীরভাবে নৈরাজ্যবাদী (anarchist) টলস্টয় রাষ্ট্র, সম্পত্তি, বিচারব্যবস্থা, সেনাদল সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সোচ্চার জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, যদিও তাঁর আদর্শ ছিল অহিংস নৈরাজ্যবাদ। সনাতন খ্রীষ্টান ধর্ম ও ধর্মমন্দিরের বিরোধিতা করেই তিনি অহিংস আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল এবং সনাতন মূল্যবোধের অনুগত সেবক—অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে **Conformist**, তাঁর ধর্মচেতনার জন্ম সনাতন ধর্মব্যবস্থার বিরোধিতার মধ্যে নয়, তাকে গ্রহণ করেই। তিনি ছিলেন 'নিষ্ঠাবান হিন্দু' (নিষ্ঠাবান বিশেষণটি লক্ষণীয়)—এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন এবং তাঁর পক্ষে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় গর্বভরে রায়ও দিয়েছেন।[১৩] টলস্টয় নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান ছিলেন না বলেই খ্রীষ্টানধর্মের নামে যে শোষণ চলে আসছে তা দেখতে পেয়েছিলেন। তারাশঙ্করের দৃষ্টি ছিল হিন্দু ধর্মের সনাতন গরিমায় আচ্ছন্ন, তাই ধর্মীয় শোষণ কখনই নগ্ন হয় নি তার সামনে। অসংখ্য ধর্মীয় আচার-বিচার, পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা, সংস্কার-

বিশ্বাস ইত্যাদির বর্ণনায় যে তিনি পাতার পর পাতা ব্যয় করেছেন তা শুধু জনজীবনের সামাজিক চরিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্যই নয়, ধর্মাচারে নিজের আগ্রহও তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে এ ধরনের বর্ণনায়। ফলে অনেক সময়ই ভগবৎ-ভক্তি ও কু সংস্কারের মধ্যে তিনি দিশেহারা হয়ে কোন বিভাজন-রেখা টানতে পারেন নি, যেমন 'সুতপার তপস্যা'য় কালীতলায় হাড়িকাঠে মাতাল চৌকিদারের থুতু-ফেলার ঘটনাটি, যাকে লেখক একটি ধর্মীয় পাপবোধ থেকে বিচার করেছেন। তারাশঙ্কর সাকার ঈশ্বরে পূজারী ছিলেন বলেই আচার-অনাচারে তাঁর এতটা আগ্রহ, রবীন্দ্রনাথ নিরাকার ঈশ্বরের বিশ্বাসী, তাই এ ধরনের সংস্কারকে মূল্য দেননি। সুতপা তাঁর শাশুড়ীর পূজা আর্চায় সাহায্য করে না বলে লেখক কম বিদ্রূপ করেননি। একেই কি সুনীতি চট্টোপাধ্যায় তারাশঙ্করের 'হিন্দুসুলভ[১৪] উদারতা' বলেছেন? জানি না ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাতীয় অধ্যাপক এই 'হিন্দুসুলভ উদারতা' বলতে ঠিক কি বোঝেন—হিন্দুদের চারিত্রিক উদারতা? হিন্দুদের কাছে হিন্দুধর্ম অবশ্যই উদার, অ-হিন্দুরাও কি তাই মনে করেন?

সম্পত্তিকে সকল অশুভ শক্তির উৎস বলে বর্জন করার নীতি প্রচার করা ও তাকে ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা টলস্টয়ের জীবন ও দর্শনের আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যকেই প্রমাণ করে। তারাশঙ্কর জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন, কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ কামনা করেননি; সম্পত্তির বিনাশ তাঁর পক্ষে অভাবনীয়, তিনি বরং স্বত্বাধিকারের সনাতন ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে নিতে আগ্রহী, উদাহরণস্বরূপ, 'গণদেবতা'য় চণ্ডীমণ্ডপের স্বত্ব নিয়ে বিতর্ক এবং দেবুর প্রতিক্রিয়া, 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ প্রুধঁর বাণী 'Property is theft' পড়ে বিশ্বাস করে যে, জমিদারী-ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে তাই, কিন্তু ময়ূরাক্ষীর চড়াভূমিতে যে কৃষিক্ষেত্র নিয়ে সে মেতে থাকলো, পরে তার মালিকানা সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও তার মনে এলো না। 'কালিন্দী'র অহীন্দ্র-ও কম্যুনিস্ট হলো, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা সম্বন্ধে তাঁরও কোনো স্পষ্ট বক্তব্য ফুটে ওঠে না। সব চেয়ে মজার হলো অংশুমানের ('কালরাত্রি') চিন্তা—'বাড়ী' শব্দটাই তার মনে মোহের সঞ্চার করেছিল। নতুন যুগে কংগ্রেস পর্যন্ত 'আবাদী' অধিবেশনে সোসালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটির কথা বলছে, সম্পত্তি এবং মালিকানা মানুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে নিন্দার কারণ হয়েছে, অংশুমান দেশের সম্পত্তি বেচে দিয়ে সম্পত্তিবানদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়েছে, এ সবই সত্য, তবুও 'বাড়ী', 'আমার বাড়ী'—এর একটা মোহ আছে সেটা, তাকে

পেয়ে বসেছিল সেদিন।' 'আরোগ্যনিকেতনে' জগদ্বন্ধু মশায় জমিদারী কিনলেন—'এ হলো তাঁর ঢাল…তাঁর ঐ ঢালের আড়ালে এ গ্রামের অনেক জনকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।'

টলস্টয়ের বিশ্বাস—ইতিহাস নেপোলিয়নের মতো মহানায়কেরা গড়ে না, বরং তাঁরাই ইতিহাসের দুর্বোধ্য অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হন। তারাশঙ্করের 'ইতিহাসে' এই মহানায়কদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য—যেমন, 'কালিন্দী'তে সোমেশ্বরের কাহিনী, যিনি ছিলেন সাঁওতালদের রাঙা ঠাকুর। তা ছাড়া, প্রায় প্রতিটি সামাজিক উপন্যাসে নায়কের কর্ম ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে চারপাশের জনতার ভাগ্য—এমন দেখানো হয়েছে। দেবু ('গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম') ভাবে (শুধু ভাবেই না, তাকে দেখানোও হয়েছে এইভাবে)—'গ্রামের শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তি হইল সে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্মান তাহারই প্রাপ্য। অরণ্যানীর শিশুশাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা অখণ্ড আলোক ভোগের জন্যেই উর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না, নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহারই সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে আকাশলোকে চলুক—এই তাহার আকাঙ্ক্ষা।' এ হলো উদ্ধারকর্তার ভূমিকা, Saviour-এর ভূমিকা। যেহেতু জনতার উদ্ধারকার্য একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এ ধরনের ত্রাণকর্তা অল্পেতেই ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়ে। দেবুরও একই প্রতিক্রিয়া—'সংসার হইতে—বন্ধন হইতে মুক্তিই সে চায়। প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আর সে পারিবে না। আর সে পরের বোঝা বহিয়া ভূতের বেগার খাটিতে পারিতেছে না (পঞ্চগ্রাম)।' কীভাবে একজন আশাবাদী সমাজসেবক এরকম আত্মকেন্দ্রিক পলাতক হবার স্তরে পৌঁছোয় তার বিশ্লেষণে তারাশঙ্কর আদৌ উৎসাহী নন; শেক্স্‌পীয়র যেভাবে টাইমনের রূপান্তরের ভিতর দিয়ে কয়েকটি সামাজিক সত্যকে তুলে ধরেছেন, দেবু ঘোষের পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেও তেমনি তিনি সামাজিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি দেবু ঘোষের এই 'গণদেবতা'র ভাবমূর্তিটিকে আরও শক্তিশালী করার দিকে নজর দিয়েছেন। তাই 'পঞ্চগ্রাম' শেষ হয় দেবু-র বিখ্যাত ভাবী স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দিয়ে। যদিও অবশেষে সে 'নেতৃত্ব নয়, সেবা নয়', 'ইহাদের প্রকাণ্ড আপনজন' হয়ে থাকতে চায়, তবু তার চিন্তা থেকে এই মহা-

মানবের ভূমিকাটা মুছে যায় না, তাই তার প্রতিজ্ঞা—সে 'বুঝাইয়া দিয়া যাইবে—জানাইয়া দিয়া যাইবে—তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না ; মানুষ মরে না' ; এ যেন বিবেকানন্দের 'হে ভারত ভুলিও না' বাণী।

তারাশঙ্করের ইতিহাস-চেতনার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাধা', 'জঙ্গলগড', 'অরণ্যবহ্নি', 'ছায়াপথ' এবং 'যুগ-বিপ্লব' নাটকে। নিঃসন্দেহে 'অরণ্যবহ্নি' ফর্মের দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখার সাহস বোধহয় অন্য কোন সাহিত্যিকের হয়নি (স্বর্ণ মিত্রের 'দামিনিকোর ইতিকথা' ছাড়া)। কিন্তু সেখানেও ঐতিহাসিক পার্সপেকৃটিভকে আচ্ছন্ন করে রাখে রূপকথার রোম্যান্স। বস্তুতঃ, ইতিহাস আর রূপকথা তারাশঙ্করের কাছে সমার্থক হয়ে যায় প্রায়ই। 'উপকথা' শব্দটির প্রতিও তাঁর মমতা মাত্রাধিক। 'উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গিয়েছে' (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা)—এই উক্তিতে 'উপকথা' যে-অর্থে ব্যবহৃত 'চন্নপুরের এই কারখানার মধ্যেই কাহারেরা আবার তৈরী করবে—নতুন এক উপকথা'—এখানেও সে-অর্থে ব্যবহৃত কি ? 'উপকথা' যদি 'উপাখ্যান' অর্থে নিই, তবে ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যাবার প্রশ্নটাই অবাস্তব, কেননা কাহারদের জীবন ইতিহাসের বাইরে ছিল এমন চিন্তাই উদ্ভট। যদি ধরা যায় 'ইতিহাস' বলতে এখানে আধুনিক শিল্প-সভ্যতা বোঝানো হয়েছে, তবে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বৈদেশিক শিল্পসভ্যতার সঙ্গে কাহারদের পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল নীলকুঠির সাহেবরাই। যিনি 'অরণ্যবহ্নি'তে সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী বলেন, তাঁর পক্ষে বনোয়ারীর জগৎটাকে 'উপকথা' আর করালীর যুগটাকে 'ইতিহাস' বলা অসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ।

বস্তুতঃ, ইতিহাস সম্বন্ধে তারাশঙ্করের চিন্তা অসংলগ্ন ও সঙ্গতিহীন। এক দিকে ইতিহাস পরিচালিত হয় কতিপয় মহামানবের দ্বারা, অগ্রসর হয় শ্রেয় থেকে শ্রেয়তরের দিকে, অন্যদিকে—'ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা জ্ঞান। পূজক তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুরোহিত তার কূটবুদ্ধি। সেখানে আজও ন্যায় নেই, পুণ্য নেই, পাপ নেই, অন্যায় নেই' (অরণ্যবহ্নি)। একদিকে ইতিহাস প্রবহমান অগ্রগামী নদী, অন্যদিকে 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি' (History repeats itself)—বিখ্যাত ইংরেজি প্রবচনটি আশ্চর্যভাবে সত্য। পৃথিবীতে সেই আদিকাল থেকে মানুষের জীবনে একই খেলার পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে (গুরুদক্ষিণা)।' অথচ তিনিই আবার বলেছেন—'জীবন—অন্তত মানুষের

মধ্যে প্রাণশক্তি—বিপ্লবধর্মা প্রগতিশীল; প্রতি মুহূর্তে সে তার অতীতকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পানে নূতন উপলব্ধির পথে চলেছে ('আমার সাহিত্য জীবন')।

টলস্টয় তাঁর চিন্তা ও জীবনেব মধ্যে সমন্বয় সাধনেব জন্য আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন; তাঁর মৃত্যুও ঐ চেষ্টারই পরিণতি। নিজের দর্শনকে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, হয়তো তার ফল সব সময় উপকাবক হযনি। চিন্তা ও কর্মের সঙ্গতি সাধনের খাতিরে তিনি শেক্‌স্‌পীযবের শিল্পনীতিব সমালোচনা কবেছেন এবং এমন কি নিজের মহৎ বচনাগুলিকেও খারিজ করতে চেযেছেন—যে কারণে মৃত্যুশয্যায় তুর্গেনিভ কাতরকণ্ঠে তাঁকে অনুবোধ করেছিলেন এই বলে, "সাহিত্যে ফিরে আসুন। সেখানেই আপনার আসল প্রতিভা। রুশদেশের মহাকবি, আমার অনুবোধ রাখুন।[১৫] কিন্তু টলস্টযের চিন্তা জুড়ে তখন একটিই প্রশ্ন: 'লও টলস্টয, তুমি কি তোমার নীতি অনুযাযী জীবনযাপন কবছ?'

তারাশঙ্কব টলস্টযের গভীর দার্শনিক অনুসন্ধিৎসাব অংশীদার ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর উপন্যাসে সব সময একজন দার্শনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হযেছেন, এবং যে-দর্শন প্রচার কবেছেন তার বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তার অসঙ্গতি। মঙ্গলবোধ, ঈশ্বরবিশ্বাস, নরনাবায়ণের সেবা, অহিংসা এই সব ধাবণাগুলি কখনই একটি স্বকীয অন্বযের দিকে এগিযে যাযনি, অথচ তাবাশঙ্করের ওপর টলস্টয়বাদের প্রভাব পড়েছিল গান্ধীবাদের মধ্য দিযে। এখানেই পার্থক্যটি স্পষ্ট—টলস্টয ছিলেন অহিংস অধ্যাত্মবাদী বিপ্লবের উদ্‌গাতা, গান্ধী ছিলেন তাব প্রয়োগকর্তা, তারাশঙ্কর এঁদেব উত্তরাধিকারী মাত্র। এই কারণেই তাঁর লেখায় চিন্তার মৌলিকত্ব অন্বেষণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁর দর্শনের অসঙ্গতি ধবা পড়ে, যখন দেখা যায়, সেখানে অহিংসা ও শক্তিপূজা পাশাপাশি অবস্থান কবছে ('আমাদেব কুলধর্ম তান্ত্রিক। আমি কিন্তু মনে মনে বৈষ্ণব হতে চেযেছি।··· বিরোধ ঘটেছে বৈকি।···ফিরেছি আবার শক্তিমন্ত্রে।'[১৬]), যখন দেখা যায়, গান্ধী ও সুভাষের নীতি একই সঙ্গে গ্রহণযোগ্য ('সুভাষচন্দ্রের আমি খুবই ভক্ত')[১৭]; যখন দেখা যায়, সামাজিক শক্তি হিসেবে রাজনীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তার পরই তাকে অস্বীকার করা এ দুই-ই আছে—'রাজনীতি সমাজনীতিকে যাঁরা বর্জন করতে চান তাঁরা জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গণ্ডিকে বৃহত্তরে প্রসারিত করতে ভীত হচ্ছেন' (আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ)[১৮] এবং 'সাহিত্যের আজ যে এই অবনতি তার কারণ, সাহিত্যজগতে রাজনীতির প্রবেশ' (আনন্দবাজার,

১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৮, জ্ঞানপীঠ-প্রাপ্তি উপলক্ষে)। যদি তারাশঙ্কর তাঁর এই স্ববিরোধিতার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে পারতেন, তবে তাঁর সাহিত্য ও দর্শন দুটোই একটা নতুন প্রাণশক্তি পেত, কিন্তু তাঁর চোখে এই স্ববিরোধিতা কখনই ধরা দেয়নি। তাই অসংখ্য বৈপরীত্যের সুখী সহাবস্থানে তিনি সমাধিস্থ। টলস্টয়ের মধ্যে সাধনা ছিল, সমাধি নয়; অন্বেষণ ছিল, আত্মতৃপ্তি নয়, জীবনের শেষ দিকে টলস্টয়ের আত্মসমীক্ষা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাই তাঁর নাটক "দি লাইট ছাট্ শাইনস্ ইন ডার্কনেস্'-এ তিনি নিজের দর্শনকে নানাভাবে জেরা করেছেন এবং তা করেছেন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। অন্য-দিকে তারাশঙ্কর শেষজীবনে আরো বেশী করে প্রশ্নাতীত ধর্মবিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তা নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছেন।

টলস্টয়ের 'মাই কন্‌ফেশন' ও 'দি কিংডম্ অব্ গড' এবং তারাশঙ্করের 'আমার কালের কথা' ও 'আমার সাহিত্য জীবন'-এর তুলনা করলেই বোঝা যায় প্রথমজন ছিলেন যথার্থ সত্যসন্ধানী, দ্বিতীয়জন মোহমুগ্ধ পর্যবেক্ষক। যদিও তিনি তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের পরিবর্তন ও পরিমার্জনে হাত দিয়েছিলেন তবু সেই প্রচেষ্টা নির্মোহ নির্দয় সমালোচক মনের নয়। 'আমি যদি আমার সমালোচক হতাম' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'এ কথার পরিবর্তে বলি, আমি আমার সর্বদাই সমালোচক' এবং 'চিরদিনই আমি আমার সমালোচক'। যদি তা সত্য হয়ে থাকে, তবে বলতে হয়, তারাশঙ্করের আত্মসমালোচনা আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল। একই প্রবন্ধে তিনি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন কিন্তু নাম উল্লেখ করেননি—'নাম না করাই ভালো, কারণ তাতে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। প্রকাশকের স্বার্থরক্ষার চিন্তা যে-আত্মসমালোচনাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় তা অবশ্যই আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মসমালোচনা নয়। তুলনামূলকভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লেখা সম্বন্ধে অনেক বেশী নির্ভীক ও নির্দয় হতে পেরেছিলেন, যার পরিচয় মিলবে 'লেখকের কথা'য় ও বিভিন্ন রচনার ভূমিকায়। লেখক তারাশঙ্কর নিজেই বোধহয় লেখক চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ নানান উপন্যাসে—'সন্দীপন পাঠশালা'র ধীরাবাবু, 'কালান্তরে'র গৌরীকান্ত, 'মহানগরী'র বিমল এবং 'আয়না' গ্রন্থের চন্দ্রশেখরবাবু তার স্বীকৃত প্রমাণ। কোথাও এইসব লেখক চরিত্রেরা তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও বিচারবোধের প্রমাণ দেয় না। কিন্তু তাদের জন্য লেখক তারাশঙ্করের মমতা অপরিসীম। তারাশঙ্করের এই মায়া-মমতা (নিজের প্রতি, নায়ক-নায়িকার প্রতি, পিতা-মাতার প্রতি, সেকালের প্রতি) তাঁর

প্রতিভাকে অনেকাংশে পঙ্গু করে রেখেছিল সন্দেহ নেই। নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব, সেকাল-একালের সংঘাত প্রভৃতির মুখোমুখি যখনই তিনি হয়েছেন, তখনই তাঁর স্নেহান্ধতা প্রকট হয়ে উঠেছে এবং তাঁর স্নেহকাতরতা সব সময়ই সেকালের প্রতিনিধিদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। ন্যায়রত্ন ও বিশ্বনাথের দ্বন্দ্বে তাঁর মানসিক সায় ন্যায়রত্নের দিকেই এবং ন্যায়রত্নের প্রতি নায়ক দেবু ঘোষের শ্রদ্ধা-ভক্তিতেই তা প্রকাশ পায়। 'আরোগ্যনিকেতনে'র জীবনমশায় ও প্রদ্যোত ডাক্তারের মধ্যে তারাশঙ্করের মনোযোগ প্রথমজনই বেশী লাভ করেছেন; শুধু তাই নয়, জীবনমশায়ের কাছে প্রদ্যোত ডাক্তারের আত্মসমর্পণে সেকাল-একালের মিলন দেখিয়েছেন। 'কালান্তরে' বৃদ্ধ কিশোরবাবুর প্রতিও সেই একই ধরনের দুর্বলতা দেখিয়েছেন তিনি, এবং এ যুগের প্রতিনিধি কপিলদেবকে এমন এক অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত করেছেন যা উদ্ভট। কপিলদেব শুধুমাত্র সুবিধাবাদের প্রতীক হলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু লেখক যেন ইচ্ছে করেই তাকে সমস্ত দোষের আকর করে তুলেছেন। যদিও রাজনৈতিক চিন্তায় সে অন্যান্যদের চেয়ে অনেক যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিমান তবু সে অ-মানুষ—এই যুক্তি ও হৃদয়বৃত্তির ব্যবধান যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখাতেন তারাশঙ্কর, তবে কপিলদেব একটি অবিস্মরণীয় 'চরিত্র হতো, তুর্গেনিভের 'ফাদার্স এ্যাণ্ড সান্‌স্' উপন্যাসের বাজারভ্ চরিত্রের মতো। কিন্তু যুগ-ব্যবধানের অমোঘ ইতিহাসকে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মন নিয়ে দেখার যে চেষ্টা তুর্গেনিভ করেছেন, তারাশঙ্করের মধ্যে তার তুলনা কখনই মেলে না। তাই কপিলদেব বাজারভ্ হতে পারে না। নিজের ধ্যানধারণাকে যাচাই করে নেবার তাগিদ ছিল না বলেই তারাশঙ্কর যে-চরিত্রের সঙ্গে নিজের মতামতের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন তার প্রতিই অনুরক্ত হয়েছেন, তাকে এক ধরনের আদর্শ বলে জাহির করতে চেয়েছেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু ফোটাতে পারেননি। ফলে তাঁর মন্তব্য ও বক্তব্য এক হয়ে ওঠেনি —অর্থাৎ উপন্যাসের ভাষায় চরিত্রসৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি, যেহেতু চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে তত্ত্বপ্রচার ও তার সত্যতা প্রমাণের অতি-সরল পথটিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আরোগ্যনিকেতনের কিশোর সম্বন্ধে লেখকের উক্তি স্মরণীয়—'এ ছাড়াও আর একটি মহৎগুণের সে অধিকারী। সে সত্যবাদী'; কিন্তু কিশোর সত্যবাদী শুধু তা বললে কিশোরের প্রতি লেখকের আত্মীয়সুলভ দরদই প্রমাণিত হয়, কিশোর যে সত্যবাদী তা প্রমাণিত হতে পারে তার আচরণে ও কর্মে, এবং এ ক্ষেত্রে লেখকের ভূমিকা উকিলের মতো। তারাশঙ্কর যে-প্রমাণ

না করেই রায় দিতে ভালবাসেন, তা ভালো লোকই হোক আর খারাপ লোকই হোক, তার প্রমাণ মিলবে এই ধরনের উক্তির মধ্য দিয়ে। 'কপিলদেব কোন কিছুকেই উপেক্ষা করেনি। সেগুলিকে চিরে চিরে দেখেছে, আসল স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছে', যদিও কপিলদেব সাক্ষাৎ শয়তান, তারাশঙ্কর নিজে এবং তাঁর প্রিয় আদর্শ চরিত্রেরা (উদাহরণস্বরূপ একই গ্রন্থের গৌরীকান্ত কপিলদেবের বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী নয়। 'আয়না' গ্রন্থে তিনি যে-আত্ম-সমীক্ষার চেষ্টা করেছেন, তা অবশেষে আত্মমহিমা প্রচারের নামান্তর হয়ে যায়। 'শুধু মানুষ হিসেবে চন্দ্রশেখর পুণ্যাত্মা, পবিত্র ও দুর্লভ'—মৃত সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর (যিনি আসলে তারাশঙ্কর) সম্বন্ধে কোন এক ভক্তের এই উক্তি তারাশঙ্কর নানাভাবে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। 'বাদল আর বাতাস' গল্পের শেষে যদিও অন্য এক ভক্তের মুখে শোনা যায় 'চন্দ্র শেখরদার সবটাই ভুল' সেটা নিতান্তই আকস্মিক—গল্পের নাটকীয়তাকে বাড়ায় মাত্র, আত্মসমীক্ষার গভীরতা বাড়ায় না। আত্মসমীক্ষা বলতে নাকি আধুনিক যুগ বোঝে যে 'মানুষের ভিতর থেকে একটি জন্তুর চেহারা দেখা যাক, বা না যাক, বের করতেই হবে'[১৯]—তারাশঙ্কর এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজের এমন একটা প্রতিকৃতি উপহার দিলেন, যার সঙ্গে 'জন্তু-জানোয়ার'-এর মিল তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষেরও মিল নেই, আছে যোগী তপস্বী-মহর্ষির।

টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ এই দু'জনের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা মনে এলেই যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো এই যে, সুযোগ পেয়েও তিনি এঁদের পথে চলতে পারেন নি, তাঁর কর্ম ও কলম দুটোই এক সংকীর্ণ জগতের মধ্যে আটকে থেকেছে। নিজে অভিজাতবংশীয় হলেও টলস্টয় অভিজাততন্ত্রের প্রতি স্পষ্টভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করে স্বশ্রেণী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গোটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করলেও সামন্ততান্ত্রিক সংকীর্ণতা ও সংস্কারকে বরদাস্ত করতে পারেননি। এখানেই তারাশঙ্করের সমাজচেতনার সীমাবদ্ধতা।

টলস্টয়ের আত্মিক বিদ্রোহ তারাশঙ্করের পক্ষে যদি সম্ভব না হয়ে থাকে তবে তিনি অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বাধীনতা-প্রীতিকে (আজকের বিচারে তা যতই অসম্পূর্ণ হোক) আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি রবীন্দ্র-নাথের অধ্যাত্মবাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর সমাজচিন্তাকে গুরুত্ব দেননি। বস্তুতঃ, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও সংস্কার এমনভাবে তাঁর মনকে দখল করেছিল যে, তাঁর ঔপন্যাসিক জগতে কোন ব্যক্তিকেই তিনি সেগুলির বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করতে দেননি; সেখানে সমাজসেবা আছে, কিন্তু সমাজসংস্কারের স্পৃহা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সমাজ ভাঙ্গার প্রবণতা আদৌ প্রশংসিত নয়। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, শাশুড়ী-বৌ ইত্যাদি সম্পর্কগুলি তারাশঙ্কর কখনই রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি-স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি—সনাতন সামন্ততান্ত্রিক অভিভাবকত্বের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েই তিনি ব্যক্তি-মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্বের বিচার করেছেন। 'সন্দীপন পাঠশালা'য় ধীরাবাবুর বিবাহ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে বিরোধ, 'পঞ্চগ্রাম'-এ ন্যায়রত্ন-বিশ্বনাথের উপাখ্যান, 'ধাত্রীদেবতা'য় মা-পিসিমার চিন্তার কাছে স্ত্রীকে ছোট করে দেখার মধ্যে শিবুর গর্ব, 'কালরাত্রি'র অংশুমান ও তার পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক, 'সুতপার তপস্যা'য় সুব্রত, তার মা ও স্ত্রীর ত্রিভুজাকার বিরোধ ইত্যাদি ঘটনায় লেখক তারাশঙ্কর যে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে নয়, সনাতন পারিবারিক নীতির পক্ষেই, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। নবীন-প্রবীণের যে-সংঘর্ষ তাঁর উপন্যাসের আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু, সেখানেও তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ছুটে গেছে প্রবীণের ধ্যান-ধারণা অভিজ্ঞতার প্রতি। তুর্গেনিভের 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসে যেরকম ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাজারভের বিদ্রোহী নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারা ও তার পরিণতিকে দেখানো হয়েছে, তারাশঙ্করের উপন্যাসে তার একান্ত অভাব চোখে না পড়ে যায় না, সেখানে বরং দুই বিরোধী শক্তির (প্রবীণ-নবীন, জমিদার ব্যবসায়ী, বৈষ্ণব-শাক্ত, গান্ধীবাদী-সন্ত্রাসবাদী) মধ্যে তাঁর পক্ষপাতিত্ব দোদুল্যমানতা কাটিয়ে এক কাল্পনিক সমন্বয়ে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে। 'সেকালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক'—এরকম উক্তি করেই তিনি আবার বলে ওঠেন 'আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই।' আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই 'একাল' ও 'সেকাল'কে তারাশঙ্কর গোটা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না ক'রে প্রধানতঃ তাঁর পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে বিচার করেছেন, একাল মানে তাঁর মা, এবং সেকাল মানে তাঁর বাবা, দু'য়ে মিলে এক 'অর্ধনারীশ্বর মূর্তি'। তারাশঙ্করের জীবনবেদ, কাল-চেতনা, শ্রেণী-চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ সবই এই পারিবারিক চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

'আমি বিদ্রোহের ছিলাম না', তিনি বলেছেন; তাই যারাই বিদ্রোহ করতে চেয়েছে তাঁর উপন্যাসে, তাদেরই তিনি আত্মসমর্থনের সুযোগ না দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। পুরাতন-নূতনের দ্বন্দ্বে জর্জরিত রাশিয়ার লেখকেরা

যেমন টলস্টয়, তুর্গেনিভ, চেখভ কখনই এই সংকীর্ণ বিচার-বুদ্ধির ফাঁদে পা দেননি।

'নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালো-মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভালো হয় না। জমিদারবংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমিদার। সুতরাং জমিদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 'জমিদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভালো-মন্দ বিচার করিবেন'[২১] —১২৭৯ সালে মীর মশাররাফ হোসেন এই বলিষ্ঠ ঘোষণা ক'রে স্বীয় শ্রেণীর যে-বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তারাশঙ্করের সাহিত্যে সে চেষ্টা থাকলে খুশি হওয়া যেত।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, তারাশঙ্কর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেও সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি, পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েও বর্তমান ভারতীয় সমাজের স্বরূপ অনুধাবন করার চেয়ে অতীত ভারতের মহিমা-কীর্তনে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন, চীন-রাশিয়া ভ্রমণ করেও আজকের দুনিয়ায় ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের ভয়ঙ্কর সংঘাতকে চেনার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন পেয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর অতিপ্রিয় পারিবারিক ধ্যানধারণার সংকীর্ণতাকে পরিহার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর ওপর পড়লেও তা সৃজনশীল হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নেননি, জেল খাটেননি, তার ওপর তিনি কোলকাতার সবচেয়ে অভিজাত বংশের সন্তান, তবু তিনি গোটা ভারতবর্ষ তথা আধুনিক দুনিয়ার সংকট ও সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন, মানুষকে দেখেছেন তাঁর নিজস্ব গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, ঠাকুরবাড়ির শেখানো কায়দায় নয়। তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদটিকে আত্মসাৎ করেছেন, কিন্তু তাঁর মানসিক উদারতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপ্তিটিকে গ্রহণ করতে পারেননি। গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলেও রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি, এমন কি গান্ধীর অতীতমুখীনতা ও বিজ্ঞান-বিরোধিতার সমালোচনা করেছেন—তাঁর মধ্যে দেখা যায় একটি সমালোচক মনের প্রবণতা। দেখা গেছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়াও নতুন চেহারা নিত। তাই শেষ জীবনে ছবি এঁকেছেন সম্পূর্ণ এক নতুন রঙে ও রেখায়, সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের কবিতা লিখেছেন নতুনভাবে জীবনের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে। তারাশঙ্করও ছবি-আঁকায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু

সেখানেও তিনি একই লাভপুরের লেখক তারাশঙ্কর। তাই নিজের উপন্যাসের অতি-পরিচিত চরিত্রগুলির মুখাবয়ব বারবার তাঁর ক্যানভাসে ছায়া ফেলেছে। বস্তুতঃ তারাশঙ্করের সমাজচেতনার মূলে দুটি উপাদান সক্রিয়—তাঁর শ্রেণীচেতনা অর্থাৎ জমিদার-চেতনা এবং তাঁর আত্মাভিমান ও বংশগৌরব। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে। তারাশঙ্করের অধ্যাত্মবাদ প্রাণশক্তি অর্জন করেছে সামন্ততন্ত্রের কাছ থেকে, যার মূলমন্ত্র হলো রাজা বা জমিদারকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বা অবতার হিসাবে ভাবা। জমিদারের অত্যাচারকে নিন্দা করেছেন তিনি, কিন্তু জমিদারের অবদানকে ছোট করে দেখেননি। তিনি নিজে নানান সমাজসেবার মাধ্যমে এই সনাতন জমিদারী আদর্শের ভাবমূর্তিকে রক্ষা করেছেন। তাঁর উপন্যাসেও (যেমন কালিন্দী, ধাত্রীদেবতা, ইত্যাদি) জমিদার-চরিত্রের এই সেবাধর্মের ওপর জোর দিয়েছেন, এবং সম্পত্তির বিনাশ না চেয়েও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, সম্পত্তির বিনাশ না চেয়েও নিজেকে আসক্তিহীন ঋষির ভূমিকায় স্থাপন করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ-দেবু ঘোষের মত নায়কদেরও অমৃতপথের যাত্রী হিসেবে মহিমামণ্ডিত করে তুলেছেন।

তারাশঙ্করের আক্ষেপ ছিলো তাঁকে প্রগতিবাদীরা বুর্জোয়া বলে সমালোচনা করে থাকে। যেমন তিনি, তেমনি তথাকথিত প্রগতিবাদীরা, একই সঙ্গে ভুল করেছেন। তিনি আদৌ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার দার্শনিক ছিলেন না, তিনি মনে-প্রাণে, কর্মে-আচরণে, নিষ্ঠাবান হিন্দুত্বে সামন্তবাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যেখানেই জমিদার-ব্যবসায়ীর সংঘর্ষ তিনি দেখিয়েছেন সেখানেই জমিদারের আত্মিক মহিমা ও ঐশ্বর্যের কাছে ব্যবসায়ী ম্লান হয়ে গেছে। 'ধাত্রী-দেবতা'র রামকিঙ্করবাবু, 'কালিন্দী'র বিমলবাবু, 'জলসাঘরে'র মহিম গাঙ্গুলী, 'মন্বন্তরে'র কানাইয়ের ছাত্রের পিতা ও অমলবাবু।

এঁরা সবসময়ই পার্শ্বচরিত্র, এবং শুধু তাই নয়, লেখকের অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র। এঁরা, অর্থাৎ আধুনিক ব্যবসায়ী শ্রেণী যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে প্রাচীন সামন্তপ্রভুদের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিবাদী, এরকম উপলব্ধি তারাশঙ্করের লেখায় পাওয়া যায় না। এর একটা কারণ হতে পারে, তিনি যে সব ব্যবসায়ীকে দেখেছেন তারা বৃটিশের দালাল-মুৎসুদ্দি এবং সেকারণেই সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ববোধের দিক থেকে অবজ্ঞার যোগ্য। কিন্তু একমাত্র 'কালিন্দী'র বিমলবাবু ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায়ীর মধ্যে মুৎসুদ্দি চরিত্রের বিন্দুমাত্র

আভাস পাওয়া যায় না। অন্যদিকে যে-জমিদার শ্রেণীর পক্ষে তারাশঙ্করের সহানুভূতি স্পষ্ট তারা কখনই বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা নেয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সন্তান এই জমিদারশ্রেণীকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য হতেন, এবং বৃটিশ প্রভুর দুই দালালশ্রেণীর গুণগত পার্থক্য নিয়ে চিন্তিত হতেন না। জমিদার-ব্যবসায়ীর যে সংঘাত তাবাশঙ্কবের অতি প্রিয় বিষযবস্তু তার ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার কবা যেতে পারে কেবলমাত্র একটি স্তরে—তাদের পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্কেব ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে, বৃটিশপ্রভুব প্রতি আনুগত্যে তাবা পবস্পবের সহযোগী। তাবাশঙ্কব এই সত্যটিকে কখনই উপলব্ধি কবেন নি এবং কবাও খুব একটা সম্ভব ছিল না, যেহেতু আমাদেব জাতীযতাবাদী আন্দোলনেব চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক মূল্যাযন এখনও হযনি এবং প্রাক্‌'-৪৭ ভারতবর্ষে প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদেব একটা ধাবণা ছিল যে, জাতীয বুর্জোযাদেব কাছে সামন্তশ্রেণী একেবারে পবাজিত। তাবাশঙ্কব এইকাবণেই হাহাকাব কবে উঠেছেন বিশ্বম্ভর, রামেশ্বর, ইন্দ্ররায় ইত্যাদিব পতনে, কাবণ তাঁর পক্ষে বুর্জোয়াকে কখনই সামন্তশ্রেণীর চেযে বেশী প্রগতিবাদী বলে মনে কবা সম্ভব ছিল না। গান্ধীবাদী হযেও তাবাশঙ্কব কেন বুর্জোয়াকে (জাতীয বা মুৎসুদ্দি যে-নামেই তাবা অভিহিত হোক না কেন আজ) এত ছোট করে দেখলেন তা ঠিক বোঝা যায় না। কারণ জাতীয কংগ্রেসে ব্যবসাযীদের অংশ মোটেই নগণ্য ছিল না এবং চবকা-শিল্পের প্রবক্তা গান্ধীব সঙ্গে বৃহৎ শিল্পপতিব, যেমন বিড়লাব, যোগাযোগ সুবিদিত। তবে কি আসল কাবণ এই যে, তারাশঙ্কব গান্ধীবাদী হযেও গান্ধীবাদেব অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক নীতিকে পুবোপুরি গ্রহণ কবতে পাবেননি ?

হযতো তাই। তারাশঙ্কর গান্ধীকে নিয়ে যতটা ভাববিহ্বল হযেছেন ততটা মাস্তিষ্ক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেননি। তাঁর কাছে গান্ধীজী মানেই ধর্মাবতার এবং রাজনীতি মানেই ১৯২১ সালেব অসহযোগ আন্দোলন এবং কখনো কখনো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ। '১৯৭১'-এ পরিবর্তিত বাজনৈতিক পটভূমিকাতেও তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধি সেই একই শিশুসুলভ সরলতার দ্বারা চিহ্নিত। সংশয-সন্দেহ মাঝে মাঝে উঁকি দিযেছে, কিন্তু তা-ও এমনভাবে যে, কখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। অংশুমান (কালরাত্রি) কংগ্রেসীও নয়, কম্যুনিস্টও নয, কিন্তু গান্ধীবাদী , সুব্রত (১৯৭১) কংগ্রেসীও নয় কম্যুনিষ্টও নয়, সে একটি নতুন পলিটিক্যাল পার্টি গড়তে চায়, যার সাহায্যে

নতুন পৃথিবী জন্ম নেবে ব্লাডবাথের ভেতর দিযে। অংশুমান যদিও গান্ধীবাদী তবু প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ধন্যবাদ জানায 'গান্ধীবাদেব গোঁড়ামি এবং ভ্রান্ত আদর্শগুলোকে সুকুশল নৈপুণ্যের সঙ্গে এদেশের জীবনের উপর থেকে' সরিযে ফেলার জন্য। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি কটাক্ষ করেছেন তারাশঙ্কর তাঁব শেষ দিককাব লেখায, কিন্তু তিনি যে ঠিক কি বলতে চেযেছেন, কোন্ পক্ষকে সমর্থন করেন, তা বোঝা সহজ নয।

গান্ধীবাদী হযেও সতীনাথ ভাদুড়ি 'জাগরী'-তে যেবকম গভীরতাব সঙ্গে দুই বিবোধী রাজনৈতিক মন ও মতের দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন তারাশঙ্কব তা পাবেননি। কারণ তিনি হলেন জাত বোম্যান্টিক। বাস্তবজগতের দ্বন্দ্বেব চেযে কল্পনার লড়াই তাঁব কাছে বেশী প্রিয—বস্তুর চেয়ে স্বপ্ন বেশী মূল্যবান। তাঁর জীবনেব যেটুকু অংশে তিনি মার্কস্‌বাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন —যাব জন্য হীবেন মুখোপাধ্যাযেব মতো প্রগতিবাদীরা এখনও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণ করেন, এবং যার জন্য দক্ষিণাবঞ্জন বসুর মতো বিরোধীমতের লেখকেরা দুঃখিত—তাতে তাঁর বোম্যান্টিক ভাববিহ্বলতা বিপন্ন হযে উঠেছিল। ফলে তিনি রূপকথাব জগতে পালাতে বাধ্য হযেছিলেন এবং সেই রূপকথায সাম্যবাদীব কপালে শযতানেব ভূমিকা অনিবার্য, তাই কপিলদেব-বিজয়দা-সুতপার সৃষ্টি। 'কালিন্দী'র অহীন যে আবেগের মাথায মার্কস্‌বাদে দীক্ষিত হয, যদি উপন্যাসে আরো কয়েকটা বছব কাটাতো, তাহলে হয তাকে সাম্যবাদ ছাড়তে হতো, নয শযতানেব ভূমিকা নিতে হতো। ব্যতিক্রম 'পঞ্চগ্রামে'র বিশ্বনাথ, তবে সে জেলেব মধ্যে মাবা গিযে লেখককে নিস্তার দিযেছে।

কম্যুনিষ্ট-চরিত্রেব প্রতি তারাশঙ্কবের অপ্রতিবোধ্য অবজ্ঞার পেছনে একটা কারণ হযতো এই যে, তাঁর সমসাময়িক কম্যুনিষ্ট নেতাবা ব্যক্তিগত জীবনে তেমন কোনো আদর্শ স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু ভণ্ড মার্কস্‌বাদীকে ঘায়েল কবা যত সহজ, মার্কস্‌বাদকে ঘাযেল করা যে তত সহজ নয (কারণ অমার্কস্‌বাদী দার্শনিকও মার্কস্‌বাদেব সুসংহত বক্তব্যকে তাচ্ছিল্য করতে সাহসী হন না।) এ সত্যেব উপলব্ধি তারাশঙ্করের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দুঃখের বিষয় এই যে, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতো দাযিত্বশীল জাতীয় অধ্যাপকের পদাধিকারী চিন্তাবিদ্‌ও তারাশঙ্করেব সামযিক সাম্যবাদী ঝোঁককে একটি আপদ হিসেবে দেখেছেন।[১২] বলেছেন, দশচক্রে ভগবান (অর্থাৎ তারাশঙ্কর) ভূত (তারাশঙ্কর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। তারাশঙ্করের কম্যুনিষ্ট-

বিদ্বেষ যে ক্রমশঃ একটি সংস্কারে পরিণত হয়েছিল তার প্রমাণ, যিনি মস্কোতে যাবাব মুখে সদ্যজাত নাতনীর নাম রাখেন লালি (লাল রাশিয়ার সম্মানে) তিনিই 'স্বতপাব তপস্যা' গল্পে একটি শিশুব গোর্কি নাম বদলে শিবা বাখার ঘটনায তৃপ্তি প্রকাশ করেন। সাম্যবাদ-বিরোধিতাব এই সবল শিশুসুলভ প্রকাশ কোয়েস্‌লার, সিলোন, স্পেণ্ডার, অরওযেল এঁদের মধ্যে পাওযা যায না। সরোজ আচার্য তাঁর 'বই পড়া' গ্রন্থে তাবাশঙ্কব ও অন্যান্যদের 'কোযেস্‌লাবদের বাঙালী সংস্করণেব মত' বলে যে তুলনা দিয়েছেন তা এই কারণেই যথার্থ নয। পুরনো 'মার্কস্‌বাদী' পত্রিকায বীরেন পাল (বাংলা সাহিত্যেব কযেকটি ধারা) তাবাশঙ্করের মার্কস্‌বাদ-বিবোধিতার মধ্যে যে সূক্ষ্মতা দেখতে পেয়েছিলেন তাও ভিত্তিহীন। তাবাশঙ্কব 'নিষ্ঠাবান হিন্দু' ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান চিন্তাবিদ্ ছিলেন না, তাই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও প্রশ্নকে তিনি সযত্নে এড়িযে গেছেন। চিবকাল তিনি মোটা দাগেই ছবি এঁকেছেন। অন্যদিকে মার্কস্‌বাদে দীক্ষিত হবাব অনেক আগেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায সূক্ষ্ম তুলিব ব্যবহাবে অভ্যস্ত ছিলেন। কোযেস্‌-লাবদের সূক্ষ্মতা তাবাশঙ্কবের মধ্যে নেই, আছে আজকের সমবেশ বসুব মধ্যে।

যাঁবা বিশ্বাস কবেন যে, তাবাশঙ্কবেব গান্ধীবাদী রাজনীতিই তাঁর ব্যর্থতার একমাত্র কারণ, তাঁদেব স্মবণ কবিযে দেবার প্রযোজন আছে যে, প্রতিক্রিযাশীল বাজনীতি ও দর্শনে আস্থা রেখেও বাল্‌জাক ও টলস্টয স্বীয শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পেবেছিলেন বাস্তবতাব খাতিরে এবং একাবণেই মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স বাল্‌জাকের এবং লেলিন-টলস্টযেব প্রশস্তি কবেছিলেন। বস্তুতঃ সত্যদ্রষ্টা হলে যে-কোনো প্রতিক্রিযাশীল শিল্পীই তাঁব শিল্পকার্যে অতিপ্রিয় দর্শনের বিপক্ষে চলে যান অসচেতনভাবে। তাবাশঙ্কব সত্যদ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি অর্ধ-সত্যেব সংগ্রাহক ছিলেন। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যাঁকে 'ঋতবাক্ ঋজুদর্শী' বলেছেন। তিনি আধুনিক ভাবতবর্ষের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কতখানি ওযাকিবহাল ছিলেন তাঁর প্রমাণ মিলবে উদ্ধৃতিতে—

'স্বাধীনতাব পব কলেবা আর ম্যালেবিযা এ দুটো ব্যাধি বিচিত্রভাবে দেশ-ছাড়া হযেছে।' (স্বতপার তপস্যা)

'রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটো স্রোত একসঙ্গে মিলালে আব রক্ষা থাকে না।' (কালরাত্রি)

তারাশঙ্কর স্বাধীন ভারত নিযে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার প্রমাণ মিলবে দেবু ঘোষের চিন্তায়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'ব শেষে, 'সন্দীপন পাঠশালা'র নতুন

ইস্কুল প্রতিষ্ঠায়। এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এক স্বপ্নের ভারতেরই নাগরিক ছিলেন। তাঁর শেষ পর্বের লেখায় কোথাও এমন ইঙ্গিত নেই যে, জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন হলেও জমিদারী উচ্ছেদ হয়নি, ভারতের কৃষক এখনও প্রাচীন সামন্ত-প্রভুদের দ্বারা নিপীড়িত, অনাহারে অপুষ্টিতে তাদের অকাল মৃত্যু ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে, বেকারী বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতিতে একদিকে, অন্যদিকে ভেজাল, দুর্নীতি ও নিরক্ষতার অপরিবর্তিত অবস্থায়। আধুনিক ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক অবস্থা কখনই তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বরং এক বিশাল কাল্পনিক কর্মযজ্ঞের ছায়া পাওয়া যায়—সোনার ভারতের ছবি, যেমন এখন অনেক লেখক সোনার বাংলার ছবি আঁকতে ব্যস্ত। কংগ্রেসে থেকেও, সরকারী পুরস্কার নিয়েও তারাশঙ্কর তাঁর দৃষ্টিকে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নিবদ্ধ রাখতে পারতেন যদি তাঁর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা থাকতো। কিন্তু ১৩৫০, মন্বন্তর প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে ব্যক্তি-জীবনের ওপর পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রভাব কীভাবে কাজ করে তার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া গেলেও পরবর্তী লেখায় তা একেবারেই অনুপস্থিত। অগভীর ও অসম্পূর্ণ হলেও প্রাক্-সাতচল্লিশ ভারতবর্ষের পটভূমিকায় রচিত তাঁর উপন্যাসে অর্থ নৈতিক শক্তির খানিকটা ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। 'গণদেবতা'র অনিরুদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে উৎখাত হয়ে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হলো এ ঘটনাকে তারাশঙ্কর যতই হাল্কাভাবে ছুঁয়ে যান না কেন, ঘটনাটার স্বীকৃতিই প্রমাণ করে যে, অর্থ নৈতিক পটভূমিকাকে তিনি অগ্রাহ্য করছেন না। কিন্তু শেষদিককার লেখায় আমরা পাই এমন একজন তারাশঙ্করকে যিনি সামাজিক-অর্থ নৈতিক শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ভুলে গিয়ে মৃত্যু, ধর্ম, পাপ, বিবেক ইত্যাদি বিষয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো আকণ্ঠ মগ্ন।

তারাশঙ্করের স্বপ্নদর্শনের আর একটি প্রমাণ এই যে, তিনি দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার প্লাবন দেখতে পেয়েছেন ভারতের মাটিতে—সেই ১৯২১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। অসহযোগ আন্দোলন থেকে ভারত-চীন, ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পর্যন্ত অধিকাংশ ভারতবাসীই যে জাতীয়তাবোধ নামক প্লাবনে ভেসে যায় নি এবং যেটুকু শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এর সরব প্রচারে ব্যস্ত তারাও যে প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক মর্যাদা নিয়ে চিন্তিত নয়, এ খবর তিনি রাখতেন না, যদিও 'গ্রামের চিঠি' লিখতেন যুগান্তরে এবং 'কালরাত্রি' ও

'১৯৭১'-এ *বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ তিনি করেছেন। প্রকৃত* অর্থে তিনি কোনো রাজনৈতিক উপন্যাস লিখতে পারেননি, যে-উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি থাকবে কেন্দ্রে। তাঁর রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি কাহিনীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, একসূত্রে গ্রথিত হয়নি। 'ধাত্রীদেবতা'কে পুলকেশ দে সরকার একটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করছেন,[২৩] কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মা-পিসিমার মহিমার কাছে রাজনীতি এখানে গৌণ হয়ে গেছে। তারাশঙ্করের 'শেষ কথা' গল্পও তাঁর শেষ কথা—'উহু পাপ হবে' বুড়ো লালমোহন পাণ্ডের এই সতর্কবাণী তারাশঙ্করেরও। একে ধর্মবোধ বলা যায়, রাজনৈতিক উপলব্ধি বলা যায় না। রাজনীতি আর যাই হোক, সমাজ থেকে দূরে দৃষ্টি সরিয়ে বিমূর্ত শুভাশুভের চিন্তা এবং স্বপ্নের জাল বোনা নয়। প্রতিক্রিয়াশীল-প্রগতিবাদী—যারাই রাজনীতি করে তারাই এটা বোঝে, তারাশঙ্করের ভ্রান্তি এই যে, তিনি যে রাজনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, তার আদর্শ-রূপ কল্পনা করে তাকেই উপন্যাসের কাঠামোয় জুড়ে দিতে চেষ্টা করতেন, কখনই তাকে বাইরের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে ও যাচাই করে নেবার কাজে আগ্রহী হননি। এ সব কারণেই তিনি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তৈরী ঐতিহ্য হাতে পেয়েও এবং বিপুল অভিজ্ঞতার মালিক হয়েও বেশীদূর এগোতে পারেননি। তাঁর হাতে বাংলা সাহিত্যের বাস্তববাদী শিল্পরীতি আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারতো, যদি তিনি একাধারে রোম্যান্টিক নাটকীয়তা, অন্যধারে নীতিবাগীশতাকে পরিহার করতে পারতেন। বস্তুত যাকে 'ক্রিটিক্যাল্ রিয়্যালিজম্' বলে, যার উপস্থিতি অ-মার্কস্‌বাদী-পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় স্পষ্ট, তারাশঙ্করে তার উপস্থিতি নিতান্তই ক্ষীণ। কেউ কেউ আছেন যাঁরা ইউটোপীয়ান ভবিষ্যতের উল্লেখ থাকলেই একটা উপন্যাসকে 'বাস্তববাদী' বলে ভাবেন (অর্থাৎ naturalism বা অবিকল অনুকরণের থেকে ভিন্ন) তাঁরা তারাশঙ্করের উপন্যাসে রিয়্যালিজম এমন কি সোশলিষ্ট রিয়্যালিজমও দেখতে পান। 'উপসংহারে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতের যে চিত্র দেবার চেষ্টা তাঁর উপন্যাসে আছে, সেই আলোকে দেখলে তারাশঙ্করের নির্মাণ-পদ্ধতিকে বাস্তবাদের কাছাকাছি বলে মনে হয়' —এ হল কার্তিক লাহিড়ীর ধারণা।[২৪], এবং 'সমাজ বাস্তবতার সার্থক ব্যবহারে তারাশঙ্কর বনোয়ারীর নাটকীয়তাকে উপন্যাসে সুপ্রযুক্ত করেছেন,' এ হল সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাস।[২৫] যাঁর উপন্যাসে ভবিষ্যৎ বর্তমানের গর্ভে জন্ম

নেয় না, চাপিয়ে দেওয়া হয়, অতীত অসংলগ্ন স্মৃতিচারণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কথকতাব পিছু পিছু আসে রোম্যান্টিক অতিনাটকীয়তা, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও সম্পর্ক একটা পর্যায়ের পব উবে যায়, পারিবারিক মূল্যবোধের কাছে কাল-চেতনা নতমস্তক হয়, তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হলেও সামগ্রিক বিচারে বাস্তববাদী নন, এবং সমাজ-বাস্তবতার কথাটার প্রয়োগ তার ক্ষেত্রে আতিশয্য ছাড়া আর কিছু নয়। তারাশঙ্কর 'উপকথা'র লেখক, সেই উপকথাব ভেতর জায়গায় জায়গায় তিনি বাস্তববাদেব অতি কাছে এসেছেন, কিন্তু তারপবই তাঁর প্রিয় স্বপ্নাবিষ্ট বোম্যান্টিক বা আদি পিতাসুলভ (Patriarch) অধ্যাত্মবাদী ভঙ্গীতে প্রত্যাবর্তন কবেছেন। তারাশঙ্করের এই অ-বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীব মূলে আছে তাঁর অসংলগ্ন, অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজ-চেতনা, যা গান্ধীবাদী হযেও সুভাষবাদী, বৈষ্ণব হযেও শাক্ত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়েও উদার, অতীতমুখী হযেও ভাবীকালের দিকে আগ্রহ প্রকাশে ব্যস্ত।

বস্তুতঃ তাবাশঙ্করের কৃতিত্ব, ও আজকের দিনে তাঁব গুরুত্বের কাবণ, তাঁর সমাজদর্শন বা লেখনবীতিব মধ্যে পাওযা যাবে না, তা পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাস-জগতেব বিশালতায়, বিষয়-নির্বাচনে, গ্রামীণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ভাঙ্গা-গডার চিত্রাঙ্কনেব চেষ্টায়। এই গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় যখন তাঁর উপন্যাসের সঙ্গে একদিকে আজকের নগরসর্বস্ব নকলসর্বস্ব আনন্দবাজারী সাহিত্য, অন্যদিকে রক্তমাংসশূন্য মেকী বামপন্থী সাহিত্যের তুলনা মনে আসে। উপন্যাসের পরিধি বাডিযে নীচুতলার মানুষকে তাতে স্থান দেওযা এবং তা বই-পডা জ্ঞান দিয়ে নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে—এখানেই তারাশঙ্কব বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শবৎচন্দ্রকে পেরিযে গেছেন এবং এখানেই তিনি অনেক বামপন্থী সাহিত্যিকের কাছে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। জমিদার হয়েও যিনি 'অরণ্যবহ্নি'র মতো রচনায় হাত লাগাতে পারেন, তাঁকে সমালোচনা করা যায, অগ্রাহ্য করা যায না এবং যেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ঔপন্যাসিক-গল্পকাব আমাদের আধুনিক সাহিত্যে নেই বললেই চলে, তাই তারাশঙ্করের গুরুত্ব থেকে যায় এবং তা যে ভবিষ্যতেও ঐতিহাসিক দিক থেকে থাকবে সে-বিষযে বর্তমান লেখক নিঃসংশয়।

নির্দেশিকা

১। সাহিত্যের সত্য, তাবাশঙ্কর।

২। 'গণদেবতা তারাশঙ্কর', সুমথনাথ ঘোষ। কালি ও কলম. তারাশঙ্কর স্মৃতিসংখ্যা ১৩৭৮।

৩। ‘এক সহিষ্ণু সম্রাট’, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ঐ

৪। ‘আমার চোখে তারাশঙ্কর’, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ। ঐ

৫। প্রমথনাথ বিশীর কবিতা, ‘তারাশঙ্কর’, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র।

৬। কালি ও কলম, তারাশঙ্কব-স্মৃতি সংখ্যা।

৭। চক্ষুদান, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কালি ও কলম, তারাশঙ্কর-স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৭৮।

৮। আমার কালের কথা, ২য় সং, পৃঃ ১২।

৯। „

১০। „ ২১৭ পৃঃ।

১১। „

১২। সাহিত্য ও সাহিত্যিক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৩। তাবাশঙ্কব বচনাবলী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

১৪। ঐ।

১৫। স্টিফ্যান্ জোয়েগ্, লিভিং থট্স্ অব্ টলস্টয়, পৃঃ ১।

১৬। তাবাশঙ্কব, ডঃ হবপ্রসাদ মিত্র, পৃঃ ৮৭।

১৭। „

১৮। সাহিত্যেব সত্য।

১৯। ঐ।

২০। মনেব আবনায় নিজের ছবি, আযনা, তারাশঙ্কব।

২১। জমিদাব দর্পণের ভূমিকা।

২২। তারাশঙ্কব বচনাবলীর ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

২৩। স্বদেশী উপন্যাসেব চার অধ্যায, পুলকেশ দে সরকাব।

২৪। ঐতিহ্য প্রগতি তারাশঙ্করের উপন্যাস, এক্ষণ, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৮;

২৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলা ‘উপন্যাসের কালান্তর’ দ্রষ্টব্য।

———

তারাশঙ্করের উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১

'আমার বই বলুন আর যা-ই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা-কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি। তার বেশী আমার আর কিছু নাই।'[১] এই জবানবন্দী যদি সত্য হয়, তা'হ'লে মানতে হচ্ছে তারাশঙ্কর সচেতনভাবেই ছিলেন আঞ্চলিক। কিন্তু যে-লেখকের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ভৌগোলিক সীমাশাসন দ্বারা খণ্ডিত তাঁর উপন্যাস কীভাবে স্পর্শ করবে জীবনের ব্যাপক ও গভীর সত্যকে এবং অনাগতকে? তারাশঙ্করের উপন্যাস, অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি কি এই সীমা-শাসনের জন্য লুপ্তির পথে হারিয়ে যাবে না? সদ্যবিগত একজন লেখক সম্পর্কে, বিশেষ করে সে লেখক যখন তারাশঙ্করের মত বহুল-প্রচারিত উপন্যাসসমূহের লেখক, এ প্রশ্ন এখনই উঠছে না। কিন্তু এখনই না উঠলেও কোনদিন উঠবে না, এমন কোন কথা নেই। তারাশঙ্করের উপন্যাস ভবিষ্যতেও সমাদৃত হবে কি-না সেই দুরূহ প্রশ্নটি কিন্তু একান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাঢ়-অঞ্চলের পটভূমিতে গড়ে-ওঠা তারাশঙ্করের সবচেয়ে সুলিখিত উপন্যাসগুলির উপর। 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'রাধা' এমন ভাল উপন্যাস তিনি আর ক'খানা লিখেছেন? এই উপন্যাসগুলির পরিবেশ রচনা করেছে অবশ্যই রাঢ়-বাঙলা, তা-ও বিশেষভাবে বীরভূম। আজও লালমাটির বীরভূমের উপর দিয়ে যেতে যেতে কৃষ্ণদাসী-মোহিনীর কথা যদি মনে পড়ে, যদি কাহার-পাড়ার বনোয়ারী হঠাৎ তার সবল পেশীবহুল চেহারা নিয়ে হাজির হয়, চপলা কালো শশী বা দুর্গা-মুচিনী যদি চঞ্চল ছন্দের তরঙ্গ তুলে পথ হেঁটে যায় তা'হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। শিবু-অহীন্দ্র-দেবুপণ্ডিত-বিপ্লবী যতীন হয়ত হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাসের অনিবার্য তাগিদে, কিন্তু রঞ্জন-কমল-নিতাই-বসন্ত-সুচাঁদ-টিকুরীর খুড়ী এখনও বোধহয় বীরভূমের গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের ধর্মবিশ্বাস, পরশ্রীকাতরতা, লোভ, পরনিন্দা, দেহকামনা, সমবেদনাবোধ যেমন এদেরকে দিয়েছে স্থানিক পরিচয়, তেমনি গ্রাম-বাঙলার চিরন্তন সম্পদও করে

তুলেছে যেন। গ্রাম-বাঙলা আজও বিশ শতকের এই উত্তপ্ত মুহূর্তে ধর্ম-নির্ভর বাঙালীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই এক স্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড। সুতরাং ধর্মকে বাদ দিয়ে গ্রাম-বাঙলা সত্য নয়। গ্রামের কথা লিখতে গেলে তাই ধর্মের প্রসঙ্গ এসে পড়ে অনিবার্যভাবে। তারাশঙ্কর বীরভূমের ধর্মকর্ম, বীরভূমের নদ-নদী-খাল-বিল, বীরভূমের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ সবকিছুর সঙ্গে একান্তভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্রষ্টাসত্তার সঙ্গে বীরভূম জড়িয়ে ছিল ওতপ্রোতভাবে। তাঁর উপন্যাসগুলিও হয়ে রয়েছে তাঁর এই অভিজ্ঞতার বাহন।

২

জয়দেব-চণ্ডীদাসের বীরভূমে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব আজও ব্যাপক। এই বীরভূমেই আছে বামাক্ষ্যাপার তারাপীঠ। এখানেই বক্রেশ্বরের মন্দির। সর্বোপরি ধর্মঠাকুর আছেন আসর জাঁকিয়ে। শৈব-বৈষ্ণব-শাক্ত সকলেই রয়েছেন অভেদে। তারাশঙ্করের উপন্যাসেও ধর্মের ভেদ কোনরকম উগ্র অসহিষ্ণুতার মূর্তি ধারণ করেনি।[১] একমাত্র 'রাধা'য় মাধবানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণদাসী-মোহিনীর ভাবদ্বন্দ্ব শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের নমুনা হয়ে রয়েছে। মাধবানন্দ শক্তিতে বিশ্বাসী, বৈষ্ণবীয় প্রেমরসের সাধক তিনি নন, কিন্তু কৃষ্ণদাসী-মোহিনী, বিশেষভাবে কৃষ্ণদাসী, অবক্ষয়িত বৈষ্ণবধর্মের প্রতিনিধি। মাধবানন্দের প্রতি কন্যা ও জননীর অনুরাগ, এদের প্রতি মাধবানন্দের রূঢ় আচরণ, কৃষ্ণদাসীর উন্মত্ততা সব মিলে ফুটিয়ে তুলেছে দেহাচার-সর্বস্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কালক্রমে ঘটনাচক্রে মাধবানন্দের মোহিনীর আশ্রয়লাভ এবং তাকেই 'রাধা' বলে ব্যগ্র বাহুতে আলিঙ্গন শেষপর্যন্ত রাধা-প্রেমেরই মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছে। বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের ছবি 'রাইকমল' উপন্যাসেও আছে, কিন্তু 'রাধা' ছাড়া ধর্মের দ্বন্দ্ব কোথাও উগ্র নয়। বরং রাঢ়-বাঙলায় বিপরীত ধর্মাদর্শের মানুষেরা যে দারিদ্র্যের সর্বময় প্রভুত্বের দণ্ডতলে একই তালে পা মিলিয়েছে তার প্রমাণ তারাশঙ্করের উপন্যাসেই আছে। শুধু শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব নয়, হিন্দু-মুসলমানও নিজেদের ধর্মের ভেদ মানে না—'হিন্দুদের অনেক বাড়ীতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। লাঠিয়ালদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই থাকিত। পীরের দরগায় হিন্দুবাড়ীর মানসিক চিনি-মিষ্টির নৈবেদ্যের রেওয়াজ এখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য দেখুড়িয়া কালীবাড়ীতে মুসলমান রোগীও আসিয়া থাকে'।[২] হিন্দু-

মুসলমানের এই মিলিত জীবনযাপনের ছবি তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সততার সঙ্গেই এঁকেছেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর বা হুগলীর নৃতত্ত্ব আলোচনা করেছেন যাঁরা, তাঁরা দেখেছেন সমগ্র রাঢ়-অঞ্চলেই ডোম-বাউরী-সাঁওতাল-মাহিষ্য প্রভৃতি জাতিরই প্রাধান্য। আবার ইতিহাসের কোনও এক পর্যায়ে ক্ষন্নিবৃত্তির তাগিদে অন্ত্যজ হিন্দু মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ধর্মীয় আচার-আচরণের পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র সীমার গণ্ডিতে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখেনি। অতএব মুসলমানের মহরমে হিন্দুর বাড়ীতে লাঠিয়াল আসা বা পীরের দরগায় হিন্দুর চিনি-মিষ্টির মানসিক রাঢ়-বাঙলার ধর্মীয় জীবনের সত্যতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে।/ বর্ণের ভেদ যে নর-নারীর মিলনপথে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না তার প্রমাণ দুর্গা-মুচিনীর জন্য অনিরুদ্ধ কর্মকারের মনে 'অঙ' ধরেছে এবং দেবু পণ্ডিতের স্ত্রী বিলু, পদ্ম ও দুর্গার সঙ্গে নির্বিচারে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণের এবং ধর্মের মানুষের মধ্যে এই যে অনায়াস অকপট হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এর কারণ তারাশঙ্কর সবিস্তারে আলোচনা না করলেও তাঁর উপন্যাসগুলি এই সত্যই প্রমাণ করছে যে, অর্থ নৈতিক দুরবস্থা রাঢ়ের জনজীবনে এক ধরনের সাম্যের সুর এনে দিয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর সমকালীন জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেছেন, সামন্ততন্ত্রের ক্রম-অবলুপ্তি এবং শিল্প-ভিত্তিক নবজাত বুর্জোয়া শক্তির বিকাশের স্বরূপ তিনি জেনেছেন, জেনেছেন রাঢ়-বাঙলায় এই সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া শক্তির এক ধরনের শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ। এবং পরিশেষে সামন্তপ্রভু ও তার অনুগ্রহধন্য বিত্তহীনের সর্বহারা শ্রেণীতে ক্রমপরিণতির বেদনাদায়ক পরিস্থিতিও তাঁর চোখে পড়েছে। কলকাতার কাছে-পিঠে হুগলী নদীর দু'ধারে শিল্পের (Industry) বিকাশ দ্রুত ঘটলেও শিল্পে বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়ার স্থান অনেক পিছনে। কিন্তু পরিমাণে অল্প হলেও কলকারখানা-নির্ভর নতুন সভ্যতার ঢেউ এইসব অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছিল। পুরাতন কৃষি-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্প-ভিত্তিক সমাজের প্রথম সংঘাতে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়ালেন নতুন বিত্তবানেরা। 'গণদেবতা'য় কঙ্কণা গ্রামের বর্ণনায় তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন তারাশঙ্কর—'সমৃদ্ধগ্রাম। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। সেখানকার মুখুজ্জে বাবুরা লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী,—এ অঞ্চলের প্রায় গ্রামই এখন তাহাদের কুক্ষিগত। মহাজন হইতে তাহারা প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার হইয়া উঠিয়াছে ; শিবপুর কালীপুর গ্রাম দু'খানাও ধীরে ধীরে তাহাদের গ্রাসের আকর্ষণে

সর্পিল জিহ্বার দিকে আগাইয়া চলিযাছে'। নতুন বিত্তবানদের মধ্যে আছে মাড়োয়ারীরা আর শ্রীহরি পালের মত অসাধু অসচ্চরিত্র হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা কিছু লোক—'ময়ূরাক্ষীর ওপারে আধা শহর—রেলওয়ে জংশন; সেখানে বহু ধনী মাড়োয়ারীর গদি আছে—দশ-বারটা চালের কল, গোটা দুয়েক তেলকল, একটা আটার কল আছে;—সেখানেও শ্রীহরি পালকে 'ঘোষ মশায়' বলিযাই সম্বর্ধিত করা হয়'। ঐতিহ্যহীন নতুন বিত্তবানদের ঐশ্বর্য মূলতঃ কল-কারখানা থেকে এবং এদের স্বভাবও শ্রীহীন, কদর্য। বিশ্বম্ভর রাযের দল পুরোনো ঠাট বজায় রাখতে যেমন নিজেদের শেষ সম্বলটুকুও ঢেলে দিতে পারে বাঈজীনাচের আসরে, নতুন ঐশ্বর্যবানেরা কিন্তু সেই ধরনের মেজাজ-মর্জির অধিকারী নয়। এরা হয় শ্রীহরি পালের মত চোরাপথে অন্ধকারে অভিসারে বের হয়, বারবার লাঞ্ছিত হয়েও নির্লজ্জের মত আত্মগরিমায় দিশেহারা হয়ে পড়ে, নযত বিমল মুখুজ্জের মত চাবুক দিয়ে নারীদেহের উপর তার অধিকার কায়েম করে। শ্রীহীন সম্ভ্রমহীন এই কদর্য লোলুপতা বুঝি নতুন বিত্তবান শ্রেণীরই চরিত্রধর্ম। শ্রীহরি পাল সম্পর্কে অনিরুদ্ধ-পত্নী 'পদ্ম'র ভীতি, বিমল মুখুজ্জের সামনে সাঁওতাল-মেয়ে 'সারী'র যুপবদ্ধ পশুর মত নির্জীব নিষ্প্রাণ সহিষ্ণুতা হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা বিত্তবানদের কাছে সহজপ্রাণের মৃত্যুর রূপক। কৃষির জাযগা দখল করে নিয়েছে কল-কারখানা, ফলে করালীর মত ডাকাবুকো যুবক প্রমত্ত কালা-পাহাড়ের মত কাহারদের চিরকালীন বিশ্বাসের স্বর্গে আঘাত হেনেছে, মদ্যপ দেহলোলুপ বিমল মুখুজ্জের কাছে প্রবল শক্তিমান ইন্দ্র রায়কে মাথা হেঁট করে কাশী যাওয়ার পথ খুঁজতে হয়েছে। সামন্ততন্ত্রে শোষণ ছিল, চাষীর উপর জমিদারের গ্লানিময় প্রভুত্ব ছিল, কিন্তু কল মানুষকে করে তুলেছে যন্ত্র, নিষ্প্রাণ দেহ। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় এবং তারও আগে 'কালিন্দী'তে রাঢ়-বাঙলায় শিল্প বিস্তার সম্পর্কে তারাশঙ্করের এই জাতীয় একটা অভিযোগ ফুটে উঠেছে।

উনিশ শতকের শেষপাদে ইংল্যাণ্ডের কৃষি-ব্যবস্থায় depression এসেছিল ভয়াবহভাবে। শিল্পের (Industry) ব্যাপক প্রসারের ফলে পূর্বের কৃষিব্যবস্থা একেবারে ধ্বসে গিয়েছিল। এই নতুন অবস্থার পটভূমিতে 'টেস'-এর ট্র্যাজেডি (১৮৯১) লিখেছিলেন টমাস হার্ডি। বিধবা 'টেস' Angel Clare-কে বিবাহ করে কামনাতুর D'urberville-এর কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। Clare-এর উন্নাসিকতায় তার সেই স্বপ্ন গেল চুরমার হয়ে। পরিস্থিতির

মোকাবিলা করতে গিয়ে 'টেস'কে শেষ পর্যন্ত D'urberville-কে হত্যা করে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। সতীত্ব রক্ষার জন্য কৃষক-রমণী টেস নরহত্যা করেছে। সতীত্ব রক্ষার জন্য তারাশঙ্করের 'পদ্ম'ও অস্ত্রে শান দিয়েছে, কিন্তু তার আচরণে ছিল এক ধরনের ভীরুতা, ভীরুতা ছিল 'সারী'রও। যে-মাটি তাদের গড়ে তুলেছে সেখানে সতীত্ব এক সুপ্রাচীনতম সংস্কার, কিন্তু 'টেস'-এর দুর্জয় সাহসিকতা তাদের ছিল না। তাই টেস-এর ট্র্যাজেডি আর 'সারী'র বিমল মুখুজ্জের সামনে ব্যাধভীতা হরিণীর অবস্থা সমস্তরের নয়। ওয়েসেক্স-অঞ্চলের কৃষক-জীবনের ট্র্যাজেডির রূপক হিসেবে হার্ডির 'টেস' যে-মূল্য পাবে, সে-মূল্য 'কালিন্দী' বা 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম' পাবে না। হার্ডি টেস-এর ট্র্যাজেডির দিকে তাঁর সমস্ত দৃষ্টি কেন্দ্রিত রেখেছিলেন, কিন্তু তারাশঙ্কর 'কালিন্দী'তে যেন রায় ও চক্রবর্তী পরিবার দুটির 'সাগা' রচনা করেছেন, আর 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম'ও প্রায় মহাকাব্যিক পটভূমিতে লেখা। সুতরাং দৃষ্টির এককেন্দ্রিকতা উপন্যাসে যে-জাতের গভীরতা সৃষ্টি করে, তা হার্ডির থাকলেও তারাশঙ্করের ছিল না। ঔপন্যাসিক হিসেবে হার্ডি এবং তারাশঙ্কর সমস্তরের না হলেও, এবং বীরভূম ও ওয়েসেক্স একই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার না হলেও এই দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু সাদৃশ্য আছে) তারাশঙ্কর এবং হার্ডি উভয়েই traditionalist, উভয়েই অলৌকিক ও অদৃষ্টে বিশ্বাসী, নৈরাশ্যের সুর উভয়ের রচনাতেই শোনা যায়। ১৯১৫ সালে একটি চিঠিতে তাঁর নিজের সম্বন্ধে হার্ডি জানিয়েছেন—'I 'believe' (in the modern sense of word) · in spectres, mysterious voices, intuitions, omens, dreams, haunted places, etc But I do not believe in them in the old sense any more for that.'[৩] অলৌকিক এবং অদৃষ্টে বিশ্বাস হার্ডি-কে এক ধরনের নৈরাশ্যভাবে পীড়িত করেছিল, জীবন সম্পর্কে এক ট্র্যাজিক-বোধে উপস্থিত করেছিল। তারাশঙ্করের উপন্যাসের অনেক চরিত্রেই জীবন ও ঈশ্বর সম্পর্কে এক ধরনের সংস্কার বাসা বেঁধেছে। মৃত বিলু ফিরে আসবে, এ বিশ্বাস দেবু পণ্ডিতের অবচেতনে বাসা না বাঁধলে আলো-আঁধারিতে সে ভুল করে দুর্গা-কে আলিঙ্গন করবে কেন? মিথ্যা সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে রামেশ্বরের অবচেতনের গভীরে আত্মগ্লানি না জমলে দু'হাতে কুষ্ঠ হওয়ার কাল্পনিক সম্ভাবনায় তিনি চিত্তবিকারে ভুগবেন কেন? কেনই বা এক পাহাড়ি সাপকে কেন্দ্র করে বনোয়ারী-সুচাঁদ অলৌকিক বিশ্বাসে মেতে উঠবে? এই অপ্রাকৃতে বিশ্বাস, দৈবে নির্ভরশীলতা

আবার গ্রাম-বাঙলার মানুষগুলিকে করে তুলেছে ভাগ্যদেবতার ক্রীড়নক। ফলে এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে জোর পায় না, দেবতার আশীর্বাদ বলেই মানুষের শোষণকে মেনে নেয়। এদের অবস্থা বিপ্লবী যতীনের মুখ দিয়ে লেখক নিজেই বলেছেন অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে—"পল্লীর কিন্তু সেই একইরূপ। অদ্ভুত পল্লীগ্রাম। বিশেষ এদেশের পল্লীগ্রাম সমাজ-গঠনের আদিকাল হইতে ঠিক একইস্থানে অনন্ত পরমায়ু পুরুষের মত বসিয়া আছে। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্‌স্‌-এর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, Sir Charles Metcalf বলিয়া গিয়াছেন—'They seem to last where nothing else lasts' অদ্ভুত। 'Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds revolution, Hindu, Pathan, Mogul, Mahratta, Sikh, English are masters in turn, but the village community remains the same."[৪] চলমান বিশ্বের পরিবর্তনের ছাপ শহরে চোখে পড়লেও গ্রাম-বাঙলা যেন চিরস্থির। গ্রাম-বাঙলা এক কুসংস্কারের গণ্ডিবদ্ধ হয়ে চরম অত্যাচারকে মেনে নিয়েছে দুর্ভাগ্যের দান বলে।

হার্ডির দেখা ওয়েসেক্স ছিল agricultural depression-হেতু এক রুগ্ণ গ্রাম্য-অর্থনীতির ছবি। সেদিন গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কৃষিজীবী মানুষেরা কল-কারখানা ও খনিতে দলে দলে চাকুরী গ্রহণ করেছিল অথবা পলায়ন করেছিল অ্যামেরিকায়। তারাশঙ্করের দেখা গ্রাম-বাঙলায় এই ধরনের depression আসেনি, কিন্তু গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-হাঁসুলি বাঁকের উপকথা পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরের রচনা। সুতরাং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রাম-বাঙলার হতশ্রীরূপ এই সমস্ত উপন্যাসে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মন্বন্তর শুধু নগরজীবনেই নির্ধনকে মুহূর্তে ধনবান বা রাজাকে ভিখারী করেনি, নতুন বিত্তবানেরা গ্রাম-বাঙলাতেও প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, অর্থের কৌলীন্যে প্রাচীন গ্রামজীবনকে গড়ে নিয়েছিল নিজেদের মনের মত করে। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সংগত কারণেই কোনও দরদী শিল্পীকে নৈরাশ্য-পীড়িত করে তুলতে পারে। তারাশঙ্করও কিছুটা নৈরাশ্য-কবলিত হয়েছিলেন, যদিও তাঁর বিশেষ ধরনের মানসিক গঠন তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত স্বর্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এই বিশ্বাসের জন্যই ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলে দেবুপণ্ডিতের মহিমময় কারাবরণ, অহীন্দ্রের সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা ও কারাবরণ, জীবনমশায়-এর ঈশ্বরের পাদপদ্মে মানসিক বিশ্রামলাভ এবং ভোগোত্তীর্ণ সেবাধর্মে কৃষ্ণস্বামীর পরম তৃপ্তিলাভ। বিশ্বাসের স্বর্গেই মাধবানন্দের

তৃপ্তি মিলেছিল। সীতারামও সব সংগ্রামের শেষে খুঁজে পেয়েছিল চরম প্রশান্তি এই বিশ্বাসের রাজ্যেই। শুধু 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'তে বনোয়ারীর সরল বিশ্বাস কোন মূল্য পেল না। নতুন দিনের পত্তন হল। করালীদেরই জয় হ'ল। বনোয়ারীর বেদনার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত বেদনা মিশে গিয়ে হাঁসুলি বাঁকের উপকথা-কে শেষ পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যকর্মে পরিণতি দিয়েছে। অসহায় স্বল্পতুষ্ট গ্রামবাসীদের তারাশঙ্কর খুবই কাছ থেকে চিনতেন, কলকারখানা যে পল্লীজীবনে ছন্দপতন ঘটিয়েছে মর্মান্তিকভাবে, তাও তিনি দরদ দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই বণিক সভ্যতার এই সাড়ম্বর আবির্ভাবকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। কিন্তু রাঢ়ের মাটিতে এই শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যে বারুদের স্তূপের মত সঞ্চিত হচ্ছে তা তিনি অনুমান করতে পারেননি। শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারারা যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়তে পারে, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, এ ভাবনা তারাশঙ্করের ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে যাঁর সজাগ লেখনী সত্যিকারের আশার পথ দেখতে পেরেছিল তিনি অবশ্যই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের কাছে রাঢ়-বাঙলা আর নারায়ণের কাছে বরেন্দ্রভূমি ছিল একান্ত সত্য। সর্বহারার জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বরেন্দ্র-ভূমির পটভূমিতে লিখেছিলেন 'লালমাটি'। কিন্তু তারাশঙ্করের প্রকৃত ঝোঁকটা ছিল সামন্ততন্ত্রের দিকে। তাই অহীন্দ্র, দেবুপণ্ডিত বা বিপ্লবী যতীনের মুখ দিয়ে সর্বহারার বেদনা ফুটিয়ে তুলতেও লেখক এমন জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছেন যে, সংগঠিত গণদেবতার শেষ জয়ের ছবি তাঁর আর আঁকা হ'ল না। তারাশঙ্কর আমাদের দেশের তথাকথিত অহিংস আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কেও কিছু জানতেন, কিন্তু গ্রামগঞ্জের মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন সমাজজীবনে যে কি প্রচণ্ড পরিবর্তন এনে দিতে পারে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী তিনি ছিলেন না। তাই দৈব, ভাগ্য প্রভৃতি মাঝে মাঝেই তাঁর উপন্যাসের নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন।

৪. রাঢ়ের ধর্মবিশ্বাস, রাঢ়ের মানুষ তারাশঙ্করের উপন্যাসে যেমন সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি রাঢ় বাঙলার বিশেষভাবে বীরভূমের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও তারাশঙ্করের উপন্যাসে সজীব হয়ে উঠেছে। নদীর মধ্যে ময়ূরাক্ষী ও কোপাই-এর উল্লেখ আছে অনেকবার, আর সরস এবং রুক্ষ দিগন্তবিস্তৃত মাঠের যে বর্ণনা আছে তা-ও বিশেষভাবে বীরভূমের কথা মনে

করিয়ে দেয়। কোপাই-এর বর্ণনায় আছে চমৎকার কবিত্ব—'কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাড়াপড়শীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইটপাটকেল, পাথর, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে, তেমনি ভাবেই সে দিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী। ...কোপাই-নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে।'[৫] কোপাই তার দুই পাশের জনজীবনের সঙ্গে একতান-বদ্ধ, আর ময়ূরাক্ষী যেন কুটিল নিয়তির মত নির্মম, নিরাসক্ত—'এ যে ময়ূরাক্ষী ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, ভয়ঙ্কর বেশে সাজিয়াছে। এপারে বাঁধের কোল হইতে ওপারে জংশনের কিনারা পর্যন্ত ভাসিয়া উঠিয়াছে। জলের রঙ তার গিরিমাটির মত। দুই তটভূমির মধ্যে ময়ূরাক্ষী কুটিল আবর্তে পাক খাইয়া তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। গেরুয়া রঙের মত জলস্রোতের বুক ভরিয়া আসিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা।'[৬] প্রকৃতির রূপ বর্ণনার সময় বীরভূম যে তারাশঙ্করের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে বিরাজ করেছে তার নমুনা ছড়িয়ে আছে বহু জায়গায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্—(ক) 'অনাবৃষ্টির বর্ষায় খর রৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াসার ভাব'[৭]। (খ) 'সমস্ত গাঁ-টা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে বাতাসে তপ্ত বালু হু হু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উঠছে, শেয়াল কুকুর শকুনি চেঁচাচ্ছে,'[৮]। (গ) 'দ্বিপ্রহরের দিক্‌চক্রবালে ধূলার আস্তরণ দেখা দিতে শুরু করিয়াছে, বাতাস উতলা হইয়াছে, সেই উতলা বাতাসে সে ধূলার আস্তরণ ঝিরঝির করিয়া বাহিয়া যায় যেন দূরের নদীর প্রবাহের মত'[৯]। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে যেহেতু 'আঞ্চলিক', তাই বোধ হয় প্রকৃতির রূপচিত্রণে প্রত্যক্ষতা সৃষ্টির এই প্রয়াস। তাঁর উপন্যাসে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন তিনি, প্রকৃতিকে সেখানেই হয় মানবজীবনের পটভূমিরূপে নয়ত বা স্বতন্ত্র চরিত্ররূপে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর কালিন্দী, কোপাই বা ময়ূরাক্ষী, আমাদের মনে হয়েছে, উপন্যাসেরই এক-একটি চরিত্র। প্রকৃতি-রূপ বর্ণনায় এই একাগ্রতা, এই প্রসঙ্গেই মনে করিয়ে দিচ্ছে, অন্য এক ঔপন্যাসিক হার্ডির কথা যিনি তারাশঙ্করের রাঢের

মতই ওয়েসেক্সকে রূপে-রসে চিরন্তনত্ব দিয়ে গিয়েছেন।) হার্ডির 'The Return of the Native-এর মার্চ মাস আবির্ভাবের বর্ণনাংশটুকু উদ্ধার করতে চাইছি এইখানে—"The month of March arrived, ··A timid animal world had come to life for the season. Little tadpoles and efts began to bubble up through the water, and to race along beneath it, toads made noises like very young ducks, and advanced to the margin in twos and threes, overhead bumble-bees flew hither and thither in the thickening light, their drone coming and going like the sound of a gong.' বর্ণনীয়কে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলার এই প্রচেষ্টা তারাশঙ্কর এবং হার্ডি উভয়কেই তাঁদের অঞ্চলের সাধারণ মানুষের নিকটে এনে দিয়েছে। হার্ডি সম্পর্কে ওয়াল্টার এলেন-এর এই উক্তি তারাশঙ্কর সম্পর্কেও প্রযুক্ত মনে হয়: 'It is in his provincialism and naivete, one could almost say his uncouthness, that his strength lies' [১০]

৫.

বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধতা ঔপন্যাসিকের মহিমা খণ্ডিত করতে পারে, যেহেতু মহৎ ঔপন্যাসিক কোন বিশেষ দেশ বা কালের ন'ন। এই বিচারে তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি মহত্ত্বের দাবি করতে পারে কি? তত্ত্বহিসেবে প্রথমেই এ'কথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে, উপন্যাসের পটভূমি নয়-জীবন-বিন্যাস-কৌশল বা জীবন সম্পর্কে মৌলিক প্রত্যয়ই কোন ঔপন্যাসিককে দেশকালোত্তীর্ণ মহিমায় ভূষিত করতে পারে। হার্ডির সমালোচকেরা তাঁর উপন্যাসের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করেও বলেছেন: 'greatness of conception' এবং 'the sense of cosmic scope behind the action' হার্ডিকে উনিশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গৌরবময় আসন দান করবে। এই গুণ দুটি কি আমরা তারাশঙ্করের উপন্যাসেও পাইনি? (যে-জীবনকে তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যে-জীবনের সত্য ছবি তিনি সততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার বৈচিত্র্য এবং ব্যাপকতা যত সামান্যই হোক এবং তাঁর উপন্যাস যে ক্লান্তিকরতা বা অবসাদই আনুক না কেন, জীবন সম্পর্কে এক অস্তিবাচক বোধ, যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসার যুগেও বিশ্বাসের প্রশান্তি তাঁর উপন্যাসকে এক স্বতন্ত্র মহিমা দেবে বৈকি! যে বিশ্বাসের স্বর্গ তিনি গড়েছেন আমরা সেখান থেকে নির্বাসিত,

একথা সত্য ; কিন্তু বাঙালীর জীবনকে তিনি যে 'এক বৃহত্তর আত্মসীমা-বহির্ভূত তাৎপর্যের'[১১] সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন তার মূল্য ও তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। বললে বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হবে না, বিশেষভাবে যতদিন ময়ূরাক্ষী বীরভূমের প্রাণ-প্রবাহিণী হয়ে থাকবে, ধর্মঠাকুর হয়ে থাকবেন অধিদেবতা, এবং রাঢ়-বাঙলার সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, কাহারেরা বেঁচে থাকবে ততদিন তারাশঙ্করও বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

পাদটীকা :

১। জরাসন্ধ : তারাশঙ্কর ও রাঢ়দেশ। 'কালি ও কলম'-অগ্রহায়ণ ১৩৭৮।
২। 'পঞ্চগ্রাম'।
৩। Walter Allen : The English Novel (Pelican books) পৃষ্ঠা ২৪৫।
৪। 'গণদেবতা'।
৫। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'।
৬। 'পঞ্চগ্রাম'।
৭। 'চৈতালী ঘূর্ণি'।
৮। ঐ
৯। 'কবি'।
১০। Walter Allen : The English Novel (Pelican books) পৃষ্ঠা ২৪৪।
১১। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

তারাশঙ্করের উপন্যাস ঃ শিল্পরীতি

ক্ষেত্র গুপ্ত

তিন

এক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। অনেক উপন্যাস লিখেছেন। জীবনভাবনা ও শিল্পরীতির দিক থেকে তাদের তিন পর্যাযে ভাগ করা সম্ভব। ঔপন্যাসিকের প্রতিভার ক্রমবিকাশ বুঝতে গেলে তা দরকারীও কিন্তু বর্তমান ক্ষুদ্রদেহ প্রবন্ধের জন্য আমি তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলিই মাত্র গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় পর্যায় বলতে ধাত্রীদেবতা থেকে আরোগ্যনিকেতন পর্যন্ত। এরূপ নির্বাচনের কিছু কৈফিয়ৎ আছে।

এই পর্যাযে তারাশঙ্করের উপন্যাস শিল্পগুণে সবচেযে উন্নত। পূর্বস্তরে পাষাণপুরী-রাইকমল-চৈতালিঘূর্ণি-আগুন প্রভৃতির মধ্যে তিনি পথ খুঁজেছেন, হাত পাকিযেছেন। এইবারে তিনি নিজের জগৎ চিনে নিযেছেন। গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-কবি-অভিযান-কালিন্দী-হাঁসুলি বাঁকের উপকথা-নাগিনীকন্যার কাহিনীর মত বইগুলি এই কালসীমায লেখা হয়েছিল। ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে ৫০-৫২। পরে এরূপ শিল্প সার্থক উপন্যাস দু-একটিই মাত্র (যেমন রাধা) লেখা হযেছে।

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি নির্বাচন করতে হলে এই সমযের মধ্যে খুঁজতে হবে। তাঁর শিল্পরীতি ঘটিত প্রতিনিধিত্বমূলক যা-কিছু বিশিষ্টতা এখানেই মিলবে।

পরবর্তীকাল প্রধানত দুর্বল পুনরুক্তি এবং পরধর্মে আত্মসমর্পণ।

দুই

বাংলা উপন্যাসের সিদ্ধকাঠামোর প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রে। যুরোপের জাত-উপন্যাসের দেহ থেকে তার রূপ আলাদা। গল্প এখানে সুনিবদ্ধ—প্রায়ই নাট্য-ধর্মী। তার কেন্দ্র স্পষ্ট, বিবর্তনপথ পরিধিতে সুবলযিত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মাঝে মাঝেই কেন্দ্রাতিগ প্রবণতার শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত করে ধরলেও শেষ-পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের অন্তগত থেকেছে। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের দেহগঠনের ক্ষেত্রে খুবই বঙ্কিমানুগ। বহিরঙ্গ ঘটনার উচ্চতাল কমেছে। নাট্যোচিত চিত্তোদ্ঘাটনের

স্থলে হৃদয়ভাব ব্যাখ্যান বেড়েছে। আবেগগাঢ় সংক্ষিপ্তির জায়গায় উচ্ছ্বসিত শিথিলতা এসেছে। কিন্তু মানবিক সমস্যাব আধারে আদিমধ্যঅন্ত্যযুক্ত কাহিনী-নির্মাণ, উপকাহিনীব তাৎপর্যপূর্ণ বিন্যাসে বঙ্কিমীকাঠামোর নিশ্চিত অনুগমন।

বাঙালীর উপন্যাসে মূলত ঘরেব কথা (সে ঘবে দেশের সমাজেব ঢেউ কখনও বেগে কখনও ধীরে লাগলেও)—মানুষেব হৃদযসমস্যাব কথা এতকাল প্রাধান্য পেয়েছে। তাব দেহগঠনও তাই-ই, পরিবারেব চৌহদ্দীব মতো সুনিযমিত সংহত। বিশিষ্ট ব্যতিক্রম বঙ্কিমেব আনন্দমঠ, বাজসিংহ, রবীন্দ্রনাথেব গোবা, শরৎচন্দ্রেব পথের দাবি। ঘরেব বাইবে পা বাড়ালেই পথ। নানাদিকে তার গতি-দেশে কালে অনেক অনেক মানুষের ভীড়ে সেখানে ছড়িযে পড়তে হয। কিন্তু বাংলা উপন্যাস এতকাল মূলত গৃহেব।

তারাশঙ্কর যখন উপন্যাস লিখতে আবম্ভ করলেন তখন শবৎচন্দ্রেব জনপ্রিযতা তুঙ্গে, প্রভাবও সুবিস্তৃত। সমকালীন লেখকদেব পক্ষে তাঁকে এড়িযে যাওযা দুরূহ ছিল। উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায, নবেশ সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ অনেকেই শবৎচন্দ্রেব শিল্পবীতি অনুসবণ করেছেন। শেষোক্ত লেখক অবচেতনাশ্রয়ী মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পথ ধবে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলেও উপন্যাস কাঠামোয তিনিও প্রথানুগ। কল্লোলের কেউ কেউ বহির্মুখ হযেছিলেন, কতকটা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহি-বাসনায, কিছুটা যুবোপীয উপন্যাসের আদর্শে, এবং অনেকটাই তাঁদের স্বভাবসুলভ উৎকেন্দ্রিকতায।

তাবাশঙ্কর অন্দবনেব লাগিদে বাইরে বেরুলেন। তাঁব উপন্যাস যথার্থ পথেব —গ্রামগঞ্জপ্রান্তবেব, গোষ্ঠীজীবনেব, সম্প্রদাযেব, অঞ্চলেব —গৃহবলিভুক নয।

এই বাইবেটা কেমন চিনে নেওযা যাক।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলেই বাঙালি মধ্যবিত্তের মন ব্যাপকভাবে নিজের থেকে দেশের দিকে ছড়িযে পড়েছিল। শুধু সহবেব নয, গ্রামের ভদ্রলোকেবাও শ্রমজীবী ও অন্ত্যজ শ্রেণীগুলিব দিকে অন্যভাবে তাকাতে অভ্যস্ত হলেন, বিশেষ কবে যাঁবা স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তাবাশঙ্কর এই শেষোক্ত দলেব একজন।

১৯১৯-২২-এ একবার এবং ১৯৩০-৩৪-এ আবার স্বদেশী আন্দোলনের দুই বিরাট ঢেউ দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িযে পড়েছিল। আর. পি. দত্ত রচিত 'ইণ্ডিযা-টু-ডে' গ্রন্থ থেকে দুটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওযা হল—

১. **The advance of the movement in 1921 was demons-**

trated, not only in the enthusiastic development of the non-co-operation movement, but in the accompanying rising forms of mass struggle in all parts of the country, as in the Assam-Bengal railway strike, the Midnapore No-Tax campaign, the Moplah rebellion in Malabar in the South, and the militant Akali movement against the Government—defended rich Mahants in the Punjab.

২. The mass movement which developed already in April went considerably beyond· ·simple limits, with rising strikes, powerful mass demonstrations, the Chittagong Armoury Raid in Bengal, the incidents at Peshawar, which was in the hands of the people for ten days, and the beginnings of spontaneous no-rent movements by the peasants in a number of localities the power of the movement during 1930 exceeding every calculation of the authorities, and growing inspite of repression, began to raise the most serious alarm in the imperialist camp.

সভা-শোভাযাত্রা-পিকেটিং-প্রচার-হরতাল, বিপ্লববাদী তরুণদের বিবিধ প্রয়াস—অনেক মানুষ। জনতার ভিড়। গণজাগরণ। দুই ঢেউয়ের মধ্যভাগে এবং উত্তরকালে তীব্রতা না থাকলেও এই অভিজ্ঞতার পূর্ণ বিরাম ঘটে নি।

পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলিম লীগের জন্ম, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। বাঙালি ভদ্রলোক বাস্তব অর্থে নৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্তের মিছিল সহরের দিকে চলেছে। পুরানো গোষ্ঠীজীবন ভেঙে পড়ছে, স্বপ্নঘেরা গ্রাম, জমিদারী-স্বচ্ছলতা বিধ্বস্ত হচ্ছে। তারাশঙ্কর এই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলেছেন।

৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ৪৫-৪৬-এর ব্যাপক গণবিক্ষোভ — অবশেষে স্বাধীনতালাভ। ১৯৫০-৫২ পর্যন্ত শিল্পচিত্তে স্বাভাবিকভাবে এরই জের চলেছে।

এই দেশ-কাল-মানুষ তারাশঙ্করকে বিষয় যুগিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, উপন্যাসরীতির মূলে গভীর প্রভাব ফেলেছে। শুধু যুগবৈশিষ্ট্যের জন্য এরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। পল্লীজীবন ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্বন্ধ, বিচিত্র গণগোষ্ঠী-কৌম ও আধাকৌমবদ্ধ লোকেদের প্রতি আগ্রহ তাঁকে বিস্তৃত

জনজীবনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে আকর্ষণ করেছে। সমকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষযোগও স্মরণযোগ্য। ফলে রীতিঘটিত এই নবীনতা।

৫২-পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের শিল্পীমন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিকল্প আত্মানুসন্ধানের মধ্যে তিনি প্রবেশের পথ খুঁজেছেন। জনতার তাজা ভিড় হারিয়ে গেছে। তারাশঙ্করের সে পর্যায়ের উপন্যাস বর্তমান আলোচনার বাইরে রেখেছি।

তিন.

তারাশঙ্করের কয়েকটি উপন্যাস এক ব্যক্তির পথ চলার কাহিনী। সে-পথ অতি দীর্ঘ। প্রায় জীবনের মতো। ধাত্রীদেবতা গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-কবি-অভিযান একটি চরিত্রকে আশ্রয় করে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রায়ই উক্ত পাত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় জাতীয় জীবনের একটা ক্রমাভিব্যক্তি কিংবা সমাজের নানা অংশধৃত হয়েছে। শিবনাথের ব্যক্তিগত সমস্যার দ্বারা, তার হৃদয়ের কামনা-বাসনার দ্বারা ধাত্রীদেবতার প্লট নিয়ন্ত্রিত নয়। শিবনাথ একটা ব্যক্তিত্বের সূত্র যাতে গ্রাম থেকে সহর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সমাজজীবনের একটি গতি রূপ পেয়েছে। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামের জনতার মধ্যে দেবুপণ্ডিতের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেন বিলীয়মান। গ্রামীণ মানুষদের মূঢ়তা ও চাঞ্চল্য মন্থরতা ও স্পন্দন-বৈচিত্র্য অনুভবের জন্য, ঐ জীবনস্রোত থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত মানুষ হিসেবেই তাকে গড়ে তোলা হয়েছে। শিবনাথকে ধাত্রীদেবতার মুখ্যপাত্র বলা গেলেও দেবুকে কখনও পৃথক করে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে হয় না। তার মাধ্যমে কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ উপন্যাসে স্থান পেলেও না। ধাত্রীদেবতায়ও উপন্যাসের আলোচ্য বিষয় শিবনাথকে ঘিরে আবর্তিত হয়নি—তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কবিয়াল নিতাই ডোম অবশ্যই ঐ উপন্যাসের নায়ক, যেমন ড্রাইভার প্রতাপ সিং অভিযানের। কিন্তু এখানেও গ্রামগঞ্জ আড়তদারের আস্তানা ডোমপাড়া গোয়ালপাড়া ঝুমুরদল নানা স্বভাবের ট্যাক্সিযাত্রী ট্রেনের স্টেশনে লোকজনের আনাগোনা। নায়কদের সূত্রে এলেও তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এই মানুষেরা। বহু প্রসঙ্গকে নায়ক স্পর্শমাত্র করেছে, অনেকগুলির সে দর্শক, কোথাও আবার তার চিত্ত সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রায় সর্বত্র বিষয়গুলির স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। এইসব মানুষ ও তাদের সমাজ কাহিনীর পটভূমি

বা পরিবেশ নয়—এরাই উপন্যাসেব বিষয। চারধারের পৃথিবী ঐ সব নাযকদের চিত্ত প্রতিক্রিয়াজাত নয, তাদের গতিও কারও হৃদয়াভিমুখী নয়। বরং নাযকই চোখ মেলে ধরেছে এই বিচিত্র জনাকীর্ণ বাইরের পৃথিবীর দিকে।

হাঁসুলিবাঁক বা নাগিনী-কন্যায তারাশঙ্কব একনাযকত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন। হাঁসুলিবাঁকে বনওযারি ও করালীর মাথা অন্যদেব চেযে উঁচু হলেও, চারপাশের একএকটা বিবাট দলের নেতা হিসেবেই তাদের বিশিষ্টতা। সেই জনতাব বিচিত্রতা এবং যৌথস্বভাব ও আচরণ ঐ দুই ব্যক্তিব জীবনকাহিনীতে ও অভিপ্রাযে সীমাবদ্ধ নয। ববং বনওযারি ও করালী যতটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী এক-একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি। নাগিনীকন্যা শবলা-পিঙলার উপবেও বেশী আলো পড়েছে, কিন্তু বিষবেদেদের গোটা সম্প্রদাযের ছবিই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।

তারাশঙ্করেব উপন্যাসে জনতাব ভিড—বহু মানুষেব কথা। ছোট-বড মাঝারি চরিত্রেব সংখ্যা অনেক। কার কতটুকু প্রয়োজন মাপবার মানদণ্ড নেই। কারণ প্রধান চবিত্র ও প্রধান কাহিনী পৃথক করে নেবার চেষ্টা বৃথা। এর আগে বা সমকালে এক-একটা উপন্যাসে এত লোকজনেব সমাবেশ আর দেখা যায না।* এবং তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীক্ষ্ণতায কোনো জটিল মনুষ্যের চিত্ত-বিশ্লেষণে কখনও ব্যস্ত নন। তাঁর ব্যক্তিরাও সরল। অধিকাংশই সবল টাইপ। এবং দলবদ্ধ বহু মানুষের প্রাধান্য। এবা মনধর্মী নয—প্রাণের স্বাভাবিক স্রোতে ভাসমান।

এব মধ্যেই তারাশঙ্করেব উপন্যাসের শিল্পরূপের বিশিষ্টতা।

চার.

তাবাশঙ্করেব উপন্যাসে উচ্চরব ঘটনাব কিছু আধিক্য আছে। শান্ত জীবনের সমতাল তাঁর বচনায প্রাপ্তব্য নয়। বাসনা-কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাস, গুপ্তহত্যা, আত্মহত্যা, ষডযন্ত্র, শক্তিপরীক্ষা, প্রতিহিংসাগ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহত্যাগ, ঘর জ্বালানো, চুরি-রাহাজানি-জুলুম-মাবপিট-দাঙ্গা এমনি নানা উত্তেজক ঘটনার সমাবেশ তাঁর উপন্যাসে। মধ্যবিত্তের গার্হস্থ্য জীবনে তরঙ্গিত ঘটনাবর্ত দুর্লভ। সেখানে ক্ষীণকণ্ঠ নৈমিত্তিক জীবন। অন্যপ্রান্তে বুদ্ধিজীবী মানুষের মনের

* অবশ্য রবীন্দ্রনাথেব তথাকথিত রূপক-সংকেত নাট্যে সাধারণ মানুষের ভীড একটা তাৎপর্য-পূর্ণ উপাদান।

গহনে অনেক অন্ধকার—নানাস্তরের লুকোচুরিতে-দ্বন্দ্বে-মিলনে জটিলতা। ফলে উপন্যাসে যেখানে নগরবাসী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কাহিনী সেখানে ঘটনা-বিরলতা প্রতিষ্ঠিত রীতি। এবং নব্য ভঙ্গী হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অঙ্গীকৃত। আধুনিক উচ্চাঙ্গ উপন্যাসের বড় ভাগটা শিল্পকলার এই পথ ধরেছে। তারাশঙ্কর আলাদা। জীবনের যে অংশকে তিনি আয়ত্ত করতে চেয়েছেন তাতে কর্মবহুল উত্তেজনা অচ্ছেদ্য। এ তৎপরতার অনেকটাই হয়ত স্থূল। সে কারণেই বিশ্বাস্য। শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষেরা প্রাণের ও প্রবৃত্তির সহজ আকর্ষণে কর্মমুখর। বঙ্কিমচন্দ্র এককালে ঘটনাবহুল কর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন ইতিহাসের আশ্রয়ে। তাতে অভিজাত পরিমার্জনা এবং সূক্ষ্ম শিল্প-কুশলতা ছিল। তারাশঙ্কর জনতার জীবন মিছিল থেকে একটা গোষ্ঠীর পল্লীর বা অঞ্চলের সমগ্রতা থেকে উপন্যাসের রূপাবয়ব নিতে গিয়ে অমার্জিত ঘটনাস্রোতে পড়েছেন। অন্ত্যজ সমাজের সঙ্গত স্থূলতা তার স্বধর্ম। 'একটি' মানুষের কথা কাজ ভাবনা অন্তর্গূঢ় ও স্মিত, 'বহু'র হলেই তা কোলাহল। তারাশঙ্করের উপন্যাসে ঘটনার কোলাহল আসলে :অনেক মানুষের কলরব। রূপভঙ্গিমায় তিনি মার্জিত ও স্বল্পোচ্চার হতে চাইলে তাঁর মূল জীবনচেতনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হত।

তারাশঙ্করের ঘটনাবলী উত্তেজক অথচ বেশীর ভাগই প্রাত্যহিক। বিশিষ্ট নয়। তরঙ্গিত হলে ঘটনা বিশিষ্টতা পায়—আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু বিশিষ্ট ঘটনা বলতে বুঝব এমন কোনো ব্যাপার যা প্রাত্যহিক নয়, অভ্যস্ত নয়। অর্থাৎ যার কারণ ও ফল সুদূরপ্রসারী। যাদের তাৎপর্য আছে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির জীবনে। তীব্র ঘটনা বিশিষ্ট হতে পারে। আবার নাও পারে। তাছাড়া আরম্ভে যে ঘটনা বিশিষ্ট মনে হয়েছিল বারংবার পুনরাবর্তনে তা প্রাত্যহিক হয়ে ওঠে। 'প্রাত্যহিক' বলতে প্রতিদিন ঘটবেই এমন বোঝাতে চাই না—এরূপ প্রায়ই ঘটে, এরূপ হওয়া নিয়মমাফিক বা স্বাভাবিক। দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

ক. গোবিন্দলাল গুলি করে রোহিণীকে মারল। [বঙ্কিম/কৃষ্ণকান্তের উইল]	তীব্র	বিশিষ্ট
খ. নগেন্দ্র হরনাথকে চিঠি লিখল। [বঙ্কিম/বিষবৃক্ষ]	তীব্র নয়	বিশিষ্ট
গ. নগেন্দ্রের বাড়িতে মেয়েরা রান্নার আয়োজন করছে। [বঙ্কিম/বিষবৃক্ষ]	তীব্র নয়	প্রাত্যহিক
ঘ. জমিদার বাড়ি ধরে নিয়ে রহিমকে প্রহার। [তারাশঙ্কর/পঞ্চগ্রাম]	তীব্র	প্রাত্যহিক [অর্থাৎ খাওয়া শোওয়ার মতো প্রতিদিন না ঘটলেও এরূপ হওয়া স্বাভাবিক]
ঙ. বাবার থানে মানত করা মুরগী পুজো না দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল করালী। [তারাশঙ্কর/হাঁসুলী বাঁকের উপকথা]	তীব্র	বিশিষ্ট [কিন্তু ক্রমে এই নিয়ম ভাঙাই হয়ে দাঁড়াল করালীর রীতি। বনওয়ারী-দের প্রাত্যহিক অভ্যস্ত আচরণের বিরোধী একটি নিয়মিত আচরণ-ধারা]

আদিতে গল্প গড়ে তোলায় কালানুক্রমে সুবিন্যস্ত বিশিষ্ট ঘটনাবলীই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিত। 'তারপরে কি ঘটল' কৌতূহলী এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হলেই যথেষ্ট। পাত্রপাত্রীর স্থান সে-সব গল্পে ছিল গৌণ। ক্রমে 'কেন ঘটল' এই যৌক্তিক প্রশ্ন উদ্ভাবিত হতে লাগল। এই পর্যায়ের গল্পে চরিত্রগুলি টাইপজাতীয় বলেই যুক্তিমূলক অর্থাৎ সাধারণ, ব্যক্তিগত নয়। কার্যকারণ সূত্রেই পর্যাপ্ত বিবেচিত হ'ত। তারপরে যখন মানুষের স্বাতন্ত্র্যের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি পড়ল তখন থেকে মানবিক আবেগ-প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলই বিশিষ্ট ঘটনার উৎস ও ফল হিসেবে কাহিনী গড়ে তুলতে লাগল। ব্যাপারটা সুনিয়মিত ঐতিহাসিক পর্যায়ে ঘটেছে এরূপ সিদ্ধান্ত করছি না। মোটামুটি ক্রমটা এরকম। দেখা গেল এতকাল বিশিষ্ট ঘটনা নিয়ে গল্প গড়ে উঠেছে, যদি তা নিম্নোক্ত এক বা একাধিক শৃঙ্খলাকে আয়ত্ত করে—

ক. কালানুক্রম খ. কার্যকারণসূত্র

গ. মানবিক আবেগ-প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

তারাশঙ্কর ১. বিশিষ্ট ঘটনাকে প্রাধান্য না দিয়ে প্লট তৈরি করলেন প্রাত্যহিক জীবনধারার ভিত্তিতে। ২. পূর্বকথিত তিন ধরনের শৃঙ্খলাকেই তিনি কাজে লাগালেন একেবারে নতুন ঢঙে বিন্যস্ত করে।

১. প্রাত্যহিক জীবনধারা—

তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রায়ই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সামগ্রিক রূপ মিলবে। কখনও গোটা উপন্যাস জুড়ে, কোথাও অংশবিশেষে। কাহার-বাউরি-বেদে-সাপুড়ে সহজিয়া বোষ্টম নেড়ানেড়ির দল ঝুমুর সম্প্রদায়। কখনও একটা গ্রামের ডোমপাড়া গয়লাপাড়া বাউলের আখড়া সাঁওতাল বসত দেহোপজীবিনীদের বস্তী। নানা শ্রেণী ও স্তরসম্বলিত এক-একটা পুরো গ্রাম কিংবা সংলগ্ন কয়েকটা গ্রাম মিলিয়ে একটা যৌথপূর্ণতা। কখনও খুঁটিনাটি বিবরণ, কখনও বিশেষ ধরনের আচার-বিচারের ছবি। আবার দু-চারটি ঘটনায় সমগ্রের আভাস দেবার চেষ্টাও আছে। আছে ব্রত-পার্বণ-পূজা গান-উৎসব মেলা বিবাহ প্রণয় বিচ্ছেদ ব্যভিচার জন্ম-মৃত্যু-চক্রান্ত হত্যা। চাষের কাজ দিনমজুরি জমিদারের সঙ্গে বিবাদ বা অমেরুদণ্ডী আনুগত্য, পুলিশ পাইক হাট-বাজার— বিচিত্র ছবি চিত্রিত, সংশ্লিষ্ট নানা ঘটনা বিবৃত। অঞ্চলে বা সম্প্রদায়বিশেষে প্রচলিত নানা কিম্বদন্তী দৈববিশ্বাস ও ভীতি—ঝড় বন্যা দুর্ভিক্ষজনিত বিপর্যয়—সংঘাত, সংঘবদ্ধ মানুষের সংগ্রামও। বেশীর ভাগই লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ। কোনটি যদি কল্পনাশ্রয়ীও হয় তবুও বাস্তবের মতই তার রূপ। ঐ সব মানুষের প্রায় গোটা জীবন তার স্বাভাবিক বিস্তারে গল্পের সব সীমা ছাড়িয়ে যাবার মতো। তবে এক্ষেত্রে ঐ সব বিবরণ ও চিত্রণই গল্প। প্লটের প্রচলিত ধারনা একেবারে বদলে গেল এমনি করে।

২. বিন্যাস-শৃঙ্খল প্রসঙ্গে—

বিন্যাস শৃঙ্খলের পূর্বকথিত সূত্রগুলির ব্যবহারে তারাশঙ্কর নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণত কালানুক্রমে যে কৌতূহল পর্যায়ক্রমে উদ্ঘাটিত হয় তাকে এড়িয়ে গিয়ে বর্ষচক্রের প্রতি ইঙ্গিত প্রায়ই চোখে পড়ে। স্পষ্টত তাঁর লক্ষ্য জীবনাবর্তনের দিকে। অধিকাংশ উপন্যাসে একাধিক মানুষের ব্যক্তিজীবনের আবেগ-নিয়ন্ত্রিত কাহিনী থাকে। কোনোটি হয়তো আকার প্রকার বড়। কিন্তু কদাচ একটি মূল কাহিনী, অপরগুলি এরূপ ভাবার অবকাশ থাকে না। প্রতি-

কাহিনী বহুখণ্ডে বিভক্ত এবং নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত। কালসূত্রে এরা সমান্তরাল, বিন্যাসে পরস্পরকে ছেদ করছে, কিন্তু একে অপরের সাপেক্ষ নয়।

আমি একটি কাল্পনিক উদাহরণ নিচ্ছি।*

ধরা যাক একটা উপন্যাসে তিনটি ব্যক্তিগত কাহিনী আছে। তাদের ১ ২ ৩ সংখ্যায় চিহ্নিত করলাম। প্রতি কাহিনী ক খ গ প্রভৃতি খণ্ডে বিভক্ত।

আরও আছে তাদের জীবনের প্রাত্যহিক বিষয়ের বিবরণ-বর্ণনা। এদের চিহ্ন—1 2 3 প্রভৃতি।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে এগুলি ব্যক্তিগত কাহিনীগুলির আভ্যন্তর অংশ নয়, অথবা পটভূমিও নয়। তাই পৃথক্ ভাবে এদের চিহ্নিত করার প্রয়োজন হল।

এদের একটি সম্ভাব্য বিন্যাস -

1—১ক—২ক—2—২খ—3—২গ—৩ক—১ঘ—4··

এই ধারায় অন্যরকমও হতে বাধা নেই।

তারাশঙ্করের এধরনের প্যাটার্নের (এর নানা বৈচিত্র্য) অনুসরণ লক্ষণীয়। এর ফলে ব্যাপারটা কিন্তু জটিল হচ্ছে না। কারণ এদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া প্রভাব নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ অল্পই। আসলে একে অপরের গায়ে লেগে আছে। তাছাড়া প্রতিটি ব্যক্তিগত কাহিনী গায়ে লেগে আছে। তাছাড়া প্রতিটি ব্যক্তিগত কাহিনী এবং সমগ্র উপন্যাসের ক্রমবিকশিত রূপ আঙ্গিকে প্রতিফলিত হলেও বিন্যাস-কৌশলে ক্রমিক উচ্চতা অকস্মাৎ নাটকীয় বাঁকফেরা ক্লাইম্যাক্স ক্যাটাসট্রফি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। নানা কাহিনী-সম্বলিত উপন্যাসগুলি বহু চূড়া সম্বলিত পর্বতের আদলে অঙ্কিত নয়। বীরভূমের রুক্ষবন্ধুর ভূমির মতো উঁচুনীচু অংশগুলি তাঁর উপন্যাসের চতুর্দিকে ছড়ানো। অংশগুলির বিন্যাসে নিশ্ছিদ্রতার যে আভাস আসে তা আসলে প্রসঙ্গগুলির বহুলতা বৈচিত্র্য এবং একের উপরে অন্যটি এসে পড়ার ফল এবং সবটা মিলে বিশালতা।

মহাকাব্যিক বিস্তারও সমগ্রতা তারাশঙ্করের উপন্যাস-আঙ্গিকের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং প্রায়ই সেই লক্ষ্য বিদ্ধ।

---

* তারাশঙ্করের কোনো বিশেষ উপন্যাসের উদাহরণ নেওয়া হল না—কারণ তাঁর কোন বিশেষ উপন্যাসের হয় একটা সাধারণ মডেল প্যাটার্নের (যে মডেল তাঁর শিল্পরীতির কাঠামো) কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে।

তারাশঙ্করের রাজনৈতিক উপন্যাস

বার্ণিক রায়

১.

রাজনৈতিক কথাটি অস্পষ্ট ও সর্বব্যাপ্ত। বাংলাদেশে রাজনীতি বলতে রাজ্যনীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির অধিকার এবং আইন নির্মাণই বোঝায়। কিন্তু প্লেটোর রিপাব্লিক গ্রন্থটিকে যদি প্রথম এবং প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করি রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে, তাহলে রাজনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়। প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য হিসেবে জ্ঞানকেই সকল বস্তুর সারাৎসার গণ্য করেছেন এবং এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে উঠবে। এই জ্ঞান মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তারাই শাসন করে। শাসন করতে গিয়ে দেখা যায় মানুষের জীবনের সামগ্রিক বোধকে বিকশিত করাই হলো আদর্শ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। যেখানে সামগ্রিক বোধ বিচ্ছিন্ন, সেখানে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্যাণও নিহত। মানুষের ও সমাজের প্রত্যেকটি ক্রিয়া ও কর্ম প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং আদর্শ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রে রাজনীতি নৈতিকবোধ অর্থনীতি মনস্তত্ত্ব শিক্ষা-শিল্প-দর্শন একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। সৎলোক সৎ-রাষ্ট্রে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্রে সত্যের আদর্শ হলো জ্ঞান, এই জ্ঞান দুই প্রকারের—স্বাভাবিক ও আহৃত। ফলে সমাজে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে পারস্পরিক সংযোগ আবশ্যিকভাবে নিহিত। এই পারস্পরিক সংযোগের কারণেই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রচিত করে রাষ্ট্র তার জ্ঞানের সাহায্যে। সুতরাং দলাদলি, রাষ্ট্রশক্তির অধিকার, অধিকারের বলে আইন নির্মাণ, আইনের সাহায্যে পীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ এবং অর্থনৈতিক শোষণে পীড়িত মানুষের বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের দুর্বার বাসনা এবং দুই দলের ক্রম যুধ্যমানতা—এ সবই সংকীর্ণ রাজনীতির ফল।

এরি উত্তরাধিকার দেখি এ্যারিস্টটলের মধ্যে। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিকের কোনো পার্থক্য মানতেন না, পার্থক্য করতেন রাজনীতি ও ব্যক্তির মধ্যে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যই দেখি, এবং কে কাকে প্রভাবিত করে এই সমস্যা আজকে সবচেয়ে বেশি। সমাজ কি রাষ্ট্রকে গড়ে তোলে, না রাষ্ট্র প্রভাবিত করে সমাজকে।

হেগেল থেকেই সম্ভবত এই বিরোধ তীব্র। তিনি সমাজের চেযে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেন, রাষ্ট্র ও সমাজ পৃথক্ নয, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যেই সমাজ আছে। এ ঠিক কোঁতের মতের বিপরীত, তিনি বলতেন সমাজের অধীনেই রাষ্ট্র। এবং মার্কস্ও হেগেলের এই তত্ত্ব প্রথম দিকে স্বীকার করেছেন এবং এর পর থেকে এই মতবাদই প্রচারিত হয, রাষ্ট্র ও সমাজেব মধ্যে নিযত সংগ্রামই হচ্ছে মানুষেব জীবনের বৈশিষ্ট্য। ১৮৪৪-এ মার্ক্স্ এ কথা জোর দিযে বলেন যে, ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবনেব মধ্যে বিরোধেব ভিত্তিতেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদিক থেকে হেবেবের রাষ্ট্র বা রাজনীতির যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এই : রাষ্ট্র হচ্ছে একটি মানুষের সম্প্রদায যা সার্থকভাবে নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে শারীরিক বলপ্রযোগেব আইনগত ব্যবহারেব একচেটিয়া অধিকার দাবি করে। সুতরাং রাজনীতি অর্থ বোঝায শক্তি বা বলপ্রযোগের অংশভাগেব চেষ্টা অথবা রাষ্ট্রের মধ্যে কিংবা রাষ্ট্রেব ভেতরে বিভিন্ন গোষ্ঠীব মধ্যে শক্তির বণ্টনকে প্রভাবিত করা। এবং রাজনীতির প্রকৃত প্রশ্নেব উত্তর হচ্ছে শক্তি বা অধিকারকে চালিত করা, রক্ষা করা, সকলেব মধ্যে পরিবেষণ করা। বলা বাহুল্য এই অর্থে রাজনীতি অতীব সংকীর্ণ, এই কারণে একালে রাজনৈতিক সমাজদর্শন বলে একটি বিষয়েব আলোচনা দেখা যায। এর প্রবক্তরা স্বীকার করেন রাজনীতি যেহেতু মানুষের সম্পর্কে অধিকারেব কথা বলে, সেই হেতু মানুষেব সামগ্রিক ব্যবহার এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয এবং অন্য সমষ্টিগত ব্যবহারেব ক্ষেত্র এর মধ্যে থাকবে, কেননা বিষযবস্তু হচ্ছে মানুষ। সেই সঙ্গে একটি সাধারণ অবস্থাকেও বিচার করে দেখতে হয যে অবস্থায বিশেষ ধরনের ব্যবহার গড়ে ওঠে। এমনিভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয, চরিত্রের ও মর্জির ব্যক্তিগত কারণও এ থেকে বহির্ভূত হয না। এমনকি বর্তমানকালে রাজনৈতিক ব্যবহারের সঙ্গে মনস্তত্ত্বও জড়িত। এই সব কথায প্লেটোর কথাই ঘুরে ফিরে আসছে, তবে নতুনভাবে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে দেখলে রাজনৈতিক উপন্যাস শুধুমাত্র রাষ্ট্রশক্তির আইনগত শারীরিক বলপ্রযোগেব কথা ও জীবন চিত্রিত করে না, রাষ্ট্রশক্তির ভেতরে বা তাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক মানুষের মনস্তত্ত্বগত বিরোধ ও ব্যবহার, সামগ্রিক মানুষের সমষ্টিগত চৈতন্যকে ব্যক্ত করে। এই সমষ্টিগত চৈতন্যের মধ্যে সংস্কৃতির সমস্ত উপাদান নিহিত। এদিক থেকেই রাজনৈতিক উপন্যাসের সার্থকতা, যেখানে এই সামগ্রিকতা বিচ্ছিন্ন, সেখানে উপন্যাসের চরিত্রও বিঘ্নিত।

(তারাশঙ্করের রাজনৈতিক উপন্যাস আলোচনা করতে গেলে আগে দুটো জিনিস স্পষ্ট করে নিতে হয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী ও বিচ্ছিন্নতাব তত্ত্ব। শ্রেণী বা ক্লাস বলতে মার্ক্সেব ভাষায় অর্থনৈতিক শ্রেণীকেই বোঝায়। এক সংখ্যক লোকের সুযোগ-সুবিধার বিশিষ্ট উপাদানেব মধ্যে একটি সাধাবণ বস্তু থাকে, এই সাধারণ বস্তুর জন্যেই অর্থনৈতিক কারণে একত্র হয। অর্থনৈতিক কাবণটাই এখানে মুখ্য, আযেব জন্য সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্রব্যের অধিকার যেমন থাকে, তেমনি থাকে শ্রমিকের অথবা উৎপন্ন দ্রব্যেব বিশেষ অবস্থা, যে অবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক দাবি এক সংখ্যক লোককে মিলিত করতে পাবে। যেখানে এই অর্থনৈতিক কাবণ নেই, সেখানে শ্রেণী আছে গণ্য করা যায় না। এই অর্থনৈতিক শ্রেণী ছাড়া আরো দুপ্রকার ভাগ আছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠায মিলিত এক শ্রেণীর লোক। সামাজিক মানমর্যাদার ওপর তাদের জীবন নির্ধারিত হয। কখনো কখনো অর্থনৈতিক শ্রেণী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার শ্রেণী মিলে যায়। কিন্তু তাদের বিবোধটাই প্রকট। অর্থনৈতিক শ্রেণীকে অর্থের উৎসের কথা চিন্তা করতে হয়, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠাভুক্ত শ্রেণী এর কথা ভাবে না, যেমনি আছে তেমনই চলে, সে শুধু ভোগ কবে, এই কাবণেই হযতো এই ভোগী সম্প্রদায অর্থনৈতিক শ্রেণীকে মাঝে মাঝে প্রভাবিত করে। কারণ উৎপাদন ও কাঁচা মালেব অধিকার নিযে শ্রেণী সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, 'গণদেবতা'র ছিবে পালএর সার্থক উদাহবণ। তৃতীয হলো অধিকার প্রয়োগ করা।

দক্ষিণ ও বাম শ্রেণীও বযেছে, দক্ষিণপন্থীবা যা আছে তাকেই চালু রাখতে চায়, বামপন্থীরা চায সাম্যের ভিত্তিতে পবিবর্তন। দক্ষিণপন্থীবা স্থিতাবস্থা স্বীকাব কবে বলেই জাতীযতা ও সাম্প্রদাযিকতায বিশ্বাসী, আর বামপন্থীরা মুক্ত মানুষে বিশ্বাসী, সর্বজনীনতায তাদের আস্থা, অপ্রাপ্য আদর্শ আকাঙ্ক্ষায তাদের স্বপ্ন জ্বলে ওঠে। সংস্থা ও সম্প্রদাযও এই শ্রেণীব মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, শিল্পগঠিত শহবে নৈর্ব্যক্তিক আমলাতান্ত্রিক সমাজে সংস্থার তৈবি, এর ধনিক-তন্ত্রবাদ বযেছে, সম্প্রদাযের মধ্যে আছে গ্রাম্য সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব। সম্প্রদায় থেকেই সংস্থা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে পরিণতি লাভ কবে।

সাম্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত না হলে ক্যাপিটালিস্টিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের ও খেটে-খাওযা মানুষের শোষণ থাকবেই। এবং শোষণ থাকলেই বিচ্ছিন্নতা বোধ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে

আসতে বাধ্য। নিজের থেকে নিজের, অন্যের ও পৃথিবীর পৃথক হওয়ার রীতিও পদ্ধতিই হলো মার্কসের মতে বিচ্ছিন্নতা। মানুষ যে কাজ করছে, যে ফসল ফলাচ্ছে, যে দ্রব্য তৈরি করছে, তার সঙ্গে একাত্মতা হারিয়ে গেলেই বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়। শ্রমেব সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। এই অর্থ-নৈতিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সমাজগত বিচ্ছিন্নতাও জডিযে আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনীতির চাপে সমাজে মানুষ অন্য মানুষের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়। এই বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিগত সম্পত্তিব সম্পর্কেই তৈরি হয়। তা থেকেই নৈতিক ও সামাজিক বোধেব বিবোধেব সৃষ্টি। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে, কি চাষী, কি শ্রমিক, দুই-ই জমিদারি বা কলেব মালিকের অর্থ নৈতিক চাপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে কবতে বাধ্য। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই আসে বিভ্রান্তি, হতাশা, ধ্বংস। তারাশঙ্কবেব উপন্যাসে এর স্বরূপ চমৎকাব দেখতে পাওয়া যায। কিন্তু উপন্যাসে বা জীবনে মানুবের প্রতি বিশ্বাস হাবালে চলে না, বিশেষ করে সাহিত্যিকেব পক্ষে। তাবাশঙ্কব মার্কসবাদী নন, তিনি সচেতন, উদাব মানবতা-বাদী, সংবেদনশীল, তাঁব চোখের সামনে পবিবর্তন দেখেছেন, তাঁর দেখা বস্তু সত্যে পরীক্ষিত বলেই যুগের সামগ্রিক রূপ দেখতে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী হলেও তাঁর নাযকেব মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন আত্মসচেতনতা এবং জীবনীশক্তিতে নিত্য ক্রিয়াশীলতা, এই কাবণেই তারাশঙ্কবের শত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, প্রাচীন ও জমিদারতন্ত্রের জন্য ব্যাকুল বাসনার নিবিড বেদনা নিয়েও তাবাশঙ্কর একালেব মানুষ। মানুষই তাঁর ঈপ্সিত, মানুষই তাঁর ঈশ্বর, যে মানুষ সমস্ত প্রলোভন জয করে, গভীর দুঃখ সযে সকলকে ফেলে একাকী স্বর্গের পথে যেতে পারে, সে মানুষ নারায়ণতুল্য। একথা গণদেবতাতেই আছে।

২

তারাশঙ্কবের আগে শরৎচন্দ্রের লেখায় এই বাস্তবতাবোধ, জমিদারতান্ত্রিক শোষণ, শোষকগোষ্ঠীর মিলিত অত্যাচার, অত্যাচারের ফলে চাষীর গ্রামত্যাগ এবং কলের মজুরে পরিণত হওয়া—এসব ইঙ্গিতে ও চকিতে প্রকাশ পেয়েছে। মহেশ শুধু গরু নয়, মহেশ গ্রাম্য কৃষিলক্ষ্মীর প্রতীক, এই লক্ষ্মীকে মৃত্যুবরণ করতে হলো জমিদার ও তার গোষ্ঠীর অত্যাচারে, এই কৃষিলক্ষ্মীকে হারিয়েই গফুর রাত্রির অন্ধকারে মেয়েকে নিয়ে গোপনে গ্রামত্যাগ করেছে, মজুর হিসেবে কলে যোগদান করেছে, যাবার আগে খোদাতাল্লার কাছে বিচাবের জন্যে করুণ প্রার্থনা জানিয়েছে,

কিন্তু কোনো বিদ্রোহ করেনি, বিপ্লবের লাল রঙ তার চোখে ভেসে ওঠেনি। হুগলির প্রকৃতির শ্যামলতার মতোই গফুরের প্রার্থনার করুণ কোমলতা রাত্রির বাতাসে শুধু ভেসে বেড়ায়। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্পে মাঝে মাঝে বীরভূমের আকস্মিক রুক্ষতাও প্রকট হয়ে ওঠে চরিত্রের কর্মে ও ব্যবহারে। শরৎচন্দ্রও শোষকগোষ্ঠীর অত্যাচারের মধ্যে নিম্নস্তরের অথবা প্রায় একই সঙ্গে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক বিরোধকে তীব্র করে তুলেছেন, পরিণামে মানবিকবোধকে সর্বজনীন করতে চেয়েছেন। গফুরের সঙ্গে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ জমিদারের সম্পর্কে, 'অভাগীর স্বর্গে' জমিদার ও রসিক বাঘের বিরোধে এই বোধ তীব্র। শরৎচন্দ্র মহাজনী প্রথাকেও গল্পে উপজীব্য করেছেন, 'একাদশী বৈরাগী' তার প্রমাণ। তবু তারাশঙ্করের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটা পার্থক্য আছে। শরৎচন্দ্র ব্যক্তির জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা-দ্বন্দ্ব-বিরোধকেই বারংবার প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সমাজ শক্তিকে পরোক্ষে রেখে, চরিত্রের ওপর অদৃশ্য শক্তির প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে ফোটাতে চেয়েছেন বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। অভাগীও সতীসাধ্বী, জমিদার-পত্নীও সতীসাধ্বী, কিন্তু জমিদার-পত্নীর মৃত্যুর পর মহাসমারোহে তার শোভাযাত্রা হয়, কিন্তু অভাগীর মৃত্যুর পর আগুন দেবার জন্যে একটুকরো কাঠও সংগৃহীত হয় না, আর অন্যদিকে জমিদার-পত্নীর দেহ চন্দন কাঠে দগ্ধ হতে হতে তার সুরভি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিরোধ তৈরি করেছে সমাজ তার অর্থনৈতিক শোষণে ও সম্প্রদায়-গত জাতিভেদপ্রথায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র অভাগীর ব্যক্তি-চরিত্রের দিকেই জোর দিয়েছেন, আর তারাশঙ্কর জোর দিয়েছেন সমাজের সামগ্রিক বস্তুর প্রতি, বস্তুর প্রত্যক্ষতা তাঁর উপন্যাসে সুস্পষ্ট। 'পঞ্চগ্রাম' ও 'গণদেবতা'র নায়ক কোনো মানুষ নয়, 'গণদেবতা'য় চণ্ডীমণ্ডপই কেন্দ্রীয় শক্তি, তাকে কেন্দ্র করেই গ্রামের সমস্ত মানুষ মিলিত হয়েছে, তার সম্পর্কেই মানুষ বিরোধ করে বেরিয়ে গেছে। সমষ্টিগত মানুষের পরিচয়ই সেখানে মুখ্য। এই সমষ্টিগত মানুষ সমাজকে কেন্দ্র করে বিচিত্র ঘটনায় কালের স্রোতে নিয়ত পরিণতির দিকে এগিয়েছে। এখানে ব্যক্তির প্রাধান্য নেই।

তারাশঙ্করের অধিকাংশ উপন্যাসে উপজীব্য বিষয় গ্রামীণ মানুষ, প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের গ্রামের অবস্থা জমিদারি প্রথায় বিন্যস্ত, সুতরাং জমিদার ও প্রজা এই সম্পর্কের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের রূপ। জমিদার একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণী, প্রজা একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণী, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ অর্থনৈতিক কারণে। জমিদার নায়েব গোমস্তা চাপরাশি দারোয়ান দিয়ে শোষণ করে অর্থনীতিতে

বলীয়ান হয়, শোষিত প্রজা খাদ্যদ্রব্য সংস্থানের জন্যেই একত্র হয়। ফলে বিরোধ বাধে। জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী, ইংরেজ সরকারের দাস। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের শোষণকে কায়েম এবং বৃদ্ধি করাই জমিদারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্তব্য। এই কর্তব্যের জন্যে অধিকারের আইনগত শারীরিক বল প্রয়োগ করে। সুতরাং অধিকার বণ্টনের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে জমিদারতন্ত্র জড়িত, জমিদারের সঙ্গে নায়েব গোমস্তা দারোয়ান সম্পর্কিত। যারা এই অধিকারকে স্বীকার করে, তারা রাষ্ট্র-শক্তির পক্ষে, যারা স্বীকার করে না, তারা এর বিরুদ্ধে। তাই এই দুয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে আলোড়িত হয়। এবং এই আলোড়নে ব্যক্তিচরিত্রের বিভিন্ন স্বরূপ বিভিন্নমুখীন হয়ে দেখা দেয়। এইসঙ্গে যুক্ত হয় জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম। জাতীয়তাবাদ স্বাধীন দেশের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতীক, কিন্তু পরাধীন দেশের পক্ষে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের প্রতীক, প্রগতিশীল শক্তি। কিন্তু তারাশঙ্কর কখনো এই বিরোধকে কেন্দ্র করে আত্মসচেতন সম্মিলিত মানুষের রক্তাক্ত বিপ্লবী চেতনায় তার কল্পনাকে উদ্দীপিত করতে পারেননি, সংবেদনশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ দর্শকের মতো সমস্ত বিরোধ ও পরিবর্তনকে দেখেছেন, আর করুণ বেদনায় অতীতের গ্রামীণ সংস্কৃতির জন্যে অশ্রু বিসর্জন করেছেন একাকী। এখানেই তাঁর দোষ, এখানেই তাঁর সার্থকতা।)

'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর স্পষ্ট বলেছেন: 'কারণ তখনো নূতন যুগের রচনা পড়ে পথ পাইনি, শরৎচন্দ্রকে অক্ষমভাবে অনুকরণ করেছিলাম।' পরে অনুকরণ না থাকলেও প্রভাবিত হয়েছেন। 'গণদেবতা'য় ছিরে পালের সঙ্গে দেবু ঘোষের গাছ নিয়ে বিবাদ 'অভাগীর স্বর্গে'র গাছের কাহিনীরই নূতন রূপান্তর। হয়তো গ্রামীণ পরিবেশ গ্রহণ করেছেন বলেই এই সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। 'সাহিত্যের সত্য' বইতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন: 'পূর্ববর্তী জীবনধারা থেকে নূতন কালের জীবনধারায় প্রয়াণের কালে যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, জাগতিক জীবনধারণ-ব্যবস্থার বিপর্যয়ের ফলে যা আমাদের মধ্যেও সঞ্চরমান হয়েছিল—অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল না, তার আবেগ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ হয়েছে শরৎসাহিত্যে।' পৃথিবীর নবভাবের সংঘাতে পুরাতন সমাজে ধ্বংসের কম্পন তখন শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থার তিন কোণ ভেঙেছে—এক কোণ ঠেকে আছে বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খলার ঠেকায়, অথচ শাসন এবং শোষণের কারণ হয়েছে হৃতসর্বস্ব, ভ্রষ্টসর্বস্ব, দীনতায়

হীনতায় মানুষ শীর্ণ, মানুষ কাঙাল, চোখে তার লুব্ধ দৃষ্টি—তাদের কথাই শরৎ-সাহিত্যে মুখ্য।'

ঠিক এই কথাই আছে 'গণদেবতায়' বিভিন্ন বর্ণনার ভেতরে : 'নহিলে, সেই সমাজ-শৃঙ্খলার সবই তো ভাঙিয়া গিয়াছে। গ্রামের সনাতন ব্যবস্থা—নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি আজ স্বকর্মত্যাগী, স্বকর্মহীন। একগ্রাম হইতে পঞ্চ গ্রামের বন্ধন, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, দশগ্রাম, বিংশতিগ্রাম। শতগ্রাম, সহস্রগ্রামের বন্ধনরজ্জু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এলাইয়া গিয়াছে।' ভবিষ্যৎ সমাজ সম্বন্ধে বলেছেন : 'গোটা সৃষ্টিটা দুর্বৃত্ত-ধর্ষিতা নারীর মতো অন্তঃসারশূন্য কাঙালিনীতে পরিণত হইবে। জীর্ণ অন্তর, বুকে হাহাকার, বাহিরে চাকচিক্য, মুখে কৃত্রিম হাসি। দুর্ভাগিনী সৃষ্টি। আত্মিক নিয়মে তার পরিণতি—ক্ষয়-রোগীর মতো তিলে তিলে মৃত্যু। তবু কিন্তু হতাশা নয় আজ।'

গফুরের গ্রামত্যাগের সঙ্গে অনিরুদ্ধ কামারের গ্রামত্যাগের সাদৃশ্য অনেক দূরের ব্যাপার। কিন্তু 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাসে গোষ্ঠের গৃহত্যাগের মূলে জমিদারের অত্যাচারই মুখ্য, 'অর্থের কাছে দেশ জাতির কোনো সম্পর্ক নেই, শ্রমিকের চেহারা সমগ্র পৃথিবীতেই এক।' এই কথাই সেই গ্রামত্যাগের আগে বলছে : 'ক্ষণপরে আপন মনেই বলে, সেই ভাল, কিসের তরে থাকব, জমি গেল, ছেলে গেল, পেট দুটো যেখানে খাটাবো, সেইখানেই ভাত, এখানেও খাটা বাইরেও খাটা। ঘর? গাছতলা তো আছে। আবার ঝড় গোঙায়। **** আবার ক্ষণপরে কহে, 'ঠিক বলেছ, কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে-বাদলে মরে?' (পৃঃ ৬৭)

এই ঝড়ের ইঙ্গিত গফুরের কথায় নেই, শরৎচন্দ্র কুলি-মজুরদের জীবনও খুব সার্থকভাবে আঁকতে পারেননি, 'পথের দাবি'র মজুররা ঠিক বাস্তব অর্থে সত্য নয়। কিন্তু তারাশঙ্কর 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাসে গোষ্ঠের মজুর-জীবনের গ্লানির ইতিহাস চমৎকার প্রকাশ করেছেন, দেখিয়েছেন গ্লানিময় জীবনের মধ্যে তাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ, ট্রেড ইউনিয়নের নেতার সাহায্যে ধর্মঘটের ডাকে মজুরদের সাড়া দেবার আকৃতি। অন্যদিকে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধতার কাহিনীও 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' লিপিবদ্ধ করেছেন, শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা'

উপন্যাসে সুযোগ পেয়েও যা বলতে পারেননি, ষোড়শী তাদের বিভ্রান্ত করেছে। এখানেই শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর অগ্রগতি।

৩

তারাশঙ্করের মধ্যে রাজনীতি ও সাহিত্যের দ্বন্দ্ব গোড়া থেকেই ছিল। সাহিত্যে ব্যর্থ হয়ে রাজনীতিতে গেছেন, রাজনীতিতে ঘৃণ্য রূপ দেখে সাহিত্যে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে এই দুয়ের প্রতিভাস তাঁর সাহিত্যে প্রকট, কখনো যুক্তভাবে, কখনো পৃথকভাবে। 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে' রাজনীতি-চেতনালব্ধ মানবতা ও বাস্তবতা, অন্যদিকে 'কবি' ও 'আগুন' উপন্যাসে নিছক সাহিত্যিক মনোভাবের প্রকাশ। 'ধাত্রীদেবতা'য় জীবন ও রাজনীতি একসঙ্গে মিশে গেছে। এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁর নিজের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে অন্যের রাজনৈতিক চেতনার সংঘর্ষ বাধলে তাকে অনুভূতির সাহায্যে কাহিনীর ভেতরে রূপায়িত করতে চেয়েছেন, 'কলকাতা ৭১' তারই নজির। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই রাজনৈতিক জীবনের তথ্য বিবৃত হয়েছে। 'সাহিত্যের সত্য' বইয়ের 'লেখার কথা' রচনায় বলেছেন : 'এই সময় আমি রাজনীতির আসর থেকে হঠাৎ শখের বসেই কল্লোল পত্রিকায় 'রসকলি' নাম দিয়ে একটি গল্প পাঠালাম।··এখানে বলা প্রয়োজন এসময় আমি রাজনৈতিক কর্মী। কংগ্রেসের কাজ করি, কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে গ্রামে গ্রামে সেবকদল নিয়ে ফিরি। বাংলাদেশের মেলায় ঘুরে বেড়াই, ভলান্টিয়ারি করি। সাহিত্য তখন শখের সামগ্রী আমার। ঊনত্রিশ সাল শেষ হতেই তিরিশ সাল এল। ডাক এল গান্ধীজির। আমি কলম রেখে ঝাণ্ডা হাতে বের হয়ে পথ থেকে লোহার ফটক ঠেলে জেলে ঢুকলাম। এই জেলেই আমার মনে একটা অবসাদ বা বিতৃষ্ণা এল রাজনৈতিক দলবাদের ওপর। জেলের মধ্যে দল উপদল অহিংসা ও সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদের কলহ দেখে মন দমে গেল। সংকল্প করলাম রাজনীতি করব না, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে এই নবজীবনের কথা লিখব।' এই দ্বন্দ্বই তারাশঙ্করের সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

'আমার সাহিত্য জীবন' বইয়ে এই রাজনৈতিক জীবনের কথা বহু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বলেছেন, একত্র করলে মোটামুটি তাঁর রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

১. '১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যেদিন জেলখানা থেকে বের হলাম সেই

দিনই মনে মনে সংকল্প করেছিলাম। জেলখানাতেই তখন 'চৈতালি ঘূর্ণি' এবং 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দুখানি পত্তন করেছি, এবং তখন জেলখানায় রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি, চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতিব দিকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হযেছে। ভারতবর্ষেব মানুষ, হিন্দু সংস্কৃতির পথে জীবনযাত্রা শুরু করেছি। কোনো মতেই মিথ্যাচরণের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পথে অগ্রসর হতে মন রাজী হলো না। আত্মাই যদি কলুষিত হয তবে স্বাধীনতাব মধ্যে কি পাব আমি? বন্ধনযুক্ত জীবনে কোন আত্মার বিকাশ হবে—প্রকাশ হবে? সব দেখে পীড়িত হলাম আত্মকলহের কুটিল কদর্যতা দেখে। পবস্পবকে হেয় প্রতিপন্ন কববার জন্য সে কি ষডযন্ত্র। মোক্ষম অস্ত্র প্রতিপক্ষকে স্পাই প্রতিপন্ন কবা। একেব দল ভাঙিযে বিশ্বস্ত অনু-সাবকদেব নিজে। দলভুক্ত ক'বে নিজেব দলকে পুষ্টি কবে তোলাটাই তখন মুখ্যকর্ম হযে দাঁড়িযেছে। তখনো সম্মুখে মন্ত্রিত্বেব গদি ছিল না, ছিল জেল-কংগ্রেসেব চৌকি। অ্যাসেম্বলিব চেযার তখনো অনেক দূরে, শুধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদ মাত্র সম্মুখে।' (পৃঃ ১১)

২. 'জলাঞ্জলি দেবার সংকল্পটিকে কাজে পবিণত কববাব জন্য কর্মজীবনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। ধানচালেব হিসেবের কাজ নয, ওতে মনই উঠল না। কাজ, দেশসেবাব কাজ। কংগ্রেসেব আদর্শে খানিকটা গঠনমূলক কাজ হলেও কংগ্রেসের কাজ নয়। ইউনিয়ন বোর্ডেব প্রেসিডেন্ট হলাম। কিছু কাজ আমাব চাই। চরকা কাটি বটে, কিন্তু ওতে সমস্ত দিনটা কাটে না। আমাদের ইউনিযন বোর্ডেব অবস্থা তখন বিশৃঙ্খল। ওই কাজই ঘাড়ে তুলে নিলাম। একটা বাই-ইলেক্‌শনে মেম্বব হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেন্ট হলাম। আমার মনের অবস্থা বুঝবার জন্যেই ঐ কথা এখানে উল্লেখ কবছি। সকালে বাইসিকল নিযে বের হই—গ্রামে গ্রামে ঘুরি, পথ-ঘাট, নালা-খাল দেখে বেড়াই। ভাঙা পথ মেবামত করাই, আঁকাবাঁকা নালাকে সোজা কবে কাটাই, ওখানকাব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সঙ্গে পবিচয় করি। তাদেব মনেব খবর বিচিত্র পবিচয নিজের মনে বহন কবে ফিরে আসি। বাড়ি ফিবি দুটো-আড়াইটাব সময়। তারপর স্নান আহার। বিকেলে বোর্ড আপিসে কাগজপত্র দেখা, মজুবদেব মজুরি দেওযা নিয়ে কেটে যায। দেখতে দেখতে কাজটা ভাল লাগল।' (পৃঃ ২৫)

'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ এবং 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে দেবু ঘোষের আদর্শ এইসব কথার মধ্যেই রয়েছে।

৩. '‌দ্বিধার মধ্যে রাজনৈতিক জীবনাবেগটাই ছিল প্রবল। এক সময় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচির সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে লাগিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদশিক শাসনমুক্ত করবার সংকল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মত লেলিহান।···১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে।' (পৃঃ ৩৪)

৪ 'রাজনীতির নেশা আমাকে তখন আরও বেশি আচ্ছন্ন করেছিল। তাছাড়া আকস্মিকভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর বৃহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও চরিত্রে অভিভূত হয়ে সে বই তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।' (পৃঃ ৪৯)

৫ 'আমি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতির কম্বলরূপী ভালুক আমায় ছাড়লে না।' (পৃঃ ৫২)

৬. 'বর্তমানকে ভেঙে-চুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয়নি। আমার রচনার সমাপ্তি-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধহয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।' (পৃঃ ৮০)

৭ 'সে আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। সেদিক দিয়ে 'চৈতালি ঘূর্ণি'র ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে বলেই মনে হয়। এ নিয়ে অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্ক্সের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়িনি। এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপরে লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কারণ ও কর্মে এবং সেই কর্ম ও কারণে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে, রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেই পেয়েছিলাম এই তত্ত্বের সন্ধান।'

৮. 'হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশ শো ষোল-সতের সাল থেকে উনিশ শো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশ বিপ্লব সেই দিনের ঊষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম, সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে।

এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে। তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেযেছি, যেটি ভারতীয সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হবার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিযে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিযন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিযে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মাবফত জেনেছিলাম প্রথম—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ কবে মিলিযে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তাব বস্তুবাদ-সর্বস্বতাকে মানতে পারি নি। পথ ও লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি।' (পৃঃ ৯৩-৯৪)

৯. 'আমি নিজেই যাদেব একজন তাদেব আত্মাব তৃষ্ণা থেকে রুচি থেকে বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয—এব পরও আছে পরম কাম্য, সেই পবম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওযা যাবে না। অন্তবের পবিত্রতা পবিচ্ছন্নতা পরিশুদ্ধতাব মধ্যেই আছে সেই পবম কাম্য সুখ ও শান্তি।···মনুষ্যত্ব কোনোও মেড ইজি উপাযে পাবাব নয। সমাজতান্ত্রিক বাযোলজি বিজ্ঞানের কথা শুনেছি। আমি বৈজ্ঞানিক নই, অভ্যাসে অভ্যাসে প্রকৃতিব পবিবর্তন হয কিনা সে তর্কে না গিযেও বলব, মানুষ গিবিপথ নয, সমগ্র সৃষ্টিব মধ্যে প্রকৃতিতে সে প্রচণ্ডতম শক্তিশালী। মানুষকে এ্যাটম বোমার ঘাযে মেবে ফেলা যায, তাকে ভীত ক'রে সামযিকভাবে হাব মানানোও যায, কিন্তু সত্য কথা জয কবা যায় না।' (পৃঃ ৯৪-৯৬)

১০. 'ইংবেজের বাজ্যবিস্তারেব সঙ্গে ইংবেজিতে রাজকার্য সুগম কবে দেবাব জন্যই বাঙালি দেশ ছেড়ে ভাবতেব বড়ো বড়ো সহরে গিযে বাস কবেছিলেন। ইংবেজিতে দখলটাই ছিল জীবনে জীবিকা উপার্জনেব মূলধন।' (পৃঃ ১৮০)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য তিনি চান, কিন্তু এই সাম্যেব চেযে পবমই কাম্য। এই পবমের কোনো স্পষ্ট রূপ নেই তারাশঙ্করের লেখায, কিন্তু বঙ্কিম-ভূদেবের লেখা থেকে এর একটা রূপ অনাযাসেই সৃষ্টি করা যায। আত্মপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি অতিক্রম করে বিশ্বপ্রীতি, এই বিশ্বপ্রীতির মধ্যে প্রকৃতি ও জীবজগৎ অন্তর্ভুক্ত, এই বিশ্বপ্রীতিকে অতিক্রম করে আরও এক বৃহত্তর

সত্য রয়েছে, এই সত্যই পরম, যিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তাকে গ্রহণ করলে, উপলব্ধি করলে সর্বজনীন সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরম সত্যই রাষ্ট্রে রূপায়িত, তাই এর মধ্যে মিথ্যা নেই, আছে আত্মা, আত্মার বন্ধনেই সকলের সঙ্গে যোগ। গণতন্ত্রে এই নির্বিশেষ সত্যই সকলের মধ্যে ঐক্য বন্ধন নিয়ে আসে ; ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, সাম্য সব এখানে একীভূত।

বলা বাহুল্য, এই চিন্তার সঙ্গে হেগেলীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তা জড়িত, কারণ হেগেলও মনে করতেন রাষ্ট্র হচ্ছে সেই পরমেরই প্রকাশ, তার মহত্ব ও গৌরবেরই রূপমূর্তি। গান্ধীও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় সত্য বা অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন, এই সত্য হচ্ছে বিশ্বপ্রেম। এই প্রেমের শক্তি গান্ধীজীর কাছে সর্বজনীন নীতিবোধ, হেগেলীয় আধ্যাত্মিকতা তাতে নেই, যা তারাশঙ্করের মধ্যে পাই। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে, অনবরত আমরা পরমের দিকে চলেছি। এই পরমই তারাশঙ্করের রাজনৈতিক দর্শনকে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করেছে।

অন্যদিক থেকে তিনি গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন গ্রহণ করেছেন সর্বত্র। বিশেষ করে গ্রাম-স্বরাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতির চিন্তায় তারাশঙ্কর গান্ধীর কথাকেই উপন্যাসে উদ্দীপ্ত ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তারাশঙ্করের 'সত্য যুগ' এবং গান্ধীর 'রামরাজ্য' চিন্তা-ভাবনায় এক। ধর্মবোধ,—যার সঙ্গে বিশ্বজনীন নীতি জড়িত, উদার মানবিকতা, সমষ্টিগত চৈতন্য, মৌল মানবতা, সত্যাগ্রহ গান্ধীজীর মতো তারাশঙ্করকেও প্রভাবিত করেছে। সত্য, অহিংসা ও আত্মত্যাগের ভিত্তিতে সত্যাগ্রহ গঠিত, এইগুলি দিয়েই তারাশঙ্কর সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। গান্ধীর মতো তিনিও মনে করতেন সত্যাগ্রহে দীক্ষিত মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য, প্রচেষ্টা, শৃঙ্খলা, নির্ভীকতা, সাহস, তপস্যা ও আত্মনির্ভরতা থাকে, সেগুলিই ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং সঞ্চারিত হলে একক শক্তির কাছে অত্যাচারী শক্তি পরাভূত হয়। তাই শক্তি বা বলপ্রয়োগের কথা তিনি বলেন না, এর দ্বারাই অত্যাচারী গোষ্ঠীর হৃদয় পরিবর্তন ঘটবে। এবং একথাও বিশ্বাস করতেন, উপায় হিসাবে হিংসা গ্রহণ করলে মানুষের ভেতরে যে পরমাত্মা আছে, তাকেও আঘাত করা হয়। সুতরাং প্রেম ও সত্যের দিক থেকে এ চিন্তা নিষ্ঠুরতম, তাই পরিত্যাজ্য। এইখানেই মার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে গান্ধী ও তারাশঙ্করের পার্থক্য। মার্কসের কাছে রাষ্ট্র অত্যাচারের যন্ত্র, তার ক্ষমতা অধিকার করাই মূলকথা। গান্ধী বলেন, অহিংস বিপ্লব শক্তির অধিকারের কথা বলে না, সম্পর্কের পরিবর্তনের কথা বলে, এবং এই পরিবর্তন ঘটে শক্তির

শান্তিপূর্ণ রূপান্তরণে। মার্ক্‌স্ শ্রেণী-সংগ্রামকেই সংগ্রামের হাতিয়ার করেছেন, গান্ধী শ্রেণী সংগ্রাম মানেননি। তাঁর বামরাজত্বে শ্রেণী তার অধিকার নিয়েই থাকে, অনুভূতিতে শুধু ঐক্য অনুভব করে, ঐক্য থেকে কিছু সাম্য আসে। মার্ক্‌স্ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকে চূর্ণ করতে চেয়েছেন, গান্ধী পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। মার্ক্‌স্ ও গান্ধীর লক্ষ্য রাষ্ট্রহীন শোষণমুক্ত সমাজবাদ, মার্ক্‌স্ অবস্থা বুঝে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে রাজি, গান্ধী বলেন, সত্য ও অহিংসাই যদি কাম্য, তাহলে পথও গ্রহণ করতে হবে সত্য ও অহিংসার। মার্ক্‌স্ সমাজবাদে পৌঁছবার আগে প্রোলেতারীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, গান্ধী বলেন এই স্বৈরতন্ত্র নিষ্ঠুর ব্যাপার, সুতরাং অগ্রাহ্য। এমনিই স্বাভাবিকভাবে বিন্যাস ঘটবে। আদর্শ রাষ্ট্রে আদর্শবাদিতার দিক থেকে এর সত্যতা আছে, বাস্তবতার দিক থেকে নেই। অত্যাচারী ও ধনিক গোষ্ঠী মুখে হৃদয়মিলনের কথা বললেও গোপনে অর্থসঞ্চয় সে করবেই। এই কারণে আদর্শ এবং আইন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। নইলে যা হবার বর্তমান ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আর এই সত্যাগ্রহ যে ইংরেজের উদারনৈতিক মানবতাবাদেই শুধু সার্থক হয়েছে, অন্যত্র হবার সম্ভাবনা নেই, একথা অনেকেই প্রমাণ করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও।

স্বদেশ ও জাতীয়তাবোধেও তারাশঙ্কর গান্ধীর পথ অনুসরণ করেছেন, দেশের মুক্তি মানে আত্মারই মুক্তি, তারই জন্যে সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে গান্ধী মনে করতেন, সমগ্র জীবনবোধ ও সত্যের সঙ্গে অর্থনীতি জড়িয়ে আছে। সামাজিক ন্যায় ও নৈতিক মূল্যবোধ এর সঙ্গে যুক্ত, এই কারণে যীশুখ্রীষ্টকেই সার্থক অর্থনীতিবিদ্ বলে গণ্য করেছেন গান্ধী। সত্যাগ্রহের সঙ্গে এই অর্থনীতির যোগ রয়েছে। ব্যক্তিকে মানেন বলেই অর্থ-নীতির ক্ষেত্রেও গান্ধী প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক মুক্তি কামনা করেছেন। বলেছেন, সকলেরই খাবার অধিকার আছে। অভাব ও দারিদ্র্য থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে। দারিদ্র্যই আত্মাকে মারে, নৈতিক অবনতি নিয়ে আসে। তিনি গ্রামের দিকে চেয়েছিলেন, তাই গ্রামীণ অর্থনীতিই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। যন্ত্র, ধন, পুঁজিবাদ, শ্রম—এদিক থেকে না তাকিয়ে লক্ষ্য করেছেন গ্রামের মানুষের কষ্টের দিকে। তাই চরকা, গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, অছিপ্রয়োগ, অপরিগ্রহ ও সর্বোদয়ের চিন্তার মধ্যে তাঁর অর্থনীতি বিন্যস্ত। কিন্তু তারাশঙ্কর মার্কসীয় অর্থনীতির ভিত্তি স্বীকার করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, অর্থই ব্যক্তি-সমাজ রাষ্ট্রকে

নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর, কিন্তু মুক্তির যে পথ নিয়েছিলেন তা গান্ধীর পথ। ফলে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটেনি। আব ঔপন্যাসিকের সেটা লক্ষ্যও নয়। তবু বিভ্রান্তি বিচার্য।

যেহেতু স্বদেশীচিন্তা পরাধীন ভাবতে তীব্র, সেই হেতু মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রবণতা মাবাত্মক। আমাব নিজেব মনে হয, তাবাশঙ্কবকে আধ্যাত্মিক দিক থেকে গান্ধীর চেয়েও প্রভাবিত কবেছে দুটি ধারণা। একটি হলো গীতার কর্মবাদ, কর্মেই মুক্তি, অন্যটি হলো পুরাণাশ্রিত হিন্দু পৌত্তলিক ভক্তিবাদ। 'গণদেবতা'য এই কর্মবাদেব কথা বারবার বলা হযেছে দেবনাথেব চবিত্রের মাধ্যমে, আর ন্যাযবত্নেব মধ্য দিযে পুরাণাশ্রিত ধর্মেব কথা। এই ধর্ম এই যুগে শেষ হযে যাচ্ছে, তবু কর্মবাদীদেব মনে এব স্বপ্নমদিব বেদনা চিত্রিত হযেছে। এমনকি 'সুতপাব তপস্যাতে'ও সুব্রতেব চবিত্রে এইরূপ দেখি।

ববীন্দ্রনাথই গান্ধীর আগে 'আত্মশক্তি' বইযে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে বাষ্ট্র বা সবকাবকে বাদ দিযে গ্রামের পবিপূর্ণ ছবি এঁকেছেন। স্বযংসম্পূর্ণতা, আত্ম-শক্তি, সকলেব মধ্যে ঐক্য এবং ধর্মভিত্তিক মনুষ্যত্ববোধই হলো ববীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের মূল কথা, এই সমাজ গ্রামীণ, কাবণ নাগব সভ্যতা ভাবতের নয। প্রত্যেক সমাজেব এই সম্পূর্ণতা ছিল বলেই রাজশক্তি ভেঙে পড়লেও সমাজের স্রোত থেমে যাযনি। সুতবাং বাষ্ট্রেব সঙ্গে সমাজেব বন্ধন কম থাকাই বাঞ্ছনীয। অথচ তাবও পূর্ব যুগে ব্রাহ্মণেব কালে বাজা ও সমাজের বন্ধন অঙ্গাঙ্গী ছিল, তখন পারস্পবিক যোগে এক বিভূতি ও মহত্ত্ব সকলকে আবর্ষণ করতো। যেহেতু সেই পারিবেশ নেই, সেইহেতু রাষ্ট্র থেকে গ্রামীণ সমাজকে বিকেন্দ্রিত করে তাকে স্বযংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। এই হলো ববীন্দ্রনাথেব কথা, এব সঙ্গে গান্ধীব গ্রামীণ সভ্যতার কোনো পার্থক্য নেই। তাবাশঙ্কর ও একে গ্রহণ করেছেন গভীর শ্রদ্ধায। কিন্তু দুটো প্রশ্ন ওঠে এই প্রসঙ্গে। গ্রামীণ সমাজ যে স্বযংসম্পূর্ণ হতে পাবে না ব্রিটিশ শাসনকালে, তার প্রধান কারণ ব্রিটিশের শোষণ শক্তি। তাব কেন্দ্রীয শোষণের সাহায্যে গ্রামীণ সমাজের হৃদয়কে উৎপাটিত কবেছে বলেই সে বিক্ত এবং আত্মশক্তি হাবিযেছে। কেন্দ্রীয় শোষণযন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, ইচ্ছা করলেও নিজেকে ছিন্ন কবা যায না। তাই বাধ্য হযে কৃষিমুখী সভ্যতা শেষ পর্যন্ত শ্রমিক সভ্যতায পরিণত হয। এবং শ্রমিক সভ্যতায পরিণত হলে যন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রেব সঙ্গে সমাজের নাড়ীর বন্ধন ঘটে। দ্বিতীয়ত, এ যুগে দেশ তো দূরেব কথা, সব মহাদেশ মিলে পৃথিবীতে

একটি সামগ্রিক ঐক্য গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা সর্বত্র দেখা যায়, যেখানে নাগরিকতা ও কেন্দ্রীয শক্তির অমোঘতা অস্বীকার করা বাতুলতা। মার্কিন মুলুকেব ডলারের অবনতি ঘটলে গ্রামেও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার মতো। সেখানে গ্রামীণ সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করা আকাশকুসুম রচনা। স্বদেশী যুগে এর রোমান্টিক উন্মাদনা থাকতে পাবে, কিন্তু এখন আর নেই। বিকেন্দ্রীকরণেব একটি শুধু সার্থকতা দেখি, সেটি হলো নীচতলা থেকে ছোট ছোট গোষ্ঠীব মধ্যে গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা গড়ে তোলা, কিন্তু তাব সঙ্গে সমগ্র দেশের নাড়ীর যোগ থাকবে কেন্দ্রীয় শক্তির সাহায্যে। এই কেন্দ্রীয় শক্তিই আবার বিশ্বশক্তির সঙ্গে যোগস্থাপন কববে। আমাদেব দেশে ওপরতলা থেকে পবিকল্পনা হয়, কিন্তু নীচতলা থেকে ওপবে ওঠে না, তাই ওপবেব পবিকল্পনাব স্রোত পথ চলতে গিযে বালির চবায পথ হাবিযে ফেলে, গ্রামীণ সমাজে গিযে আব পৌছয না।

ঔপন্যাসিক হিসাবে তাবাশঙ্কব এইসব চিন্তা করেননি, তিনি গ্রামেব মানুষ, ক্ষযিষ্ণু জমিদাব পবিবাবে জন্মেছেন, তাই আদর্শ জমিদাবের দৃষ্টিতে তাঁর নিজের গ্রামকে শ্রীবৃদ্ধি ও স্বযংসম্পূর্ণ করতে চেযেছেন অতীত-স্মৃতিচাবী রোমান্টিক বেদনায। এখানে তাঁর পিতাই তাঁব আদর্শ।

কিন্তু তবুও তাবাশঙ্কব আধুনিক। আধুনিক এই কাবণে যে, তিনি আদর্শ হিসেবে যে বস্তুই গ্রহণ করুন না, তাঁব দৃষ্টি স্বচ্ছ ও মুক্ত। মুক্ত দৃষ্টিব সাহায্যে দেখেছেন বলেই ব্রিটিশ শক্তির অধীনে শোষণকাবী জমিদাব শ্রেণীকে যথার্থভাবে চিত্রিত কবেছেন, দেখিযেছেন জমিদার ও তাদেব শোষণযন্ত্রেব চাপে প্রজা কিভাবে উৎপীডিত ও উৎখাত হয। শ্রমেব মূল্যে নিঃসঙ্গ হযে কিভাবে অর্থের জন্যে বিক্তচিত্তে ব্যবসাযী ও বণিকশ্রেণীব হাতেব ক্রীডনক হয। গ্রামীণ কৃষি সভ্যতায় সাধাবণ নগণ্য প্রজাবও একটা নিবাপত্তা ছিল, মাটিকে মা বলে ভাবতে পাবতো, পুবাতন ঐতিহ্যেব সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা জডিযে ছিল, কিন্তু শহবেব শ্রমিকেব মধ্যে তাব কোনো বালাই নেই। সামন্ততান্ত্রিক জমিদাব-প্রথাব শোষণ থেকে নূতন সমাজব্যবস্থায শোষণকারী মানুষেব কাছে তাবা নেহাতই শ্রম, মানুষ কখনো নয। শহবের সভ্যতাকে ঘৃণা করলেও, দেবনাথের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজেব স্বপ্ন উদ্ভাসিত হলেও, এই অনিবার্য পরিণতি তিনি দেখিযেছেন। দেখিযেছেন এই অনিবার্য পরিণামেব সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্র কিভাবে পবিবর্তিত হয, যে পবিবর্তন পূর্বে গ্রামীণ সমাজে চণ্ডীমণ্ডপের অধিকাবে কখনোই কল্পনা কবা যেতো না। আমবা ভাবতে পারি কি, বন্ধ্যা

কামার বৌ স্বামীর পৌরুষ ও প্রেমকে ভুলে, তার অবর্তমানে দুর্বার কামনায় ও মর্যাদার বোধে মিতে দেবুকে আলিঙ্গন করতে চাইবে, প্রত্যাখ্যাত হয়ে অত্যাচারী ও কামুক ছিরে পালের কাছে আশ্রয় চাইবে, এবং তারপর সচেতন হয়ে পালিয়ে গিয়ে নূতন পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে, যে জীবন কামনায় পরিপূর্ণ। ভাবতে পারি কি, মুচিদের যৌন বন্ধনহীন মনুষ্যত্বচ্যুত জীবনের মধ্যেও মানবিক অনুভূতি আসতে পারে। এইসব কারণেই অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদপ্রথা তারাশঙ্করের রচনায় নিন্দনীয়। তাঁর উপন্যাসে বিধবা স্বর্ণ বিপত্নীক দেবনাথকে ভালোবাসে, দেবনাথ তাকে সহধর্মিণীর মর্যাদায় বসায়, হিন্দু কামার বৌ ক্রীশ্চান নগেন্দ্রনাথকে বিবাহ করে, সদ্‌গোপ চাষী দেবনাথ অস্পৃশ্য মুচিনী দুর্গার হাতে জল খায়, ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত ত্যাগ করে, বীরবংশী, মুসলমান কায়স্থ সকলের সঙ্গে একই টেবিলের ওপর প্লেট থেকে খাবার তুলে খায়। গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবভিত্তিক নয় বলেই অনাধুনিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বদেশী যুগে সমাজের অগ্রগতির একটা প্রবণতা আনতে পেরেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এর স্থান অনস্বীকার্য, তারাশঙ্করও একে গ্রহণ করে বাংলা সমাজের জগদ্দল পাথরটাকে অনেকটা গড়িয়ে দিয়েছেন, যা শরৎচন্দ্রের মধ্যে ছিল না। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

৪

'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাসের মধ্যেই তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চেতনা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এবং পরবর্তীকালের উপন্যাসের চরিত্রের বীজ এর মধ্যে আছে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন :

'আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'চৈতালি ঘূর্ণি'।

'রাইকমলে'র আগে ১৩৩৫ সালের 'কালি কলমে' 'শ্মশানের পথে' নামে একটি গল্প বেরিয়েছিল। এই গল্পটির মধ্যেই আমার ভাবী সাহিত্যিক জীবনের সুর নিহিত ছিল। পল্লীজীবন, পল্লীসমাজ জীর্ণ হয়েছে, ভেঙে পড়তে গিয়ে কোনোক্রমে সেই ভাঙা কাঠে বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে—শ্মশান আসছে এগিয়ে। জমিদার, মহাজন, কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়না, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।

'এ অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যক্ষ। ছোট জমিদার বংশে আমার জন্ম—আবার

কংগ্রেসকর্মী, এবং আমার মা দিয়েছিলেন এক বিচিত্র ন্যায়-অন্যায় বোধের ধারণা, তাই গ্রামে গ্রামে কখনো খাজনা আদায় উপলক্ষে কখনো সেবাধর্ম উপলক্ষে ঘুরবার সময় গ্রামের অবস্থা আমার চোখে বিচিত্ররূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল।'

'চৈতালি ঘূর্ণি'র প্রথম পর্বের কাহিনী তারাশঙ্কর এখানে বলেছেন, উপন্যাসের প্রথম বাক্যেই সঙ্কেতের মধ্য দিয়ে এর বিষয়বস্তু বর্ণিত : 'অনাবৃষ্টির বর্ষার খর রৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব, মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস, হুহু করিয়া একটা দাহ বাহিয়া যায়।' এই উত্তপ্ত দাহই উপন্যাসের নায়ক গোষ্ঠের জীবনে তিনি দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসের বর্ণনাগুলিই এই উপন্যাসের ভাববস্তু, ঘটনা ও চরিত্র এই বর্ণনার কাছে ম্লান হয়ে গেছে :

'জীবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গার, কঙ্কাল, শব।' 'কঠিন রসলেশহীন মাটির বুকে শীর্ণ পাংশুটে গাছগুলি তবু অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, যেন শুষ্কবক্ষ কঙ্কালাবশেষা নারীর সন্তান সব, মরণের শোষণে রসময়ী ধরণী মা সেও বুঝি বন্ধ্যার মতো শুষ্কবলা হইয়া উঠিল। বাতাস বয়, সঙ্গে সঙ্গে চিতার ছাই উড়ে, এদিকে গাছপালা দোলে, উহাদের পাতায় ছাইগুলা জড়াইয়া যায়, যেন মুমূর্ষু জীবন মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।'

'বাহিরের ওই মরণের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক যেন মৃতের রাজ্য।' এ ভাষা সহজ সরল নয়, স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যায় না, মুমূর্ষু ব্যক্তির রুদ্ধশ্বাসের মতো হুঁচোট খেয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির নির্মমতা। এই নির্মমতা তান্ত্রিকের শব-সাধনার মতোই ভয়াবহ। এই নিষ্ঠুর বর্ণনার মধ্যে শুধু গ্রামীণ সমাজের মৃত্যু তারাশঙ্কর সঙ্কেতিত করেননি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ও ভারতের শোষিত রূপকেও প্রকাশ করেছেন। সারা ভারতবর্ষের গ্রামের চেহারা ওপরের বর্ণনার মতোই ভয়াবহ।

গোষ্ঠ চাষী, তার বাপের আমলে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গাই, পুকুর-ভরা মাছ সবই ছিল, কিন্তু জমিদারের অত্যাচারে ও শোষণে সব গেছে, জমিদারি প্রথায় জমির মালিক চাষী নয়, মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার, সরকারকে নির্দিষ্ট কর দিয়ে নিজের খুশি মতো জমিদার প্রজার খাজনা বাড়ায়, প্রজার জমির গাছের মালিকও জমিদার, পথ চলার রাস্তার অধিকারও সে পায় না, খেয়া পেরোতে কর দিতে হয়, বিয়ে হলে নজরানা পাঠাতে হয়। জমিদার শোষণ

চালায তার নিযুক্ত চাপরাশি, গোমস্তা-নাযেবদের দিয়ে। জমিদাব আবাব ব্রিটিশ শক্তিরই প্রতিনিধি। সুতরাং প্রজা একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন, অন্যদিকে শোষিত। নিজের ক্ষেতেব আখ চাপবাশি ভেঙে নিলে বলবার অধিকার চাষীর নেই, ববং গালাগাল খেযে চুপ কবে থাকতে হয। এই অবস্থায় দাম্পত্যজীবন সুখের হয় না, সুন্দর স্ত্রী থাকলেও। তাই গোষ্ঠের স্ত্রী দামিনী অনাহাবক্লিষ্টা। এব সুযোগ নিয়ে বোষ্টম সুবল দামিনীব প্রতি আসক্ত হয, যদিও সুবলেব একনিষ্ঠ প্রেম এখানে জটিলতা সৃষ্টি কবে, কিন্তু গোষ্ঠের অর্থের সামর্থ্য থাকলে সুবল কখনোই দামিনীর প্রতি নজর দিতে পারতো না। আর দামিনী সত্যিই গোষ্ঠকে ভালোবেসেছে, তাই সুবলের এই চুরি কবে লুকোনো প্রেমকে ঘৃণা করে। কিন্তু যৌবনে অভাবেব দাহে দামিনীব চিত্ত মাঝে মাঝে প্রলোভিত হয। আব গোষ্ঠ অভাব মোচন করবাব জন্য কাবুলিব কাছে টাকা ধার নেয। ধাব সত্ত্বেও মহাজনেব সুদ দিতে পারে না গোষ্ঠ, তার কথা শুনতে হয, মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হযে ওঠে চিত্ত। কিন্তু প্রকাশেব পথ পায না। গোষ্ঠেব ছেলেব অসুখে কবিবাজ ডাকে সুবল, বাধা দিতে ইচ্ছে হয, কিন্তু জীবনের কাছে মর্যাদা হাব মানে। এই অবস্থাযও গোষ্ঠের চোখের সামনে সবুজ ধানেব গুচ্ছ স্বপ্ন নিয়ে আসে: 'সবুজ মাঠে গোষ্ঠেব বুকখানা জুড়াইয়া যায়, সে ভাবে, আশা বোধ হয় সবুজববর্ণী।' এই আশাব স্বপ্ন দেখতে দেখতেই সে খবব পায তাব জোতজমি নিলামে ডিক্রি হয়ে গেছে। শুনে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু পারে না, তবু গোষ্ঠ সবুজ কচি ধানের ওপর হাত বুলিয়ে যায়, ধানগুলি শিশুর মতো তাকে চঞ্চল করে। কৃষকের এই অবস্থার মধ্যেই মধ্যবিত্তরা গান্ধীব স্বদেশী আন্দোলনে প্রভাবিত হযে স্বপ্ন দেখে। কাগজে পড়ে উল্লসিত হয়, অসহযোগের আন্দোলনের মধ্য দিযে স্বরাজ আসবে, স্বরাজে সকলেব জন্মগত অধিকার। তাদের মধ্যে নবীন-প্রবীণেব দ্বন্দ্ব বাধে, কিন্তু রিক্ত চাষীর মনে এ সকলেব চেয়ে এই প্রশ্ন গভীর হয়ে ওঠে, 'জমিদার-মহাজন উঠবে কবে বলতে পাব?' 'অতকালের অত্যাচারে অনাহারে, অতীতেব—সব দেশ-ধর্ম-সমাজ, সমস্ত ইহাদেব কাছে বুঝি তুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। শুধু জীবজগতের একমাত্র জন্মগত প্রেরণা, বাঁচিবাব চেষ্টায় পাগল।'

এখানেই তারাশঙ্কর শ্রেণীচেতনা দেখিযেছেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতায জাতীয়তাবোধ আসতে পারে, কিন্তু সর্বহাবা মানুষ শ্রেণী-সংঘর্ষের জন্যই উন্মুখ, তাই বিদ্রোহ মাঝে মাঝে জীর্ণ হলেও 'চৈতালি ঘূর্ণি'র মতো মাথা চাড়িয়ে ওঠে,

কিন্তু যেহেতু দলবদ্ধ সচেতনতা নেই, সেইহেতু তা চিরস্থায়ী হয় না। হয়তো তারাশঙ্কর এইখানে সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত, তাই গান্ধীর হৃদয় পরিবর্তনের বদলে সংঘর্ষে কিছুটা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।

গোষ্ঠের শিশুপুত্র অনাহারে মারা গেল গোষ্ঠ ও দামিনীর হৃদয়ে শ্মশান জ্বালিয়ে দিয়ে। সৎকাবে সুবলই সাহায্য করলো। পুত্রের সঙ্গেই জমি গেল মহাজনের কাছে, ডাকাত রাযবল্লভ লাঠি দিয়ে মহাজনকে মারতে যায, মহাজন এসেছিল আদালতের প্রেয়াদা ও জমিদাবের নগদী নিযে। সুতরাং সরকার, জমিদার ও মহাজনের সম্মিলিত শ্রেণার অত্যাচারে গোষ্ঠ বিব্রত, সকালবেলাই জমিদারেব খোট্টা চাপরাশির বর্বব ব্যবহাবে দামিনী বাধ্য হযে সুবলকে জড়িযে ধবে, পবমুহূর্তেই মান ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ছিটকে আসে। স্ত্রীকে একা রেখে জমিদাবের চাপরাশির ভযে পালিযে গিযেছিল। ফিবে এসে জানায গাঁযে বান ঢুকেছে।

দামিনীর মনের ভেতবে স্বামীর পৌরুবহীনতায ঘৃণা, সুবলের প্রবৃত্তিজাত ভালোবাসার আলোড়ন, স্বামীর প্রতি অতীত প্রেমের নিষ্ঠা ও স্ত্রীব মর্যাদাব সঙ্গে ঘটনার সংঘর্ষ চৈত্র আকাশেব ঝড় তোলে। সুবলই টাকা দিয়ে চাপরাশিব বর্বর আচবণ থেকে বাঁচিযেছে। খাজনা দিযে বাসিদ সেই সংগ্রহ কবেছে, ফলে অত্যাচারের হাত থেকে কিছুকালের জন্য রেহাই পেযেছে।

গ্রামে বান ঢুকেছে। জমিদাবেব খোট্টা চাপরাশি এসেছে গোষ্ঠকে নিতে কাছারিতে জল বোধ করবার জন্যে। গোষ্ঠ যেতে নাবাজ, চাপরাশিকে ধাক্কা দিযে ফেলে দেয়, চাপরাশি লাঠি হানে, সেই লাঠি ধরে গোষ্ঠ চাপবাশিব মাথায মারে, বৃষ্টির জল ও চাপবাশির মাথার রক্ত এক হযে যায।

কিন্তু ব্রিটিশের আইনে অত্যাচারীকে হত্যার অধিকার নেই। তাই ভয়ে ও পরিপার্শ্বের চাপে গোষ্ঠ ভাবে ও বলে,

'সেই ভাল, কিসের তরে থাকব, জমি গেল, ছেলে গেল, দুটো পেট যেখানে খাটাব, সেইখানে ভাত, এখানেও খাটা বাইবেও খাটা। ঘর? গাছতলা তো আছে।'

গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে যেতে পথের ওপর দাঁড়িয়ে গোষ্ঠ বলে :

'কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?'

গোষ্ঠ মাটি ছেড়ে শহরে শ্রমিকে পরিণত হতে চলেছে, মাটির সঙ্গে তার

ঐতিহ্য ছিল জড়িয়ে, কিন্তু শহরের শ্রমে, যন্ত্রের চাকায়, চিমনির ধোঁয়ায়, বয়লারের আগুনে কোনো ঐতিহ্য বা প্রীতি নেই, আছে যান্ত্রিক কাজ, এবং এই কাজ বা শ্রমের সঙ্গে তার একাত্মতা ঘটে না, অর্থাৎ তার শ্রম অনুযায়ী বেতন পায় না, তাই কারখানার মালিক ও পুঁজিবাদী শোষণ ক'রে অর্থ সঞ্চয় করে, এবং সেও রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি। তাই বিরোধ বাধে শ্রমিক ও মালিকে। মালিক পক্ষেরই জয় হয়, কারণ আইনগত শারীরিক অধিকার তার হাতে।

গোষ্ঠের কথায় নিরীশ্বরবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে, তার ব্যবহারে ব্যক্ত হয়েছে হিংসা এবং বিপ্লব। এই চেতনা কখনো গান্ধীবাদী নয়। ১৯২৫ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৭ সালে 'ওয়ার্কার্স্ এ্যাণ্ড পেজেণ্টস্ পার্টি' গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে। ফলে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধে। আর সুভাষচন্দ্রও কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী আন্দোলন চালিয়ে এই মতবাদ প্রচার করছিলেন যে, সমাজতন্ত্র আনতে গেলে শ্রেণীসংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, শ্রেণীসংঘর্ষ হিংসা ছাড়া কিছু নয়। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য দূর করতে গেলে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বণ্টন দরকার। (যদিও অধ্যাত্মতত্ত্ব বাদ দেননি এর সঙ্গে) এই পরিবেশেই তারাশঙ্কর গোষ্ঠের মধ্যদিয়ে বামপন্থী শ্রেণী-সংঘর্ষের স্বরূপ ব্যক্ত করতে চাইছেন, কৃষক আন্দোলনকে ভিত্তি করে। কিন্তু তা ক্ষীণ।

এই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনকেও এই উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তারাশঙ্কর। উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ শহরের মজদুরদের ছবিতে পূর্ণ।

কৃষিজীবনের প্রতি যে মমত্ব ও ভালোবাসা, রোমাণ্টিকতা প্রকাশ করেছেন, শহরের বর্ণনায় তা নেই। শহর তাঁর কাছে রিক্ত, বহিঃসৌন্দর্যের ছলনা। দুটি বর্ণনার পার্থক্য দেখলেই বোঝা যাবে।

'গোষ্ঠ ফিরিয়া আপন জমির আড়ুলের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ধানের পাতা নাড়ে-চাড়ে, কচি কচি সতেজ ধানগুলি হাওয়ায় লুটোপুটি খেলে, গোষ্ঠর গায়ে পড়ে, পায় পড়ে। যেন দুরন্ত চঞ্চল শিশুর দল।'

শহরের বর্ণনা:

'কালো কালো পাথরের কুচি দেওয়া চওড়া রাস্তা। দুই পাশে দোকান—পান, বিড়ি, মিষ্টি, মনিহারী, চকচকে ঠুনকো জিনিসে ভরা, সবারই মাঝে একটা বহিঃ-সৌন্দর্যের আস্ফালন।

ওপাশে রেল স্টেশনের ধারে স্তূপ-বাঁধা কয়লার ডিপো, কালিতে রাস্তাঘাট কালিমাখা, সব যেন রুক্ষ, রৌদ্রে কয়লার স্তূপ ঝাঁঝে ভরা। আশপাশ পর্যন্ত ওই উত্তাপে তপ্ত।

লোহার দোকান, শুধু ঝন ঝন শব্দ, মাটির বুক ফালি ফালি করিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিবার কত অস্ত্র—গিমনা, গাঁইতি, শাবল, সব যেন তীক্ষ্ণ, হিংস্র, রৌদ্রের আলোয চক চক করে।'

মাটির বুক ফালি ফালি করে দেয এই শিল্পসভ্যতা—এই ধারণাই তারাশঙ্কর গান্ধীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

এই শিল্পসভ্যতায় মজুরশ্রেণীর জীবনও কালিমালিপ্ত : 'লাইনের ধারেই ছোট ছোট পায়রা খুপীব মত ঘব—ওই মজুরের বস্তি, সমাজের আঁস্তাকুড়, অর্থশালীর ডাস্টবিন।' সুতরাং এদের জীবন ডাস্টবিনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। শোষণের বিরুদ্ধে মজুরেরা ব্যক্তিগতভাবে চিৎকার করে, কিন্তু দলবদ্ধ হতে পারে না। এই জীবনে এসে গোষ্ঠ প্রথমে শান্তি পায, কিন্তু কিছুদিন বাদেই মজুর জীবনের অভিশাপ তাকে কলঙ্কিত করে। গোষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে সুবল এসেছে তার কামনা নিয়ে, দামিনীর প্রতি কলের ছোট মিস্ত্রীর লোভার্ত বাসনা জ্বলে ওঠে, গোষ্ঠ মদ খেতে শুরু করে, অর্থ নষ্ট করে এবং দামিনীকে প্রহার করে মাতাল অবস্থায়। দামিনীর পরনে কাপড় নেই, সুবল গোপনে কাপড় দেয, প্রকাশ্যে ছোট মিস্ত্রী কাপড় নিয়ে আসে দামিনীর জন্য। কাপড় পুড়িয়ে ফেলে দুজনের কামনা থেকে শুদ্ধ হয়ে ওঠে দামিনী। আর এরি মধ্যে ফিটার বুড়ো দামিনীকে মেয়ের মতো মনে করে, তাকে কাপড় দেয, গোষ্ঠ প্রথমে সন্দেহ করে, কিন্তু বুড়োর ব্যবহারে কেঁদে ফেলে। এবং শোষণের বিরুদ্ধে মজুরদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র ক'রে মালিকপক্ষ অত্যাচার চালায়, গোষ্ঠ হাসপাতালে মরে।

এই মজুরদের জন্যেই শিক্ষিত তরুণেরা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করে, তাদের আত্মসচেতন করতে চায়, শিক্ষিত করতে চায় তাদের। তাই এদের নেতৃত্ব দেয়, কিন্তু মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে মজুরদের প্রবল ঘৃণা। কারণ ঘুষ খেয়ে এরা ধর্মঘট পান্‌চাল করে দেয়। তাদের মধ্যেই আক্রোশ জাগে, কয়লার আগুনের মতোই গোষ্ঠ বাইরের সমস্ত সৃষ্টিকে গলিয়ে দিতে চায। এই শোষণের ফলেই তারা বোঝে, তারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া কোন মুক্তি নেই, তারাশঙ্কর বলেন :

'দোষ নাই, যুগযুগান্তর যাহারা ইহাদের লুটিয়া খাইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস

করিবার মত শক্তি ইহাদেব নাই। কথাটা এত খোলাভাবে ইহারা বুঝে না, কিন্তু জন্মগত সংস্কার, অহিনকুলেব জন্মগত বিরোধেব মত।'

মালিক-মজুরেব সংঘর্ষে এই উপন্যাসে মালিকের প্রবোচনায় ও অত্যাচারে মজুব মারা গেছে, কিন্তু তাবাশঙ্কর এই সংঘর্ষের মধ্যদিযে শুভ প্রভাতের আলোর রেশ আকাশে দেখতে পেযেছেন। তাই উপন্যাস শেষ করেছেন এই ভাষায:

'সেই দিক পানে চাহিযা শিবকালী আপন মনেই বলে, চৈতালীব ক্ষীণঘূর্ণি, অগ্রদূত কাল বৈশাখীব।'

এখানে তাবাশঙ্কব পুরোপুবি শ্রমিক আন্দোলনেব তত্ত্ব স্বীকাব করেছেন, সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীব তত্ত্ব এবং আন্দোলন, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিযেই এর লক্ষ্যে পৌছুতে হবে, লক্ষ্য হলো সেই সমাজ যে সমাজে থাকবে সমষ্টিগত নিযন্ত্রণ, শ্রমজীবীবাই বাষ্ট্রেব শাসনযন্ত্র অধিকার করবে এবং শিল্প-বাণিজ্যে স্বাযত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু গান্ধীর সমাজতন্ত্র এই শ্রেণীসংগ্রামেব হিংসা স্বীকার করে না, শ্রম ও পুঁজিবাদেব মধ্যে সুসংগতিপূর্ণ সহযোগিতা থাকে। ধনী তাব ধন নিযে গবীবের সঙ্গে ঐক্যবোধ করে। ভগবানেব বাজত্বে ধনী হচ্ছে অছি, ভগবানেব সম্পদ সে বিলোয। বলা নিষ্প্রযোজন, এই সমাজতন্ত্রবাদ চোবকে চোর হতে শেখায, গবিবকে গবিব হতে বাধ্য কবে।

৫

কিন্তু তাবাশঙ্কব ১৯৩৯ সালেব উপন্যাসে, ধাত্রীদেবতায, পুরোপুরি গান্ধী-প্রবর্তিত বীতিকেই অনুসবণ কবেছেন, যাব পূর্ণ প্রতিফলন 'গণদেবতায' ও 'পঞ্চগ্রামে'। ধাত্রীদেবতায সমস্যা সমাজতন্ত্রবাদ নয়, জাতীযতাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা আন্দোলন সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদে আসবে না, আসবে গান্ধীর সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, অহিংসা, আইন-অমান্য আন্দোলনে, অহিংস ধর্মঘটে ও মিছিলে।

শিবনাথেব জাতীযতাবোধের মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু সচেতনতা নেই। এবং সে তলস্তযজীবন-প্রভাবিত কৃষিসভ্যতা ও আন্দোলনে এসেছে দেশপ্রেমের জন্যে বা জাতীযতাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে নয়, ব্যক্তিজীবনের রিক্ততা থেকে, গৌরীর অভিমান ও অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে, সংসার ও জীবনের চাপে, যদিও উচ্ছ্বাসমূলক দেশভক্তি তার ছিল, কিন্তু জনসাধারণের সচেতন আন্দোলনে তার ভূমিকা নেই, এবং এই জনসাধারণ সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞও নয়। স্বাভাবিকভাবেই সব ঠিক হয়ে যাবে

এই বোধই সক্রিয। ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন তারাশঙ্করকে এমন-ভাবে প্রভাবিত করেছে যে, কারাগারে আহৃত মার্কসীয় তত্ত্ব তিনি একেবারে মন থেকে মুছে ফেলেছেন। সুতরাং 'চৈতালি ঘূর্ণি'র সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তারাশঙ্করের দিক থেকে একটি কথা বলা যেতে পারে যে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের দেশাত্মবোধের ভেতরে এই জাতীযতাবোধের উচ্ছ্বাসই স্বাভাবিক, কারণ শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব মানলে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হযে যায। কিন্তু একথা যে ভ্রান্ত, তার নজির মেলে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে দেবনাথ ঘোষের তত্ত্বে, বক্তব্যে, আচার-আচরণে, কর্মে, ব্যবহারে, স্বপ্নে ও আদর্শের চিন্তায। দেবনাথ গান্ধীর গ্রামীণ সমাজতন্ত্রবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তারাশঙ্করের মধ্যে এই মতবাদের বিরোধ ও পরিবর্তন লক্ষণীয। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে বিপ্লববাদী দাদাকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদী দলের যুবক, বিপ্লববাদী তারাশঙ্করকেও হত্যা করেছে গান্ধীর দর্শন। 'চৈতালি ঘূর্ণি' রচনার সময 'পথের দাবি' (১৯২৬) উপন্যাসের ও সুভাষচন্দ্রের বিপ্লববাদ তারাশঙ্করকে প্রভাবিত করেছে, সব্যসাচীর কথার সঙ্গে কিছু মিল আছে, সেই সঙ্গে মার্কসীয় ভাবনা ও চিন্তা। কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা'য তারাশঙ্কর, গান্ধী ও রবীন্দ্র-প্রভাবিত। ১৯৩৪ সালে 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হযেছে, রবীন্দ্রনাথ মানবতার দাবিতেই সন্ত্রাসবাদকে অস্বীকার করেছেন। এই সঙ্গে বঙ্কিমের দেশজননী-কল্পনা ও গোরার বিশ্ববোধ সক্রিয। বিপ্লববাদী দাদা মৃত্যুর আগে যে কথা বলেছিলেন সেগুলি তারাশঙ্করের নিজের কথা। এবং এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হযেই শিবনাথ পরবর্তীকালে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে, বিপ্লববাদ হত্যার পথ, তাই ভুলের পথ এবং বর্জনীয়। 'আমার ধারণা, ইংরেজ তাড়ানোর নামই স্বাধীনতা নয়, বৈদেশিক শাসন উচ্ছেদ করে সাম্প্রদায়িক শাসন প্রবর্তনের নাম রাজ্য নিযে কাড়াকাড়ি। দেশের সত্যকার স্বাধীনতা ও থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।' গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের মতোই বলেছেন : 'চরম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাই পরম উন্নতি। আমার সভ্যতা, আমার জাতীয ভাবধারা অনুমোদিত পন্থায পরম প্রাপ্তির সাধনার অবকাশ, সুযোগ, অধিকার। আমার ওপর বিদেশী রাজশক্তির চাপিয়ে দেওযা বিদেশী জীবনদর্শনকে আমি অস্বীকার করতে চাই। আমার জীবনের সাধনায অপরের নির্দেশ আমি মানতে চাই না। পূর্ণ, আজ বৈদেশিক শাসনের ফলে, তাদের জীবনদর্শনের চাপে চরম বস্তু পরমকে ভুলিয়ে দিলে। আমি স্বাধীনতা চাই সেই জন্যে, আর সেই জন্যেই বিদেশীর নির্দিষ্ট অ্যানার্কিজম, কি টেররিজম আমি

গ্রহণ করতে পারি না।' এবং রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ীই মূর্ত হয়ে উঠেছে: 'সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বস্তু, সেই বস্তুর মূর্তিমতী তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তুর বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।'

তলস্তয়ের দেশ পরাধীন ছিল না, সুতরাং বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় তিনি অমানুষিকতার দিক থেকে বিচার করতে পারেননি, এবং এই কারণেই সেই আদর্শ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এবং প্রয়োগ করতে গিয়ে বিরোধের সম্মুখীন হয়েছি, তা থেকে ধ্বংস আমাদের অনিবার্য হয়ে উঠছে। তবে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথও রাজনৈতিক হাতিয়ারের অনেকগুলির মধ্যে একটি, অন্ততঃ প্রাথমিকরূপে একে গণ্য করা যায়।

৬

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে সংসার থেকে বিক্ত হয়ে দেশাত্মবোধে শিবনাথ উদ্দীপিত হয়েছে, আর 'গণদেবতা' উপন্যাসে দেবনাথ সংসারের প্রেম থেকে বাইরের বঞ্চিত মানুষের সেবা, কল্যাণ ও মুক্তির জন্যেই বেরিয়ে এসেছে। তার ঘরের প্রেম ও বাইরের প্রেম এখানে এক, বরং মানুষের প্রেম অনেক বেশি। তাই দেবর, স্ত্রী, বিলু ও পুত্র খোকার মৃত্যুর পর উদাসীন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থ ঘুরলেও দেশের ও দশের মানুষের আকর্ষণে আবার গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। দেবু বিক্ততাকে পূর্ণ করেনি, পূর্ণ থেকেই পূর্ণের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। দেবু জমিদার ও উচ্চশিক্ষিত নয়, দেশের চাষী মানুষ, সে তাদের আত্মীয় হয়ে তাদের সমস্যা দেখেছে, তাই তার আন্তরিকতা অপরিমেয়। তবে এখানে তারাশঙ্কর গান্ধীবাদকে অনুসরণ করে যে গ্রামীণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তাতে দুটি বস্তু প্রতীকের মতো মনে হয়, সন্ত্রাসবাদী যতীনকে তিনি উধাও করে দিয়েছেন, অথচ তার প্রতি একটা সম্ভ্রম ও ভালোবাসা পাঠকের প্রতি জেগে উঠছে বারংবার, সন্ত্রাসবাদের প্রতি গোপন প্রীতিই হয়তো কাজ করেছে তারাশঙ্করের মনে, কারণ ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ তীব্র, এই দুটো তারাশঙ্করকে নিয়ত টানে, তাই তাকে নিরুদ্দিষ্ট করলেও ভালবাসা দিয়েছেন অন্তরের। কিন্তু নিরীশ্বর কম্যুনিস্ট ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথকে তিনি জেলে

হত্যা করেছেন, তার প্রতি একটা ঘৃণা পাঠকের মনে জাগে, সে যখন জংশনের বাংলোয় সেনের বোনেব হাত ধরে টানে, তখন তার দেশপ্রেমকে ছাপিযে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণ্য কপটতাই তীব্র হযে উঠেছে, এবং বিশ্বনাথের মৃত্যুরও কোনো কারণ তারাশঙ্কর দেননি। ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশঙ্করের এই ক্রটি অমার্জনীয় মনে হয়। 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাসে শিবকালী, 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথ, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে দেবু তারাশঙ্করেবই আত্মপ্রতিকৃতি, শিবকালী থেকে দেবুর পরিণামও তাবাশঙ্কবেব বাজনৈতিক জীবনেব পরিণাম।

'গণদেবতা' উপন্যাসে কালবিচার আশাপ্রদ নয। একত্রিশ পৃষ্ঠায আছে: 'এদিকে যুদ্ধ লাগিয়া সব যেন উন্টাইযা গেল।' 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেব তিনশ তেত্রিশ পৃষ্ঠায আছে: 'উনিশ-শ ত্রিশ সালেব আইনঅমান্য আন্দোলন আবম্ভ হইযা গিযাছে। পঞ্চগ্রামেও উত্তেজনা জাগিযাছে।' সাতাশ অধ্যাযে আছে: 'তিন বৎসব পব। উনিশ শ তেত্রিশ সাল। প্রায কুড়ি বছরেব ইতিহাস এখানে বিবৃত। দেবুব বযস যদি উপন্যাসেব গোড়ায কুড়ি বাইশ হয, উপন্যাসের শেষে অন্ততঃ বিযাল্লিশ তেতাল্লিশ হবে। কিন্তু তার মানসপবিবর্তন খুব কম। জমিদাবেব ইতিহাস চলাতে উনবিংশ শতাব্দী থেকে ছাব্বিশ সাল বলাব মধ্যেও ইতিহাসেব অনৌচিত্য আছে।

'চৈতালি ঘূর্ণি'ব প্রথমপর্বেব ঘটনা এখানে বিস্তৃত। বাষ্ট্রশক্তি হিসেবে জমিদার, জমিদাবের প্রতিনিধি হিসেবে গোমস্তা, মহাজন, চাপবাশি, দারোযান, নগদী চিত্রিত হযেছে, সেই সঙ্গে বাষ্ট্রশক্তিব অধিকাবী কানুনগো সেটেলমেণ্ট অফিসাব, আমিন এই জমিদাব শ্রেণীব সঙ্গে যোগ দিযেছে। গণদেবতায শিবকালীপুরেব গ্রামেব এই বাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে ছিরুপাল, যে পববর্তীকালে ধনেব আভিজাত্যে শ্রীহবি ঘোষ হযেছে। তাবাশঙ্কব বর্ণনা দিযেছেন: 'লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড, প্রকৃতিতে ইতব এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদেব যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কাবণেই ছিরুব নাই। অভদ্র ক্রোধী গোঁয়ার, চবিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে ভয় কবিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয না।' পল্লীগ্রামের জমিদারেব সর্বজনীন সাংকেতিক রূপ। তাই সে মুচির মেয়ের সঙ্গে রাত কাটায, মদ খায, অনিরুদ্ধ কামারেব বৌ পদ্মেব দেহ ভোগের জন্য ঘোবা-ফেরা করে, আর গোমস্তা ও জমিদাবের অধিকাবে খাজনা ও মামুলিচাঁদা, সেস, সুদ, চেকেব দাম, নজরানা, তলবানা, তহুবি, আমলা খবচ হযতো বা থিয়েটাব বৃত্তি, মন্দিব সংস্কারের টাকা সংগ্রহ কবে। গোমস্তারূপে জমিদারের নির্দিষ্ট

খাজনা দিয়ে যথেষ্ট অত্যাচার চালায় অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের জন্য, সেই সঙ্গে ভোগ কামনা।

তারাশঙ্কব 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে জমিদারদের রূপবর্ণনা দিয়েছেন বারংবার। এই জমিদারও গ্রামে থাকে না শ্রীহরির মতো, শহরে বিলাসবহুল জীবন অতিবাহিত করতো, সাধারণ ব্যক্তিকে তারা শাস্তি দিত, কিন্তু নিজেরা ব্যভিচারে মত্ত, মদ্যপান ছিল তন্ত্রশাস্ত্র অনুমোদিত। মত্ত হয়ে জমিদারনন্দনেরা গালাগাল করতো। রাত্রে অসহায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রগৃহে তরুণী বধূ ও কন্যাকে ভোগ করবার জন্যে দরজায় আঘাত করতো জোরে। সাধারণ মানুষ কোনো কথা বলতে পারতো না। বোবা জানোয়ারের মতো সব সহ্য করতো। আর ইংরেজের চাটুকারিতা করে খ্যাতি ও খেতাব নিতো কেউ কেউ। কিন্তু এই জমিদার-শ্রেণীর সঙ্গে জমির কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এরাই জমির মালিক:

'যখন হইতে জমিদার হইল গ্রামের সর্বময় কর্তা, হাসিল পতিত খাল-বিল-খানাখন্দ খাসকর, বনকর, জলকর, ফলকর, পাতামহল, লতামহল, এমনকি উর্ধ্ব অধঃ দরবস্তু হুকুমের মালিক, তখন হইতেই বাঁধ হইয়াছে জমিদারের খাস সম্পত্তি, জমিদারের বিনা হুকুমে কাহারও বাঁধের গায়ে মাটি দিবার বা কাটিবার অধিকার রহিল না। যখন এ প্রথা উঠিয়া গেল, তখন জমিদার বেগার ধরিয়া বাঁধ মেরামত করাইতেন।' (পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ২০৯)।

এদের অত্যাচারেই 'জীবনের গাছের শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে।' তাই সৎ ও সচ্ছল চাষী তিনকড়ি অনাহারে ডাকাতে পরিণত হয়, বাদ্যকর পাতু জমি ছেড়ে, বাজনা বাজানো ফেলে কলের মজুর হয়, কামার অনিরুদ্ধ জাতিব্যবসা ও জমি হারিয়ে কলকাতায় মিস্ত্রি হয়, নাপিত গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যায়, সচ্ছল চাষী ও জমিদার সম্পত্তি ও জোত-জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, শেষে টাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর পর্যন্ত বিক্রি করে। এই অবস্থায় পাতুর মুখ দিয়ে তারাশঙ্কর অর্থনৈতিক অবস্থাকেই ব্যক্ত করেছেন: 'শালা বলছে যাস না, যেতে পারি না, গেরস্ত ধম্ম থাকবে না। গেরস্ত ধম্ম না কচু। পেটে ভাত নাই—বলে ধরমের উপোস করেছি। শালা ভিখ মেগে খেতে হচ্ছে--গেরস্ত ধম্ম।'

জমিদারির এই অবস্থায় প্রাচীন ভারতের বৈদিক নীতি-নিয়ম ভেঙে গেছে। ব্রাহ্মণ আজ আর বিধান দেয না। বিধান দেয গাঁয়ের জমিদার, অর্থের আধিপত্যে। ব্রাহ্মণ মুচির চামড়ার ব্যবসা করে। কিন্তু তারাশঙ্কর এই নিঃস্ব রিক্ততার মধ্যে তাঁর জীবনের দর্শনকে পূর্ণ করেননি। একে পরিপূর্ণ করে

তুলতে চেয়েছেন গান্ধী প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। দেবনাথ ঘোষ বা দেবুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই আদর্শ প্রকট করেছেন। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিধবা ও অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে গান্ধীর মতই ব্যক্ত করেছেন ও চরিত্রের অনুভূতিতে তাকে প্রকাশ করেছেন। জেল থেকে ফিরে এসে বালবিধবা শিক্ষিত সুন্দরী তরুণী স্বর্ণকে দেবু তার কল্পনা ও আদর্শের কথা বলছে :

'দেবু স্বর্ণকে বলিয়া চলিয়াছে—তাহার যে কথা বলিবার ছিল। তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানো কথা। সত্যযুগের আমন্ত্রণ নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভরা ধর্মের সংসার।

দেবু বলিল—তোমার আমার সে ঘরে সমান অধিকার; পুরুষ স্বামী নয়—স্ত্রী দাসী নয়,—কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলবো আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের—শিশুদের, আমি পড়াব ছেলেদের—যুবকদের। তোমার আমার দুজনের উপার্জনে চলবে ধর্মের সংসার।

দুর্গা তাহাদের কাছেই বসিয়া সব শুনিতেছিল। সে অবাক হইয়া গেল। শুধু তাহাদেরই নয়—পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য-স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহারের শক্তিতে, ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম, মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট সবল দেহ—আকারে তাহারা বৃদ্ধি লাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলাফেরা করিবে। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার পথ-ঘাট। ঝকঝকে বাড়িগুলি অবারিত আলোয় উজ্জ্বল উত্তপ্ত—মুক্ত বাতাসের প্রবাহে নির্মল সুস্নিগ্ধ। সুন্দর সুগঠিত সুসমান পথগুলি বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া সুদূর-প্রসারী হইয়া চলিয়া যাইবে—শিবকালীপুর হইতে দেবুড়িয়া, দেবুড়িয়া হইতে মহাগ্রাম, মহাগ্রাম হইতে কুসুমপুর, কুসুমপুর হইতে কল্পনা, কল্পনা হইতে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া জংশনের দিকে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যাইবে সেই পথ। সেই পথ ধরিয়া চলিবে পঞ্চগ্রামের মানুষ, পঞ্চগ্রামের শস্যবোঝাই গাড়ি। দেশ-দেশান্তরে শত গ্রামের সহস্র গ্রামের মানুষ তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া সেইপথ ধরিয়া আসিবে পঞ্চগ্রামে।

দেবু বলিল—সে-দিনের প্রভাতে মানুষ ধন্য হবে। পিতৃপুরুষকে স্মরণ

করবে উর্ধ্বমুখে সজল চোখে। আমাদের সন্তানেরা আমাদের স্মরণ করবে, তাদের মধ্যেই আমরা পাব—তাদেরই চোখে দেখব সেদিনের সূর্যোদয়।'

এই কথা বলেই রাত্রির শেষে কলের বাঁশির শব্দে চমকে কাজের তাগিদে জেগে উঠেছে দেবু। দেবু কর্মের বন্ধনে ধর্মকে বন্দী করতে চায়। কর্মই তার জগৎ। এর দ্বারাই গ্রামের দীনতা হীনতা কদর্যতা দূর করবে সে, অশিক্ষা হটিয়ে দেবে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবে। এটাই সত্যযুগের আমন্ত্রণ যা গান্ধীর কাছে রামরাজ্য এবং গ্রামীণ স্বরাজ।

এই স্বরাজ-চিন্তায় সেবা নয়, দান নয়, কর্ম ও বিনিময়ই প্রধান। নেতৃত্বের বদলে সেবার পরিবর্তে সে কর্ম করবে, কর্মের বিনিময়ে সে যে অর্থ পাবে, তা দিয়েই তার অন্নসংস্থান হবে। সে গ্রামের লোকের স্বজাতি ও জ্ঞাতি হয়ে থাকতে চায়। দেনা-পাওনার কারবার করে জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করে গ্রাম ও আত্মোন্নতিই তার লক্ষ্য। 'বিনিময়। সেবা নয়, দান নয়। দেনা পাওনা।' জেল থেকে ফিরে এসে সে এই শিক্ষাই পেয়েছে। আগে সে কর্মহীন জীবনে সেবা করেছে, এখানেই তার পরিবর্তন।

সে জেল খেটেছে দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়তার জন্যে। গ্রামীণ স্বরাজের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা জড়িত। কারণ পরাধীন ভারতে, দেশের মানুষের মুক্তি নেই। তাই দেশকে স্বাধীন করা মানুষকে মুক্ত করারই সামিল। কিন্তু এই দেশের মুক্তি যতীনের সন্ত্রাসবাদে নয়, বিশ্বনাথের বিপ্লববাদে নয়। সন্ত্রাসবাদ হত্যাকে বিশ্বাস করে, কিন্তু হত্যা মৃত্যুরই সামিল, বিপ্লববাদ নিরীশ্বরবাদী, ধর্ম জাতি দেশ কিছুই সে স্বীকার করে না, সুতরাং এও দেবুর কাছে পরিত্যাজ্য। 'অঙ্কশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্রই' আমাদের সর্বস্ব দাদু, ধর্ম আমাদের, একথা ন্যায়রত্ন যেমন শুনতে চাননি, দেবুও বিশ্বাস করে না। তাই গান্ধীর আদর্শে এই মরণোন্মুখ পল্লীকে ভালোবেসে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছে সে। ন্যায়রত্ন ও বিশ্বনাথের মধ্যবর্তী দেবু, ন্যায়রত্ন প্রবীণ ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতিভূ, একালে যার অস্তিত্ব নেই। আর, বিশ্বনাথ কম্যুনিজমে বিশ্বাসী, সে অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সর্বহারার মুক্তি আনতে চায় বিপ্লবের পথে। ন্যায়রত্নের প্রতিই দেবুর পক্ষপাত বেশি, একটা রোমান্সসুলভ অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে সে, ন্যায়রত্নের কাছে ভাগবতের কাহিনী শুনে নিজেকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু কালের পরিবর্তনে ও গণতন্ত্রের প্রভাবে সে জাতিভেদ মানে না, অস্পৃশ্যতাকে অপাঙ্‌ক্তেয় বলে মনে করে। এবং কালের ও গণতন্ত্রের প্রভাবেই তো সে তার

নিজস্ব বৃত্তি চাষবাস ছেড়ে শিক্ষার গুণে পণ্ডিত হতে পেরেছে। আধুনিক শিক্ষা ও গণতন্ত্র চির-অভ্যস্ত ও প্রথাগত বৃত্তিবিন্যাস স্বীকার করে না, কারণ প্রত্যেকের স্বাধীনতা স্বীকার করে। সেই স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হিসাবেই গাঁয়ের মধ্যেই সে পণ্ডিত, শিক্ষক, ব্রাহ্মণ সন্তানও তাকে প্রণাম করে। দেবু জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রেরই রূপমূর্তি। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

'স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।'

দেবু তারাশঙ্করের কাছে এই সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ। আগে চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে এই ব্যক্তির কৃতিত্ব ছিল না, কিন্তু এখনকার গণতন্ত্রে সেটাই এসেছে নতুনভাবে। 'গণদেবতা'র চেয়ে 'চণ্ডীমণ্ডপ' নাম অধিক প্রযোজ্য। কারণ এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে। তাকে ঘিরেই গ্রামের সমস্ত মানুষের পরিচয় এসেছে, রূপ এসেছে। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা আমার কাছে এই মনে হয়, এর প্রতিটি ঘটনা এবং কথা সমাজের প্রতিটি মানুষকে প্রভাবিত করেছে, এর প্রতিক্রিয়া সর্বত্র সঞ্চারিত। পঞ্চগ্রামে এই সংহতি নেই, দেবু অনেক প্রাধান্য পেয়েছে, এবং তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ এবং কল্পনা-আদর্শ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। গণদেবতার ঘটনায় নাটকীয়তা ও চরিত্রের পরিণাম ছিল মুখ্য, এখানে ঘটনা কম, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বেশি। আর একটি দোষ বর্ণনার পুনরাবৃত্তি।

'ধাত্রীদেবতা'য় জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের স্বাধীনতার জন্যে মুক্তিসংগ্রাম রূপায়িত, আর গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থাকলেও মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রামীণ স্বরাজকে প্রতিষ্ঠিত করা। তারাশঙ্কর 'চৈতালি ঘূর্ণি'র বিপ্লববাদ ও ট্রেড ইউনিয়নের সংগ্রাম থেকে গান্ধীবাদে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এই বিশ্বাস তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল। ছিল বলেই তিনি মনে করতেন, পৃথিবীর সমস্ত জমিই গোপাল বা কৃষ্ণের। চাষী তারই রূপ, সুতরাং তাকে জমি দিতে হবে। এই বিশ্বাসেই নিজের জমির কিছু অংশ বিনোবাকে দিয়েছিলেন। আর এই মতবাদ ও বিশ্বাসের দ্বারাই মৃত্যুর আগে লেখা বইতে নতুন পার্টির মনোভাবকে নতুন পরিবেশে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

৭

'১৯৭১' বইয়েব প্রথম গল্প 'একটি কালো মেয়েব কথায়' মানুষের জীবনচরিত্র খুবই সামান্য, সংবাদপত্রেব ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন তারাশঙ্কর, তথ্য দিয়েছেন, বর্বরতা প্রকাশ কববাব জন্যে উলঙ্গ নাবীদেহেব বর্ণনা দিযেছেন সর্বত্র, শেষে জাফব খাঁ উলঙ্গ শবীর নাজমাব অচেতন নগ্নদেহ বর্ণনার ভেতর একটা অমানুষিক বর্ববতা প্রকাশ কবেছেন। এই কাহিনীর মধ্যে বাজনীতিব দিক থেকে কযেকটি দিক ব্যক্ত হযেছে। প্রথমত, ভাবতবর্ষেব দিক থেকে কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা কবেছেন, তাই বর্ববতাব চিত্র অত্যধিক। কাবণ ফেডাবেল রাষ্ট্র থেকে বাংলা দেশকে বিচ্ছিন্ন কবলে ভারতকেও বিচ্ছিন্ন করা যায, তাই যুক্তিটা হলো মানবতাব দিক থেকে। মানবতা ও মনুষ্যত্ব ফেডাবেল বাষ্ট্র থেকেও উচ্চে, তাব অবমাননা মৃত্যুব মতোই। সেই দিক থেকে ভাবত বাংলাদেশকে মুক্ত কবেছে, এতে অন্যায কিছু হযনি। দ্বিতীযত, ডেভিড আর্মস্ট্রং অথাৎ খ্রীশ্চান, অ্যাংলো-ইণ্ডিযান, বাংলাদেশে এসে মনসুব হযেছে, মনসুব আলি বিয়ে কবেছে হিন্দুমেযে ছায়াকে, প্রেমে পড়ে। সর্বধর্ম ও জাতিব মিলন-প্রচেষ্টা এই পরিকল্পনায আছে। তৃতীযত, কাহিনীর শেষে মনসুব বলছে, সে নাজমাকে ভালোবাসে। অর্থাৎ ভিখিবি মেযে নাজমা পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বরদেব কাছে ধর্ষিতা, তবু এই ধর্ষিতাব জন্যেই পবম ভালোবাসা, এখনেই উদাবতা। চতুর্থত, সে বাংলাদেশে ফিবে যেতে চায, সেখানেই পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে।

মনসুব জন্মেছে কলকাতায এণ্টালিতে, মানুষ হযেছে লাহোবে, চাকরি কবেছে ও বিযে কবেছে বাংলাদেশে। দেশের বন্ধন তাব নেই, তবু ধর্ষিত দেশই তাব ভালোবাসা পায়। বাংলাদেশেব বিভিন্ন পার্টিব পবিচয দিয়েছেন। ভাসানিব আওযামি লীগ মার্কসপন্থী, এবং চীনপন্থী, তবু দুর্যোগেব দিনে জাতীযতাবাদী, মুজিবেব আওযামি লীগ ভাবতেব কংগ্রেসেব মতোই জাতীযতাবাদী ও গণতন্ত্রী, দেশেব মুক্তিব জন্যে বদ্ধপবিকর, কারণ তাবা মনে কবে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানেব কাছে উপনিবেশ মাত্র, সুতরাং ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তিই কাম্য। আব পশ্চিম পাকিস্তানেব কায়েমি স্বার্থ রক্ষাব জন্য মুস্লিম লীগ, রাজাকাব সম্প্রদায. জামেত উলেমা। তাবাশঙ্কর পাকিস্তানকে দেখিযেছেন মধ্যযুগের অত্যাচারী নবাবের উত্তরাধিকারী হিসেবে, এরা নৃশংস, অত্যাচারী, শোষণকামী, নারীভোগী, আগেব উত্তরাধিকারেই বাংলাদেশে হাবেম তৈবী করে।

মনসুর-চরিত্রে তারাশঙ্কর তাঁর চির অভ্যস্ত বাউণ্ডুলে মদ্যপ গাঁজাখোর রূপের ভেতরে বিশুদ্ধ মানবতাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, এ-চরিত্র তাঁর টাইপ চরিত্র, যা শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এখানে উদ্দেশ্য যতো প্রবল, গল্পের জটিলতা ও বিচিত্র অনুভূতির সংমিশ্রণের ততো অভাব।

৮

'সুতপার তপস্যা' (১৮৭১) গল্পে তারাশঙ্কর শেষবারের মতো তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রাম, গান্ধীর আদর্শে গ্রামীণ স্বরাজের আদর্শ, নগর মানুষের কাছে সত্যাগ্রহ—সব যেন এখানে ধূলিসাৎ। তারাশঙ্কর এখানে সুতপার মতো পালিয়ে গেছেন, গান্ধীর অহিংসনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে, তার তপস্যা ও মানবতা হারিয়ে গেছে। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে নগর-জীবনের বিভিন্ন চরিত্র তাদের আসন থেকে নেমে এলেও একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, এখানে সেই আদর্শ নেই, বরং তার মৃত্যু ঘটেছে। বৈষয়িকতা ও রাজনীতির পার্থক্য থাকলেও ধাত্রীদেবতার গৌরীর সঙ্গে সুতপার মিল আছে, কালের পরিবর্তনে শিবনাথই সুব্রত হয়েছে নতুনভাবে।

কম্যুনিস্টদের প্রতি তাঁর বিরূপ ধারণাই একালের প্রেক্ষাপটে নূতন রূপ নিয়েছে। দেশের জন্যে রাজনীতি নয়, পার্টির জন্য রাজনীতি, পার্টিও করে কয়েকটি বুদ্ধিজীবী, সুতরাং কয়েকটি বুদ্ধিজীবীই হলো পার্টি, বুদ্ধিজীবীরাই রাজনীতিবিদ্। তাদের দ্বারাই দেশ শাসিত হয়। যেহেতু এই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেশের মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই, সেইহেতু দু'একজনের বুদ্ধির কর্তৃত্বই হয় রাজনীতির মূলধন, এই বুদ্ধির কর্তৃত্বই অন্য পার্টিকে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে, মতের বিরোধিতাকে স্বীকার করে না। তাই মিশেলের মতো বলতে হয়: ডেমোক্র্যাসি ইজ দ্য রুল্ অব্ পলিটিসিয়ানস্। বিজয় দাশগুপ্তের ছেলেরা ব্যারিস্টার, অর্থাৎ চরম বুদ্ধিজীবী, কারণ বুদ্ধি দিয়েই আইনের ফাঁক বার করে আসামীকে খালাস করিয়ে দেয়। আর এই বুদ্ধিই কাজে লাগায় রাজনীতির ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত জীবনে এরা ধনীর কন্যাকে বিবাহ করে, ধনীর কন্যাও রাজনীতির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে যথাসাধ্য। কিন্তু সর্বহারার জন্যে এদের কথা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আসলে এটা একটা স্লোগান। এদের কোনো মানবতা নেই, কোনো বৃদ্ধ যদি অসুখে কোনো বৌকে থাকতে বলে বিপদের কথা ভেবে, বৌ ভাড়া-করা নার্সের পরামর্শ দেয়, কারণ সেবা নার্সের কর্তব্য, কোনো পুত্র-

বধূর নয়। তাই সহজে মাধুরী ড্রেস রিহার্সালে চলে যায়, কারণ পূর্বস্বামীকে ত্যাগ করেছে তো সে এইভাবেই। মানবতার বদলে নিষ্ঠুর হিংসাই হলো এদের পথ, হত্যা করতে এদের বাধে না। আর এরা ভাবে, এদের দলই একমাত্র সত্য পথ নিয়েছে, সুতরাং এই দলের সব কাজ পবিত্র, এবং যতো পারা যায়, এই দলের কুক্ষিগত করতে হবে। এই কারণেই দলবৃদ্ধির জন্যে অনাচারকেও পার্টির হাতিয়ার করে, যেমন সতীশ করেছে জগা চৌকিদারের ব্যাপারে। বিজয় দাশগুপ্তের পরিবারের এই চেহারা। অথচ বিজয় দাশগুপ্ত নিজে উদার, মানবিক, বিচক্ষণ।

এই পরিবারেই সুতপার জন্ম। পার্টির সদস্য না হলেও দাদাদের মতকে সমর্থন করে, এইসব মতবাদ তার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। তবু প্রেমে, সুব্রতর পৌরুষে মুগ্ধ হয়ে, শিক্ষায় অভিভূত হয়ে তাকে বিয়ে করেছে। সুব্রত কংগ্রেসী নয়, কিন্তু কংগ্রেসের অনেক ধর্মকে সে নিজের মনে করে। তার কল্পনায় যে রাজত্ব গড়ে ওঠে, সেই রাজত্বে ধনী-দরিদ্র থাকবে না, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীশ্চানের বিরোধ অন্তর্হিত, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-শূদ্রের ভেদ বিলুপ্ত, অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার নেই, দেশে রোগ থাকবে না, অজ্ঞানতা থাকবে না। এ দেব্‌ ঘোষেরই নূতন সংস্করণ। ব্যক্তিগত জীবনেও সে ব্রাহ্মণ হয়ে বৈদ্য কন্যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। সে পিতার ও মাতার আদর্শে ধৈর্য ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করে, গ্রামের মানুষের সেবায় সমর্পিত-প্রাণ। প্রেম থাকলেও দম্পতির মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে বিরোধ বাধে। ভালোবাসা যদি প্রধান হতো তাহলে এই বিরোধ কাটিয়ে উঠতে পারতো। পারেনি বলেই সুতপা সুব্রতর গৃহ ছাড়ে, সুব্রত যখন গ্রামের আগুন নেভাতে গেছে তখন। এই আঘাতে সুব্রতর মা মারা যান। সুব্রত নিঃসঙ্গ, একাকী, রাজনীতি ছাড়া কিছু নেই, স্ত্রীকে না পেয়ে পরাজিত হয়ে রাজনীতির হত্যায় নিজেকে বিসর্জন দেয়। তার ব্যক্তিজীবনের হাহাকারই তাকে এপথে নিয়ে গেছে। সকলেই জানে সুতপার স্বামী সুব্রত মারা গেছে, কলিয়ারিতে দুই দলের মারামারিতে। সুতপা শ্রাদ্ধও করেছে। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর বাদে সকলকে চমকে দিয়ে অকস্মাৎ সুব্রত ফিরে এসেছে সুতপার কাছে। সুতপা রাজনীতির মতবাদ ত্যাগ করে শ্বশুরের ভিটেয় ছেলে নিয়ে তপস্বিনীর মতো পুণ্যের জীবন কাটাচ্ছে, হিংসার স্থান সেখানে নেই। কিন্তু সুব্রত ফিরে এসেছে নতুন মানুষ হয়ে। তার কাছে ঈশ্বর ধর্মশাস্ত্র তীর্থ মিথ্যা। অর্থ যৌবন রাজনীতি আকর্ষণীয়। বহু লোককে সে

হত্যা করেছে, আজ সে অহিংসায় বিশ্বাস করে না, বলে : হিংসাই সত্য। প্রকৃতি ওইটিকেই দিয়েছে—দেহের প্রদীপে শক্তির তেলে চুবিয়ে শলতে করে ব্যবহার করতে। ওতেই শিখা জ্বলে। সেই শিখাকে ঘরে লাগাও, ঘর জ্বলবে গ্রাম জ্বলবে—দেশ জ্বলবে। অহিংসা আজ আমার কাছে ভ্রান্তি। নিছক ভ্রান্তি।' তাই সে অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতেও পেছপা হয়নি। সুব্রত নগ্ন সত্যের ওপর ভিত্তি করে নূতন পৃথিবী ও পার্টি গড়তে চায়। 'একটা ব্লাড বাথের মধ্য দিয়ে হবে নতুন দিনের সানরাইজ।' সুতপা শুনে আঁতকে উঠেছে। এই রক্ত ও হিংসার পথ থেকে সুতপা রাত্রির অন্ধকারে গোপনে শিশুপুত্র শিবুকে নিয়ে সুব্রতর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে, দূরে অনেক দূরে, যেখানে নতুন কালের প্রভাত আসবে। এ প্রভাত তারাশঙ্করের কল্পনা, বাস্তবে নেই। সুতপার মতোই তারাশঙ্কর পলায়নপর। ন্যায়নীতি ধর্ম ঈশ্বর মানবতা সব এই পৃথিবীতে আজ মিথ্যে, মিথ্যে বলেই প্রেমিক ও নীতিবান, ঈশ্বর বিশ্বাসী ও মানবিক সুব্রত রাজনীতির মোহে সুতপাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে হত্যাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছে, এই ধর্মে দীক্ষা পেয়েছে। বাংলার সমস্ত রাজনীতিই সুব্রতর মতো আজ পরিবর্তিত, কলুষিত।

'আমার কালের কথা' বইয়ের শেষে তারাশঙ্কর পিতা ও মাতার ধর্মকে এক করে নিয়ে বলেছিলেন : আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ (প্রাচীন জমিদারি), তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ। আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সে কাল আর একালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। চির কল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোন কালে এপারে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপভেদ করেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সেদিন আমার মাল্য রচনা সমাপ্ত হবে।'

বলা বাহুল্য, তারাশঙ্কর এই মাল্য রচনা শেষ করতে পারেননি, নতুনকালে এসে তার ফুল দলিত হয়েছে, নূতন কোনো ফুল পাননি, তাই পালিয়ে গেছেন, হয়তো পুরনো আদর্শের মধ্যে, তা না হলে সুতপা সর্বানন্দপুরে আবার ফিরে আসবে কেন, তাদের প্রেম চিরঞ্জীব হয় না কেন? তবু তারাশঙ্কর একালের সমস্যাকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন, কিন্তু মেলাতে পারেননি।

'একটি কালো মেয়ের কথা'য় চরিত্র ফুটে ওঠেনি, সুতপার তপস্যা'য় দশ

বছরের রাজনীতির ইতিহাস সংবাদপত্রের মতো চমকপ্রদভাবে বর্ণিত হলেও স্বামীস্ত্রীর দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ, দেহানুরাগ, রাজনীতি ও ব্যক্তির সমস্যা, ঘটনা ও কাহিনীর অদম্য প্রভাব চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ও বাংলাদেশে কংগ্রেসের অধঃপতন তারাশঙ্কর কংগ্রেসের লোক হয়েও স্পষ্ট দেখেছেন শিল্পী ও সমাজসংস্কারক হিসেবে।

ক বাংলাদেশে বিধান রায়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের শূন্যস্থান সেন পূর্ণ করতে পারেননি। তার উপর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের আসরে রাজ্যহীন রাজা-রাজপুত্র, জমিদারহীন জমিদারি—জমিদার নন্দনদের সমাবেশের মাঝখানে বসে কংগ্রেস সভাপতি হাস্যে পরিহাসে আস্ফালনে—সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনয়ে—দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবাকর্মের আয়োজনের মধ্যেও লুকানো অহংকারে ও ক্ষমতাহীনতায়—সাধারণ মানুষের যে বিরূপতা এবং বিদ্বেষ অর্জন করেছিলেন, সে ঘটনা ঐতিহাসিক এবং তার ফলে যে বিস্ফোরণ আসন্ন তাও ঐতিহাসিক এবং তা সব দলই বুঝেছিল।

খ ধান-চালের ব্যবসাদারেরা যে চক্র তৈরি করলে—সে চক্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার ভাঙতে পারলেন না বা ভাঙলেন না। জোতদারদের সঙ্গে, ধান-চালের মহাজন কলওয়ালাদের সঙ্গে, ওঁদের আঁতাত যেটা, সেটা প্রমাণ কেউ করেনি, কিন্তু না করলেও এটা প্রমাণিত সত্য থেকেও বড় সত্য—বেশি সত্য।

গ সারা ভারতবর্ষে দিনের পর দিন—মানুষ অনুভব করতে লাগল—সময় হয়েছে, কংগ্রেসের যাবার সময় হয়েছে, জীর্ণ হয়েছে কংগ্রেস, অন্যায়ে ভরে গেছে কংগ্রেস, ভারতবর্ষের সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বঞ্চনা করেছে এরা। যদিও সুব্রতর মুখে একথা বসানো হয়েছে, কিন্তু তারাশঙ্করের গল্প লেখাতেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'দেশের কথা' ও 'গ্রামের কথায়'।

'সুতপার তপস্যা' গল্পে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তির বিরোধ চিত্রিত হয়নি, যা অন্য উপন্যাসে হয়েছে, শক্তির অধিকার নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরোধ ও সংগ্রামই এই উপন্যাসের উপজীব্য। এখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের চেয়ে দলগত বিরোধই মুখ্য: সংকীর্ণ অর্থে প্রকৃত রাজনীতি। গুপ্তের গণতন্ত্রের স্বাধীনতার মধ্যে ভবিষ্যতে যে বিপদের সম্ভাবনা দেখেছেন, এখানে পার্টির দলাদলিতে তা প্রকট, স্বাধীনতা হত্যাকে প্রশ্রয় দেয়।

একথা বিশ্বাস করতে আমার সঙ্কোচ নেই, উপন্যাসে যে জীবন চিত্রিত হয়, তা যদি সার্থক শিল্প হয়, তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত

থাকেই, কারণ সমাজশক্তি রাষ্ট্রশক্তিরই বৃহত্তর পরিধি, আর উপন্যাস যেহেতু ব্যক্তির সংগ্রামের ও স্বাধীনতার কাহিনী, সেইহেতু সমাজের ও রাষ্ট্রের পরিবেশ এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বা গোপনে সক্রিয় থাকে, এমনকি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নায়কের মধ্যেও, কিন্তু তাই বলে শিল্পের দাবি অস্বীকার করা যায় না। এই আলোচনায় সেই আলোচনাই বাদ দেওয়া হয়েছে।[১]

১ এই সঙ্গে বার্ণিক রায়ের 'পথের দাবি ও বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস', শরৎ সাহিত্য সম্মেলন '৭১, 'আরোগ্য নিকেতন' কালি ও কলম, আগস্ট '৭১, Tarashankar Banerji Calcutta Review, August 1960 প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই প্রবন্ধরচনায় রাজনীতির কয়েকটি বই দিয়ে সাহায্য করেছেন ডঃ শ্রীকেশব চৌধুরী, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও তারাশঙ্করের পুত্র শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং পৌত্র নীলাদ্রিশঙ্করও কিছু সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

তারাশঙ্করের সাহিত্য-চিন্তা

শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল

প্রাচীন ভারতবর্ষে সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে দার্শনিক নানা প্রস্থান গড়ে উঠেছিল। আলঙ্কারিকগণ সকলে ছিলেন দার্শনিক, তাঁদের ছিল জিজ্ঞাসু মন ও দুর্লভ প্রজ্ঞা। স্বভাবতঃ তাঁদের সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় মননের বিশেষ প্রভাবটি অঙ্কিত হয়েছে। এইহেতু তাঁরা নানাদিক থেকে সাহিত্যকে বিচার করবার প্রয়াস করেছেন। তবুও এই প্রয়াস মূলতঃ রীতির দিকে সীমাবদ্ধ।

রীতিকে কাব্যের আত্মারূপে প্রমাণিত করবার বহু প্রয়াস দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এমন কথা বলেছেন যে, কাব্যে বিষয় হলো গৌণ, প্রধান হলো তার উপস্থাপনার দিকটি, তার রূপ-সৃষ্টি। এই রূপ-সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য হেতু কীটসের নাইটিঙ্গেল কবিতা ভাবের দিক থেকে রুগ্ণ হলেও তা বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে। সৌন্দর্যপ্রেমিক কবি-জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিশ্চিত পরিণাম প্রত্যক্ষ করে একটা গভীর বিশ্বাসের প্রত্যয়ভূমি অনুসন্ধান করেছেন। যে প্রেম, সৌন্দর্য ও যৌবন ধ্রুব তাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। নাইটিঙ্গেল পাখীর গান কবির নিকটে মনে হয়েছিল চিরন্তন, কেননা সঙ্গীত-প্রতীক বিহঙ্গের মৃত্যু নেই। গ্রীসিয়ান আর্ন কবিতায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিল্প সৃষ্টিকে অমরত্ব দান করে থাকে। তবুও কাব্যে বিষয়কে উপেক্ষা করা চলে না, বিষয় অনুযায়ী রীতির উৎকর্ষ ঘটে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করতেন যে, বিষয় অনুযায়ী রচনারীতির উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ আরও একটি মনোজ্ঞ উপমার সহায়তায় রীতির গৌরব স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে দিঘির জল মানুষের পরিশ্রমের পুরস্কার। মানুষের গৌরব হলো যে উপায়ে সে দিঘির জলকে ব্যবহারযোগ্য করে রাখে। তৎসত্ত্বেও একথা মেনে নিতে হয় যে, সাহিত্যের সম্পদ হলো বিষয়বস্তু। এর গৌরব না থাকলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ট্র্যাজেডি ও এপিকের মহিমা কদাপি প্রকাশিত হতো না।

ক্রোচে তাঁর ইস্থেটিক গ্রন্থে বলেছেন যে, সৌন্দর্যের তত্ত্ব হলো তার রীতিতে। এ-কথার তাৎপর্য এই নয় যে, বিষয় অপ্রাসঙ্গিক। বিষয়ের আকর্ষণ আছে বলে সেই বিষয় রূপে প্রকাশিত হয় 'being interested is precisely, the raising of the content to the dignity of form.' য়ুরোপেও সাহিত্য-

চিন্তার ধারাকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা প্রস্থান গড়ে উঠেছে। কাব্যের আত্মা, ধ্বনি ও রস এবং প্রকাশের রীতি, ঔচিত্যবাদ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করে নানা তর্ক ও বিরুদ্ধমত গড়ে উঠেছে।

প্রাচ্যের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার লক্ষ্য রসের দিকে। যা রসের অভিব্যক্তিতে সহায়ক বা রসানুকূল তা গ্রহণযোগ্য। আমাদের দেশে কাব্যে অলঙ্কারকে স্থান দেওয়া নিয়ে অনেক তর্ক আছে। আনন্দবর্ধন বলেছেন যে, অলঙ্কার যদি বিনা প্রযত্নে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ রসের আকর্ষণে যদি সে আসে, তবে কাব্যে তার স্থান সুনির্দিষ্ট। স্থায়ী বৃত্তিসমূহের অবলম্বনে আনন্দময় অস্তিত্বের নাম হলো রস। কাব্যের পূর্ণতা ঘটে এই রসে। পাশ্চাত্ত্যে সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মূল সুর হলো যে, সাহিত্য কতদূর জীবনাশ্রয়ী তা লক্ষ্য করা। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস ও দর্শনের সঙ্গে তুলনায় কাব্যসত্যের গভীরতা ও জীবন-মুখিতার পরিচয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্লেটোর অভিযোগের কারণ ছিল যে, কাব্যে জীবন-সত্যে নিত্যমূল্য ও শিক্ষাদানের দিকটি অসম্পূর্ণ। তাঁর মতে কাব্য যদি প্রাকৃত সত্যের অনুকরণ না করতো তবে হয়ত চিরন্তন ভাবসমূহ, যাকে তিনি বলেছেন দেশকাল নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় সত্য, বা কর্ম তা কাব্যদেহ সুশোভিত করতো। প্লেটো থেকে যে ধারা নেমে এসেছে তাতে এই সত্য ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, জীবনের রূপকে পুনর্বিন্যাস করা হলো কাব্যের ধর্ম। সাহিত্য-তত্ত্বে এইটি হলো আরিস্টটলের বড় দান। ট্র্যাজেডির সঙ্গে যখন তিনি এপিকের পার্থক্য দেখিয়েছেন তখন এপিকে অবিশ্বাস্য বা অলৌকিক ঘটনাবলী অবতারণার দিক সমর্থন করেও তাকে তিনি জীবনাভিমুখীন করবার কথা বলেছেন। সাহিত্য-তত্ত্বের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সৌন্দর্য-তত্ত্ব। প্রাচীনকালে এ সম্পর্কে কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয় দেখা যায়নি। আরিস্টটল বলেছেন যে, সামঞ্জস্য ও দৈর্ঘ্যের উপরে সৌন্দর্য নির্ভর করে। এর পরে নানা ব্যাখ্যা এসেছে।

সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা এ-দেশে এবং ও-দেশে ঘটেছে। বাংলায় এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ধারাবাহিক আলোচনা আর কেউ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। আর সকলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য-চিন্তা। এই চিন্তাও এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে, কোন একটি বিষয়ের সূত্র ধরে।

ভারতবর্ষ চিরকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। যারা ভারতবর্ষে এসেছিল বহিরাগতরূপে, তারা ভারতীয় প্রাণসত্তার অঙ্গীভূত হয়েছে। ভারতের প্রাণ-

ধর্ম অলুব্ধ, নম্র, সুদৃঢ় ও নির্ভয়। মৈত্রী ও মিলনের মানবধর্মে তার প্রাণ উদ্দীপিত। যে তপস্যায় সে রত তা হিংসাকে অতিক্রম করবার জন্য। বহুমুখী সাধনার একমুখী সমন্বয় হেতু ভারতকে স্বতন্ত্র বা তৃতীয় শিবির বলা চলে।

বর্তমানকালে পশ্চিম থেকে যে নববার্তা এসেছে তা বাণীরূপ পেলো ভারতের পূর্বপ্রান্তে, শান্তিনিকেতনে ও কর্মযোগরূপে গুজরাটে। কর্মে ও বাণীতে সমন্বয় সাধিত হলো। ভারত পশ্চিমের বিজ্ঞানবুদ্ধিকে গ্রহণ করেছে কিন্তু তার মধ্যে অনুসন্ধান করেছে কল্যাণরূপ। যেদিন হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল, সেদিন ভারতে অহিংসার শক্তিতে মুক্তিযুদ্ধের অভিযান চলেছিল। এই প্রাণধর্মের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র—রাষ্ট্রনীতিতে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে।

নূতন কালে এসেছে বুদ্ধিনির্ভর শুষ্ক নাস্তিকতাবাদের মতবাদ। ভারতবর্ষ এই পথ পরিহার করে শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম গ্রহণ করবে। দেশের চারদিকে দেখা যায় নূতন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা। বিজ্ঞানের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে দেশ গড়ে উঠবে। কিন্তু 'অন্তরে সে গঠন করবে নিজেকে। পরিশুদ্ধচিত্ত, নির্ভয়, সত্যবান আত্মাকে সে লাভ করবে'। তারাশঙ্কর আশা করেন যে, ভবিষ্যতের কবি শুধু একতারা হাতে নিয়ে মূক জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করবেন না, 'ভবিষ্যতের কবি রচনা করবেন এই নূতন জীবন এবং নূতন সমাজ নিয়ে নব ভারত'।[১]

আধুনিককালে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে সঙ্কটের রূপ তারাশঙ্কর আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগে আমরা প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অতিক্রম করে মানবতার ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছি। ভৌগোলিক দূরত্ব এ-কালে কোন ব্যবধান রচনা করে না। তবুও যেন মনে হচ্ছে যে, আমরা দুর্যোগপূর্ণ চৈত্র-সংক্রান্তির শেষ রাত্রে উপনীত হয়েছি।

যত উৎকণ্ঠা তত প্রত্যাশা। উৎকণ্ঠা বর্তমানকালের, প্রত্যাশা আগামী দিনের। মানবজাতির পক্ষে এ এক পরীক্ষার কাল। আমাদের মনে দেখা দিচ্ছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, কুটিলতা ও হিংসা। এ-যেন ভগবান বুদ্ধের বোধি-লাভের পূর্বে মারের আবির্ভাব। পশ্চিম দেশে চলেছে মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনী

১। সাহিত্যের সত্য : সমাজ ও সাহিত্য, পৃঃ ৩১

পরীক্ষা ও প্রাচ্যে শান্তির আকাঙ্ক্ষা। প্রশ্ন উঠেছে জীবনে প্রয়োজন কি বস্তুর, বস্তুসম্পদের, না, মনের বিকাশের জন্য সত্য ও প্রেমের। ভোগবিলাসের অতিরিক্ত ত্যাগ ও তপশ্চর্যা আত্মানুসন্ধানের আনন্দ অবারিত করে। কিন্তু মানবজীবনে এমন সঙ্কট দেখা দিয়েছে যে, মনে হচ্ছে মৃত্যুই সত্য, অমৃতের সাধনা মিথ্যা। তাই মানুষের মনে হচ্ছে, অতি-প্রাচীন বিশ্বাসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ[১], আবার মনে হচ্ছে অতীতের অকৃতার্থ সঞ্চয় ধ্বংস করে ফেলা কর্তব্য। অতএব এই মন্তব্য অযথার্থ হবে না যে, পৃথিবীর সাহিত্যের ও সংস্কৃতির স্রোত রুদ্ধগতি হয়ে ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে একদিকে ভূগর্ভের মধ্যে প্রবেশ করে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছে, অন্যদিকে সূর্যের উত্তাপে বাষ্প হয়ে শূন্যলোকে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে প্রয়াসী।

তারাশঙ্কর যে কালের দিকে লক্ষ্য করে এই মন্তব্য করেছেন তা হলো ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী যুগ। এই সময়টি নানাদিক থেকে নৈরাজ্যের। তারাশঙ্কর মন্তব্য করেছেন যে, প্রগতিবাদের নামে বুলি-সর্বস্ব চিন্তাধারা ক্রমে সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, সত্য একমাত্র দরিদ্রের ও পতিতের সাহিত্য, বিপ্লবের সাহিত্য। আর মিথ্যা হলো অতীতের তপস্যালব্ধ সাহিত্য। যেখানে রাজা বা সামন্ত জমিদার সাহিত্যের নায়ক, সেই রচনা কৃত্রিম ও মিথ্যা। কিন্তু এই যে ধ্বনি-সর্বস্ব সাহিত্য তা অন্তরে সাড়া জাগাতে পারছে না। নায়কের একমাত্র গুণ যদি দারিদ্র্য হয় তবে তা থেকে মুক্তির ঘোষণা করা হয় কেন? এতকাল নায়কের আসনে যিনি অভিষিক্ত হয়েছেন তিনি ন্যায়নীতিতে পূর্ণ, মনুষ্যত্ববোধে দীপ্ত। নায়কের যে চারটি গুণের কথা আরিস্টটল উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রধান হলো সৎগুণ অর্থাৎ মানবিক গুণ। টলস্টয় আপত্তি তুলেছেন যে, যে-ভাবে বিত্তবানদের জন্য কলা সৃষ্টি হচ্ছে তা সাধারণ মানুষদের মনে আবেদন জানায় না। এই উচ্চ সাহিত্যে বর্ণিত হয় দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, স্বাদেশিকতা ও প্রেম। পরিশ্রমী মানুষদের নিকটে এদের আবেদন নেই। সাহিত্যের কোন আধ্যাত্মিক সম্পদ এরা লাভ করতে পারে না। তিনি বলেছেন যে, আর্ট মানবজীবনের পরিপূরক ও তা মানুষের বোধশক্তিকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করে। সাহিত্য সৃষ্টি স্রষ্টার মনকে নির্জনতা থেকে মুক্ত করে সকলের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।[২] এই

১। Great God I'd rather be
A Pagan suckled in a Creed outworn,
So might I standing on this pleasant lea,
Have glimpses that would make me less forlorn. (*Wordsworth*)

২। What is Art P 228 ও P. 61

হেতু শিল্পীর পক্ষে তিনটি গুণ অপরিহার্য—(ক) অনুভূতির স্বকীয়তা (খ) প্রকাশের স্পষ্টতা ও (গ) বিশ্বস্ততা বা আত্মপ্রত্যয়।

যে-ভাবে আধুনিককালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ গণ-সাহিত্য সৃষ্টির কথা ব্যাখ্যা করেন তার উত্তর দিয়ে টলস্টয় বলেছেন যে, ফরমায়েশী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, সাহিত্য হলো স্বতঃপ্রকাশ যা শিল্পীর মন থেকে উদ্ভূত হয়ে মানুষের নিকটে নূতন পথের নির্দেশ দান করে থাকে।[১]

প্রলেটারিয়েট সাহিত্য অর্থে বুলিসর্বস্ব গণসাহিত্যকে বোঝায় না। মুখে কতকগুলি বুলি আওড়ান গেল, কিন্তু যা অন্তরের উপলব্ধির বিষয় হয়ে ওঠেনি তাকে নূতন সাহিত্যের লক্ষণ বলা চলে না। যা হতে পারে অথবা যে ঘটনাবলী একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার পরিণতি প্রদর্শন হলো প্রলেটারিয়েট সাহিত্যের বিষয়। নীলদর্পণ নাটকে নীলকরদের অত্যাচারে রাইয়তগণ ক্ষিপ্ত হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচার গোলোকনাথ বসু, ক্ষেত্রমণি ও নবীনমাধবের মৃত্যুর কারণ। বাস্তবে অনুরূপ অবস্থার সমর্থন না পেয়েও যদি নাট্যকার রাইয়তদের দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতেন ও নীলকরদের অত্যাচারে যদি তাদের আন্দোলন রুদ্ধ হতো, তথাপি সেই পরিণতি হতো বাস্তব অর্থাৎ শিল্পগত সত্য। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা রূপে যা পরিচিত তা সমাজের সর্বাঙ্গীণ রূপের ও তার বিকাশের ধারার ইঙ্গিত দান করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে অনেক লেখক আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে কডওয়েলের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।[২]

সমাজ মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। বাস্তব জীবনধারা থেকে মানসিক জীবনকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আর্ট বা কলাসৃষ্টি যেহেতু সামাজিক ক্রিয়ার অন্তর্গত সেইহেতু এর জন্য কোন স্বতন্ত্র জগৎ নেই। একে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান করা অসঙ্গত, কেননা এটি বাহিরের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রলেটারিয়েট সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে সেই আদর্শকে জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত করে নিতে হবে। এই আদর্শ সমগ্র সমাজ-জীবনের প্রকাশ। এই অর্থে আর্ট জীবনের পরিপূরকরূপে, তার বাঙ্‌ময় প্রকাশরূপে দেখা দেয়। এই

১। 'Socialist realism is a possibility rather than an actuality' (G. Lukacs the Meaning of Contemporary Realism, p. 96

২। Illusion and Reality, p 239—248

নব্য-সাহিত্যে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটবে। সামাজিক সত্তার পরিবর্তন হেতু শিল্পীর রচনার মধ্যে স্বকীয়তার প্রতিফলন দেখা যাবে। বুর্জোয়া সাহিত্য সৃষ্টিতে বহির্জীবনের স্বাধীনতার উপরে জোর দেওয়া হয়, কিন্তু যে সম্পর্ক গভীর অর্থাৎ সমাজ-জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ, সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। আর্টের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করে, তাই আর্ট হলো বাস্তব সত্য।

এই আলোচনার বড় ত্রুটি হলো যে, শিল্পসৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে দেখা হয়েছে। কিন্তু শিল্পীর নিজস্ব যে সৃষ্টি-প্রতিভা আছে সেদিকে আলোচনা করা হয়নি। শেকসপীয়র তাঁর মহৎ প্রতিভার গুণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে পরিচিত। প্রলেটারিয়েন আর্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেও তাঁর সৃষ্টি সর্বকালের হয়েছে। তাকে শ্রেণীসাহিত্যরূপে নিন্দা করা হলেও তার প্রাণশক্তি অসাধারণ। একে 'the art of a dying class'-রূপে তাই ব্যাখ্যা করা চলে না।

তারাশঙ্করের মতে সাহিত্যে নায়ক চিরকাল মহিমান্বিত মনুষ্যত্বের গুণে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। 'সাহিত্য মানুষের, অন্যায়ের সঙ্গে মনুষ্যত্বে অধিষ্ঠিত সংগ্রামী মানুষের'। মানুষ চিরকাল এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে, 'অমানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কাহিনীই সাহিত্যের মর্মকথা। সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অন্যায়ধর্মী সকল তন্ত্র যা মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে তার বিরুদ্ধে'। ধর্মজীবনের ভ্রান্ত সংস্কার হেতু যে অলৌকিক তত্ত্ব পারলৌকিক তত্ত্বের মূঢ় বিশ্বাসকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায় তা এ-কালে মানুষ গ্রহণ করতে চাইবে না। ইন্দ্রত্বের প্রলোভন আজ মিথ্যা, মন্দির ও স্বর্গলোক থেকে দেবত্ব এসে আশ্রয় নিয়েছে মানুষের মনোলোকে।

লৌকিক দেবদেবীগণ, মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, যখন থেকে তাঁদের স্বীকৃতির জন্য মর্ত্যলোকের নর-নারীগণের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন, স্বর্গলোকের কাহিনী মর্ত্যলোকের ধূলি-ধূসর পথে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তখন থেকে সাহিত্যের বিষয় হয়েছে মর্ত্যলোকের নর-নারীগণের জীবনযাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত হলো বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ভারতের আত্মা জাগ্রত হয়েছে বাঙ্গালীর জীবনধারার মধ্যে। দূর অতীতে গ্রীক-হূণ-শক প্রভৃতি দল বিজয়ীর বেশে এদেশে এসেছিল, কিন্তু তারা ভারতীয় সংস্কৃতির

অঙ্গীভূত হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে এসেছে ইংরেজ-জাতি। তাদের 'আক্রমণাত্মক আবির্ভাবকে' বাংলাদেশ আত্মসাৎ করে নব প্রাণে ও ধর্মে জাগ্রত হয়ে উঠলো। 'বাংলাতে জাগ্রত হল তার সেই প্রাণ, যার ধর্ম অলুব্ধ এবং নম্র, নম্র হয়েও যা সুদৃঢ় ও শান্ত এবং শান্ত হয়েও যা নির্ভয়'। এই প্রাণধর্ম তপস্যায় নিমগ্ন ও জৈবধর্মের অতীত। রাজা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাবের মধ্যে নব-জীবনের জাগরণ সূচিত হলো। এই জাগরণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল যে, য়ুরোপীয় ভাবধারা গ্রহণ করেও তা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাবান। ভারতের সুপ্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস থেকে নব-জাগরণ প্রাণ-শক্তি আহরণ করেছে। এই জাগরণ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ভারতবর্ষে।

স্বাধীনতা পাবার পরে অতীতের অনেক গ্লানি ও কুসংস্কার দূরীভূত হলো। বর্তমানকালে সংস্কৃতির মহাযজ্ঞে বাঙ্গালী পুরোধা না হলেও জাতি হিসাবে সে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসাহী ও অকৃত্রিম উত্তরসাধক।

তারাশঙ্কর বলেছেন যে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি বিস্ময়কর। কিন্তু তার পরে মনে হয় সাহিত্য যেন নূতন পথ অনুসন্ধান করেছে। সাহিত্য অবসর বিনোদনের জন্য উত্তেজক পানীয় মাত্র নয়, সে প্রাণরসদায়ী সঞ্জীবনী সুধা। তারাশঙ্করের মতে বাংলা সাহিত্য য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ নয়। বাংলা ভাষার প্রকাশ-শক্তি, সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশের জন্য ব্যঞ্জনার রূপমাধুর্য অসাধারণ। বাংলা ছোটগল্পের প্রসার ব্যাপ্ত, প্রসাদগুণও অসামান্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজ-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে উপন্যাস রচনার নৈপুণ্য কম নয়। রস ও ব্যঙ্গ রচনা, ইতিহাস ও সমালোচনা সৃষ্টির নব-প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ। এখন প্রতীক্ষা করতে হবে নব-জীবনের জোয়ারের। এই জোয়ার জাতীয় জীবনের খাতে প্রবাহিত হলেও বহন করে আনবে বিশ্বজনীনতার অমৃতাস্বাদ। মহাজীবনে জীবন্ময় হয়ে উঠবে মানুষ। তিমির বিদীর্ণ করে যে জ্যোতির্ময়ের অভ্যুদয় হবে তাকে স্বাগত জানাতে হবে।[১]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এসে কেন সাহিত্যের ধারা স্তম্ভিত হলো তার কারণসমূহ তারাশঙ্কর ব্যাখ্যা করেননি। তিনি লিখেছেন 'সে পথ খুঁজছে'। এইটি অত্যন্ত সত্য। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ থেকে তার পরের কয়েক বৎসর দেশে

১। সাহিত্যের সত্য : আধুনিক কাল ও সাহিত্য।

দুর্যোগের কাল। বাংলাদেশে অতি বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে এলো স্বাধীনতা। খণ্ডিত বাংলাদেশে তখন আরম্ভ হলো পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারী, শিশু ও স্থবির, তাঁদেব পূর্বপুরুষদেব বাস্তুভিটা ছেড়ে নূতন কবে উপনিবিষ্ট হবাব আশায আশ্রযপ্রার্থী হলেন পশ্চিমবঙ্গে। এ এক মহাদুর্যোগেব কাল, জাতির ইতিহাসে ক্রান্তি-লগ্ন। তাঁরা সাদবে অভ্যর্থিত হননি। যাঁরা দরিদ্র তাঁদের দুর্ভাগ্যেব অন্ত ছিল না। উন্মুক্তস্থানে রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায নিযে তাঁদেব দিন কেটেছে। এত দুর্যোগেব মধ্যেও তাবা তাঁদেব ধর্মকে মনুষ্যত্বকে রক্ষা কবতে প্রযাস করেছেন। এই দুর্যোগের আভাস দিযে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ অঙ্কিত কবেছেন এক আরবেব চিত্র। সে :

A lances he bore, and underneath one arm
A stone and in the opposite hand a shell
Of a surpassing brightness.

স্টোনটি হলো ইউক্লিডের জ্যামিতি ও শঙ্খ হলো কাব্য। সেই আরব বললো : 'the waters of the deep gathering upon us' এই কথা বলে সীমাহীন প্রান্তবেব উপব দিযে সে দ্রুতবেগে চললো।[১] এই দুর্যোগেব কালে পবীক্ষা-নিরীক্ষা চলে প্রত্যযভূমিতে উত্তীর্ণ হবাব জন্য। তখন জয হবে মানবতাব, জয হবে জীবনেব।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণেব মত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে হতাশাব্যঞ্জক। সেদিক দিযে এখানে নেতিবাদ প্রবল হযে দেখা দিযেছে। সমালোচকগণ বলেন যে, বর্তমানে spirit-এব উপরে matter জযী হযেছে। বহির্জগতেব নিকটে লেখকগণেব স্বাধীন কল্পনা আত্মসমর্পণ কবেছে, 'সমাজেব স্বেচ্ছাচাবেব কাছে স্বকীয কল্পনাব পক্ষচ্ছেদ'। তাদেব তাই মত হলো যে, আধুনিক লেখকগণের বচনা মসীরেখার মত বিলীন হযে যাবে। অভিযোগ সত্য হলে সাহিত্যিকগণকে বচনাব মোড ফেবাতে হবে। তবে এই অভিযোগ বিচারযোগ্য। উনবিংশ শতকে বাঙ্গালী জীবনে যে নব-জাগবণ এসেছিল, এসেছিল আশা ও আনন্দের জোযাব তাব পবিণতি আত্মাব উপবে জডশক্তিব প্রাধান্যে ঘটলো কেন। বাঙ্গালীব মানসিক স্বাস্থ্যেব অবনতিব জন্য সাহিত্যকে দাযী কবা চলে না।

১। Prelude : Book V

ঊনবিংশ শতকে দেখা যায় যে, বাংলার গ্রামজীবন ছিল শক্তিতে ও সম্পদে পূর্ণ, 'ছিল না কেবল সাংস্কৃতিক চৈতন্য'। ইংরেজ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালীর নবজাগরণ ঘটলো, জেগে উঠলো স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। বাঙ্গালী 'জাতীয়তার ভিত্তির উপর জীবন-সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীনতা অর্জনের আবেগ সৃষ্টি' করতে চাইলো। কিন্তু, তবুও সেই গভীর আবেগ পরাধীনতার বাঁধ ভাঙতে পারলো না, সম্পদ শোষণকেও রুদ্ধ করতে পারেনি। এই শোষণের ফলে জাতীয় স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো। এর মূলে আছে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা। সুতরাং এর জন্য সাহিত্যকে দায়ী করা অসঙ্গত।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তার যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিজ্ঞানের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলেও শোষণকে রুদ্ধ করা যেতো না। চীন স্বাধীন থেকেও নিজেকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করবার জন্য আমাদের দুর্ভাগ্যও অনিবার্য হয়েছিল। বাঙ্গালার জীবনাবেগ বাস্তব শক্তির নিকটে পরাভূত হয়েছে। তাই বাঙ্গালীর সাহিত্য তার জীবনীশক্তির ন্যায় আজ বাস্তবমুখী।

তারাশঙ্করের বক্তব্য বিশ্লেষণের পথ অনুসরণ করেছে।[১] প্রচণ্ড জীবনাবেগ সত্ত্বেও য়ুরোপের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জড়বাদী শক্তির নিকটে বাঙ্গালীকে নত হতে হয়েছিল। জীবনীশক্তির ন্যায় সাহিত্যও তাই আজ বাস্তবমুখী হয়েছে। আসলে জগৎব্যাপী পরিবর্তন, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, জড়বাদী ইংরেজী সভ্যতার মহাজনী রূপ আমাদের মনেও অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত করেছে বাস্তবচেতনা। এইক্ষেত্রে শিক্ষারও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। তাই বর্তমান-কালে বাস্তববাদী শক্তিকে উপেক্ষা করবার কোন উপায় নেই।

সাহিত্য যে আজ বহির্লোকমুখী তা ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মে। ১৯০৫ ১৯৩০ পর্যন্ত বাংলাদেশে চলেছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। হিন্দু রেনেসাঁসের বাঙ্গালী যুবকগণ প্রাণ উৎসর্গ করে আত্মার দীপ্যমান দুর্জয় মহিমা ব্যক্ত করেছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিলিতি বস্ত্র পরিহার করা হলো, বস্ত্রাদির অগ্ন্যুৎসব করা হলো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এলো অসহযোগ আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্র বর্জনের আহ্বান[২]। এই দুই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে আমেদাবাদ-

---

১। সাহিত্যের সত্য : আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ।

২। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধে বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও বস্ত্রাদির অগ্ন্যুৎসবকে কঠিন ভাষায় নিন্দা করেছেন।

বোম্বাইয়ে গড়ে উঠলো বস্ত্র উৎপাদনের কল-কারখানা। বাঙ্গালী নিঃস্ব হলো। পাশ্চাত্ত্য বণিককুলের ষড়যন্ত্রে পূর্বেই তার তাঁতশিল্প বিনষ্ট হয়েছিল।

যে আন্দোলন উনিশ শতকের বাঙ্গালীর প্রাণশক্তির দুঃসহ আবেগে ও উদ্যমে গড়ে উঠেছিল তা বিংশ শতকে এসে নূতন মতবাদ সৃষ্টি করেছে। অসহযোগ আন্দোলন, হরিজন আন্দোলন প্রভৃতি বাংলার মাটিতে সাম্যবাদের আশ্রয় অনুসন্ধান করেছে। সাম্যবাদের প্রবণতা বাংলাদেশে নূতন নয়। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন সাম্যবাদ। 'সেদিন বাঙলার হিন্দুসমাজ রক্ষা পেয়েছিল এই শক্তিতে, অথচ তারা ভীত হয়েছিল, ত্রস্তও হয়েছিল এই শক্তির বিকাশে'। বাঙ্গালী জীবনের জাগরণ ঘটেছিল মহাপ্রভু-আচরিত সাম্যবাদ-ভিত্তিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ফলে। তখন সৃষ্ট হয়েছিল কীর্তন, পাঁচালি, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কূলপ্লাবী নূতন জোয়ার এসেছিল। কিন্তু এই সাম্যবাদ মূলতঃ ভাববিপ্লব বলে তা মানসিক জীবনে অবরুদ্ধ রয়ে গেল! রাষ্ট্র বা সমাজ-বিন্যাসে তার প্রভাব সঞ্চারিত হলো না। বর্তমানকালে স্বীকৃত হয়েছে যে, সাম্যবাদের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ বৈদেশিক হলেও তাকে আমরা দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করেছি। আর একটি প্রশ্ন হলো যে, মানুষের মনোলোকের উপরে বস্তুবাদ যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে 'মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান হারিয়ে মানুষের সঙ্গে সাহিত্য মাটির ধুলোয় মিশে যাবে'। মানুষ তার মনন-শক্তিতে বহির্লোক জয় করে চলেছে। কিন্তু এর ফলে কবির সৃজনী-শক্তি হ্রাস পাবার কোন কারণ নেই। একদা ফুল তার বর্ণ ও সৌরভে সকলকে আকৃষ্ট করতো। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পরে জানালো যে, যৌবনরহস্যের জন্য ফুলে এসে ভ্রমর সংলগ্ন হয়। সুতরাং 'ফাল্গুনে তরুর মর্মে যে বেদনা জাগে' তা কবির কল্পনাকে নূতন করে জাগিয়ে তুললো। বহির্জগতে যখন মানুষ অনুভব করবে জীবনস্পন্দন, তার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপিত হবে তখন সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। গোলাপের বর্ণ-গন্ধ-রূপ-রেখায় আমরা একের সুষমা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মধ্যে আত্মারূপী এক, তার সঙ্গে আত্মীয়ত্ব স্বীকার করে। অন্তর ও বাহিরের এই মিলনকে বলে সৌন্দর্য। এর নাম দেওয়া হয় আনন্দরূপ।[১]

১। সাহিত্যের পথে : তথ্য ও সত্য।

সাহিত্য নিতান্ত কল্পলোকের সৃষ্টি নয়। উপন্যাস-গল্প-নাটকে জীবন-লীলা অঙ্কিত হয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের সঙ্গে স্থান ও কালের সংযোগ আছে। রাজনীতি ও সমাজ-নীতি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়, তাদের সঙ্গে দেশ ও কালপ্রবাহ অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। বহির্জগতের পরিবর্তন তাই সাহিত্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে থাকে। নিজের দেশ বা অন্য দেশের সঙ্গে মিলনে-সংঘর্ষে মানুষের বেদনা গভীরতর হয়। 'এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই মানুষের বিকাশ ঘটছে'।

চণ্ডীদাস-রামীর প্রেম সমাজনীতি-বিরোধী। এই বাধাকে অতিক্রম করতে যেয়ে যে দুঃখ চণ্ডীদাসকে পেতে হলো তার মাধ্যমে কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন প্রেমের বরণীয়তা। তিনি লিখলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক আছে, সে-সম্পর্ক গভীর। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো যে, পটভূমি বড়, না জীবন বড়। তারাশঙ্কর লিখেছেন যে, একদা সমাজনীতির অনুশাসনে সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সীতা বিজয়িনীরূপে ধরিত্রী অঙ্কে স্থান পেলেন। জীবন জয়ী হলো, স্বীকৃত হলো তার মহিমা। সাহিত্যে জীবনের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আঘাতে সমাজের চেতনাও জাগ্রত হয়, মানুষের মধ্যেও আসে নব-চেতনা।

জীবন-দর্শন বা মতবাদ অভিব্যক্তির অঙ্গ। ভাব-প্রকাশের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীও প্রকাশিত হয়। কিন্তু মতবাদ সামঞ্জস্যের স্থান ছাড়িয়ে গেলে তা হয়ে ওঠে প্রচারধর্মী। তাকে সাহিত্য বলা যায় না। আবার জীবনকে যদি দেশ-কালের পটভূমিতে না দেখা যায় তবে তাও সম্পূর্ণ হয় না।

সাহিত্য যেখানে দেশ ও কালের পটভূমিকে বর্জন করে সেখানে তা good art হলেও great art হয় না। তারাশঙ্কর একটি মনোজ্ঞ উপমা ব্যবহার করেছেন। 'সাজানো গোছানো কনে অসুন্দর নয়—কিন্তু তার সে স্বভাবরূপ নয়'।

জীবন চলেছে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ধারায়। জীবনের এই চিরপরিচিত ও চিরনূতন রূপ প্রকাশিত করা সাহিত্যের ধর্ম। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গণ্ডিও প্রসারিত করা প্রয়োজন। তাই রাজনীতি সমাজনীতিকে বর্জন করা যাবে না।

এখানে রবীন্দ্রনাথের সাবধান বাণীর কথা মনে হয়। তর্ক-বিতর্ক, সমস্যাবলী উপন্যাসে স্থান পেতে পারে। কিন্তু দেখা দরকার তারা জায়গা জুড়ে বসেছে, না, কাহিনী ও চরিত্রের প্রয়োজনে এসেছে। গোরার বিতর্ক বা সন্দীপের রাজনৈতিক বক্তব্য যদি স্বাভাবিকভাবে এসে থাকে, যদি তারা উপন্যাসে

অনাকাঙ্ক্ষিতরূপে জায়গা দখল না করে তবে তা সম্বর্ধনা লাভের যোগ্য। কিন্তু তারাশঙ্করের 'মন্বন্তরে' রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। বোমা-বিধ্বস্ত আতঙ্ক-বিহ্বল নাগরিক জীবনের বিপর্যস্ত রূপ অঙ্কনের দিকে লেখকের দৃষ্টি যেন অধিকতর নিবদ্ধ। দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধার্ত নরনারীর খাদ্যান্বেষণে অভিযান, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশা, গান্ধীজার অনশন প্রভৃতি ঘটনাবলী সংবাদপত্র থেকে সঙ্কলন করে লেখক উপন্যাসে স্থান দিয়ে রাজনীতির সঙ্গে, দেশ ও কালের পটভূমির সঙ্গে উপন্যাসের যে নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান তা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনাবলী 'উপন্যাসের কাঁচা মাল মাত্র, ইহার পরিণত শিল্প সৌন্দর্য নহে'। কিন্তু গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে সমাজের অবক্ষয় প্রদর্শন করে তিনি নরনারীর জীবনযাত্রাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আদর্শচ্যুত, পরিণাম অজ্ঞ সমাজের ছবি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠায় কাহিনী ও চরিত্র এক দূরবিস্তৃত মহিমা লাভ করেছে। তারাশঙ্কর 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসে বর্তমানকালের আধ্যাত্মিক-বিশ্বাসচ্যুত মানুষের অদ্ভুত অশান্তি ও অস্থিরতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। দেহকামনার ভোগবাদকে অধ্যাত্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করলে মানুষের জীবনে মর্মান্তিক পরিণাম কিভাবে রচিত হয়, বর্তমান যুগের এই রূপটি তারাশঙ্কর অঙ্কিত করে উপন্যাস ও যুগজিজ্ঞাসাকে সমন্বিত করেছেন।

তারাশঙ্কর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন, তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধে। ঐতিহ্যবোধ যেখানে জীবনের শুদ্ধ গতিবেগকে আত্মগত ও সর্বজনীন কল্যাণের পথে মুক্তিদানে প্রয়াস করে না সেখানে তা অর্থহীন। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে মনোলোকের ব্যাপ্তি ঘটে। মানুষ আপনার মধ্যে অপরকে উপলব্ধি করে। সাহিত্যে এই উপলব্ধির বাণী উচ্চারিত হয়ে থাকে। এইস্থানে তার সার্থকতা।

'আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্য' সম্পর্কে তারাশঙ্করের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। চলচ্চিত্রের দাবী ও জনপ্রিয়তা এ-যুগে অত্যন্ত বেশী। রঙ্গমঞ্চকে জাত খুইয়ে অনেকখানি বন্য করে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে। ঘূর্ণ্যমান মঞ্চ, দৃশ্যপটের বিচিত্র বিন্যাস, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সহায়তায় মোহ সৃষ্টি করতে হয়, চলচ্চিত্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার ফলে। কিন্তু এই জাতীয় পদ্ধতিতে চলচ্চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। 'দৃশ্যকাব্যের দৃশ্য অংশটি বাহু হয়ে কাব্য অংশটিকে গ্রাস করেছে'। দৃশ্যপটের ব্যবহার, মঞ্চসজ্জার আধিক্য নাটকের রসসৃষ্টির পক্ষে অন্তরায়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে বলেছেন। নাটকের আবেদন

ঘটে অভিনয়ের সাফল্যের উপরে। অত্যাধুনিক কালে দূরদর্শন, নৃত্য, যন্ত্রে ধরে রাখা সঙ্গীতের ব্যবহার, স্থির অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে মঞ্চাভিনয়কে শ্রুতি ও দৃষ্টিসর্বস্ব করবার আয়োজন চলেছে। নাট্যাভিনয়ে বিষয়ের প্রাধান্য গৌণ হয়ে পড়েছে।

তারাশঙ্কর বলেছেন যে, নাটকে অবান্তরের স্থান নেই। সামগ্রিক তাৎপর্যের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই অথবা নাটককে যা পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দেয় না তা নাটকে অবান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র একদা লিখেছিলেন যে, নাটকে সকল কিছু উপসংহৃতির উদ্‌যোজক হবে। নাটকের আবেদন মনের গভীরে। সেখানে একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ঝড় হয়ে ওঠে, একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি উদ্‌ঘাটিত করে মনকে। 'নাটকের মধ্যে অতি প্রকটের বাহুল্য তার মনোময় প্রকাশকে ব্যাহত করে'।

অন্য নাট্যকার আছেন যাঁরা ঘটনাকে লঘু করে মনোজগতের 'চিন্তা-ভাবনাকে বড় করে তুলেছেন। তারাশঙ্কর মন্তব্য করেছেন 'নাটকীয়তাবর্জিত নাটক এঁদের সাধনা'।

লেখক প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করে সুবিন্যস্ত ঘটনাবলীর প্রবাহকে নাটকের প্রাণরূপে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু গত শতকে ইবসেন, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতিকে অবলম্বন করে সমস্যামূলক নাটক যখন প্রাধান্য লাভ করলো তখন নাটকে চিন্তা-ভাবনা-সমস্যা, আলোচনাকে কেন্দ্র করে বড় হয়ে উঠলো। এতে এই সকল নাটকেও ঘটনাবলীর আশ্রয়ে চিন্তা ও সঙ্কল্প, আরিস্টটল যাকে বলেছেন Thought, মুখ্য স্থান অধিকার করলো। কিন্তু য়ুরোপে প্রধানতঃ নাট্যজগতে রূপান্তর আনলেন মেটারলিঙ্ক। তিনি বহির্জগতের ঘটনাবলীকে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য হত্যা প্রভৃতি বিষয় উপেক্ষা করে দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট আছেন যে বৃদ্ধ তাঁর মনোজগতের নানা চিন্তার দিকটি বড় করে তুললেন। মানুষের মনের লীলা সর্বদা বড় রাজপথ ধরে চলে না। পরিবেশ-নির্ভর ছোট ছোট সঙ্কেতপূর্ণ ঘটনাবলীকে তা আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়। মেটারলিঙ্কে নাটকে বড় ঘটনা উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি অবতরণ করেছেন মনের রহস্যলোকে। বন্ধুত্ব, প্রেম, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ের গৃহীত নিত্য মূল্যবোধকে তিনি নূতন করে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকসমূহে ঘটনা ও তত্ত্বকে সুন্দরভাবে সমন্বিত করেছেন। তিনি মেটারলিঙ্কের ন্যায় ঘটনাবলীকে উপেক্ষা করেননি, তাদের তত্ত্ব-প্রকাশের সহায়করূপে নির্বাচন করেছেন। 'রাজা' নাটকে কাহিনীর ধারাবাহিকতা আছে। 'ডাকঘরে'ও অমলের মনোলোকের

রহস্য ব্যক্ত করবার জন্য কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মেটারলিঙ্কে এই কাহিনীগত ধারাবাহিকতা নেই। তাঁর আছে অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা।

তারাশঙ্কর লিখেছেন 'তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র রূপায়িত হয়ে উঠলে তা হবে নাটক সৃষ্টি'। তারাশঙ্কর প্রাচীন ধারা অর্থাৎ আরিস্টটলের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। লেখক আরও বলেছেন যে, জীবনে ইচ্ছার যে ধারাটি শুকিয়ে যাচ্ছে 'নাটকের মরীচিকায় তাই অথৈ সরোবর হয়ে উঠছে'। কিন্তু এই জোগানদারী নাটককে ছাপিয়ে উঠলে তা সাহিত্যের ও সমাজের পক্ষে হানিকর হয়। ইচ্ছার ধারাটিকে অর্থাৎ রোমান্সের কল্পনাকে তিনি নাটকে ব্যক্ত করতে চান পরিমিত ভাবে, বাস্তববোধকে ক্ষুণ্ণ না করে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, ইচ্ছা বা কল্পনার সৃষ্টি হবে পরিবেশ স্বতন্ত্র। পরিবেশ-নির্ভর চরিত্র সৃষ্টি না হবার জন্য একদা রবীন্দ্রনাথ 'ষোড়শী' নাটকের সমালোচনা করেছিলেন। 'দুই পুরুষ' নাটকেও নুটু মোক্তারের পরিকল্পনায় রোমান্সের প্রাবল্য আছে। পরে তারাশঙ্কর মন্তব্য করেছেন 'আমাদের নিজেদের জীবন আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা-ঐতিহ্যকে নিয়ে আমাদের নাটক গড়ে উঠুক'।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তারাশঙ্করের বক্তব্য হলো যে, তাঁর নামে একটি যুগ চিহ্নিত হয়েছে। 'তিনিই আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগ'। বাংলা সাহিত্যের ধারা বর্তমানকালে যে 'সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে জীবন-বিপ্লবের খাতে প্রবহমান', তার মূলে শরৎচন্দ্রের দান অনস্বীকার্য। রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে একদা নবজীবনের দ্বিদল বীজ রাজনীতি-ধর্ম ও সমাজজীবনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে যুগের বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো, শরৎচন্দ্র এসে যুগপ্রবাহকে বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত করলেন। রবীন্দ্রকাব্যের সুউচ্চ ব্যাখ্যায় যে শোভা ও সৌন্দর্যের বিকাশ, তা শরৎসাহিত্যের নিম্নভূমিতে এসে নতুন রূপ ধারণ করলো। চিরকালের দেখা বস্তু অভিনব সৌন্দর্য-মূর্তিতে ব্যক্ত হয়ে চিত্তে বিস্ময়রসের উদ্বোধন ঘটালো। মধ্যবিত্ত সমাজের সন্তান শরৎচন্দ্র জন্মেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সমাজে। গ্রামজীবন ম্যালেরিয়ায় ক্লিষ্ট, সংস্কৃতির নামে অন্ধ কুসংস্কারের প্রাবল্য, দারিদ্র্য—এককথায় 'মা যা হইয়াছেন' এই সামাজিক পরিবেশ থেকে তিনি সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানবমনের মিলনে যে আনন্দ উদ্ভূত হয় তার অভিব্যক্তি হলো সাহিত্য। মানুষ আত্ম-চৈতন্যকে উপলব্ধি করে এই সাহিত্যে। মানুষ আত্মার আলোকে

পরিচয় লাভ করলো সৃষ্টির ও স্রষ্টার। ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন স্তরে এই উপলব্ধি বিকাশ লাভ করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই উপলব্ধির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

এদিকে যন্ত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। ভারতে ধারায় ধারায় বহু আক্রমণ সত্ত্বেও এ দেশের সমাজ-কাঠামো ভাঙেনি। কিন্তু যন্ত্রশক্তি এসে আঘাত করলো সমাজ-বিন্যাসকে। শরৎ-সাহিত্য দ্বিতীয় ধারা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। যে-কথা তারাশঙ্কর বলেননি তা হলো যে, এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ শরৎ-উপন্যাসের পটভূমিকা। এর সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ ঘটেছে। আবার এই সূত্র ধরে তিনি নিপীড়িতদের কথা বলেছেন, বিশেষ করে তাঁর ছোট গল্পসমূহে। তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি থেকেই লাভ করা রূপবোধ নিয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন—দুঃখ-প্রপীড়িত দুর্গত পতিত জীবনের পটভূমিতে মানুষের সেই সত্য—যে সত্য সবার উপরে সত্য'। রবীন্দ্রনাথের রূপবোধ হেতু শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন দুঃখ-পীড়িত জীবনের পটভূমিকায় পরম সত্যকে। রূপবোধ কথাটির অর্থ স্পষ্ট নয়। এর তাৎপর্য যদি ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় দান করাকে বলে তবে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রউপন্যাসে তার প্রকাশ অবারিত। কিন্তু সমাজের পটভূমিকা ব্যতীত ব্যক্তির রূপ পরিস্ফুট হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পসমূহ বাদ দিলে তাঁর উপন্যাসে এই রূপ প্রকাশিত নয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব চেতনা অত্যন্ত প্রবল। গৌণ চরিত্রসমূহ সৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভ্রান্ত পরিচয় রেখে গিয়েছেন। নবযুগের বৈপ্লবিক চেতনার পরিচয়, তারাশঙ্করের মতে এনেছিল বিনোদিনী ও শরৎচন্দ্রে সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী ও চন্দ্রমুখী। বিনোদিনী তরঙ্গ-মাত্র সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত চেতনা এনেছিল দামিনী। কিন্তু তাকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন মননের দীপ্ত আলোকে। তারাশঙ্কর বলেছেন যে, বিনোদিনী প্রয়াণ করলো জীবনের ঊর্ধ্বলোকে, চাওয়া-পাওয়ার অতীত বৈরাগ্যের জগতে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তার উল্লিখিত নারী-চরিত্রসমূহে দেখিয়েছেন বেদনার ইতিহাস, যা বাস্তব ও নিত্যকালীন সত্য। বিনোদিনী নিয়ে প্রশ্ন আছে যে, তার পরিণাম স্বাভাবিক হয়েছে কিনা। আবার সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী শরৎচন্দ্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে প্রকাশিত। 'বেদনায় তাদের অন্তরে অশ্রুসাগর উথলে' উঠলেও তাদের জীবন-পরিণাম সত্য হয়ে ওঠেনি কিংবা তাদের আদর্শনিষ্ঠার পরীক্ষা হয়নি। রমা, অন্নদাদিদি, জ্ঞানদা ও সন্ধ্যা, অচলা প্রভৃতির মধ্যে 'বিপ্লবের ধ্বনি জেগে উঠেছে' ও তারা পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অচলাকে বাদ দিলে এদের মধ্যে একটা প্রতিবাদের সুর,

অন্তর্লোকে বিক্ষোভের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু একে 'বিপ্লবের ধ্বনি' বলা চলে না। নারীর আত্মিক মূল্য শরৎচন্দ্র যে স্বীকার করেছেন তা তাঁর আদর্শবাদী মনোভাবের প্রকাশ। কিন্তু তারাশঙ্কর বলেছেন, 'এ এক বিপ্লবাত্মক স্বীকৃতি'। স্বীকৃতি এই অর্থে যে, শরৎচন্দ্র নারী-সত্তাকে সামাজিক দৃষ্টিতে বিচার না করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে. ব্যক্তির জীবনের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে সমাজ-নির্ভর কিনা। ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ-সত্তার মূল্য বেশি এ-কথা স্বীকৃত হলো। তাই রোহিণী বা শৈবলিনী-চরিত্র অঙ্কিত করতে যেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নারীর পদস্খলনকে সামাজিক মন নিয়ে বিচার করেছেন।' 'শরৎ-সাহিত্যে নারীর আত্মিক রূপ-মহিমার প্রকাশ'। শরৎ সাহিত্য যে বিপ্লবাত্মক তার কারণ হলো যে, তিনি মানুষকে ভালবেসে বর্তমানের জীর্ণতাকে নিরাসক্তভাবে বর্জন করে নব-কল্যাণের আবেগকে প্রকাশিত করেছেন। এককথায় তাঁর সৃষ্টির পশ্চাতে আছে মানবতাবোধ। তিনি যে বাস্তববোধের অপরিহার্য প্রেরণায় আগামী সমাজের রূপ অঙ্কিত করেছেন যে আদর্শ প্রলেটারিয়েট সাহিত্যের, তা নয়, কেননা সমস্যা-সমাধানের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেননি, সমাজ-অন্তর্গত মানুষের উপরে ন্যস্ত করেছেন। তিনি জীবন বিপ্লবের খাতে সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন, তারাশঙ্করের এই মন্তব্য যথার্থ নয়। পৃথিবীর সাহিত্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যুক্ত হয়েছে, বিপ্লবাত্মক আদর্শের দিক থেকে, এই বিচারও অভ্রান্ত নয়।

তারাশঙ্কর নিজের সৃষ্ট উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন। অন্ততঃ তিনি 'কবি' উপন্যাসের দুটি চরিত্র ও 'সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দুর আলোচনা করেছেন। কবি তাঁর প্রথম কালের রচনা ও ভাষাও অপরিণত। লেখকের কাছে এসে দাঁড়ায় ঠাকুরঝি ও বসন। কেন তাকে মারা হলো এই প্রশ্ন ঠাকুরঝি করে। সে তো কবিয়ালকে ভুলে ঘর-সংসার করতে পারতো, এমন তো বহুলোক করে, ভালবাসে ও ভোলে। বসন অনুযোগ করে যে, শেষ সময়ে যে কথাগুলো তার মুখে দেওয়া হয়েছে, সে-সব ভাল ভাল কথা তারাও জানে। সমালোচক তারাশঙ্কর লেখক তারাশঙ্করকে বলেন যে, কবি উপন্যাসের মার্জনা প্রয়োজন। কৃষ্ণেন্দুর ব্যাধি নিয়ে অভিযোগ টেকে না। কেননা লেখক তাকে স্বর্গের সিংহদ্বারের সামনে পৌঁছে দিয়েছেন। তারাশঙ্কর চিরদিন তাঁর নিজের সমালোচক। এই দাবী সকল লেখকদের।

তারাশঙ্কর ও তাঁর গল্প

রবিন পাল

১

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় —বোধকরি একথায় বিতর্কের অবকাশ নেই। তারাশঙ্কর বলেছেন—তাঁর সাহিত্যজীবনের দুটো ধারা—একদিকে তিনি 'কল্পনাপ্রিয় কবি' অন্যদিকে 'নানা তথ্যসন্ধানী সামাজিক।'[১] তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকেই কথাটা প্রমাণ করা যায়। তাঁর প্রথম ছোট গল্প 'রসকলি'-তে মঞ্জরী, পুলিন ও গোপিনীর প্রেমজীবনের রূপায়ণের মধ্যে 'কল্পনাপ্রিয় কবি'ত্বের পরিচয় স্পষ্ট। আবার একই সময়ে লেখা 'শ্মশানের পথে' গল্পে আছে সামাজিক দৃষ্টি। এই গল্প অবলম্বনেই তাঁর প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' রচিত হয়।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বলেছেন, 'তাঁর সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য—মাটি আর মানুষ। মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমা।'[২] একথা যথার্থ। প্রসঙ্গত বলা যায়, চল্লিশের যুগে সমাজকে ব্যাপক এবং সমগ্ররূপে দেখার প্রবণতা আমাদের সাহিত্যে যেমনি দেখা যেতে থাকে, তেমনি আসে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপর্যায়কে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কার্যকরণসূত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা। তারাশঙ্কর এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিছুটা সাফল্যও দেখিয়েছিলেন।

তারাশঙ্করের আর একটা বড় কৃতিত্ব, বাংলা সাহিত্যের 'পরিধি সম্প্রসারণে।' রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে বাঙালী সমাজের থেকে চরিত্র ও ঘটনাগত উপাদান সংগ্রহের কৃতিত্ব দেখালেও তার পরিমাণ সীমিত, শরৎচন্দ্র সেক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারাশঙ্কর যেভাবে ও যতটুকু বাঙালীর সমাজজীবনকে, জীবনের অন্তর্গত চরিত্রকে সাহিত্যরূপ দানের চেষ্টা করেছেন, তার তুলনা নেই। অনেকদিন আগে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত এক সাহিত্যসভায় তারাশঙ্করকে "বঙ্গ সরস্বতীর খাসতালুকের মণ্ডল প্রজা" আখ্যা দিয়েছিলেন।[৩] ঐ আখ্যা নিঃসংশয়ে সার্থক বলা চলে।

সিউড়ীতে এক বাড়ীতে রাত কাটানোর সময় 'কালি কলম' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দের একটি গল্প পড়ে তিনি বিস্মিত হন। তাঁর ইচ্ছে হয়, এমনি সত্যিকারেব রক্ত মাংসের মানুষ নিয়ে গল্প লিখবেন। এই প্রেবণা থেকেই রচিত হয়—'রসকলি'। প্রবাসীতে ব্যর্থ হযে 'কল্লোল' পত্রিকায তিনি গল্পটি পাঠিয়ে দেন। গল্পটি মনোনীত হল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, 'এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?'[৪] সাহিত্যজীবনে এই প্রথম যথার্থ স্বীকৃতি তারাশঙ্করকে নতুন উৎসাহ দান কবে। কল্লোল ও কালিকলম পত্রিকায এ সময় তাঁর আবো কযেকটি গল্প ও কবিতা ছাপা হবার পর, তিনি পত্রিকাচালকদেব ব্যবহাবে মনঃক্ষুণ্ণ হন ও সম্পর্ক ত্যাগ করেন। 'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকাব তরুণ লেখকদেব সঙ্গে তাবাশঙ্কবের মনোধর্মেব পার্থক্য নিযে অনেকে আলোচনা করেছেন। যেমন, নাবায়ণ্ গঙ্গোপধ্যায লিখেছেন, 'চরিত্র ধর্মেব দিক থেকে 'কল্লোল' ছিল নাগরিক—শিক্ষিত বুদ্ধিজীবির ব্যর্থতাবোধ এবং গ্লানিব সঙ্গে নিরুপায বিদ্রোহ-প্রযাসেই 'কল্লোলেব' বৃত্তবেখা নির্দিষ্ট। কিন্তু পল্লীপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মোটেব ওপব গ্রামীণ ঐতিহ্যে বিশ্বাসবান তাবাশঙ্কব কোনোদিনই প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমাব, গোকুল নাগ, মনীশ ঘটকেব সমগ্রোত্রীয ছিলেন না'[৫] কল্লোলীযদেব সঙ্গে তাবাশঙ্করের এই মন কষাকষিব কাবণ খুঁজতে গিযে অচিন্ত্যবাবু লিখেছিলেন, 'আসলে সে বিদ্রোহেব নয, সে স্বীকৃতিব, সে স্থৈর্যেব।'[৬] এব উত্তবে তাবাশঙ্কব লিখেছেন—'বর্তমানকে ভেঙে চুবে তাকে অগ্রাহ্য কবে শূন্যবাদেব মধ্যে জীবনকে শেষ কবাব কল্পনায আমাব মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয নি।......আমাব মনে ভেঙে গডার গভীর স্বপ্ন ছিল।'[৭] এই দুই উক্তি থেকে স্পষ্ট হযে যায, কল্লোলেব সর্বাত্মক নেতি এবং তারাশঙ্করেব অস্বচ্ছ 'ইতি'ব মধ্যে বনিবনা না হওযাই স্বাভাবিক। 'কল্লোলীযবা এই নেতি মনোভাবকে সামর্থ্যদান করতে দেশজ ঐতিহ্যেব প্রতি সচেতনভাবে উদাসীন থেকে যুবোপীয সাহিত্যে পাঠ নিতে চেযেছে, অন্যদিকে তাবাশঙ্কব 'ইতি'-র টানে দেশ ও মানুষের প্রতি অভিনিবিষ্ট হযেছেন। অবশ্য, নানান কারণে তাবাশঙ্কবের ওই 'ভেঙে গডাব গভীর স্বপ্ন' সাহিত্য

৪। কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৃ ৩১২

৫। বাংলা গল্প বিচিত্রা : পৃ ১১২ ৬। কল্লোলযুগ, পৃ ৩১৫

৭। আমার সাহিত্য জীবন (১ম) : পৃ ৭৭

জীবনের প্রথম ও মধ্য পর্বে অব্যাহত থাকলে ও পরবর্তী জীবনে সে স্বপ্নসূত্র ছিন্ন হয়েছে নানাভাবে।

২

তারাশঙ্করের রচনায় পুরোনো কালের প্রতি এক ধরণের আচ্ছন্নতাবোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সাহিত্যিক মনের নিয়ামকরূপে দেখা দিয়েছে। তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন জমিদারবাড়ীর সন্তান। তাঁর আমলে তাঁদের জমিদারীর ভগ্নদশা হলেও জমিদারীপ্রথা ও সংস্কারের ঐতিহ্য তখনও অটুট এবং জমিদারী ব্যবস্থার পুরাতন কীর্তি ও গৌরবকাহিনীগুলোর সজীবতার মধ্যেই তিনি লালিত ও বিকশিত হয়েছেন। এর প্রভাব আমরা তাঁর জমিদার জীবন নিয়ে লেখা গল্পের মধ্যে দেখতে পাই। 'রায়বাড়ী' এবং 'জলসাঘর' গল্পের কথা এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি। 'রায়বাড়ী'র ঘটনাকাল ১৮৬৩, রাজারামপুরের প্রতাপশালী জমিদার রাবণেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে প্রজারা। প্রজারা নজরানার টাকা দেয়, জমিদার খেতে দেয় প্রচুর মাছ দুধ আর ধুতিচাদর ও ফেরার গাড়ীভাড়া। সামান্য কথার ভুলবোঝাবুঝিতে প্রজাদের হাতে জমিদারের গোমস্তা খুন হলে জমিদারের আদেশে কালী, বাগদী গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। জমিদার বাড়ীতে পুণ্যাহ, নানান পূজাসংক্রান্ত আচার, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, জলসাঘর প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা এ গল্পে লক্ষ্য করার মতো। পুণ্যাহের দিন জমিদারের স্ত্রী-পুত্র নৌকাডুবি হয়ে মারা গেলে জমিদার সংসার ত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। এদিকে প্রবল বন্যায় অসহায় প্রজারা আশ্রয়প্রার্থী হলে তাদের জমিদার বাড়ীর দরজা খুলে দেওয়া হয়। চলে যাবার মুখে নদীর ঘাট থেকে জমিদার দেখলেন তাঁর শখের জলসাঘরে বিয়ের আসর বসেছে, আহারতৃপ্ত প্রজারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে—'অক্ষয় হোক রায়-হুজুরের রাজত্ব, আমরা সুখে বেঁচে থাকি।' বিচলিত হয়ে জমিদার ফিরে আসেন। গল্পাংশ এখানে শিথিল, তবে ১৮৬৩ সালের জমিদার চরিত্রের ভালোমন্দের দুদিকের চিত্রণে লেখকের দক্ষতার পরিচয় আছে। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিখ্যাত 'জলসাঘর' গল্পটি 'রায়বাড়ি' গল্পের পরিপূরক বলা যেতে পারে। 'জলসাঘর' এর বিশ্বম্ভর রায় একই জমিদার বাড়ীর সপ্তম পুরুষ যার আমলে রায়বাড়ির লক্ষ্মী ঋণ-সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন। এ গল্পেও জমিদার পুত্রের উপনয়নের দিন জমিদার-স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা কলেরায় মারা যায়। আগের গল্পটির মতো এ গল্পেও জমিদারী আবহাওয়াটা চমৎকার ফুটেছে। বাড়তি

যেটা, তা' হল নতুন কালে মহাজন শ্রেণীব বিকাশে ও বিস্তারে জমিদারের ক্ষোভ ও ক্রোধ। একদিকে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি চলে যায়, অন্যদিকে মহাজন গাঙ্গুলীরা সে অঞ্চলেব দখল নিতে থাকে। এই ক্ষোভ থেকেই গাঙ্গুলী বাড়ির নাচেব আসবেব নিমন্ত্রণ জমিদার বিশ্বম্ভর রায প্রত্যাখ্যান করেন, সর্বস্বান্ত হযেও জলসার আসব বসিযে মর্যাদার লডাইয়ে নামতে পিছু পা হন না। 'রায়বাড়ি' গল্পে ছিল জমিদারী ব্যবস্থার অব্যাহত জৌলুষের পরিচয, 'জলসাঘর'-এ ফুটেছে জমিদাবী ঐতিহ্যের মর্মান্তিক জীবন-সন্ধ্যা। এই ধরনের গল্প সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ বায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'তাব বচনায জমিদার-সম্প্রদায়েব সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হযেছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষবশ্মিব অপবাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘনিশ্বাসে ভবে উঠেছে।'[৮] 'মুখুজ্জে মশায়' গল্পে জমিদাবী ব্যবস্থায পবিবর্তন, জমিদারদেব গ্রাম পরিত্যাগ ও সহরবাস এবং ব্যবসায় নেমে পডার কথা বালিগঞ্জবাসী জমিদাব হীবেন্দ্রেব মারফৎ প্রকাশ পায। 'বন্দিনী কমলা' গল্পে পাওযা যাবে জমিদাবী অন্দরমহলের চিত্র, যা 'রাযবাড়ি'তে আমবা কিছুটা পেযেছি। বাজহাটের বাযবাড়ি প্রাচীন বনেদী ঘর। এখানে ছেলেদের খাওযা আবম্ভ হয দেডটায, বাবুদেব আডাইটায, মেযেদের সাডে-তিনটায, আর চাকবদের পৌনে চাবটায। সেকালেব বৃদ্ধা জমিদাব-গৃহিণীর ছবিটি যত্নবচিত। বাডীতে গৃহপালিত প্রাণীর বিরাট সংসাব। বাডীব বউদের নামকবণ হয হীরা মণি মাণিক্য আতর বেল চাঁপা প্রভৃতি নাম দিযে। বাডীব নতুন বৌ কাঞ্চন তাব দিদিশাশুডীব কাছে গল্প শোনে কিভাবে তাব শ্বশুব পাইকদের সর্দাব থেকে শেষে নাযেব হযেছিল। কোম্পানির কাছে দাদন নিযে সমযে শোধ দিতে না পেবে লুকিযে থাকা তাঁতীদের ধবে এনে খুঁটিতে বেঁধে দাদন আদায় করিযে দিযে তাব শ্বশুরেব মতো লোকেরা সেকালে 'দেওযান' প্রভৃতি পদ পেত। আর, এসব বাডীব পুরুষদেব অনেকেরই 'বাবফটকা রোগ' অর্থাৎ বেশ্যাসক্তি ছিল। কাঞ্চন শুনেছিল, লক্ষ্মীব ঘবে নাকি লক্ষ্মীদেবীকে বন্দিনী করে রাখা আছে। ঘটনাচক্রে সে ঘরের মরচে পডা তালা খুলে সে লক্ষ্মীর বদলে, একটি নরকঙ্কাল আব বিবর্ণশীর্ণ একটি নামাবলী দেখতে পায। বোঝা যায়, ইনি এ বাডীব কোন এক পূর্বপুরুষ। গল্প শেষে এই আকস্মিকতা সৃষ্টি করে লেখক, জমিদার-বাডীতে লক্ষ্মীকে অচলা কবে রাখা, সম্পত্তিলাভেব কারণে প্রিয়জন হত্যা, 'যক্ষ'

৮। গল্প পঞ্চাশৎ : ভূমিকা, পৃঃ পনেরো

করে রাখার বিশ্বাস ইত্যাদি সামন্ত সংস্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি'তে যেমন আছে জমিদারী দাপট, লালসার চিত্র, তেমনি আছে পরবর্তীকালে রচিত 'প্রতিমা', 'দোল', প্রভৃতি গল্পেও। 'সনাতন' গল্পে আছে 'চারপুরুষের চাকর' হয়ে থাকার সামন্ত প্রথার কথা। এরকম ছোটখাট উদাহরণ তাঁর লেখায় অজস্র আছে। আমরা যে সব উল্লেখ থেকে আপাতত বিরত থেকে শুধু ১৩৫১, আশ্বিন, শনিবারের চিঠি-তে প্রকাশিত 'শেষকথা' গল্পটির উল্লেখ করতে চাই। এ গল্পের গোড়াতেই আছে লাট ভরতপুরে সোনার সম্পত্তির কথা। লেখকের মতে, আগে প্রজারা সুখেই ছিল, কিন্তু "এখন আর সেকাল নাই ··· আজকাল আধপেটা খায়, রোগে হাকায়, কোনরকমে চাষ ক'রে ভগবানকে কেউ ডাকে, কেউ ডাকে না।" এ অঞ্চলের হালআমলের জমিদারীর বৈশিষ্ট্য : পাইকের দলের ওপর ভরসা রেখে সাউমশায়দের জমিদারী আর দোকান-কলকারখানা বসিয়ে ব্যবসাদারী। এই সাউদের সঙ্গে আর এক জমিদারের সীমানা নিয়ে ফৌজদারী বেধে যাওয়ায় চাষীদের অবস্থা হয়—"ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুখাসের মত।" পরিত্রাণে উন্মুখ চাষীদের চাঁই লালমোহন পাণ্ডে কিন্তু সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিল, বলল : 'হাঁ, আমি মরব। আমি যদি মরি, তবে তখন উয়ারা মনে দুখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। তখন আমাদের কথা ঠিক উয়াদের সমঝে আসবে।' অহিংস অসহযোগ মাধ্যমে শত্রুর হৃদয়পরিবর্ত্তনের অবাস্তব তত্ত্বের প্রতি লেখকের পক্ষপাত এ গল্পে প্রকট। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, 'শেষকথা' গল্পটি 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত এবং গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে—মহাত্মা গান্ধীকে।

'জলসাঘর গল্পে বিশ্বম্ভর রায় ও মহিম গাঙ্গুলীর বিরোধটা সরাসরি অর্থনীতিগত। অন্য আর একভাবে নতুন ও পুরাতন কালের সম্পর্ক বা তার বিরোধকে কিছু গল্পে দেখানো হয়েছে (এ বিরোধের নিয়ামক শক্তি ও শেষ পর্যন্ত কিন্তু অর্থনীতি)। যেমন, 'পিতাপুত্র'। বিপনান্দী গ্রামের শিবশেখর ন্যায়তীর্থ জীবন পরিবর্ত্তনে অবিশ্বাসী, এবং 'বংশগত বিদ্যায় একান্ত শ্রদ্ধাশীল. তিনি ইংরাজী চর্চার বিরোধী। কিন্তু কালের টানে যে পরিবর্তন অনিবার্য তাকে তিনি রুখবেন কি করে? তাই তাঁর ছেলে শশিশেখর নবদ্বীপে ন্যায় পড়তে এসে গোপনে ইংরেজি ভাষা ও পশ্চাত্য দর্শন চর্চা করে। জানতে পেরে পিতার ভয়, পুত্র 'স্বধর্মচ্যুত' হবে। প্রবল অসন্তোষে পুত্রের রচনায়, বিনা অনুমতিতে 'সুস্পষ্ট' শব্দটি বদলে 'বিস্পষ্ট' লিখে আত্মতৃপ্তিসংগ্রহ করেন, পণ্ডিত সভার অধিবেশনে

পুত্রের সঙ্গে দার্শনিক প্রসঙ্গে অসঙ্গত মতভেদ সৃষ্টি করে শেষে অসুস্থতার অজুহাতে সভা ত্যাগ করেন এবং শশিশেখরকে সরকার 'উপাধি' দেবে একথায় আনন্দের বদলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুত্র অন্তরাল থেকে এসব শুনে তাব প্রতিষ্ঠায় পিতার ঈর্ষা অনুমান করে ক্ষোভে দুঃখে ট্রেনেব তলায় আত্মহত্যা করে। বলা বাহুল্য, পুত্রের মৃত্যু ঘটিযে লেখক পিতাব প্রতিই পক্ষপাত দেখিয়েছেন। লেখক নিজেই একথা বলেছেন: "শিবশেখরেশ্বরের মধ্যে আবিষ্কার করলাম এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে।...এই ন্যায়রত্ন চরিত্র · পরবর্তীকালে আমার বহু বৃহৎরচনার কেন্দ্রে প্রায় প্রাণশক্তির মত আবির্ভূত হযেছে।"[৯] 'বোবাকান্না' গল্পে রোগীকে কেন্দ্র করে চণ্ডীপূজারী ত্রিপুরা ভট্টাচার্য আর অল্প-বযসী ডাক্তার মিহির মুখুজ্জে—এই দুইকালের দুই প্রতিনিধির সংঘর্ষ দেখানো হযেছে। চরণামৃত আর ওষুধের এই সংঘর্ষ অবশ্য শেষপর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট পথে অনুসরণ করে নি, দুর্ভিক্ষের বোবাকান্নার সামনে তারা দুজনই অসহায়বোধ করেছে। 'শিলাসন' গল্পে আদিবাসী মোড়ল আর তার উদ্ধত জামাই কাঁদন-ও দুইকালের দ্বন্দ্ব প্রকট করে। মোড়ল পুরাতন কালের অতিথিসেবা ও ক্ষমাধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু কাঁদন প্রতিশোধলিপ্সু—'প্রাচীন সংস্কারের কাছে নিঃসংশযে আত্মসমর্পণ করতে পারছে না।' 'খাজাঞ্চীবাবু' গল্পে দেখি, পুরাতনকালের বিশ্বস্ত ও কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্ত খাজাঞ্চীবাবুর অভ্যস্ত আচরণ নতুনকালের ম্যানেজারের মনঃপূত না হওযায় তাকে কারখানা থেকে বিদায় নিতে হয।

'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে বৃদ্ধ মুকুন্দ পালকে তরুণ শ্রীকৃষ্ণ ওরফে 'চেকা' কুস্তি লড়তে চেযে ঠাট্টা করলে জরাগ্রস্ত মুকুন্দ বড ব্যথা পায। 'ময়দানব' গল্পের বিশ্বাসী পুরাতন যন্ত্রমিস্ত্রী নতুনকালে কারখানার বৈদ্যুতিকীকরণের নৃশংস শিকার হয। সব গল্পেই কিন্তু নতুন কালের নৃশংসতা, অশালীনতাই লেখক দেখাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে পুরাতন কালের প্রতি তাঁর মমতা ও পক্ষপাত সুস্পষ্ট। তারাশঙ্কর বলেছেন—'আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে-কালকে। ধরাশাযী বিশালকায ঘনপল্লব বনস্পতি।...তাই সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটিবিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি, আমার পৈতৃকচরিত্রের ত্রুটির মত।'[১০] আর এক জায়গায বলেছেন—'...জীবনে বংশগত শিক্ষায় অতীতকে পুরাতনকে

৯। প্রিয়গল্প, ভূমিকা ১০। আমার কালের কথা, পৃ. ২১৭-১৮

অসম্মান করতে কোন কালেই পারি না বা পারিতাম না।'[১১] জীবনধর্মী শিল্পী জীবনের পরিবর্তনের অনিবার্যতাকে মূল্য দিতে চাইছেন না, এটা দুঃখের কথা তাতে সন্দেহ নেই।

৩

চল্লিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে জীবনচিত্রণে সামর্থ্য ও নিষ্ঠার বিচারে তারাশঙ্করের নামোল্লেখ একেবারেই অনিবার্য একথা আগেই বলা হয়েছে। এখন এই রূপায়িত জীবনের কিছু কিছু পরিচয় নেবার চেষ্টা করব। জীবনকে দেখার সুযোগ লেখক করে নিয়েছেন নানাভাবে। লাভপুরে পারিবারিক আবহাওয়ায় তার প্রথম সূচনা। জমিদারবাড়ী, ছোট হলেও তার বিভিন্ন শরিক ও আত্মীয় জীবন এবং সে সব বাড়ীতে আসা-যাওয়া নানান বৃত্তির নানান মানুষের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। তাছাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং গ্রাম্যপরিব্রাজকের মতো এখানে ওখানে বেড়িয়ে তিনি বহুমানুষের সঙ্গে মেশবার দুর্লভ সুযোগ করে নিয়েছিলেন। তাদের জীবনের কথা তারাশঙ্করের লেখায় রূপ পেয়েছে অবিচলনিষ্ঠায়। প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য যথার্থ : 'বীরভূমের সঙ্গে যার কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তার মনে হবে যে সরেজমিনে বীরভূমে এসে পড়েছে সে…।'[১২]

কল্লোলের লেখকদের রচনায় মধ্যবিত্তজীবনের কিছু সম্প্রসারণ নিশ্চয়ই ঘটেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ প্রভৃতির রচনায় অন্ত্যজশ্রেণীর জীবন অবলম্বিত হচ্ছিল, কিন্তু জীবনের কাছে পাঠ নেবার পদ্ধতিতে গণ্ডগোল থাকায় সে সাহিত্য যথার্থ 'বাস্তব'-রূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারাশঙ্করের বিশিষ্টতা যেখানে, তা হল, অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত,আদিবাসী, সভ্যতার আলোকস্পর্শ বিরহিত জীবনের ছবি আঁকার ব্যাপারে তিনি সমকালীন প্রায় সব লেখককেই ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রথমেই উল্লেখ করি 'বেদেনী' গল্পটি। শম্ভু বাজিকর আর তার বৌ রাধিকা বেদেনী কঙ্কালীতলায় প্রতি বছর ভোজবাজি দেখাতে আসে। সেবার 'কিস্টো-বেদের তাঁবু পড়তে দেখে তারা ক্ষেপে গেল। পরিচয় হবার পর একদিন

১১। বিচিত্র, পৃ ৩০

১২। তারাশঙ্কর রচনাবলী (১ম), ভূমিকা, পৃঃ ১/

রাধিকা কাপড়ের ভেতর থেকে ক্ষিপ্র হস্তে একটা কালকেউটের বাচ্চা তুলে কিস্টোর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল—'কই কালিয়দমন কর দেখি।' এই বাধিকা কিস্টোর দুর্দাম সবল চেহোরার প্রতি আকৃষ্ট হযে পড়ে। গল্পের শেষে সে শম্ভুব তাঁবুর ওপবই কেবোসিন ঢেলে দিযে কিস্টোর সঙ্গে চলতে চলতে খিলখিল কবে হেসে বলে—'মরুক বুড়ো পুড়্যা।' যৌবনেব অন্ধ আবেগটাই বড হযে উঠেছে এ গল্পে। বেদে জীবনের আবো প‍রিচয মেলে—'যাদুকরী' গল্পে। বীরভূমেব সীথল গ্রামের এই মেযেবা বিলাসিনী, প্রধান অবলম্বন নাচগানের মাধ্যমে ভিক্ষা ও বশীকবণেব ওষুধ বিক্রি। এ গল্পের যাদুকবী মেযেটি একপাডা থেকে অন্য পাডায় স্বচ্ছন্দে বিচবণ কবে, শুধু খেলায নয, পাবিবারিক বিরোধেও তার বুদ্ধির যাদুব খেলা দেখায়।

মাঝি জীবনের সুখ-দুঃখের খণ্ড পবিচয পাওযা যায 'তাবিণীমাঝি' গল্পে। ময়ূরাক্ষী নদীব পবিবেশে লালিত তাবিণীব জীবনে বিত্তেব দীপ্তি নেই, ফলে অল্পেই তুষ্ট হয। একটি মেয়েকে নদীর জল থেকে বাঁচিযে কযেকটা টাকা ও একটা 'ফাঁদিলত' পুবস্কার নিযে ও দিশী মদ খেযে বাডাবাডি করে বাডী ফেবে। তার বৌ সুখী সত্যই ছিল সুখী। ময়ূরাক্ষীব বন্যায় ঘব ছেডে তাবিণী তার বৌ সুখীকে নিযে জলের মধ্য দিযে চলতে চলতে নদীব প্রবল স্রোতে পডে। শেষ পর্যন্ত গিযে পডে ঘূর্ণিতে। কিন্তু ঘূর্ণির মধ্যে পডে অচেতন সুখী আবো জোবে তারিণীর গলা চেপে ধবে। যন্ত্রণার্ত তাবিণী জল থামচে ধবতে চায। শেষ পযন্ত বাঁচার দুর্বার আগ্রহেবই জয় হয, সে দুহাতে প্রবল আক্রোশে সুখীব গলা পিষে ধবে। ক্রমে সুখীব বিপুল ভারটা খসে যায, তাবিণী জলের ওপব ভেসে ওঠে। এটি তাবাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। এ গল্প প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন : 'তাবিণী মাঝি' গল্পটিব মধ্যে এমনই প্রাণবান তাব সুখদুঃখ, এমনই চিবকালেব যে তাকে অতি চেনা কাছের মানুষ বলে মনে হবে।'[১৩] 'প্রাণবান সুখদুঃখ' কথাটা লক্ষণীয। তাবাশঙ্কর এই প্রাণবাণ সুখ দুঃখেরই গল্প লিখতে ভালবাসেন। 'আখড়াইযেব দীঘি' গল্পে এই প্রাণবানতার পরিচয পাই দুর্ধর্ষ লাঠিযাল কালী বাগ্দীব জীবণ রূপাযনে। ভুল কবে কালী আখডাইযের ধাবে নিজেব ছেলে তাবাচরণকেই ফাবডা মেবে খুন কবে, তারপব, দেহটা ওই দীঘিতে পুঁতে দেয। দীঘিব পরিবেশ এবং কালী বাগ্দী ও তাব ছেলেব বৌ-এর চিত্রবচনায় তাবাশঙ্কব অদ্ভুত দক্ষতার পবিচয় দিযেছেন।

১৩। স্বনির্বাচিত গল্প, লেখকের ভূমিকা

এই সব মানুষের পাশাপাশি বীরভূমের রুক্ষ, বীভৎস একদল মানুষ তাঁর গল্পে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয়—'অগ্রদানী'র পূর্ণ চক্রবর্ত্তী। লোভ তাকে নির্লজ্জ, এবং শেষ পর্যন্ত নির্বিবেক করেছে। জমির লোভে নিজের জীবিত ছেলেকে বদল করে দিয়েছে জমিদারের মৃত ছেলের সঙ্গে। শেষে জমিদারের অনুরোধে জমিদার পুত্রের (যে তারই পুত্র) শ্রাদ্ধে অগ্রদানী হবার অনুরোধ সে ফেলতে পারেনি, কারণ—দশ বিঘে জমি পাবার সুযোগ। 'তিনশূন্য' গল্পে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এই বীভৎসতার আর এক চিত্র মেলে। ক্ষুধার্ত, ভিখিরী মেয়েকে এক ভদ্রলোক পুরোনো সৌখীনপাড় শাড়ী ও টাকার লোভ দেখিয়ে আচ্ছন্ন করে। রাত্রে দৈহিক অত্যাচার করে, টাকা ও এক ঠোঙা খাবার দিয়ে চলে যায়। মেয়েটির একটি সন্তান হয়, বিকৃত রোগের প্রভাবে যার কঙ্কালসার দেহ, সর্বাঙ্গে থকথকে ঘা।' পনের বছর পর সেই বর্বর পশুর মতো ছেলেটা হাতে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। মুখ দিয়ে লালা আর চোখ দিয়ে জল ঝরে। লোকে তাকে বলে—'ল্যালা।' একদিন ক্ষুধার জ্বালায় নর্দমা দিয়ে একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বাসন উচ্ছিষ্ট বাসন চাটতে থাকে পরমানন্দে। তারপর ঘরের মধ্যে বছর চৌদ্দর একটি মেয়েকে শিথিল আবরণে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন দেখে তার যৌন-ক্ষুধা জাগে ও সে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটির ওপর। দুর্ভিক্ষকালীন বীভৎসতা নিঃসন্দেহে এ গল্পের প্রেরণা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা। তারাশঙ্করের অনেক গল্পে চরিত্র শরীরী ভাবে বীভৎস হলেও তিনি বীভৎসতার পূজারী নন, তিনি বীভৎসতার মধ্যে সুন্দরকে খোঁজেন, কুশ্রীতার মধ্যে খুঁজে নেন প্রসন্নতা। যেমন, 'মতিলাল'। 'অগ্রদানী' 'মুখুজ্জেমশায়' প্রভৃতি আরো অনেক গল্পের সূত্রে আমাদের একথা মনে হয়, তারাশঙ্করের গল্পধারায় সবল, কর্মব্যস্ত, সামাজিক প্রেরণাস্থল, ইতিবাচক চরিত্র অপেক্ষা কর্মবিমুখ, অলস, চিন্তাপঙ্গু নেতিবাচক চরিত্রের ভিড় বেশী এবং এসব চরিত্রের উত্তরণ নিয়ে লেখক-ও খুব একটা ভাবিত নন।

তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ়বাংলার গ্রাম্য ঐতিহ্যের পরিচয় পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সমস্ত গ্রাম্য সংস্কারের মধ্যেই 'ডাইনী' সম্পর্কিত কুসংস্কারটা পড়েছে। ডাইনীর অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবু এককালে গ্রামীণ মনে ডাইনীতে ছিল দৃঢ়বিশ্বাস। সব থেকে মর্মান্তিক হল, যাকে ডাইনী অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সে-ও পরিপার্শ্বের চাপে আস্তে অস্তে একথা বিশ্বাস করতে শুরু করে। তখন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত জ্বালার অবধি থাকে না। এই মর্মান্তিক সংস্কারের

সুন্দর চিত্র ফুটেছে—'ডাইনীর বাঁশী' গল্পে। রাধানগরের বেনেদের নিঃসহায় মেয়ে স্বর্ণ হাটে তরীতরকারী বিক্রী করে পেট চালায়। সে বাচ্চা টুকুকে খুবই স্নেহ করে। টুকুর মা-র এটা অপছন্দ, কারণ তার দৃঢ় ধারণা যেহেতু স্বর্ণর মা-কে সবাই 'ডাইনী' বলত, অতএব স্বর্ণ-ও তাই। একদিন স্বর্ণেরই মনে হয়, ব্যাপারটা সত্যি নয় তো ? সে ভয় পায়। মুখুজ্জে বাড়ীর গর্ভবতী বৌ অসুস্থ হলে বাড়ীর গিন্নী তার নামে অপবাদ দেয়। স্বর্ণর বাড়ী থেকে ফিরে টুকুর প্রবল কম্প দিয়ে জ্বর আসে, আচ্ছন্নতার মধ্যে সে স্বর্ণর নাম করে বলতে থাকে—'আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে কনে।' মুখুজ্জে বৌ মারা গেল। স্বর্ণ নিজের বিছানায় পড়ল, সর্বাঙ্গে বেদনা, মাথার মধ্যে আগুনের শিখা যেন দপদপ করছে। টুকুর জন্য বাঁশী নিয়ে তাদের বাড়ীর আড়ালে গিয়ে সে দাঁড়ায়, রেখে চলে আসে। পরের দিন দুপুরে স্বর্ণ অদৃষ্টের কথা ভাবছে, রাক্ষসী মা-কে অভিসম্পাত দিচ্ছে। টুকুর পায়ের শব্দ শুনে তাকে বুকে চেপে ধরার উন্মত্ত অধীর আবেগ জাগলেও অপবাদের কথা ভেবে আবার দরজা বন্ধ করে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। কিছু পরে দরজার ওপাশ পর্যন্ত এসে টুকুর বাঁশী বাজতে বাজতে দূরে যাচ্ছে শোনা গেল। স্বর্ণের নিখাদ বাৎসল্য ও ডাইনী-বিশ্বাস এ গল্পে মিলে মিশে এক অপূর্ব চমৎকারিত্ব অর্জন করেছে। 'ডাইনী' নামে লেখকের আর একটি গল্প আছে। এ গল্পের নায়িকা 'সোরধনি' বৃদ্ধা, রামনগরে সাহাদের আমবাগানে চল্লিশ বছর বাস করছে। পাশেই ভয়াবহ ছাতিফাটার মাঠ। লোকের বিশ্বাস—"তিন চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতিফাটার মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে।" 'সোরধনি' ও আজ নিজেকে ডাইনী বলে মনে করে, ভয় পায়। এক যুবতী তার শিশু পুত্রের জন্য ওর কাছে জল চাইতে গেলে তার লোলুপতার তীব্রতার সামনে শিশুটি ঘামতে থাকে, তার চোখ লাল হয়ে ওঠে। 'সোরধনি' চীৎকার করে ওঠে—'যা যা পালা, ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে।' রাত্রে সেখানে হাজির এক বাউরী প্রেমিকা ও তার প্রেমিককে দেখে তার নিজের পুরাতন জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। হঠাৎ সে ভাবল, ওই বাউরী ছেলেটাকে খাব। শিউরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। একদিন বাউরী ছেলেটাকে ডাকতেই সে ভয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। সোরধনি চেঁচাল—'মর, মর—তুই মর্…।' ছেলেটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল, পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাল, কিন্তু শেষে তার মৃত্যু হল। লোকে বলল, সে বান মেরেছে।' অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই

শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিযা উঠিল, ওগো তুমি ফিরে এসো গো।' প্রচণ্ড ঝড় উঠল সেদিন। পরদিন লোকে দেখল, ছাতিফাটার মাঠের ধারে খৈরী গুল্মেয় ভাঙা ডালের সুচালো ডগায় বিঁধে ঝুলছে ডাইনী। এরকম চরিত্র-সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে আব কেউ করতে পাবেন নি। চরিত্র ও পরিবেশ এ দুই গল্পে অনন্যসাধারণ পারম্পরিকতা লাভ করেছে।

৪

তারাশঙ্করেব গল্পেব আরো এক বিশিষ্ট শাখা: প্রেমেব গল্প। অনেক সমালোচকেব ধারণা যে প্রেমেব চিত্র বচনায তাঁব যথেষ্ট শক্তিমত্তাব পরিচয় পাওযা যায না। স্বযং লেখকই এক সময় জানিযেছিলেন—'আমি জানি এবং পাঠকেরাও জানেন—প্রেমের গল্প আমার বেশী নেই, প্রেমেব গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।'[১৪] কিন্তু আমাদেব মনে হয তাঁব এ ধাবণা অহেতুক। এটা ঠিকই, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বা শিক্ষিত জীবনেব প্রেম রূপাযণে তাঁব পটুত্ব একবালে ছিল না, কিন্তু সমাজেব অন্তেবাসী জীবনে প্রেমেব লীলাকে তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাকে আব যাই হোক 'আড়ষ্ট' বলা চলে না।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি' প্রেমেব গল্প। বৈষ্ণব পুলিন, মঞ্জরী ও গোপিনীকে কেন্দ্র করে স্নিগ্ধ প্রেমের চিত্র বচিত হযেছে। অল্পবুদ্ধি পুলিনেব জীবনে সুখশান্তিব কথা ভেবে তাব প্রেমিকা মঞ্জরী সবে আসতে চেযেছে, নিজ দেহ দান কবে জমিদারেব ক্রোধ থেকে পুলিনকে বাঁচিযেছে, তাব হযে জরিমানা দিযেছে, শেষে গৃহত্যাগ কবে বৃন্দাবনবাসী হযেছে। আত্মত্যাগেব এই চিত্র সত্যই সুন্দব। পূর্বে আলোচিত 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু, রাধিকা ও কিষ্টোব জীবনে যে নাটকীয় পবিবর্ত্তন ঘটে গেল তাতে প্রেমের জৈবিক আবেগেব তীব্রতাই স্পষ্ট হয়েছে। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে সাপ ও নাবীব প্রতি যে প্রেম সমর্পিত, তা বিকৃত হলেও এমন প্রেমেব গল্প সাহিত্যে দুর্লভ। প্রেমেব স্নিগ্ধতার সুন্দব পরিচয় পাই 'তমসা' গল্পে। অন্ধ ছেলে পঞ্চী ষ্টেশন এলাকায় গান গেযে, পশুপাখীব ডাক নকল কবে ভিক্ষে করে। খ্যামটা নাচের দলেব একটি মেযের গান শুনে তাব ভালো লাগে, তার মিষ্টি কথায পায স্নেহেব ছোঁযা। নাচেব দলের অনুসবণ কবে সে-ও ট্রেনে চেপে জংশন স্টেশনে যায়। অনেকদিন থেকেও তাদের দেখা মেলে না।

১৪। স্বনির্বাচিত গল্প, লেখকের ভূমিকা

একদিন এক দোকানে রেকর্ডে সেই মেয়েটির গান শুনে সে 'ঠাকরুন' বলে ছুটে গিয়েছিল। অনেক বছর পর তার চুলে সাদা ছোপ পড়েছে, দাঁত পড়েছে কয়েকটা, কানে শোনার শক্তি কমে গেছে। এক তীর্থক্ষেত্রে পঞ্চী পথের ধারে বসে ভিক্ষে করছিল মেয়েটির কাছে শেখা গানটি গেয়ে। সেদিন সেই এতদিনের খুঁজে ফেরা কণ্ঠস্বর পঞ্চী শুনতে পেল। মেয়েটির সঙ্গের পুরুষটা তাকে একটা আধুলি দিয়ে বলল, 'আধুলি, পয়সা নয় রে বেটা। হাত বুলিয়ে মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ করে মেকী কিনা পঞ্চী পরখ করে নিলে। 'তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করলে। তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল। পাখীরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হল। পঞ্চী ও উঠল।' পঞ্চীর জীবনের এই পরিবর্তন, তা প্রেমের টানে, কিন্তু প্রেমের আলোয় তার জীবনের তমসা আর কাটল না—এই বোধ পাঠক হিসাবে আমাদের বেদনার্ত করে। 'ঘাসের ফুল' গল্পে-ও কয়লা খাদের মেয়ে উজ্জ্বল চুড়কীর প্রেমের স্নিগ্ধতা ও শেষে তার অপমৃত্যু রচনায় লেখকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরকীয়া প্রেমের এই সব গল্পের সঙ্গে স্বকীয়া প্রেমের কয়েকটি গল্প বা চিত্র আমরা উপস্থিত করতে চাই। তারাশঙ্কর অবশ্য লিখেছেন—'আমার সাহিত্যে নব দম্পতীর বা তরুণ-তরুণীর রাগ অনুরাগ বিরহ-মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে।'[১৫] নব দম্পতী বা প্রেমিক প্রেমিকার রাগ অনুরাগ বিরহ মিলনের যে প্রবল ধারার অনুবর্তন সেকালের, বিশেষতঃ কল্লোলীয়দের, সাহিত্যে চলছিল তারাশঙ্কর খুব সম্ভবত সেই সব রচনার সঙ্গে নিজের রচনার তুলনা করেই একথা বলতে চেয়েছেন। মনে হয়, সাহিত্যে প্রেমচিত্রণের ব্যাপারে তাঁর মনে একধরনের cumplex কাজ করত। নইলে, কল্লোলীয়রা অনেক ক্ষেত্রেই মাটি-ছাড়া প্রেমের রূপকার, প্রেমের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে নিজেদের সামাজিক মনের অপরিণত অবস্থাকেই তাঁরা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে চল্লিশের ভিন্নতর পরিবেশে মাটীর মানুষের জীবন অঙ্কন করতে গিয়েছেন তারাশঙ্কর, প্রেম স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে তবে তা ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন পরিবেশের।

'মতিলাল' গল্পের মতিলাল সঙ সেজে পয়সা রোজগার করে। সে আর তার বৌ ভুবন দুজনেই কুৎসিত। তাদের সম্পর্ক কিন্তু কুৎসিত নয়। সন্তান নেই

১৫। কৈশোর স্মৃতি, পৃ ৯৪

এই তাদের জীবনের দুঃখ। নব দম্পতীর প্রেমের একটি উদাহরণ দিই : বিয়ের প্রথম দিনই সন্ধ্যায় সে (মতিলাল) ভুবনকে ডেকে বলে—বস, একটা জিনিস এনেছি, দেখ। তোকে কেমন সোন্দর করেদি, দেখ। একথা বলে খড়ির মত সাদা গুঁড়ো জলে গুলতে বসে। ভুবনের প্রশ্নে বলে, এগুলো যাত্রায় মুখে মাখে, কালো কুৎসিত সুন্দর হয়। এই বলে সে ভুবনকে রঙ মাখাতে বসে। তারপর তার মুখের সামনে আয়না ধরে। ভুবন আয়নায় নিবিষ্ট হয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। তারপর সহসা আয়না রেখে ভুবন বলে—আয়, তোকে মাখিয়ে দি আমি। 'তারিণী মাঝি' গল্প থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটা বউকে নদী থেকে উদ্ধার করে তারিণী। পুরস্কার চাইল 'ফাঁদিলত' একখানা আর চাদরের বদলে শাড়ি—দুটোই বউয়ের জন্য। পাওয়া টাকায় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরছে তারিণী। ঘরের দরজায় আলো জেলে দাঁড়িয়ে ছিল সুখী—তারিণীর স্ত্রী। তারিণী গান ধরল—'লো-তুন হয়েছে দেশে ফাঁদিলতের আমদানী—।' 'সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এস। ভাত কটা জুড়িয়ে কড়কড়ে হিম হয়ে গেল। হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল, আগে তোকে লত পরতে হবে। লত কই—কই, কোথা গেল শালার লত?' সুখী ভাত বাড়তে গেল। তারিণী টলতে টলতে ঘরে গিয়ে তাকে পেছন থেকে ধরে বলল, চল, এখুনি তোকে যেতে হবে। তারিণী বলে, চল তোকে পিঠে নিয়ে ঝাঁপ দোব গনুটের ঘাটে,উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে। সুখী বলল,তাই হবে, ভাত খেয়ে লাও দেকিন। তারিণীর কাপড়ের খুঁট থেকে সুখী পেল নথটি আর তিন টাকা। 'সুখী বলিল, দাঁড়াও, আয়নাটো লিয়ে আসি, লতটো পরি। তারিণী খুশী হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়নার সম্মুখে নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি, দেখি। সুখীর মুখে পুলকের আবেশ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।' নিঃসন্দেহে এগুলি দাম্পত্য প্রেমের চিত্র। এসবই প্রেমেরই গল্প বা চিত্র এবং এখানে বিন্দুমাত্র 'আড়ষ্টতা'র প্রকাশ নেই। সতর্ক সমালোচকের চোখে তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পের তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে :—ক) তারাশঙ্করে তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' প্রেমের গল্পের অভাব, তবে প্রেমানুভূতি একাধিক ভাবানুষঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। খ) তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পে তারুণ্যের রসোচ্ছলতার চেয়ে প্রৌঢ়ত্বের ভাবস্থির অনুভবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। (গ) তাঁর প্রেমের গল্পের

পরিণতি সাধাবণতঃ মিলনান্তক হয না এবং স্থলভ রোমান্সের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহই নেই।"[১৬]

৫

পশুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিযে তারাশঙ্করেব অনেকগুলো ভালো গল্প আছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', কিংবা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের পাশে সেগুলো নির্দ্বিধায় স্থান পেতে পাবে। পশুতে মানবধর্ম আরোপ, কিংবা পশুকে মানুষের ঘনিষ্ঠজন হিসাবে কল্পনা এসব গল্পের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে—'নারা ও নাগিনী' গল্পের কথা। খোঁড়া শেখ কুৎসিত দর্শন হলেও মানুষটিরও কিন্তু নবজন্ম হয়েছে। প্রভাতসূর্যেব বক্তাভাব মধ্যে সে এক তুর্লভ উদযনাগ সাপকে দেখতে পেযে ধবে আনে, নাকে 'মিনি' পবিযে দেয, বলে, 'বিশ্বেস নেই ওদের বিষদাঁতকে। নইলে ওবা তো ভালোবাসে, জোবেদা।' একথা বলে সাপের ঠোঁটে চুমা খায। তাব সামনে আযনা ধবে। শেখেব বিবি জোবেদা সাপটাকে হিংসে কবত। একদিন সাপটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সেই সাপ ফিবে এসে জোবেদাকে ছোবল দেয। জোবেদা মাবা যায। শেখ সাপকে ছেড়ে দিয়ে বলে—'শুধু তোর দোষ কি, মেযে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পাবত না।' এরপব সে ফকিবী নেয। সাপ ও জোবেদাব প্রতি সমানুভূতিব পবিবেশসৃষ্টিতে অভাবনীয সংযম ও আশ্চর্যকুশলতাব যে স্বাক্ষব এ গল্পে তাবাশঙ্কব রেখেছেন তার তুলনা নেই। নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায বালজাকের A Passion in the desert গল্পেব সঙ্গে তুলনা করে এ গল্পেব সম্মান বাড়িযেছেন সন্দেহ নেই।[১৭] এ পর্যায়ে আব একটি উল্লেখযোগ্য গল্প—'কালাপাহাড'। প্রভাত কুমারের 'আদবিনা'র সঙ্গে এ গল্পেব কিছু মিল থাকলেও তুই ভিন্ন মনোধর্মী লেখকের হাতে তুই গল্পের আবেদনসৃষ্টি ভিন্নতব হযেছে। বডচাষী বংলাল পছন্দসই গরু কিনতে চায। বাড়ীরগরুজোড়া বিক্রীব টাকা নিযে পাচুন্দির হাট থেকে ঘটনাচক্রে সে কিনে ফেলে তুটো অতিকায মহিষ, কালাপাহাড ও কুম্ভকর্ণ। বোজ তাদের নদীব ধাবে চরাতে নিযে যায, দূবে চলে গেলে অবিকল মহিষেব ডাক ডেকে ফিবিযে আনে। তুজনার ঝগডা হলে, তাদের আলাদাভাবে স্নান করিয়ে পেট ভরিয়ে খাইয়ে তবে

১৬। গল্পপঞ্চাশৎ : ভূমিকা, রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ২৬

১৭। বাংলা গল্প বিচিত্রা, পৃ. ১২৩

একসঙ্গে মিলতে দেয়, উপদেশ দেয়—'ছিঃ, ঝগড়া করতে নেই। একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবি—তবে তো'। একদিন বাঘ পড়ল তাদের ওপর। কুম্ভকর্ণ বাঘটাকে গিঁথে ফেলেও মারা গেল। রংলাল বালকের মতো কাঁদতে লাগল। এখন, কালাপাহাড়কে সামলানো বিপদ। সে রংলালের কোলে মুখ তুলে দেয়, রংলাল পরমস্নেহে দেয় তার মাথা চুলকে। তার দুর্দান্তপনায় অস্থির হয়ে রংলাল এক পাইকারের কাছে একে বিক্রী করলেও ফিরে আসে। শেষে এক জমিদারের পাইকার তাকে কিনল, কিন্তু পাইকারের হাত থেকে গলার দড়ি ছিনিয়ে নিয়ে কালাপাহাড় শহরের রাস্তায় ছুটতে থাকে আর রংলালকে ডাকে—আঁ-আঁ-আঁ। শান্তিভঙ্গের কারণে পুলিশসাহেব একে গুলি করে মারলেন।

'সাহেব রিভলবারটা খাপে ভরিয়া সঙ্গের কনস্টেবলকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন—'ডোম লোককো বোলাও।' অনভ্যস্ত পরিবেশে এই অতিকায় অথচ অসহায় প্রাণীর মৃত্যু আমাদের বেদনার্ত করে।

৬

তারাশঙ্করের গল্পে বাৎসল্যরসের উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো। বাৎসল্যের আকুতি কিংবা অপ্রাপ্তিতে অবরুদ্ধবেদনা অথবা সকরুণ স্নিগ্ধতা একাধিক গল্পে সুন্দর শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'স্থলপদ্ম' গল্পে 'ছোট লোক দল'-এর মেয়ে 'বেলে'র ছেলে জন্মের পরই মারা যায়। ওর স্বামী 'হারা' ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল চাকরী খুঁজতে। পাঁচমাস পর হারা বাড়ী ফিরছে, পিঠে বোঁচকা, হাতে রঙিন কাগজের বাক্স। তার মন আর মানছিল না। কতদিন পর সে বেলেকে দেখবে, আর দেখবে—একটা কচিমুখ। শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কথার গুঞ্জন কানে এল: 'ওরে আমার ধন ছেলে, এই পথে বসে কাঁদছিলে।' এক অদম্য কৌতূহলে সে শ্মশানের ভেতর গিয়ে দেখে এক ছিন্নবস্ত্র রুক্ষকেশ শীর্ণকঙ্কাল মেয়ে ঠিক যেন সদ্যমরা এক ছেলেকে আদর করছে, অজস্র চুম্বন করছে, অভিষেক আর গান গাইছে। 'তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গেল, হাত হইতে কাগজের বাক্সটা পড়িয়া ডালা খুলিয়া গড়াইয়া পড়িল—রঙিন ছিটের• কয়টা ছোট জামা, জরির টুপি, ঝুমঝুমি, কয়গাছা রূপার চুড়ি, কোমরের বিছে, অমনি আরও কি কি। হারা উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, বেলে, বেলে।' পিতৃমাতৃহৃদয়ের হাহাকার এ গল্পে মুখর হয়ে উঠেছে। 'সন্ধ্যামণি' গল্পেও মৃতসন্তানের জন্য বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটের পাশে বামুন মেয়ে কুসুমের ঘর, মাতৃর

বোনে। স্বামী কেনারাম চাটুজ্জে বাউণ্ডুলে। তিন বছরের মেয়ে সন্ধ্যামণি মারা যাবার পর সে এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়। একদিন রাত্রে কেনারাম এল। কিন্তু কুসুমের সঙ্গে দেখা না করেই শ্মশানের কুকুরছানাটাকে কোলে নিয়ে শ্মশানে চলে গেল। শ্মশানপ্রহরী পৈরু খেতে বসলে কেনারাম শ্মশানচুল্লী তদারক করতে যায়, হরিশ্চন্দ্র পালা আওড়ায়। চিতার আলোয় পৈরু দেখে, চাটুজ্জের চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। অপ্রস্তুত চাটুজ্জে বলে : 'মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হলেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়। মা-মণির, আমার সন্ধ্যামণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জ্বলজ্বল করে ভাসে।' তারপর আবার কথা আবোল তাবোল হয়ে যায়। চাটুজ্জে ঘুরে এসে বলে : 'কুসুম কাঁদছে। আমি শুনে এলাম চুপি চুপি গিয়ে।' সকালবেলা চাটুজ্জে ঘরের দাওয়ায় এল। শ্মশানে রাত কাটিয়েছে বলে স্নান না করে ঘরে ঢুকতে চায় না।

'হাসিয়া কুসুম কহিল—তা হোক। চাটুজ্জে বলিল—সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে—খুকু গাছ পুঁতেছিল। দোকানে দোকানে তখন হাঁক উঠিয়াছে—

—তুফানী বিড়ি, মিঠা পান—

—গঙ্গাফল নিয়ে যান মা।

—পুতুল মা, পুতুল।

কুসুম সজল চক্ষে প্রত্যাশার হাসি হাসিয়া বলিল—সে আবার আসবে।'

ব্যর্থ প্রতীক্ষাকাতর পিতামাতার অবরুদ্ধ হৃদয়বেদনাকে তারাশঙ্কর শ্মশানের পটভূমিতে বিস্ময়করভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের বাড়তি কৃতিত্ব হল—এই গল্প তাঁর কন্যা বুলুর মৃত্যুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত শোক এখানে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—মেয়ের মৃত্যুর পর তিনি কেনারামের মতই উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, শ্মশানে বসে থাকতেন। তারপর "কলকাতায় এসে এই গল্পটি লিখতে বসে আমার কন্যাশোকার্ত অন্তরের বেদনা ফুটে উঠলো লেখাটির মধ্যে।" সজনীকান্ত সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম সংখ্যাতেই গল্পটি ছাপা হয়। 'সাহিত্যজীবনের নূতনযাত্রা—তার সূচনা হোল গল্পটি থেকে। আমার প্রিয় গল্পের গল্পগুলির মধ্যে স্মৃতিতে ইতিহাসের দিক থেকে সেই কারণে 'সন্ধ্যামণি' আমার সবচেয়ে প্রিয় গল্প।'[১৮] 'বাবুরামের বাবুয়া' গল্পে সন্তান বাৎসল্যের চেহারা যথেষ্ট অস্বাভাবিক কিন্তু সুন্দর জমাদার বাবুরাম বলে :

১৮। প্রিয়গল্প, ভূমিকা

"ছেলেপুলে হল না, খাঁ খাঁ করে চারিদিক, মন আপনি উদাস হয়, তা কি করব আমি ?" একদিন হাসপাতালের ডাক্তারের কাছ থেকে একটা ছেলেকে পেয়ে ওর মন ভালো হয়ে গেল। ছেলেটার তিনচার বছর বয়সের সময় তার বাবা জোর করে তাকে নিয়ে গেল। মনে আঘাত পেয়ে বাবুরাম চলে এল বর্ধমান। সেখানে একটি ছেলেকে মানুষ করল, কিন্তু সে-ও একটু বড় হয়ে টাকাকড়ি চুরি করে পালাল। আবার ক্ষেপামি এল বাবুরামের। দুবছর পর গল্পের বক্তা গ্রামে গিয়ে দেখল সে আবার ক্ষেপে গেছে। কারণ, এবারের ছেলেটাকেও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাসখানেক পর বাবুরামের বৌ সুখীয়ার কোলে তোয়ালে জড়ানো একটি শিশু। এই যে বাৎসল্যের আবর্তসৃষ্টি, আবার মোহভঙ্গ, ক্ষেপে যাওয়া—এই পৌনঃপুনিকতার থেকে বুঝি তাদের আর মুক্তি নেই। পেয়ে হারানোর এই বেদনা বড়ই মর্মান্তিক। 'মতিলাল' গল্পে-ও এই বাৎসল্যের বেদনা বড়ই মর্মান্তিক, অথচ তার শিল্পসম্মত রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। কুৎসিত দর্শন মতিলাল ও তার বৌ ভুবন নিঃসন্তান। অন্যের ছেলে খুব ভালবাসে। মতিলাল জন্তু-জানোয়ার সেজে বাচ্চাদের মজা দেখায়। বাবুদের ফুটফুটে ছেলে পার্বতী তার বাড়ীতে এলে সে বলে : "প্যারা খাবে এস খোকাবাবু। যাবার সময় আমি হাতি সেজে পিঠে করে দিয়ে আসব তোমাকে···।" তাকে পেয়ারা পেড়ে দেয়, ভালুক সেজে দেখায়। ঝাঁটাবুড়ি সেজে সবাইকে ভয় দেখিয়ে মতিলাল দুটাকা বখশিস পেল। এদিকে ভয়ে পার্বতী অজ্ঞান হয়ে গেছে। পেয়ারা নিয়ে মতিলাল সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে ছুটল। কিন্তু সমবেদনার বদলে "দরজা খুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের মাথায় পড়িল এক লাঠি। লাঠি মারিয়া মুখুজ্জে বলিল, বেরো শালা বেরো।" ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের হুকুমে তার গ্রামে ঢোকা বারণ হয়ে গেল। শিশুপ্রিয় মতিলালের কাছে এ আদেশ মর্মান্তিক। আঘাতের তীব্রতায় সে এই কথা ভেবে শঙ্কিত হল যে, তাদের কুৎসিত ছেলে হলে, সে-ও এইরকম দুঃখ ভোগ করবে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বাড়ীতে এল। 'ভুবন চকিত হইয়া বলিল, ও কি, মাদুলি ধরে টানছিস কেনে, ওই ? পট করিয়া মাদুলির সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদেরই মত কুচ্ছিৎ হবে তো ভোবন। কাজ নাই।" এই নাট্যগর্ভ সমাপ্তির সংহতিতে মতিলালের বাৎসল্যের চাপা বেদনা সুন্দর ফুটে উঠেছে।

॥ চ ॥

তারাশঙ্করের গল্পে অধ্যাত্ম চেতনার একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা আছে। তারাশঙ্কর আজন্ম অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যে লালিত। "মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর তত্ত্ব সন্ধানের আকুতি থেকে আমি পেয়েছিলাম আমার পথ"[১৯]—একথা লেখক বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, জীবনের বিভিন্ন পর্বে তিনি ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা নেবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। বাড়ীতে অন্যান্য পূজা এবং পিতার প্রতিষ্ঠিত তারা মন্দিরের পূজা, পুরোহিত নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁর অবিচলিত সক্রিয়তা ছিল। প্রবোধ সান্যাল লিখেছেন—"তাঁর সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে ও পূর্ববঙ্গে আমি ভ্রমণ করেছি, কিন্তু সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন লক্ষ্য করতুম তিনি জপ ও আহ্নিকের আসনে বসতে ভুল করেন নি।"[২০] তাঁর পুত্রের লেখায় জানতে পারি, শেষ পর্যন্ত তিনি মায়ের কাছেই দীক্ষা নেন, সকালে উঠেই পূজোয় বসতেন, ইষ্টমন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতার নাম লিখে দিন শুরু করতেন।[২১] রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা লেখকদের মধ্যে যেখানে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ শুরু হয়েছিল, সেখানে তারাশঙ্করের এই সুদৃঢ় অধ্যাত্মনিষ্ঠা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম।

তাঁর প্রথম জীবনের 'শ্মশানঘাট' এবং 'বৈষ্ণবের আখড়া' গল্পের মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার বীজ ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একথা বলেছেন।[২২] এ প্রসঙ্গে প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি'র নামোল্লেখও করা চলে।

অধ্যাত্মচিন্তা মানুষের মনকে নির্দ্বন্দ্ব করার দুরন্ত সাধনায় নামে, এই চিন্তার জয়ের পরিণাম—জীবন ও জগৎ ব্যাপারে এক উদাসীন প্রশান্তি। তারাশঙ্করের অনেক গল্পে এই প্রশান্তি এক ধরনের দার্শনিকতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই পর্যায়ের গল্পে প্রথমেই মনে পড়ে 'ইমারত' গল্পের কথা। বিখ্যাত রাজমিস্ত্রী জনার শেখ বহু অট্টালিকা নির্মাণ করে, কিন্তু তার জীবনে স্থায়ী ঘর বাঁধার স্বপ্ন কোনো দিনই সফল হয়নি, বারে বারে বিবিরা পালিয়েছে। আর সে পেয়েছে কুৎসিত রোগ। শেষ দশায় জনার দুরারোগ্য ব্যাধি ও একটি সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে নিজের অঞ্চলে ফিরে এল। কিন্তু তার ঘর বাকী খাজনার দায়ে কিনে নিয়েছে রসিদ আলির বাপ। জনার দুদিন রইল আবদুলের দাওয়ায়। কিন্তু মেয়েটাও

১৯। আমার কালের কথা, পৃ ৯১
২০। তারাশঙ্কর বিচিত্রা, পৃ ৫২
২১। ভূমিকা, তারাশঙ্কর গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড
২২। বাংলা গল্প বিচিত্রা, পৃ ১৩৭

চলে গেল রসিদের বাড়ি। সে তাকে কলমা পড়িয়ে নিকা করবে। জনাব বটতলায় চালাঘর বানিয়ে থাকে, আর তাকায় এধার ওধার। এ অঞ্চলের সব বড় বাড়ীর নির্মাণের সঙ্গে যে তার পরিশ্রম জড়িয়ে আছে। সেখানে সোনার বরণ বৌঝিরা; বৈঠকখানার বাবুরা, বারান্দায় বাচ্চারা নিশ্চিন্তে আছে। জনাব জানে, ওদের কোনো ভয় নেই, বৃষ্টি নেমে এলেও এক ফোঁটা গলে পড়বে না। সে বলে—'আনন্দ রহো, আরাম করো।' জীবন সম্পর্কে এই দুর্লভ প্রশান্তদৃষ্টির অধিকারী হয়ে সে দুনিয়ার সব দুঃখ ভুলে যায়।

ঝপঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছটার পাতায় পাতায় ঢাকা গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।"

এই গল্পের আলোচনা করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা' তাৎপর্যপূর্ণ: "তারাশঙ্করের ছোটগল্পে এই যে আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি—এই যে গ্লানিহীন, ক্ষোভহীন এক উদার শান্তি বিকীর্ণ হচ্ছে—তার ধারা আজ পর্যন্ত চলেছে।—গান্ধীবাদের আদর্শের মধ্যেও অনিবার্য পরিণাম আছে—তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিন্তাধারাও সেইজন্য অধ্যাত্মমূলক এক উদার মানবতার সন্ধান পেয়েছে।"[২৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের স্পষ্ট সমর্থন মিলবে 'শেষকথা' গল্পে।

ভবতপুর আর ধর্মপুরের মধ্যেকার বিরোধে চাষীরা অতিষ্ঠ। ভবতপুরের চাষীদের নেতা বুড়া লালমোহন পাণ্ডে। সে ফৌজদারীর পরামর্শ দেয় না, বলে—"লড়াবে ভাই। মনকে শুধাই। মন শুধাক ভগবানকে। তবে তো।" শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত: বিপক্ষদলের আক্রমণের সামনে তারা বুক পেতে দেবে। তাদের রক্তে মাটি লাল হলে তখন শত্রুদের আক্কেল হবে, "ভগবান জ্ঞান দিবে।" ইতিমধ্যে সাউবাবুদের নায়েব বুড়ো বুড়িকে আটক করলেও বুড়ো নির্বিকার। বুড়ির মনে হয় বুড়ো "তার দিকে চেয়ে নাই, চেয়ে আছে ওই—কোন দিক দিগন্তরে, অনেক দূরে সেই পাহাড়ের মাথায় আছে যে, ঠাকুরের মন্দির, সেই মন্দিরের চূড়ার দিকে।" বুড়ির মৃত্যুর সময় উপস্থিত। "সে বললে, বুড়া। চোখে

২৩। বাংলা গল্প বিচিত্রা, পৃ, ১৩৯

জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ি, কি বুলছ, বল ?

—মরণ, ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়ল, ঝরে পড়ল বুড়ির কপালের ওপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ি বললে, না থাক।"

অধ্যাত্মচিন্তা, গান্ধীবাদ ও মৃত্যুচেতনা এ গল্পে মিলেমিশে গিয়েছে। সেদিক থেকে তারাশঙ্করের ছোট গল্প ধারায় এ গল্পের তাৎপর্য অনেক।

॥ ছ ॥

বিখ্যাত সমালোচক Georg Lukac's লিখেছেন—"...it is the evolution of society that determines the line the evolution of an author will take"[২৪] একথায় মতভেদের অবকাশ নেই। এই নিরিখেই তারাশঙ্করের জীবনাগ্রহের মূল্যায়ন করতে হবে। ইতিহাসের দিকে একবার তাকানো যাক। ১৯২১-এ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের একটি পর্ব সমাপ্ত হয়। তার সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণ ও সংকটের তীব্রতা দেখা দেয়। এর ফল, সমাজজীবনের সর্বস্তরে ব্যাপক হতাশার সঞ্চার। কল্লোল-পর্বের সাহিত্যে যে সর্বাত্মক হতাশা ও নৈরাজ্যের চেহারা দেখতে পাওয়া যায় তার উৎস এইখানে। ১৯২৫-২৮ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নতুন পর্যায় শুরু হয়। কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের গ্রাসে পড়ে। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের আবির্ভাবে কংগ্রেস কর্তৃক বয়কট ঘোষণা, সারা ভারতব্যাপী হরতাল, ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে ৫০,০০০ শ্রমিকের মিছিল, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়। এই তরঙ্গসংকুল পরিস্থিতিতে চতুর কংগ্রেস নেতৃত্ব পুনরায় অহিংস আন্দোলনের ডাক দিলেন। ১৯৩০, ১২ই মার্চ গান্ধীজী গুজরাটে লবণ আইনকে উপলক্ষ খাড়া করে আইন অমান্য আন্দোলনের নতুন পর্যায় শুরু করলেন। এই আন্দোলনের কার্যসূচীতে বিদেশী জিনিস বয়কট, মদের দোকানের সামনে পিকেটিং, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি-ও থাকল। এই পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে দেখা দিচ্ছিল সর্বস্তরেই উন্মাদনা ও আশাবাদিতা। এই পটভূমিতেই তারাশঙ্করের আবির্ভাব। তিনি নিজে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন

২৪। Studies in European Realism, পৃ ১১ ১২.

বলে এর ভালো ও মন্দ ফল দুইই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অসহযোগ আন্দোলনে বাস্তববিচারবুদ্ধি ছিল না। ও সবকিছুর নিয়ামক যে দেশের ব্যাপক জনসাধারণ এই চেতনার প্রবেশাধিকার ছিল না, সেখানে বোধি (Intuition), ভাবাবেগ (emotion) এবং আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য ছিল। এ ত্রুটির শিকার হয়েছেন তারাশঙ্কর। অন্যদিকে, নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয় স্বদেশদর্শনের আগ্রহ। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথের মা শিবনাথকে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের দিক নির্দেশ করেছিল এইভাবে : 'দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে।' তারাশঙ্করের মধ্যে এই প্রেরণা কাজ করেছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-পরিবেশ ছিল এক্ষেত্রে অনুকূল। নিজেদের ছিল ছোট জমিদারী, চারপাশে আরো অনেক ছোট ছোট জমিদার—তাদের ঐতিহ্য ও ভগ্নদশা তিনি কাছের থেকে দেখেছেন। তাঁর শ্বশুরকুল ছিল জমিদার বংশ কিন্তু পরে ব্যবসায়ী। লাভপুরে এ ধরনের মিশ্র পরিবার অনেক তৈরী হচ্ছিল। এ ছাড়া ইউনিয়নবোর্ডের কাজে, মহামারীতে সেবার এবং কংগ্রেসের প্রচারের কাজে তিনি তার অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত ও গভীর করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারাশঙ্কর তার দেখা মানুষ ও পরিবেশকে প্রায় সরাসরি সাহিত্যে রূপ দিতে চাইতেন। এ তাঁর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র সুচাদ, 'কবি'র বণিক মাতুলের চায়ের দোকান, নিতাই, সতীশ, রাজা, ঠাকুরঝি লেখকের নিজের চোখে দেখা।[২৫] 'ডাইনী' গল্পের স্বর্ণডাইনী, সুন্দীপুরের বটতলার উল্লেখ 'ডাকহরকরা' ও 'হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা' গল্পে, 'তামস তপস্যা' উপন্যাসে আছে। 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পের কাহিনীটি গল্পে বর্ণিত বাদশাহী সড়কের ওপর বসে লেখক নিজেই শুনেছেন, নিজগ্রামের শশাঙ্কবাবুর কথা এসেছে 'চন্দ্রজমাইয়ের জীবন কথা' গল্পে, 'বেদেনী' গল্পের রাধিকা বেদেনী, 'যাদুকরী' গল্পের যাদুকরী দল, 'কামধেনু' গল্পের গরুমারা—এরা লেখকের দেখা চরিত্র।[২৬] নিজগ্রামের শশীডোমের প্রসঙ্গ এসেছে 'চোর', 'বোবাকান্না', 'চোরের মা' 'যাদুকরী' গল্পে, নিজমেয়ে বুলুর কথা পরোক্ষে এসেছে 'সন্ধ্যামণি' গল্পে।[২৭] এছাড়া আরো অনেক চরিত্র ছোটখাট বর্ণনা, বাগভঙ্গী, গান ইত্যাদি যে পরিপার্শ্ব থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন তা লেখকের স্মৃতি-

---

২৫। আমার সাহিত্যজীবন-১ম খণ্ড ২৬। আমার কালের কথা,

২৭। আমার সাহিত্য জীবন-২য়

কথাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে গল্প উপন্যাসগুলি পাঠ করলেই সহজে বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বলেছেন—'আমার কাছে মনে রাখবার মত মানুষ যারা তারা আমার লেখার মধ্যে অবশ্যই রূপ নিয়েছে।' আর একার্যে তাঁর সফলতা সত্যই যথেষ্ট বিস্ময়কর।

এখন বিচার করতে হবে, অভিজ্ঞতার এই রূপায়ণ কি 'স্থির' চিত্র রচনাতেই সমাপ্ত হয়েছে, না কি তা জীবনের 'গতিময় বাস্তবতা'কে ধরতে সমর্থ হয়েছে। কারণ, বাস্তববাদী লেখক তাঁর সাহিত্যে বর্ণিত সমাজকে সবসময়ই 'living and moving centre' রূপে দেখে থাকেন। সেক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে ঘটনা এবং ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তি এবং ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে সমাজের প্রবহমান জীবন কার্যকারণ সূত্রে পরস্পর অন্বিত থাকে। সুতরাং সাহিত্যে সমাজবাস্তবতা রচনা শুধু সমাজকে দেখার আগ্রহ থেকেই সম্ভব হয় না, তার জন্য দরকার বাস্তব পরিস্থিতির ধারাকে তার সমগ্রতায় দেখার আগ্রহ এবং লেখকের যুক্তিবুদ্ধি। এ প্রসঙ্গে বালজাক ও টলস্টয়ের সাহিত্যে বাস্তবতার কথা আমাদের মনে পড়া উচিত। বালজাক ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। [illegible] শ্রেণীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও বেদনা ছিল প্রকাশ্য। কিন্তু তিনি [illegible] পতনের অবশ্যম্ভাবিতা যেমন দেখতে পেয়েছেন তেমনি আগামী কালের প্রজা শ্রী ও নিম্নশ্রেণীগুলির অনিবার্য উত্থানে। [illegible]—নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জীবনের দাবী মেটাতে গিয়ে। এই ব্যাপারটিকেই এঙ্গেলস 'বাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জয় এবং বালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন।[২৯]

টলস্টয় খৃষ্টীয় আবেশগ্রস্ত এক উদ্‌ভ্রান্ত জমিদার, যিনি ধর্ম ও অহিংসা প্রচারে ছিলেন আগ্রহী। তাকে লেনিন 'মহানশিল্পী' আখ্যা দিয়েছিলেন তার কারণ টলস্টয় তাঁর সমস্ত অপগুণ সত্ত্বেও 'রুশ জীবনের অনবদ্য আলেখ্য অংকন' করেছেন, 'সামাজিক মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে ঋজু, বলিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রতিবাদ' জানিয়েছেন, 'শোষণের নির্মম সমালোচনা, সরকারী হিংস্রতা বিচার প্রহসন ও শাসনব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন ও শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অধোগতির চিত্র রচনা করেছেন। যার ফলে তার সাহিত্য রুশ বিপ্লবী অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনো কোনো দিক দিয়ে 'দর্পণে'র কাজ করেছে।'[৩০]

২৮। সহযাত্রী, পরিশিষ্ট
২৯। মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠি, এপ্রিল, ১৮৮৮,
৩০। লেনিনের টলস্টয়সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য

তারাশঙ্করের সাহিত্য আলোচনায় বালজাক ও টলস্টয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ আছে। তুলনা একেবারেই চলে না, তবু এই তিনজনই জীবনাগ্রহী লেখক, কল্পলোক বিহারী নন। চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে উপন্যাসে এই দিক দিয়ে নূতন সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। বালজাক এবং টলস্টয়ের মত তারাশঙ্করও বিলীয়মান কালের পক্ষ নিয়েছেন। তবে, বালজাক রাজতন্ত্রী ফ্রান্সের পরাজয় এঁকেছেন, পরাজয়ের অনিবার্যতার দিকটাও বিশ্লেষণ করেছেন। ১৭৮৯ থেকে ১৮৪৮ সালের ফরাসী সমাজের চিত্র আঁকতে গিয়ে He repeatedly demonstrates not only the inevitability of the French revolution, but also the inevitability of the general Capitalist transformation of France as a result of that revolution.”[৩১] টলস্টয় পুরাতন কালের সমর্থক হয়েও ১৮৬ --১৯০৪ কালের রুশ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই সব রচনায় প্রকাশিত হয়েছে ‘জমে ওঠা ক্রোধ, উন্নততর জীবনের জন্য পরিণত প্রচেষ্টা, অতীতের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা’ আর ‘জনতার বিপ্লবী সংগ্রামের অপরিণত কল্পনা এবং সংগ্রামে প্রবৃত্তির অভাব, এ দুয়ের ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক শর্তাবলী’।[৩২] এইভাবে পুরাতন কালের সমর্থক হয়েও এই দুজনের রচনায় তাই এসেছে ‘ruthlessness towards their own subjective world picture’ অপরপক্ষে, তারাশঙ্কর পুরাতন কালের চিত্র রচনায় বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিলেও তা ‘স্থিরচিত্র’ মাত্র, সেখানে প্রবহমান সমাজজীবনের সমগ্রতা তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়নি। পুরাতন কালের পতন আঁকতে গিয়ে সে পতনের জন্য তার বেদনা প্রকাশ্য, কিন্তু সেই পতনের ‘অনিবার্যতার’ কথা তিনি রাখতে নারাজ, অতীতের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তার একেবারেই নেই ফলে নতুনকালের অভ্যুদয়ে তার আগ্রহ প্রায় নেতির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। পূর্বে উল্লিখিত ‘পিতা ও পুত্র’ গল্পে নূতন ও পুরাতন কালের বিরোধের কথা আছে। কিন্তু তার সামাজিক উপস্থাপনা যথেষ্ট নয়। এ গল্পে নূতন কালের প্রতিনিধি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত উদারচেতা শশিশেখরকে আত্মহত্যা করিয়ে নূতনকালের দাবীকে স্পষ্টতঃ উপেক্ষা করা হয়েছে। তারাশঙ্কর বলেছেন—“শিবশেখরেশ্বরের মধ্যে আবির্ভাব করলাম এ দেশের সমাজ

৩১। Studies in European Realism, G. Lukacs, পৃ ৩৬

৩২। লেনিনের তলস্তয়সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী

ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে।" কিন্তু শিবশেখরকে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ বলা মানে বাংলাদেশের ইতিহাসেরই অবমাননা করা। তারাশঙ্কর আরো যা বলেছেন তা হলো, "বিংশ শতাব্দীর ভাববিপ্লবেও এ দেশের নেতৃত্ব করেছে ব্রাহ্মণ" এবং তা অব্যাহত থাকবেই, একাবণে এই ন্যাযবত্ন চবিত্র তাঁব "বহু বৃহৎ বচনাব কেন্দ্রে প্রায় প্রাণশক্তির মত আবির্ভূত হয়েছে।"[৩৩] পুবাতনপন্থী এবং জীবনেব স্বাভাবিক অগ্রগতিব প্রাণপণ বিবোধী শিবশেখব সম্পর্কে লেখকেব এই মনোভাব তাঁব পুরাতন কালকে প্রাণপণ আকডে ধবাব কথাই স্পষ্ট করে তোলে। বস্তুতঃ তারাশঙ্কবেব গল্প ধাবায নতুনকালের সম্ভাবনামষ মানুষের পদসঞ্চার একেবারেই বিবল, কিন্তু যাব একাধিক উদাহবণ বালজাক ও টলষ্টযেব বচনায আমরা দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে 'শেষকথা' গল্পেব কথা উঠবে। এ গল্পে ভবতপুবের বিদ্রোহী চাষীদেব মোডল লালমোহন পাণ্ডে যখন অহিংস সত্যাগ্রহেব পথ নেবাব ঘোষণা কবে, তখনও তাতে সমকালীন বাস্তবতাব বেদনাদাযক প্রকাশটুকু ছিল, কিন্তু গল্পেব উপসংহাবে লালমোহন যখন বলে, 'মবণ বড সুন্দব' তখন বাস্তবতাব দাবীটা অপমানিত হয়। অথচ তাবাশঙ্কব তাঁব স্মৃতিকথায বীবভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহের উল্লেখ কবেছেন[৩৪], 'কালিন্দী' ও 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে তাব কিছুটা প্রকাশ আছে। কিন্তু তাবাশঙ্কবেব গল্প ধাবায কৃষক-বিদ্রোহেব চিত্র নেই, সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী, বিদেশী শাসন-বিবোধী কোনো কথা নেই, একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক চবিত্র নেই যে পুবাতন কালেব সঙ্গে সংঘাতে নূতন কালেব দাবীব সপক্ষে লডাই কবছে। অন্যত্র তাবাশঙ্কব বলেছেন—পুবাতন কালের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলন সব জেনেও—"সেকালকে আমি শ্রদ্ধা কবি, প্রণাম কবি, তাব মহিমাব কাছে আমি নতমস্তক।"[৩৫] বালজাক বা টলষ্টয দুজনেবই বিলীযমান কালেব প্রতি 'শ্রদ্ধা' কম ছিল না, কিন্তু তাঁবা সেকালেব মহিমাব কাছে 'নতমস্তক' হননি, আপন প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়েই পুবাতন কালেব পতনেব অনিবার্যতা এবং নবজীবনের অভ্যুদযেব কথা বলেছেন, এমনকি চাষী, মজুবেব মুখে বিক্ষোভকে ভাষা দিয়েছেন। নেপোলিযনেব কালেব সমাজ-বাস্তবতা বচনায বালজাকেব অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য কবে লুকাচ তাকে 'creative historian' আখ্যা দেন আব এঙ্গেলস বলেন—বালজাকের রচনায বর্ণিত ফবাসী সমাজচিত্র থেকে এমনকি 'খুঁটিনাটি অর্থনৈতিক

৩৩। ভূমিকা, প্রিয়গল্প ৩৪। কৈশোর স্মৃতি, পৃ ৭৮
৩৫। আমার কালের কথা, পৃ ২১৮

তথ্য সম্পর্কে (যেমন, ফরাসী বিপ্লবের পর বাস্তব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনর্বণ্টন) এ সময়ের সকল পেশাদারী ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক-এর লেখার চেয়ে অনেক বেশি তিনি জানতে পেরেছেন।[৩৬] অন্যদিকে, বিস্তৃত অভিজ্ঞতার অধিকারী হলেও তারাশঙ্করকে Creative historian আখ্যা দেওয়া যায় না। জীবনদৃষ্টির ক্রমান্বয় অধোগতিই এর কারণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্করের গল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—'তারাশঙ্কর মুখ্যত জনসাধারণের শিল্পী। এই জনসাধারণ আবার নীচের তলার মানুষ।"[৩৭] রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—'সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে।'[৩৮] কিন্তু এই মন্তব্য দুটি কতদূর সত্যি? জনজীবনের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা সত্যি সত্যি কতখানি ছিল? তাঁর ব্যক্তিজীবনের দিকে তাকালে দেখি, ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন তাঁকে বিচলিত করে। তিনি সাহিত্যসেবার সঙ্গে সমাজসেবক সমিতি প্রতিষ্ঠা, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ, আগুন নেভানো, সাপে কামড়ানো, কলেরায় সেবা ইত্যাদির সঙ্গে ক্ষুদ্র জমিদারীটিও পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের স্থানীয় নেতৃত্ব করে জেলে যান। জেলখানায় 'রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষের চেহারা,' তাদের মিথ্যাচারণ, আত্মকলহের কুটিল কদর্যতা দেখে তিনি ঠিক করেন—'যদি পারি তবে রাজনীতি থেকে ভিন্ন পথে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করব'। একথা বললেও কংগ্রেসী রাজনীতির মোহ তিনি কোনকালেই ছাড়তে পারেননি।[৩৯] ১৯৪৩ নাগাদ ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘ বা প্রগতিলেখক সংঘের বিভিন্ন শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও ১৯৪৫ সাল থেকে ঘোষণা করে মার্কসবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। অথচ তারাশঙ্কর কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বারংবার গর্বভরে বলেছেন। 'দেশের স্বাধীনতার পর কোন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও মনে মনে আমি গান্ধীবাদের ও কংগ্রেস আদর্শেরই অনুগামী ছিলাম। ১৯৫১-৫২ সনের ইলেকশনে আমি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছি।[৪০]

৩৬। মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা পত্র, এপ্রিল ১৮৮৮

৩৭। বাংলা গল্প বিচিত্রা, পৃ. ১২২. ৩৮। গল্পপঞ্চাশৎ, ভূমিকা—পৃ পাঁচ

এ তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। কংগ্রেসী রাজনৈতিক দর্শনে, সমাজ বিশ্লেষণে ও রাজনৈতিক পন্থানির্ধারণে বারেবারে কার্যকারণতত্ত্ব, বাস্তববোধ ও ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। এই দর্শনের প্রবক্তারা এর সঙ্গে অধ্যাত্মচিন্তাকে সংমিশ্রিত করে একে জনসাধারণের অনুপযুক্ত করে তুলেছেন। কংগ্রেসী তারাশঙ্কর-ও ধীরে ধীরে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সাহিত্য থেকে বিসর্জন দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্মচিন্তায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি হল: 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫২) রচনার পূর্বে বাঁদী পাঁচথুপীতে গান্ধীমেলায় গিয়ে অধ্যাত্মদর্শন হয়ে তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়, তখন "এতকালের জগতের সকল স্বাদ আমার রুচিবহির্ভূত মনে হল।"[৪১] অর্থাৎ বাস্তবতার দাবী উপেক্ষিত হল। ওঁর জীবনের এই সব তথ্য বিচার করে তাঁকে কি 'মুখ্যত জনসাধারণের শিল্পী' বলা যাবে? ম্যাক্সিম গোর্কী যে 'জনসাধারণের শিল্পী' এ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ নেই। কিন্তু কেন? এ সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত সমালোচক বলছেন—"He showed not only the growth of the revolutionary movement among the industrial workers and peasants, but devoted much attention to the portrayal of the bourgeoisie the petty bourgeoisie, the intelligentsia, demonstrating in detail why long before the revolution they could not live in the old way any more and how the insoluble conflicts without such a revolution is impossible, come about in the lives of the 'top dogs'"[৪২] এইসব শর্ত তারাশঙ্করের সাহিত্যে আদৌ পালিত হয়নি। তারাশঙ্করের রচনায় সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় যুক্ত নিপীড়িত গ্রামের মানুষ থাকলেও তাদের সমস্যা, তার ঐতিহাসিক বিচার সঠিকভাবে নেই, কোনো সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ-বিরোধী বক্তব্য নেই। বাংলা দেশবাসীদের মধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে নতুন করে জীবনাগ্রহের প্রেরণা সঞ্চারের যে দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়েছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য সে দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারলেন না। কাল, পরিবেশ ও মানসিকতার প্রতিকূলতায় গ্রামবাংলার রূপকার হিসাবে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ

৪১। ঐ. পৃ ৪৪৫

৪২। Studies in European Realism—Lukac's, পৃ. ২০৬

এমনকি মানিকবাবু কেউই ততটা সম্ভাবনার পরিচয় রাখেননি, যতটা সম্ভাবনা ছিল তারাশঙ্করের মধ্যে। সন্ত্রাসবাদী নেতা যাদুগোপাল মুখার্জী গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম পড়ে বলেছিলেন—"বিপ্লবের গোড়াটা নির্ভুল ধরেছ তুমি—নির্ভুল"[৪৩] কথাটি ভাববার মতো। বিপ্লবময় বাংলা গ্রামীণ সমাজের চৈতালী ঘূর্ণি সঠিক রূপায়ণের সম্ভাবনা নিয়ে যিনি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি যে গন্নাবেগম বা মঞ্জরী অপেরার কিস্‌সা রচনায় তলিয়ে যাবেন একথা কে ভাবতে পেরেছিল?

২

তারাশঙ্করের শৈল্পিক ত্রুটির কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু তবু তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়—'স্বরাজ্যে স্বরাট'। এ সাফল্যের রহস্য কি তা আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। (ক) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—'বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের অনেক গল্পই টেল-পর্যায়ী।'[৪৪] রথীন্দ্রনাথ রায়ও বালজাক ও মেরিমের মতো গল্পলেখকের উল্লেখ করে তারাশঙ্করের গল্পে টেল-ধর্মিতার কথা বলেছেন।[৪৫] 'টেল' ধরনের রচনায় 'ইঙ্গিত গর্মিতা বা ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা'র অভাব থাকলেও 'টেল' 'গল্পরসে রসায়িত, বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল' হতে পারে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হিসাবে আমরা পৌষলক্ষ্মী, আখড়াইয়ের দীঘি, কালাপাহাড়, না, দেবতার ব্যাধি প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি।

(খ) এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। তারাশঙ্কর তাঁর অনেক ছোটগল্পকে উপন্যাস বা নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন, সমুদ্রমন্থন>রাত্রিদেবতার মধ্যে, কবি (গল্প)>কবি (উপন্যাস), নক্স কালিন্দী, হুটুমোক্তারের সওয়াল> হুজপুকুর, রাইকমল (গল্প)>রাইকমল (উপন্যাস), শ্মশানের পথে>চৈতালী ঘূর্ণি, বড়বৌ>চাঁপাডাঙ্গার বৌ ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যায় বড় কাহিনীর বিস্তারকে তিনি ছোটগল্পে সংহত করে আনার চেষ্টা করবেন। এর ফলে গল্পের সংকেতধর্মিতা থাকে না, থাকে 'টেল'-ধর্মিতা।

(গ) তারাশঙ্করের গল্পের প্লটে বৈচিত্র্য আছে। যেমন—দৃঢ় সংহত প্লট—নারী ও নাগিনী। শিথিল প্লট—পৌষলক্ষ্মী, বোবা কান্না। সরল প্লট (যাতে একটিমাত্র কাহিনী)

৪৩। আমার সাহিত্যজীবন, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩৪

৪৪। সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃ ৩৪৭ ৪৫। গল্পপঞ্চাশৎ, ভূমিকা, পৃ পঞ্চান্ন

—তারিণী মাঝি। যৌগিক প্লট (একটি প্রধান ও অন্য অপ্রধান কাহিনী)—জটায়ু। বৃত্তাকার প্লট (আদি-মধ্য-অন্ত-সম্বলিত একটি কাহিনী)—পুত্রেষ্টি। পত্থাকার প্লট (শিথিল গঠন, জীবনের টুকরো টুকরো ছবি একটি ভাবদৃষ্টি ও কয়েকটি চরিত্রের সূত্রে আবদ্ধ)—যাদুকরী, মেলা। হর্ম্যাকার প্লট (বিস্তৃত পটভূমি, বিচিত্র চরিত্রের আসা যাওয়া, মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী, নানা ঘটনা, দৃশ্য, পরিস্থিতি)—শিলাসন।

(ঘ) ষ্টিভেনসন ছোটগল্পের তিনটি শ্রেণী নির্ণয় করেছিলেন—প্লটের গল্প, চরিত্রের গল্প, ইম্প্রেশনের গল্প। চরিত্রের গল্প রচনার দিকেই তারাশঙ্করের ঝোঁক প্রথমাবধি অর্থাৎ—"to take a character and chose incidents and situation to develop it" (Stevenson).

'রসকলি' লেখার প্রেরণা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—"ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে।"[৪৬] এই রক্তমাংসের মানুষের অজস্রতা তারাশঙ্করের রচনাকে বর্ণবন্ত করেছে। কতকগুলি গল্পের নামকরণ সরাসরি চরিত্র প্রকাশক। যেমন,—অগ্রদানী, যাদুকরী, ডাইনী ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে, গল্পে একটি মুখ্য চরিত্র লক্ষ্য করা যায, যার নানা স্বভাব প্রকাশক ঘটনানির্বাচনের দিকেই লেখকের ঝোঁক। টাইপ চরিত্রের উদাহরণ—বোধবুদ্ধিহীন অলস গ্রাম্য প্রেমিক পুলিন (রসকলি), নতুনকালের দম্ভিত ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলী (জলসাঘর), ইণ্ডিভিজুয়াল চরিত্র—বিশ্বম্ভর রায় (জলসাঘর), ফ্ল্যাট, থিন চরিত্র—পূর্ণ চক্রবর্তী (অগ্রদানী), বৃত্তাকার চরিত্র—জনার (ইমারত), সেটপীস বা ব্লক চরিত্র—কালী বাগ্দী (আখড়াইয়ের দীঘি), বিবর্তমান চরিত্র—খোঁড়াশেখ (নারী ও নাগিনী)। তারাশঙ্কর এর চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা কৃতি গল্পকার রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'রসকলি' পড়ে তিনি তারাশঙ্করকে লিখেছিলেন—"যে সব চরিত্র এঁকেছ তা সজীব হয়ে উঠেছে, তাদের নিয়ে যে খেলা খেলিয়েছ মনের মধ্যে সে ছাপ দিয়ে যায়, বেশ রাখে।"[৪৭] বিদেশী সমালোচক পিয়ের ফালোঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিধ্বনি শুনি : "তাঁর (তারাশঙ্করের) গল্পগুলির বিভিন্ন

৪৬। আমার সাহিত্য জীবন, ১ম খণ্ড, পৃ ২০

৪৭। সাহিত্য ও সংস্কৃতি—এপ্রিল-জুন : ৭২ সংখ্যায় উদ্ধৃত, পৃ, ৫

চরিত্র এত প্রাণবন্ত যে, পাঠক ষ্টাইলের কথা ভুলে গিয়ে কাহিনীর স্রোতে ডুব না দিয়ে পারেন না।"[৪৮]

(ঙ) তারাশঙ্করের ছোটগল্পে উপমা প্রযোগ অজস্র। তা' বর্ণনায়, সংলাপে প্রকাশিত হয়ে তাঁর গল্পের গৌরবকে নিশ্চিত বাড়িযেছে। চরিত্রের সত্তাপ্রকাশক উপমা—"মাযাহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি, প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।"(অগ্রদানী) বক্তব্যপ্রকাশক উপমা—'সেদিন আর এদিন। আজকের দিনকালগুলো যেন ভাসান-গান ভাঙার পর শেষ রাতের আসর।(পৌষলক্ষ্মী)

উপমা : একটি বিশেষ প্রবণতা—তারাশঙ্কর নানান পশুকে উপমান হিসাবে রাখতে বিশেষ পছন্দ করেন। যেমন,—"পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত।"(জলসাঘর) কিংবা, "জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জারীর মতো ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটাগাছটা আস্ফালন করিযা বলিযা উঠিল—বেরো, বেরো, বেরো।(ডাইনী) উপমা—যেখানে বিস্ময়কর সাফল্য :—প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ইত্যাদি গান শুনে "গিরির অন্তরের অরূপ কামনা অপরূপ হইযা ফুটিযা উঠিল। সে রাত্রে বাড়ি ফিরিল পুষ্পিত উদ্যানের মত মাতাল মন লইয়া।"(হারানো সুর) -অথবা, (নদীর কিনারায় সাহেবদের রেশমকুঠি দেখে জনাবের মনোভাব) "ক্রোশভর কিনারা একদম নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বাঁধিযে ফেলেছে। বাঘিনীর মুখের মধ্যে লোহার দস্তানা-পরা হাত পুরে দিলে যেমন হয়, দরিযার হাল হযেছে ঠিক তেমনই। কষের দাঁত দিযে বেঁকিয়ে বেঁকিযে চিবুতে চেষ্টা করছে সে।"(ইমারত) এ ধরনের উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। শিল্পী তারাশঙ্করের বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় মেলে এইসব ক্ষেত্রে।

(চ) ছোটগল্পে সংলাপের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারাশঙ্করের গল্পে সংলাপ-রচনার কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন—"তারিণী' মত্ত হাসি হাসিযা বলিল, বড ঘুরণ-চাকে তিনটি বুট বুটি, বুক-বুক-বুক-বুক, বাস্—কালাচাঁদ ফরসা।"

৪৮। কালি ও কলম, তারাশঙ্কর সংখ্যা পৃ ৫৬৪

(তারিণী মাঝি)[ময়ুবাক্ষী নদীর মাঝি বড ঘূর্ণিতে পড়ে তার সহকারী কালাচাঁদের কিভাবে মৃত্যু হতে পাবে, মত্ত অবস্থায় সে কথা বলছে ।] আর একটি উদাহবণ : 'বতন বুঝাইয়া বলে—সরকাব আমাকে ধবলে, বতন আমাকে বাঁচাতেই হবে, নইলে মান ইজ্জত তো আর বইল না। পঁচিশ টাকা ঠিক হল। তিনদিন না যেতেই বুঝলেন—ছুটে গেল বেটাব চালে চালে লাল ঘোডা।" (ব্যাঘ্রচর্ম) [অর্থাৎ, চালে আগুন দেওয়াব কথা বলছে বতন।] কিংবা, "হাত জোড করে বললে (গ্রামেব মোডল),—চিনি তো দেশে হযেছে অতিথি মহাশয, আব আমবা চিনি খাইও না। গুড কি তুমি খেতে পাববে ?"(শিলাসন) [দেশেব লোকেব ঘবে চিনির অভাব কি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত।] তাবাশঙ্কবেব এই সব জীবন্ত সংলাপ গল্পেব আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বাডিযেছে এবং সেগুলি সুনিশ্চিতভাবেই language of the soil থেকে উদ্ভূত। তাছাডা সংলাপে ছডা, গান, গ্রামাণ প্রসঙ্গ ইত্যাদিব ব্যবহাবে তা, আরও বর্ণবন্ত হযে উঠেছে। তাবাশঙ্কব যখন বলেন—"আমাব পাত্রপাত্রীব মুখে আমাব ভাষাব কথা আমি বসাতে পাবি না, তাদেব নিজেদেব ভাষা আমাব ভাবনায—বচনায বেবিয়ে আসে"[৪২] তখন সেকথা নির্দ্বিধায না মেনে উপায থাকে না।

(ছ) বাঢেব উপভাষায তাবাশঙ্কবেব দখল বিস্ময়কব। সাহিত্য রূপাযণেব দিক দিযে এক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিছু পবিচয নেওয়া যাক। বাক্যরীতিব বিশিষ্টতা—উ আপনাব মাথা ঠুকর্কে কেনে, আমাব আস্পদ্দা হযে যেযেচে আজ্ঞে, শ্বশুব তোমাব আইচে বলে। বিশেষ আঞ্চলিক শব্দ—মাথালি (মাথায দেবাব টোকা), কাঁতাব (ছোট নদী), বশিব মেযা (বেনোমদেব ছিবডে), জাওন গাডি (পঙ্কক্ষেত্র), আনন্দবাজাব (গ্রাম্য মেলায বেশ্যা-অঞ্চল), আলান (আল কেউটে), ঝালা (জ্যৈষ্ঠেব দুপুরের বাতাস) ক্রিযাপদেব বিকৃতি—লাবি, গোঙারছে, ফোঁসাইছে, ছেড্যা, উপুডে ফেলাচ্ছে। সর্বনামেব বিকৃতি—ই<এই, যি<যে, উ <ও, হুখন<এখন, ইথে<এতে। বিশেষ্য ও বিশেষণেব বিকৃতি—আমান্নুষী< অমানুষী, পচি<পশ্চিম, সিন্নুব<সিন্দুব, টুকচা<একটু, এত্যানি<এতখানি।

(জ) আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রসঙ্গেব ব্যবহাব তাঁর গল্পকে বিশেষ মর্যাদা দান কবেছে। যেমন—বৈষ্ণব সম্প্রদাযেব জাতবৈষ্ণব ও ভেকধারী, ছাডপত্র প্রথা (বসকলি), ঘাঁটি খেলা (আখডাইযেব দীঘি), সূতিকা

৪২। আমার সাহিত্যজীবন, ১ম খণ্ড, পৃ, ২২

গৃহের দুয়ারে রাত্রে ব্রাহ্মণ প্রহরা (অগ্রদানী), পৌষ আগলানো (পৌষলক্ষ্মী), রাঢ়দেশে বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় নিম্নজাতির মধ্যে ধর্ম-পূজা উপলক্ষে মুক্তিস্নান (মতিলাল), অন্ত্যজ জাতির মধ্যে 'সাঙা প্রথা (স্থলপদ্ম), ভাজো গান (বাবুরামের বাবুয়া), সুবচিমঙ্গল গান (কামধেনু) ইত্যাদি।

(ঝ) গল্পে ব্যবহৃত ছড়া ও প্রবচন অসংখ্য :—লাজে মা কুঁকুড়ি, বেপদের ধুকুড়ি, সোম শুক্রে পরে শাড়ি, ধন হয় তার আড়ি-আড়ি, চৈতে কুয়া, ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান, প্রথম পক্ষ হেলা-ফেলা', দ্বিতীয় পক্ষ ফুলের মালা, তৃতীয় পক্ষ হরিনামের ঝোলা, ইত্যাদি।

(ঞ) গল্পে গানের ব্যবহারও কম নেই :—পাঁচসিকের বোষ্টুমি তোমার, ওহে গোঁসা করেছে, গোঁসা করেছে, চোখে ছটা লাগিল, তোমার আয়না বসা চুড়িতে, বাবুদের চিলে কো-ঠার ছাদে চিল কাঁদিছে গো ভরা-দুপুরে, বহু-যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে, ইত্যাদি।

(ট) তারাশঙ্করের ভাষা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—"তারাশঙ্করের ভাষা ও শৈলী কলাকৌশল বর্জিত—সহজ, সবল, আন্তর্যক ও বলিষ্ঠ। বীরভূমের রুক্ষ ধূসর মৃত্তিকার সঙ্গে তার ভাষার একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে।"[৫০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—"তারাশঙ্করের ভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষা বলিষ্ঠ, পৌরুষদীপ্ত, কখনো অমার্জিত, গ্রীষ্মদগ্ধ বীরভূমের প্রকৃতির মতোই রুদ্র রৌদ্রোজ্জ্বল।"[৫১] কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

"তখন (গ্রীষ্মকালে) ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম্রধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। আকাশে রঙের নরম ধুলার রাশি প্রায় একহাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোন বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না, কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।"(ডাইনী)

৫০। গল্প পঞ্চাশৎ, ভূমিকা—ছায়াময়

৫১। বাংলা গল্প বিচিত্রা—পৃ ১৪১

[গ্রীষ্মদগ্ধ রুক্ষ প্রকৃতির এই পট উন্মোচনের মারফৎ লেখক ডাইনী চরিত্রটি উপস্থিত করেছেন, ফলে ডাইনীর রুক্ষ ধূসরতা প্রকট হয়েছে।]

অবশ্য, তাঁর লেখায় স্বপ্নবর্ণনা যে একেবারেই নেই তা বলা চলে না। যেমন :—"বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু দুজনেই (মুকুন্দ পাল ও তার বন্ধু যোগেন্দ্র) দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াশায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধবধবে সাদা মলমলের চাদর দিয়ে ঘুমন্ত মা বসুমতীকে ঢেকে দিয়েছে।" (পৌষলক্ষ্মী) আর দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক যেখানে বর্ণনায় তারাশঙ্করের দক্ষতা তর্কাতীত। যেমন :—"প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল।" (তারিনী মাঝি) অথবা, "সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্পশক্তি বর্ষার আকাশের ক্রমবিস্তৃত-কলেবর পুঞ্জিত মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছে।" (ময়দানব) অথবা, "মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলনের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরী-কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কর্নিক দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মত চকচক করছে।" (ইমারত) [রাজমিস্ত্রী জনাব শেখের এই বর্ণনায় রাজমিস্ত্রীর ব্যবহৃত উপকরণ ও কাজের তুলনা ব্যবহার অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে।]

এইসব উদাহরণ থেকে তারাশঙ্করের ভাষাগত দক্ষতা স্পষ্ট হয়। সহজ, সরল ভাষাতে তিনি সঞ্চার করেছেন এক নিজস্বতা। অন্যদিকে তারাশঙ্করের রচনা সম্পর্কে শৈল্পিক-অচেতনতার অভিযোগের বিরুদ্ধেও এই সব উদাহরণ স্বচ্ছন্দে আত্মপক্ষ সমর্থনে দাঁড়াতে পারে।

(ঠ) তারাশঙ্করের রচনারীতিকে নানাজনে নানাভাবে দেখেছেন। 'রসকলি' গল্প সংগ্রহ পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তোমার লেখা যতই পড়ছি, ততই বুঝছি তুমি একজন লিখিয়ে বটে তাতে সন্দেহ নেই।"[৫২] বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন—(His short stories), "are often free from these specific faults (যথা, শৈল্পিক দৃষ্টিকোণের অভাব), for the form debars many of them, and compels him……to keep more or less to the stricter path of cohesion"[৫৩] এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি পরবর্তীকালে

৫২। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

৫৩। An Acre of green grass, p. 84.

হরপ্রসাদ মিত্রের লেখায় পাই : 'উপন্যাসের তুলনায় গল্প রচনার ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর শিল্প-দক্ষতার বেশি পরিচয় দিয়েছেন।—গল্পে তিনি সংযমী, সংযতবাক্, সন্দেহাতীত-ভাবে অব্যর্থ।'[৫৪] অন্যদিকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে বলেছেন—'তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবনরসের রসিক।' কারণ, শ্রীকুমার বাবুর মতে, তারাশঙ্করের মধ্যে 'সদাজাগ্রত উদ্দেশ্যবোধ' এবং 'নিগূঢ় কলা কৌশল'-এর অভাব ছিল।[৫৫] বহু উদাহরণ মারফৎ দেখানো যায়, তারাশঙ্করের গল্পে এই দুই বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, 'গল্প লেখায় তুমি আধুনিক বাংলাসাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে।'[৫৬]

তারাশঙ্করের লেখায় শিথিলতার অভিযোগ অসত্য নয়। 'যাক ওসব কথা', 'তাই বলিতেছিলাম', 'আরও একবার হয়েছিল এমনই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ' ইত্যাদি বলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন, কিংবা নানান ভাষা, সমাজ, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য উত্থাপন করে গল্পের স্বাভাবিক গতিকে অনেক সময় ব্যাহত করেছেন। কিন্তু নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয়, এ ত্রুটি তাঁর শিল্পনিষ্ঠার অভাব থেকে আসেনি। মনে রাখতে হবে, তিনি সাহিত্যকে পূজামণ্ডপের সঙ্গে এবং নিজেকে সেবাইতের সঙ্গে তুলনা করেন একজন আস্তিকের পরম নিষ্ঠা নিয়ে।[৫৭] তিনি যে পরিশ্রমী শিল্পী ছিলেন, এ সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি—'সে আমলে আমি প্রতিটি গল্পই অন্ততঃ দুবার করে লিখেছি, প্রয়োজন হলে তিনবার চারবার ও লিখেছি।'[৫৮] সুতরাং, গল্পে যে শিথিলতা দেখা যায় তা, শিল্প-অচেতনার থেকে আসেনি, বরং এটাই তাঁর একটা প্রবণতা। তাছাড়া, মূলতঃ চরিত্রপ্রধান গল্প রচনার ঝোঁক থাকায় চরিত্রের বলয়িত প্রকাশের স্বার্থে ঘটনা ও বর্ণনার অতিরেক ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, মুখে মুখে গল্প বলার বৈঠকী রীতি তাঁকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল একথা তিনি স্বীকার করেছেন।[৫৯]

আসলে, রীতিবিষয়ে অতিরিক্ত সচেতনতার ব্যাপারে তিনি একেবারেই অনাগ্রহী ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমার নিজের মনে বিশেষ ঘটনা বা পাত্র পাত্রী—এই সবই প্রধান,—এরাই সুখ-দুঃখের ঢেউ হয়ে আসে,—বলবার কৌশলটা আলাদা করে ভাববার জিনিস কী ?'[৬০] শিল্পী-মানসের এই প্রবণতার কথা স্মরণ

৫৪। তারাশঙ্কর—পৃ ৯০
৫৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ,৫৩৩
৫৬। আশ্বিন,১৩৪৬
৫৭। আমার সাহিত্য জীবন, ১ম খণ্ড ৫৮। ঐ
৫৯। আমার কালের কথা. পৃ ৩৬ ৬০। কালি ও কলম : তারাশঙ্কর সংখ্যা, পৃ ৬২৩

না রাখলে বিচারে ভুলের অবকাশ থেকে যায়। তারাশঙ্করেব সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভেই সজনীকান্ত দাসের চোখে কিন্তু লেখকের রচনা পদ্ধতির মূল ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। ১৩৪৫-এ প্রকাশিত 'রসকলি' গল্প-সংগ্রহেব ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন—'অন্য সকলের ক্ষেত্রে গল্প বলিবার আর্ট বস্তুটা মুখ্য, বিষযবস্তু গৌণ। তারাশঙ্করের আর্ট বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করিয়া চলে, বিষয়কে প্রকাশ করিয়া আর্ট গৌরবান্বিত হয়।' এ মন্তব্য অব্যর্থ বলেই মনে হয। 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসের ভূমিকায় বচনাটিব 'থীম' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিযে তাবাশঙ্কর লিখেছিলেন—'এ আমাব কৌশল-সর্বস্ব রচনা নয, এ আমাব অন্তবের যন্ত্রণার সঙ্গীত।' এই মন্তব্য অনুসবণে তার রচনাবীতি সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে বোধ হয় বলা চলে—কৌশলসর্বস্ব রচনা নয,বরং অন্তবেব যন্ত্রণার ভাব-মন্থনে উঠে এসেছে অমৃত, উঠে এসেছে বিষ।

———

তারাশঙ্করের গল্পে জীবন ও প্রকৃতি

দীপক চন্দ্র

১

বাংলার জল-হাওয়া মাটিতে নিষিক্ত হয়ে তারাশঙ্করের গল্পগুলির আত্মপ্রকাশ। জীবনের সঙ্গে তাদের অভিন্ন যোগসূত্র আজও অম্লান। শুধু তাই নয়, আরণ্য-প্রকৃতিতে জীব-স্বভাবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষী সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে এক নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার সূচনা করেছে। বেদে, ডোম, কাহার, বাগ্দী, মাঝি, চণ্ডাল, ডাইনী, বেশ্যা, ডাক-হরকরা, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি অবজ্ঞাত মানুষেরা তারাশঙ্করের সেই কৌতূহলের বিষয়।

এই সব নিম্নশ্রেণীর জনগণের জীবনযাত্রার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে গল্পের উপকরণরূপে বেছে নিয়েছেন তারাশঙ্কর। তারপর, গল্পের ক্যানভাসে যখন জীবনের রঙ চাপিয়েছেন তখন প্রকৃতিও হাতে তুলি পাত্রে রঙ নিয়ে এসেছে। জীবনে প্রকৃতি থেকে তারা (চরিত্রগুলি) বিচ্ছিন্ন নয় বলেই এমনটা হয়েছে। চরিত্রগুলির জীবন ও স্বভাবে আরণ্য-প্রকৃতির দান কতখানি ব্যক্ত হয়ে উঠেছে, একমাত্র ভাবগত অনুভূতির মাধ্যমেই তা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রত্যুষে মানুষ যখন আরণ্য-প্রকৃতির ছায়ায় বাস করত তখন সে ছিল দুর্জয়, দুঃসাহসী, বন্য, বর্বর, উদ্দাম। এত শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও আরণ্য-জীবনের প্রতিকূলতা যে দুঃসহ অসহায়তা সৃষ্টি করেছিল তাই থেকে তার আধিভৌতিক বিশ্বাস হয়েছিল প্রবল। অদৃশ্য-নিয়তি শক্তির ওপর তার ছিল অতিমাত্রায় আস্থা। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে দেবতা-জ্ঞানে বিশ্বাস করত। নিম্নশ্রেণীর মানস-লোকে সেই সুপ্রাচীন জীবনযাত্রা-পদ্ধতির চিহ্ন এখনও রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, আরণ্য-জীবনে গোষ্ঠীবদ্ধ বসবাস ছিল তাদের আর এক অন্যতম স্বভাব। প্রকৃতির অকিঞ্চিৎকর অনুগ্রহে তারা সদা সন্তুষ্ট। দ্বীপধর্মী ধারাবাহিকতা-হীন জীবনে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, উন্নত জীবনবোধ কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষার আকাশস্পর্শী পক্ষবিস্তার নেই। মনোভাবে রয়েছে একপ্রকার বিনয় ও শ্রদ্ধার ভাব। তৃতীয়তঃ, মানুষের আদিম বৃত্তিগুলি ঝগড়া, বিবাদ, অত্যাচার, যৌনাকাঙ্ক্ষা আরণ্য-প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। আরণ্য-প্রকৃতির মহিমা এদের জীবনের ওপর

রাজচ্ছত্র মেলে ধরেছে। চতুর্থতঃ, প্রকৃতিরাজ্যের বিশালতা তাদের চিন্তা-চেতনাকে করেছে উদার ও মুক্ত। সর্বপ্রকার হীনমন্যতা-মুক্ত হয়ে তাই এরা জীবন ধারণ করে। আনন্দময় সার্থকতাবোধ এদের সমাজ-সংস্কৃতির একমাত্র লক্ষ্য। তাই সুবাসক্তি, অবাধ যৌন-লালসা এদেব জীবনেব বৈশিষ্ট্য, আনন্দ বা স্ফূর্তির উপকরণ। আব সেজন্য কোনবকম বিবেক দংশনও নেই তাদেব। এমনকি পাবিবাবিক পবিত্রতা হানি হয না সেজন্য। নীতিজ্ঞানেব অদ্ভুত অসঙ্গতিপূর্ণ চিত্রটি গভীব মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্কিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রাব পদ্ধতিব সঙ্গে প্রকৃতিব আরণ্য-জীবনেব যে মিল গভীব তাবাশঙ্কবেব সংবেদনশীল শিল্পীমন তাকে জীবনেব ভেতব প্রত্যক্ষ কবল। তিনি আরও দেখেছেন যে, এই জীবননীতি এদেব সমাজ ও সংসার-যাত্রার পিছনে একটা প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি কবেছে। আদিম অসংস্কৃত প্রবৃত্তির বেগবান উচ্ছ্বাস তাদেব দিনযাপনের একমাত্র সম্পদ।

কিন্তু শিক্ষিত মানুষেব আত্মপ্রসাব এবং বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসা প্রকৃতির বহস্যানু-সন্ধানের মধ্যে কোন আত্মপ্রক্ষেপণেব চেষ্টা ববে না। তাদেব জীবনে প্রকৃতি শিথিলবদ্ধ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পবিচ্ছেদেব সমষ্টি। শিক্ষিত মানুষেব চিন্তায, অভিজ্ঞতায, কল্পনায প্রকৃতিব প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ, গতানুগতিক ও প্রাচীন। কিন্তু যারা সমাজে আদি-মানুস বলে পবিচিত সেই সব অনুন্নত মানুষেব জীবন ও সমাজে প্রকৃতিরূপের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সজীব ও প্রত্যক্ষ।

২

মানুষেব জীবনে প্রকৃতির এই অদৃশ্য প্রভাব কতখানি কার্যকব তাবাশঙ্কবের গল্প-উপন্যাস পাঠ কবলে তার প্রমাণ মেলে। মানুষেব প্রাণলীলায প্রকৃতি-সত্তার বিকাশ বিস্ময়কর। সাহিত্যের প্রচ্ছদপটে ইতিপূর্বে ভদ্রেতব চরিত্রগুলো প্রকৃতিব রূপে রঙ পায়নি। তাবাশঙ্কবের গল্পে-উপন্যাসে তাদেব ব্যক্তিমূল্য সামাজিক মূল্যেব বিচাব হল সামগ্রিকভাবে। জাতিগতভাবে এবং ভৌগোলিকভাবে ,নিম্নতব মানুষগুলো যে আরণ্য-প্রকৃতিব নিকটবর্তী প্রাণী, এই সত্যের সাক্ষাৎ মিলল। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিব এই মানুষী সত্তার রূপান্তর ইতিপূর্বে হযনি। কেন, তা বলছি।

উপন্যাসে প্রকৃতির পটভূমি কিছুমাত্র নতুন বা আকস্মিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার প্রথম বিকাশ। ইংবেজ লেখকদেব দৃষ্টান্ত বাংলা কথাসাহিত্যে

তিনি তার প্রথম প্রবর্তন করেন। কিন্তু উনিশ শতকের শান্ত নিরুদ্বেগ সমাজ-চেতনার পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিভাবনা ছিল অত্যন্ত প্রাচীন ও রোম্যান্টিক; কোনরকম জীবন-জিজ্ঞাসা সৃষ্টিতে ছিল অক্ষম। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রীতি ছিল 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' এই ঔপনিষদিক চিন্তাধারায় পুষ্ট। তাবাশঙ্কবের মত জীবনযাত্রার পদ্ধতিব ভেতর প্রকৃতি-সত্তার নিভৃত বিস্তাব কখনও উপলব্ধি কবেননি। বিস্ময় এবং অর্ধপরিচয়ের রহস্যে আবৃত প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের গল্পে পুবোপুবি রোম্যান্টিক।

এ দিক দিয়ে বিভূতিভূষণেব গল্পে ও উপন্যাসে প্রকৃতি অনেক বেশি প্রাণবন্ত, মৃত্তিকা সংলগ্ন ও আবণ্যক। তথাপি, তারাশঙ্করেব উৎকর্ষ বিভূতিভূষণের ছিল না। (তাবাশঙ্কব ও বিভূতিভূষণ কিন্তু সমকালেব লেখক।) জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে ও দেখাতে বিভূতিভূষণ ব্যর্থ হযেছিলেন বলেই ঘোমটাবৃত প্রকৃতির দৈন্য-দশা নাশ হযনি তাঁর হাতে। তাবাশঙ্করেব গল্পে প্রকৃতির প্রথম দীনতাব লজ্জা দূর হল। ব্রাত্যদেব জীবন ও কর্মেব ভেতর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি জীবনানুভবের বৃত্তে কতখানি স্পষ্ট তাকে প্রত্যক্ষ কবাব কৃতিত্ব শুধু তারাশঙ্করের নয়—একালের সব লেখকের।

এই শিল্পচেতনাব মূলে আছে লেখকদেব আত্মোপলব্ধি তথা কালজ্ঞান। বিশ শতকেব তৃতীয, চতুর্থ দশক থেকে জীবন ও মননের জটিলতা সভ্যতার বিপুল বিস্তাব, বিশ্বযুদ্ধজনিত বাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া, যান্ত্রিক আবিষ্কাব, শিল্প-বিপ্লব, সম্ভোগ, উপকবণেব প্রাচুর্য, বেকাবত্বেব অভিশাপ, জীবনেব বিকৃতি প্রভৃতির যোগফলে জীবনেব প্রকাশ যখন অবরুদ্ধ, অবদমিত, সুস্থ বিকাশেব অন্তবায, তখন লেখকবা প্রকৃতির সহাযতা গ্রহণ কবলেন জীবনেব শূন্যতা ও যন্ত্রণা-বিস্মরণের উপাদানরূপে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-মানুষের ক্লেদ-গ্লানি-জর্জবিত জীবনে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা সব এবং শেষ কথা নয। জীবন বিবাট সম্ভাবনাময। তাই সংগ্রাম স্বপ্ন বিনষ্টিব অসমতল জমি পবিত্যাগ করে বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্কে মানবজীবনের এক অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রেব আববণমুক্ত করলেন। শুধু যে একটা বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে প্রকৃতি-প্রবাহ এসেছে একথা সত্য নয। আরো আছে। বিশেষ করে, রুশ-বিপ্লবের শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রকল্পনা ও গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লৌকিক জীবনবৃত্ত গঠনে সহায়তা করেছে।

মানুষেব জীবনকে লক্ষ্য করে সেকালে জেগে উঠল এক নতুনজিজ্ঞাসা, নতুন

দৃষ্টিভঙ্গী। আত্মার স্বপ্রকাশিত সত্যকে একালেব লেখকরা বড় করে ভাবতে শিখল। কল্লোলেব পৃষ্ঠায় নীচুতলাব মানুষদেব জীবনচর্চাব মধ্যে প্রকৃতির অকৃত্রিম নৈকট্য এবং উভয়ের মর্ম-সম্বন্ধ আদিমপ্রায় মানবতাব বলিষ্ঠ হিংস্র জীবনোল্লাস এক নতুন দৃষ্টির বৃত্ত রচনা করল। এঁবা হলেন শৈলজানন্দ মুখোপোধ্যায, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায, মনোজ বসু, সরোজ রাযচৌধুবী প্রমুখ। এঁদেব মধ্যে তারাশঙ্কব অন্যতম।

প্রকৃতি প্রবাহে ভেসে-আসা মুক্ত দীপ্ত মহাজীবনের বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাস শিল্পীর প্রগাঢ় জীবনপ্রীতিব অনুবাগে অভিনন্দিত। তাবাশঙ্কবেব গল্পে-উপন্যাসে প্রকৃতিব মুক্ত পক্ষে বিহার সবচেযে বেশি সহজ ও স্বাভাবিক। একটু অনুধাবন কবলেই এই সত্য উপলব্ধি কবা যায়। শৈলজানন্দ প্রধানতঃ শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে গল্প লিখেছেন। সে শ্রমে আছে মাটিব সংস্পর্শ, প্রকৃতির প্রাণলীলার মহিমা। কিন্তু উপন্যাসের বক্ষপুটে নেই প্রকৃতিবৃত্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব বিজ্ঞাননিষ্ঠ সচেতন মন প্রকৃতিব নির্লিপ্ত নির্বিকাবভাবেব মধ্যে নিযতিরূপ অদৃষ্টকে প্রত্যক্ষ কবে। প্রকৃতি রূপে-রঙে চরিত্রগুলি অভূতপূর্ব। অন্তবশাযী আদিমতায সুচিহ্নিত তাবা। শিল্পদৃষ্টি যত সার্থক হোক না কেন, প্রকৃতিবৃত্ত থেকে শেষ পর্যন্ত সবে গেছে শিল্পীব জীবন-জিজ্ঞাসা। সবোজ বাযচৌধুবীর বচনাতে আছে নাগবিকতাব উন্মেষ। গ্রাম ও শহরের দুই সীমান্তবেখায বিস্তৃত তাঁব উপন্যাস। মানুষ ও প্রকৃতিব পারস্পরিক সম্পর্ক তাতে ব্যক্ত হযনি বেশি। কিন্তু তাবাশঙ্কবেব গল্পে প্রকৃতির রূপে-রঙে বেড়ে ওঠে জীবন। উপকথায়, রূপকথায গাঢবর্ণ তাঁব প্রকৃতি। প্রকৃতিব বুক থেকেই চবিত্রগুলিব উৎপত্তি বলেই মাটিমাখা মানুষেব কাজে কথায ভাবনায তাবাশঙ্কবেব সর্বদেহ ধূলি-ধূসব।

৩

তারাশঙ্কবেব প্রকৃতিচিন্তা যত বোমান্টিক হোক না কেন, তা কখনও চবিত্র-গুলিকে আচ্ছন্ন করে বাখে না। চবিত্রগুলিকে উজ্জ্বল কবাব জন্য প্রকৃতির প্রয়োজন যতখানি ঠিক ততখানিই ব্যক্ত হযেছে গল্পে। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং মানুষ মিলে তাঁর গল্পজগৎ বচনা কবেছে। এককে বাদ দিলে অন্যটি অর্থহীন হযে পড়ে। উভয়কে নিযেই গল্পেব সম্পূর্ণতা।

'যাদুকবী' ও 'বেদেনী' গল্প দুটি বেদেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বেদেদেব জীবনপ্রণালী অনেকখানি প্রকৃতিনির্ভর ও প্রকৃতিস্বভাবের সঙ্গে যুক্ত।

লেখক তাঁর সংগৃহীত জ্ঞাতব্য তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত করে তাকে গল্পের পাত্র-পাত্রীর ভেতর প্রত্যক্ষ করেছেন। তথ্যের সঙ্গে গল্পকে মিলিয়ে রচনা করবার ফলে গল্পমূল্য ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিরন্তন বিশ্বাস বা ধারণাগুলিকে গল্পের উপাদান করে মানুষ ও প্রকৃতির অভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, পুরুষদের অর্ধউলঙ্গ ধূসর মূর্তি কালো পাথর কেটে গড়া। 'দেহটাও যেন শ্যাওলাধরা অতি প্রাচীন একটা পাথরের দেওয়াল।' মেয়েরাও আশ্চর্য কালো। প্রকৃতির বিচিত্র কৌতুকময় রূপে অনুপমা তারা।

আরণ্য-প্রকৃতির গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত বেদেদের জীবনেতিহাস। 'যাদুকরী' গল্পে সে পরিচয় লিপিবদ্ধ। যাযাবর তারা। ঘর তাদের একটা আছে। কিন্তু তার প্রতি আসক্তি তাদের খুব জমা হয়ে নেই। বিশ্বরাজ্য ঘুরে তারা বিভিন্ন বিচিত্র মানুষের জীবন দেখতে ভালোবাসে। জীবনটা এদের কাছে উপভোগের। ক্ষুধা হরণের মত প্রয়োজন মিটলেই সব চুকে যায়। এদিক দিয়ে তারা অত্যন্ত আদিম। প্রকৃতির নিকটতম অধিবাসী। সংস্কারহীন মুক্তির আনন্দ উপভোগ এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির সঙ্গে এদের অভিন্নতা বোঝানোর জন্য লেখা একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। নিসর্গ শোভা-সৌন্দর্যে যখন চারদিক জমজমাট, একটা মুক্ত আনন্দের উল্লাস—তখন বেদেরা অকস্মাৎ আসে মানুষের সভায়। গল্পের শুরুতেই দেখি নিসর্গের কণ্ঠে কাহিনীর সেই সুর :

'শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল। গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দিঘীর সঙ্গে তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ বারোটি বাজীকরের মেয়ে ও জনচারেক বাজীকর পুরুষ।'

বেদেদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে মিল রচনা করে লেখক যেন এই উপমাটি প্রকৃতির ভেতর আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অন্তরধর্মের মিলটি তাতে পরিস্ফুট হয় বেশি। প্রকৃতির প্রাচুর্য বালিহাঁসের ডানায় ভর করে যেন ওদের জীবনের ওপর নেমে এসেছে। অফুরন্ত জীবনের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে গ্রামখানির সুপ্তিভঙ্গ হয় হঠাৎ। কেননা, প্রকৃতির স্পর্শ বাজীকরদের সর্বদেহে। কৌতুক রসিকতায় তাদের সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলছে। তারা যখন নাচে, হাসে, কথা কয়, তখন ভীষণ নির্লিপ্ত, উদাসীন। মুক্ত আনন্দাস্বাদনে অনেকটা আত্মতৃপ্ত ও বিহ্বল।

প্রকৃতির সন্তান বলে সভ্য মানুষের কাছে বেদেদের তাই একটা দুরন্ত মূল্য

আছে। বৎসরে নির্দিষ্ট দিনে তাদের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তারা। নাগরিকতার আকর্ষণে সভ্য মানুষ প্রকৃতি থেকে যত বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ততই অন্তরে রিক্ততা বাড়ছে তার। আর ভেতরে ভেতরে আকুল হচ্ছে প্রকৃতির সান্নিধ্যের জন্য। বেদেদের সংস্পর্শে এলে সেই অভাবটা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। 'যাদুকরী' গল্পে লেখক তার ছবি এঁকেছেন। সব কাজ পণ্ড করে দুর্বার আকর্ষণে ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই ছুটে আসে তাদের বিভিন্ন রঙ ও খেলা দেখতে, বিভিন্ন প্রকৃতিজ দ্রব্যকে রোগ প্রতিষেধকের টোটকা ও ঔষধ বলে সংগ্রহ করে। প্রকৃতির ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছে বলে সাধারণ লোকের এক ধরনের অতিলৌকিক বিশ্বাস আছে তাদের প্রতি। সাধারণ মানুষের মত তাদের জীবনযাত্রা নয় বলেই বাজীকররা কৌতুক ও কৌতূহলের বিষয়। 'যাদুকরী' গল্পে তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তা তার সুন্দর প্রচ্ছদ সৃষ্টি করেছে।

বাজীকররা মিষ্টি হাসি চটুল কথায় মুখর সর্বদা। মানুষের রাগে ক্ষোভে বিরক্তি নেই তাদের। প্রকৃতির বুক থেকে উৎপত্তি বলে তারা নিজেদের সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন, সমাজ সম্বন্ধে সংস্কারহীন। নৈতিক শাসনও শিথিল তাদের। প্রকৃতির মত যে তারা নির্লিপ্ত, নির্বিকার, উদার, মুক্ত এই কথাটি বোঝানোর জন্য লেখক একটি সুন্দর চিত্রপটের আয়োজন করেছেন। বাজীকরী মেয়ের নগ্ন অবয়বে নাচের ভেতর দিয়ে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

'লোকে বলে তামার বদলে রূপো দিলে নির্বিকার চিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়েরা। দর্শক চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না। দুনিয়ার লোক ছি ছি করে কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই।'

আনন্দময় সার্থকতাবোধ এদের সমাজ-সংস্কৃতির একমাত্র লক্ষ্য বলে পুলিশদের অনুরোধমাত্র বাজীকরী যৌবন-লীলায়িত তনুদেহ অনাবৃত করতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। দর্শকের কামপীড়িত কালো কালো চোখগুলো লুব্ধ লালসায় তার দেহ লেহন করতে থাকলেও কোনরূপ বিকৃতি বা তালভঙ্গ ছিল না নাচে। ভদ্র মানুষের কদর্য কামনা নিয়ে বাজীকরীর এ-এক ধরনের কৌতুক। তাদের অসংখ্য ভোজবাজীর খেলার ভেতর এটিকেও একটা অন্যতম খেলা বলে মনে করে। তাই নারীর লজ্জা-সম্ভ্রমকে নিরাবরণ করতে কুণ্ঠা নেই মনে। বরং বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টির বিচিত্র রহস্য উপভোগ করতে তারা এক ধরনের বর্বর আনন্দ পায়। তাই ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-কৌতুকে কণ্ঠ হয় সঙ্গীতময়। 'হায়রে মরি গলায় দড়ি/তুমি হরি লাজ দিবা/তুমার লাজেই আমি মরি/নইলে আমার

লাজ কিবা।' আরণ্য-প্রকৃতির এই আনন্দময় সার্থকতা-বোধ 'যাদুকরী' গল্পের প্রাণ।

'বেদেনী' গল্পটিও আরণ্য-প্রকৃতিব পরিবেশের সঙ্গে একসুরে বাঁধা। মানুষের আদিম বৃত্তি—ঝগড়া, বিবাদ, জিঘাংসা, প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষাব বিচিত্র প্রকাশ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় উত্তীর্ণ। প্রকৃতিব প্রাণলীলায বেদেদের আদিম অসংস্কৃত লোভ, লালসা, প্রবৃত্তিব বেগবান উচ্ছ্বাস, যৌনবৃত্তিব তাড়না স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ, মেলামেশার নিঃসংকোচ স্বাধীনতা বেশ সবসভাবেই বর্ণিত হযেছে। সমগ্র গল্পে দেখি প্রকৃতিজগতেব অদৃশ্য আকর্ষণের মত প্রকৃতিগত আকর্ষণও তাদেব জীবন-যাত্রায প্রধান। বিশ্বরাজ্যের প্রাণের ছন্দ এর ভেতব দিযে উচ্ছ্বসিত হযে ওঠে। বেদেদেব সমাজ ও সংসাবযাত্রাব পেছনে এই শক্তিব তীব্র গতিবেগ লক্ষ্য কবেছেন লেখক।

কামনাব কূপে বন্দী কবে লেখক এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কবেছেন। ফলে যৌনবৃত্তিব গতিপথে এগিযেছে প্রকৃতি-প্রবাহ। আর এই পথেই আবির্ভূত হযেছে গণজীবন-প্রবাহেব ধাবা। এই গল্পে কেন্দ্রীয চরিত্র রাধিকা। প্রকৃতি তাব আভরণ।

'কালো সাপিণীর ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিণী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা। সে যেন মদির সমুদ্র স্নান করিয়া উঠিল। মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইযা দেয় একটি নেশা।'

শুধু রাধিকা নয, শম্ভু কেষ্টও প্রকৃতি-আশ্লিষ্ট গ্রামীণ এবং মাটিব স্তন্যবসে পুষ্ট তাদেব কলেবব। 'শম্ভুব সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুব হিংস্র ছাপ যেন মাখা আছে।—শম্ভুর দেহবর্ণ উগ্র তামাটে, আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোবতা।' 'কিষ্টোব . বুকখানা কি চওড়া, হাতেব পেশীগুলো কি নিটোল।' মানুষ হিসাবে বেদেরা যে প্রকৃতি-পরিবাবের অন্তর্ভুক্ত এই সত্যটি বোঝানোর উদ্দেশ্যে লেখক তাদেব দেহগত বর্ণনাকে এত ব্যঞ্জনাময করেছেন।

নবনারীর পাবস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণেব মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির মানবিক সম্ভোগ পিপাসাই একমাত্র জীবন-সত্য। বেদেদেব জীবনে ও সমাজে তাব একটা মুক্ত রূপ আছে। প্রকৃতির ব্যাপ্তি ও বিশালতা এদেব জনজীবনকে কবেছে উদার সংস্কারহীন এবং সর্বপ্রকাব হীনমন্যতা মুক্ত। তাই কোনরকম যৌন সংস্কার নেই তাদের। ভালোলাগার উদ্দাম আবেগে বন্য তারা, আনন্দময় সার্থকতাবোধে

উদ্দীপ্ত। কামনা, লালসা, যৌন-এষণা কখনও পারিবারিক পবিত্রতার শ্লীলতা হানি করে না। সমাজজীবনও হয় না অসুস্থ অসামাজিক।

আরণ্য প্রাণীর মত রাধিকাও সেজন্য সবল শক্তিমান পুরুষকে সঙ্গী করে চরিতার্থ হতে চায়। তার জান্তব প্রবৃত্তি সর্বাত্মকরূপে প্রকৃতির অন্তর-স্বভাবের ইঙ্গিত বহন করে। গল্পের ভেতর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর-প্রবণতাকে এক করে আঁকার কৌশল সার্থকতায় উত্তীর্ণ।

রাধিকার দ্বৈত-সত্তায় প্রকৃতির মদির রূপের অভিব্যক্তি যেমন আছে, হিংস্র জিঘাংসা এবং ক্রোধও আছে তেমনি অক্ষুণ্ণ। উদ্দাম জীবনের আনন্দ মদিরা পান করার জন্য সে শম্ভু বাজীকরের কঠিন কঠোর কর্কশ পাথুরে বলিষ্ঠ দেহের প্রতি এক সুতীব্র অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করে শিবপদের ঘর ছেড়ে চলে যায়। আবার কিষ্টোর লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা হঠাৎ রাধিকার মনটাকে টলিয়ে দেয়। অনুরাগের বিপরীত কোটিতে রাধিকাকে স্থাপন করে লেখক এক অভিনব মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন যার তির্যক বিকাশ এই গল্পের সম্পদ ও সমস্যা। জৈবিক জীবনের ত্রিকোণিক দ্বন্দ্বের টানে এগিয়ে চলেছে গল্পপ্রবাহ। রাত্রির অন্ধকারে হিংস্র প্রাণীর মত চুপি চুপি নিঃসাড়ে রাধিকা আসে কিষ্টোর তাঁবুতে আগুন লাগাতে। কিষ্টোর আসুরিক দেহপাশে হঠাৎ ধরা দেবার প্রলোভন জাগে অন্তরে, প্রকৃতি জগতের প্রাণীকুলের মত রাধিকা আপনার উদ্দাম বাসনাকে গোপন বা অস্বীকার করতে শেখেনি। বর্বর পরিতৃপ্তি বুকে ধরে কিষ্টোর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে। শম্ভুকে পরিত্যাগ করার জন্য দুঃখ নেই তার মনে। নীতিজ্ঞানকে অভিভূত করে তার স্বভাবসিদ্ধ আদিম বর্বরতা অন্ধরোষে গর্জন করে ওঠে।

'সে দেশলাই তুলিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।'

সাপের সঙ্গে বেদের যে জৈবিক সম্বন্ধ তাকে অবলম্বন করেও যে গল্প হতে পারে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' তার দৃষ্টান্ত। এই গল্পে বেদেদের জীবনে আর এক বিস্ময়কর জগতের অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বসৃষ্টির আদিম জীবন-স্পন্দন এক নতুন সুরে ধ্বনিত হয়েছে। গল্পটির মূল আবেদন জৈবিক। প্রবৃত্তিগত জীবন-রহস্যকে আদিমতায় অবনত করে মানুষ ও পশুর প্রভেদের মূল্যায়ন করেছেন। আরণ্য-প্রকৃতির রহস্য ও প্রকৃতিগত সত্যকে (instinctive) বিস্ময় এবং অর্ধপরিচয়ের রহস্যে আবৃত করে তারাশঙ্কর এই কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন। জৈবিক জীবনের ক্ষেত্রে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক রূপটি

জোবেদা এবং উদয়নাগের মধ্যে এক অনুপম শিল্পশ্রী লাভ করেছে। নারীর প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বভাব উদয়নাগের মতই ক্রুব। ওঝা খোঁড়া শেখ বিকৃত, কদাকাব, পাশবিক চরিত্রের প্রতীক। আবণ্য প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে যার সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক। পশু-প্রকৃতি মানুষ ও উদযনাগেব মধ্যে এক অভিন্ন আত্মীয়তা সৃষ্টি কবেছে। নিকৃষ্ট নীচুতলার প্রাণী উদয়নাগের সঙ্গে মানুষকে এক করে দেখার ফলে, জোবেদার সঙ্গে তার আত্মাধিকারেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাস্তবতার সীমা নির্দেশ কবে না। বাসনা-বন্ধনে বন্দী এই নাগিনী জোবেদাব মতই ঈর্ষাদগ্ধ হযে একদিন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দংশন কবে তাব প্রাণান্ত ঘটায। গল্পটিব এই পবিণাম চিন্তা মানুষেব আদিমতম বৃত্তিতে ভীষণ। জীবজগতে সমগ্র স্ত্রী জাতিব প্রকৃতিগত প্রবণতা তাবতম্যহীন। এদিক দিযে ইতব প্রাণীব সঙ্গে প্রভেদ নেই তার। ওঝা শেখ আপন জীবন-অনুভবের বৃত্তে সেই সত্যকে উপলব্ধি করেছিল।

'শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জেবেদাও তোকে দেখতে পারত না।'

—নাগিনীব ক্রুব সর্পিল স্বভাব যেন এখানে মানবাযিত হযে উঠেছে। লেখকের প্রকৃতি-প্রীতি প্রকৃতিব স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ কবে ধারাবাহিক জীবন স্রোতের জোযাবে Idea-কে ভাসিযে দেযনি। প্রকৃতি-ধর্মেব মধ্যেই সমগ্র গল্পটি বেড়ে উঠেছে।

বেদেদেব বংশগত জীবন ও কর্মেব ভেতব প্রকৃতিব প্রভাব কত প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ও বাস্তবানুগ উপরোক্ত গল্পত্রযেব মধ্যে তাব পবিচয পাই।

৪

প্রকৃতিসত্তাব সঙ্গে মানুষী স্বভাবের মাখামাখি একমাত্র শ্রেণীহীন মানুষের মধ্যেই প্রত্যক্ষ কবা সহজ। তাই, সব শ্রেণীব ভদ্রেতব মানুষগুলোকে নিয়ে তারাশঙ্কর যেন প্রকৃতিজগতে এক বিচিত্র রূপ ও বহস্যেব স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতী।

জীবিকাব ক্ষেত্রেও যে প্রকৃতিব অদৃশ্য উপস্থিতি আছে 'তারিণী মাঝি' গল্পটি তাব দৃষ্টান্ত। লেখক তাঁর উদ্দেশ্য সফল কবে তোলাব জন্য প্রথমেই বানুটিযা ঘাটের মাঝি তারিণীব সঙ্গে মযূরাক্ষীর একটা অভেদ সম্পর্ক সৃষ্টি কবেছেন। নদী বক্ষেই একমাত্র সে স্বাভাবিক।

'তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয় তখন সে খাড়া সোজা।'

মযূবাক্ষীর সঙ্গে নাড়ীর সূত্রে বাঁধা সে। নদীর বুকে জীবিকা সন্ধানে তার

সারাক্ষণ কাটে। তাই নদীর মতই 'জলের শরীর' তার। 'রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে।' অপরপক্ষে ময়ূরাক্ষীর প্রাণধর্মিতার সঙ্গে মিল তার গভীর। খরস্রোতা রাক্ষুসী ময়ূরাক্ষীর বুকে যখন নৌকা ভাসায়, তখন শক্তি, বিশ্বাস ও সাহসে দুর্জয় সে। শিশু যেমন সবল বিশ্বাসে মাকে আঁকড়ে ধরে তারিণীও তেমনি অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় ময়ূরাক্ষীকে জীবনের পরম আশ্রয় ভেবে আঁকড়ে থাকে। জননী-জ্ঞানে এই বিশ্বাসের ফলে তারিণী চরিত্রে একপ্রকার আরণ্য-প্রকৃতির স্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

জলচর প্রাণীর মতই জলেই স্বচ্ছন্দ সে। ভয়ঙ্কর রাক্ষুসী ময়ূরাক্ষীর গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিমজ্জিত মানুষকে উদ্ধার করার জুড়ি নেই তার। তার আচরণ, স্বভাব, কথাবার্তা নদীর মতই সরল সহজ, উচ্ছ্বাসে ভরপুর। নদীর স্রোতধারায় মিশেছে মানুষের জীবনের ছন্দ। ফলে, ময়ূরাক্ষী এবং মানুষ যেন একই সত্তার দুই রূপে মূর্ত। 'তারিণী মাঝি' গল্পে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে তারিণীর এই একীকরণ বিস্ময়কর। তারাশঙ্করের দৃষ্টি জীবনের অতলান্ত গভীরে প্রসারিত। তাই, ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে তারিণী মাঝির মঙ্গলময় আত্মীয়তার সম্পর্ক এই গল্পে সব এবং শেষ কথা নয়। দুর্দিনে জীবনের চরম সংকট-লগ্নে এবং ঘটনা পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি প্রকৃতির দ্বিতীয় সত্তার আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তোলে। আদিমকাল থেকে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কটা কখনও মৈত্রীর নয়, বৈরীর। লেখক যেন তারই সূত্রানুসন্ধানে আগ্রহী এই গল্পে।

আষাঢ়ের আকাশে বৃষ্টি না দেখা দেওয়ায় মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হল। দলে দলে লোক গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরাভিমুখী হল। তারিণীও নিরুপায় হয়ে গ্রামের বাইরে পা দিল। কিন্তু সীমানা ছাড়ার আগেই প্রকৃতির শিশু, ময়ূরাক্ষীর সন্তান দেখল পিঁপড়েরা বাসস্থান বদল করছে, 'কাকেরা কুটো তুলছে, বাসার ভাঙা ফুটো সারাবে বলে।' তারিণী যে মনে প্রাণে আদিম এবং আরণ্যক। সেই কথাটি বোঝানোর জন্য লেখক এই টেকনিকটি অবলম্বন করেছেন। সৃষ্টির আদিমতম উৎসে প্রকৃতির ইসারা থেকে মানুষ যেমন করে প্রকৃতির বার্তা সংগ্রহ করত, তারিণীরও অনুরূপভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ করে ঘরে ফেরে।

'জলের শরীর' ময়ূরাক্ষীর। রোদে শুকিয়েছিল, বৃষ্টির জল পেয়ে আবার ফুলে উঠল তার দেহ। দৈত্যের মত উল্লাসমুখর ময়ূরাক্ষী।

'ময়ূরাক্ষীর গর্জন বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ, লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্যে আর চীৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ডাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।'

ময়ূরাক্ষীর এই প্রলয-নৃত্যের মধ্যে তারিণী নিঃশঙ্ক। দাঁড়ানোর মত মাটি যখন থাকল না তখন খেলুড়ের মত নির্ভযে সুখীকে পিঠে নিয়ে ময়ূরাক্ষী পার হওযাব জন্য ঝাঁপ দেয জলে। ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা স্রোতে ঝাঁপিযে পড়ার দুঃসাহস আদিম মানুষেব নিরুপায জীবন-সংগ্রামের মত বন্য ও ভযহীন। ময়ূরাক্ষীব ক্ষুধার গ্রাস কেড়ে নিযে সে মানুষেব জীবনবক্ষা কবেছে। কিন্তু ভাগ্যেব নিয়ামক সেই ময়ূরাক্ষীব বদ্ধ মুষ্টি থেকে স্ত্রী সুখীকে সে মুক্ত কবতে পাবে নি। ময়ূরাক্ষীর প্রবল খবস্রোতে জীবন যখন বিপন্ন, আত্মবক্ষাব প্রবল তাগিদে সুখী তখন অক্টোপাশেব মত কঠিন বাহুবন্ধনে তাবিণীব কণ্ঠ আঁকড়ে ধবে।—

'তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস—বাতাস। যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ।'

ময়ূরাক্ষীব বুকে সে যে জলজ প্রাণীব মত আদিম, বন্য, বর্বব—আত্মরক্ষাব আদিম প্রবৃত্তি সেই নিষ্ঠুব জীবনসত্যকে প্রকাশ কবে। প্রকৃতিব লীলাবহস্যেব রঙ্গস্থলে মানুষেব প্রকৃতি-নির্ভবতাব চবম পবাভবেব ট্র্যাজেডিই গল্পেব উপজীব্য।

তাবাশঙ্কবেব মানস-বিবর্তন এগিযেছে প্রকৃতি থেকে মানুষে আব মানুষ থেকে অতিপ্রাকৃতে। 'ডাইনী' এরকম একটি গল্প। প্রকৃতিকে অপবিচযেব রহস্যে আবৃত কবে মানবজীবনেব একটি গভীবতব অর্থেব সন্ধান করেছেন লেখক। তাঁর দৃষ্টিকোণ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বোম্যান্টিক।

ছাতিফাটা মাঠেব নামগৌববেব সঙ্গে যে সব বিভিন্ন গল্প এবং উপকথা প্রচলিত আছে সেগুলিকে গল্পের উপাদানরূপে গ্রহণ করে অতিপ্রাকৃতের প্রতি মানুষী বিশ্বাসগুলিকে দৃঢ় করেছেন। অলৌকিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কার মানুষের জীবনে কত ভযাবহরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পাবে, 'ডাইনী' মেযেটির জীবন ট্রাজেডি এবং শোচনীয দুর্ভাগ্য মানুষেব অতিবিক্ত অন্ধ প্রকৃতি-নির্ভবতাব এক চরমতম রূপ।

প্রকৃতিব রুদ্ররূপেব নিষ্ঠুবতায় ছাতিফাটা মাঠ অভিশপ্ত। নিসর্গের অগ্নিময তৃষ্ণাব জ্বালামযীরূপ দ্বাদশ বর্ষীযা কিশোবীব দুই চোখকেও সর্বদা প্রদীপ্ত কবে রাখে। ডাইনী মেযেটির বিষজর্জর দৃষ্টিব সঙ্গে ছাতিফাটা মাঠের বন্ধ্যাত্বের মিল আশ্চর্য। এই মিল কাহিনীব্যাপী। এ ছাড়াও আছে মানুষী সন্দেহ এবং কুসংস্কার। ফলে, ডাইনীব মানুষী সত্তার মৃত্যু হযেছে। পাঁচজনের বিশ্বাসে তার আত্মপ্রত্যয নষ্ট হযেছে। ডাইনী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পাবে না নিজেকে।

'নরুণ দিয়ে চেরা ছুরির মত চোখে, বিড়ালীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভালো লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না।'

ছাতিফাটা মাঠের নিঃশ্বাস লেগে যেন তার জীবন এতখানি রিক্ত, শূন্য, প্রেমহীন। ছাতিফাটা মাঠের মত ডাইনীর অন্তরটাই তৃষ্ণার্ত। নিসর্গ বৈশিষ্ট্যগুলো তার মনুষ্য ধর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। ফলে, অতিপ্রাকৃতের ক্যানভাসে ডাইনীর যে চিত্রাঙ্কণ হল তা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় অত্যন্ত জটিল। ডাইনীর ঘরে একবার পথশ্রান্ত একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী তার হৃষ্টপুষ্ট নধর ছেলেটি কোলে করে কয়েক মুহূর্তের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল, ঘর্মাক্ত ছেলেটির দিকে সকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল তার—'দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিয়াছে।' অমনি এক অস্বাভাবিক মনঃপীড়ায় তার মনুষ্যধর্ম বিলোপ হল। সে এক অন্য অপ্রকৃতিস্থ মানুষীতে রূপান্তরিত হল।

'এঃ ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে। দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে। চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি? মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ। যাঃ. নিতান্ত অসহায়ের মত আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম, ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা, পালা।'

কুসংস্কার, অতিপ্রাকৃতের বিশ্বাস তার সকল আত্মপ্রত্যয় ধ্বংস করেছে। নিজেকে মানুষের দেহরস-লোলুপা রাক্ষসী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। মানুষের নিত্য সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, লাঞ্ছনা তার মানবী সত্তাকে হত্যা করেছে। তাই সে নিষ্ঠুর পাষাণ-দেবতার কাছে বুকফাটা ব্যাকুল মিনতি জানিয়ে বলে—'মা আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব।' তার নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত জীবনের ব্যাকুল আর্তি সমবেদনাহীন রিক্ত জীবনের পরিণাম। নিসর্গ শোভাও তার নরুণ চেরা দৃষ্টির সম্মুখে এক আতঙ্কময় রূপ ধারণ করে। কালবৈশাখীর রুদ্ররূপের নিষ্ঠুরতার ভেতর দিয়ে যে প্রকৃতি-বৈরিতা সূচিত হয় তার নিষ্করুণ পরিণাম ছাতিফাটা মাঠের বিভীষিকাকেও ছাড়িয়ে যায়।

'একটা ভাঙা ডালের সূচালো ডগায় তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাইনী। আকাশ পথে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্র প্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে।'

গ্রামীণ মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের সঙ্গে একটি সরল গ্রাম্য বালার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সংযুক্ত করে যে অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হল তা ছাতিফাটা

মাঠের 'তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়ার মত।' নিসর্গকে মানবায়িত করার এই শৈল্পিক সার্থকতা গল্পের পরিসমাপ্তিতে শোচনীয় ট্র্যাজেডির বীজ রোপণ করে।

৫

তারাশঙ্করের প্রতিটি গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা শুধু ভাবসর্বস্ব নয়, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব। প্রকৃতির প্রাণলীলায় মানবিকতার বিকাশ বিস্ময়কর। 'সনাতন' গল্পটি সেই শিল্প সাফল্যের নিদর্শন। প্রকৃতির নির্বোধ সারল্য সনাতন চরিত্রের বিশেষত্ব।

এই গল্পে তারাশঙ্কর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব পৃথিবীর এক আশ্চর্য যাদুপ্রভাব সনাতনের ভেতর প্রত্যক্ষ করেছেন। তার সর্বদেহ ধূলিধূসর, পাথুরে, কর্কশ। সনাতন প্রকৃতির প্রতীক। দাক্ষিণ্যে তার প্রাণ-মন ভরপুর। নন্দরাণী তার একমাত্র সঙ্গী। 'তাহাদেরই মত ডাকাবুকো মেয়েটা কষ্টিপাথরের মত কালো, শ্যাওলার মত নরম সেই মেয়েটা।'

এদের দু'জনকে নিয়েই মোটামুটিভাবে প্রকৃতিবৃত্ত গড়ে উঠেছে।

'সনাতন এখানকার কীট পতঙ্গটিকেও চেনে। ওই প্রকাণ্ড বড় কেউটের রীতিনীতি গতিবিধি সব তাহার সুবিদিত নন্দ ক্রমে ক্রমে অনেক চিনিল। প্রজাপতির ডিম সনাতন চিনিত না, সে জানিত না নন্দ সনাতনকে চিনাইয়া দিল।'

এমনি করে দুটি প্রকৃতির শিশু মিলে গল্পে একটি প্রকৃতি-পরিমণ্ডল রচনা করেছে। কিন্তু এ রকম ভাবে মূল গল্পকে বেশী দূর টেনে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর বলে নন্দরাণীর মৃত্যু আখ্যায়িকায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। নন্দরাণীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাই ঘটনার যবনিকাপাত হয় না। এর ফলে গল্পের মূল বক্তব্য আরো উজ্জ্বল এবং প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে। সনাতন যে মাটি-মাখা মানুষ, সে যে প্রকৃতির নির্বোধ শিশু, লেখকের সংবেদনশীল মন সেই সত্য প্রকাশে ব্যগ্র। তাই বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের মধ্যে দিয়ে গল্পরস প্রবাহিত হয়ে প্রতিপাদ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গল্পের সমাপ্তি সূচিত হয়।

নন্দরাণীর মৃত্যুর পর সনাতন উপর্যুপরি বিয়ে করেছে। দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রভাতী অত্যন্ত বিলাসী। সখ চরিতার্থতার জন্য সনাতনকে চুরি করায় উৎসাহিত করে। এই জাতীয় কুৎসিত প্ররোচনায় সনাতনের আহত ব্যক্তিত্ব জমাটবাঁধা আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হিড়িম্বার হা-ঘরের মত লুকিয়ে-চুরিয়ে খাওয়ার স্বভাবের মধ্যে প্রতারণাপ্রিয়তা লুকিয়ে আছে বলে ত্যাগ করে তাকে। সারল্য ও সততা তার

ব্যক্তিত্বের একমাত্র আশ্রয়। তাই মানুষের সংসারে তার সত্যিকারের স্থান হয়নি। পরিশেষে পুরাতন মনিবের বাড়ীতে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন লেখক। বৃদ্ধ বয়সে সনাতনের মনিবগৃহে প্রত্যাবর্তনের মূলে একটি বিশেষ লৈখিক উদ্দেশ্য সক্রিয়। রচনায় এই বিশেষ কৌতূহলের ভেতর দিয়ে লেখকের প্রকৃতিপ্রীতি অভিব্যক্ত হয়েছে।

মনিবপুত্র শিবনাথকে ছোটবেলায় নন্দরাণী হাতে পিঠে করে মানুষ করেছিল। মরণকালে অন্ততঃ সে নন্দরাণীর স্মৃতির প্রতীক শিবনাথকে দেখে নয়ন সার্থক করবে এই রকম একটা ধারণা ছিল তার মনে। তাই মৃত্যুকালে চোখের আলো নিভবার আগে শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দর উজ্জ্বল স্মৃতিকে শেষবারের মত খুঁজে নিতে গিয়ে সে দৃষ্টিহীনতার যন্ত্রণায় ডুকরে কেঁদে ওঠে। প্রকৃতিও মানুষের প্রেমময় সম্পর্কটি রচনার কৌশলে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে এই গল্পে।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রেমময় সম্পর্ক পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সমবেদনার ওপর প্রসারিত। 'বোবা কান্না' গল্পে প্রকৃতিপ্রীতি ও জীবনপ্রীতি একটি সমান্তরাল রেখা ধরে চলেছে। প্রকৃতিপ্রেমের প্রাচীন আদর্শটি অনুসৃত এখানে। 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম।' প্রকৃতিকে অপরিচয়ের রহস্যে আবৃত করে লেখক তার ভেতর একটি গভীরতর অর্থের সন্ধান করেছেন। লেখকের জীবনচিন্তা এবং পাত্রপাত্রী চারপাশের প্রকৃতিজগৎ থেকে দূরবর্তী নয়।

'বোবা কান্নায়' আতুর স্ত্রীকে কেন্দ্র করে গল্পরস জমে উঠেছে। গল্পের totality তাকে নিয়ে। কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণলীলায় মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করে তোলা। কাহিনীর সূচনায় 'চৈতে কুয়া, ভাদ্দরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান' এই বিশেষ প্রবাদবাক্যের টানাপোড়েনে গল্পটির সূক্ষ্ম বুনন হয়েছে। প্রকৃতির বিরাট ছায়ায় তাই বেড়ে উঠেছে সমগ্র কাহিনী।

ভাদ্রের বন্যায় মানবজীবনের যে সীমাহীন দুর্গতি এবং ভাগ্যবিপর্যয়ের সূত্রপাত, যুদ্ধের বোমারু বিমানের আনাগোনায় তা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও মানবের এই দানব মূর্তিতে জীবন রুগ্ণ, বিকৃত, পঙ্গু, অসহায়। নরমুণ্ড গড়াগড়ি তাই আর কথার কথা নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য। গ্রাম জুড়ে চলেছে মৃত্যুর এই তাণ্ডবলীলা।

'গ্রামে কাক নাই, কুকুর নাই, অন্নহীন গ্রাম ছেড়ে নরমাংস লোভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে। আকাশে প্রায় অহরহই শকুনের পাল পাক খেয়ে উড়ছে দেখা যায়।'

নিয়তির মত শক্তিমান প্রকৃতির এই বিচিত্র খেলায় মানুষের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। প্রকৃতির খেলার পুতুল সে। প্রকৃতিও উদাস, অক্ষম, মানুষের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের শরিক নয় সে। বাহ্যতঃ একথা মনে হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। মিথ্যা প্রমাণের জন্য লেখক একটি শাখা-কাহিনী যুক্ত করেছেন। অমনি গল্প একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়েছে। প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং সাহচর্যের ভূমিকা তার ফলে উজ্জ্বল হল আরো। জীবনে অনিবার্যরূপে যা উপস্থিত লেখক কেবল তারই আবরণ মোচন করেছেন।

ডাক্তার মিহির মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাননিষ্ঠ সচেতন মন আণুর স্ত্রীর বোবা কান্নার ভেতর দিয়ে মানবভাগ্যের নিষ্করুণ ট্রাজেডির মর্মকথাটি ব্যক্ত করেছে।

'এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। মৃত্যুকে মানুষ আপনার স্বার্থের জন্য ব্যবহার করছে। যুদ্ধ সৃষ্টি করলে, দলে দলে মানুষ মারলে, মহামারী এল, মহামারীতে দেশ শশ্মান হয়ে গেল। প্রতিকারের পথ রুদ্ধ। বিজ্ঞান পঙ্গু।'

মানুষের কুচক্রের কাছে পরাজিত প্রকৃতি অত্যন্ত অসহায়, প্রতিকূল পরিবেশের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে নির্লিপ্তের মত নির্বিকারভাবে নিয়তিরূপ অদৃষ্টকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

নিসর্গকে মানবায়িত করে তারাশঙ্কর আণুর স্ত্রীর মধ্যে তাকে অনির্বচনীয় করে আঁকলেন। জননী বসুন্ধরার মূর্তির সঙ্গে আণুর স্ত্রীর সোনার প্রতিমার পার্থক্য নেই। জননী বসুন্ধরার মত নির্বাক অবগুণ্ঠিত সর্বাঙ্গী সে, তার ভাগ্যহত সকরুণ বেদনাকাতর নিস্পন্দ পাথর-প্রতিম বৈধব্যমূর্তি যেন হৃৎসর্বস্বা রিক্তা বসুন্ধরার প্রতীক।

মানুষ তার নিজের সত্তা দিয়ে প্রকৃতির বিবিধ প্রাণলীলায় নিজেকে অনুভব করার যে ক্ষমতার অধিকারী বেদনা এবং অশ্রুপাত থেকে এখানে সেই উপলব্ধি উদ্গত। আণুর স্ত্রীর মধ্যে জননী বসুন্ধরার বেদনা করুণ নিঃস্ব রূপ প্রত্যক্ষ ক'রে ডাক্তার, ত্রিপুরা ভট্টাচার্য এবং শশীডোমের বুক হাহাকার করে ওঠে, বিস্ময়ে চোখ স্থির হয়ে যায় তার দিকে তাকালে।

'অপূর্ব সুন্দর মুখ। রুক্ষ ঘন চুল। অদ্ভুত বড় দুটি চোখ—হাঁ, অদ্ভুত, এতবড় চোখে একটি ছাড়া কোন ভাষা নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। নারীসুলভ লজ্জাতেও সে দৃষ্টি নত হয় না।'

নিসর্গের কাঙাল রূপের সঙ্গে এক সমান্তরাল রেখায় মিলে গেছে আণুর স্ত্রীর নিরাভবণ রূপের দীনতা। পৃথিবীর চারপাশে ছডানো গাছপালা, আকাশ বাতাস বস্তুপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে তাকে দেখেছেন।

'বউটির আশপাশ চারদিকের মাঠ ঘাট সমস্ত খাঁ খাঁ করছে, যেন বউটি ওই খাঁ খাঁ করা খালি হাত বুলিয়ে দিয়েছে সমস্ত কিছুর উপর।'

বিশ্বরহস্যের সঙ্গে একত্রিত করে আস্বাদন করেই তারাশঙ্করের আত্মিক তৃপ্তি।

মাতা বসুমতীর সঙ্গে তাকে অভেদ কবে দেখাব ফলে চরিত্রগুলি তাব জন্য একটা বেদনা অনুভব কবে। এরা সবলেই তাব অসুস্থ সন্তানের আবোগ্যেব জন্য উৎকণ্ঠিত। ঐ সন্তানটিব কিছু হলে মেয়েটিব কোমল স্নেহাতুব প্রাণে আঘাত লাগবে সেই কথা ভেবে উক্ত চবিত্রগুলো শিউবে ওঠে। আণুব স্ত্রীব কোন উদ্বেগ নেই। 'অদ্ভুত ওই তরুণী মেয়েটি।' অসহায বসুন্ধবাব মত সন্তান কোলে কবে আগলে বসে আছে। এর অতিবিক্ত কবাব কিছু নেই। মানুষী চেষ্টা ব্যর্থ কবে দিয়ে ঐ সন্তানটি যখন ইহলোকেব মাযা কাটাল তখন ঘুমে সে আচ্ছন্ন। অর্থাৎ, প্রকৃতি যে জড, লেখক তার মানুষী সত্তায তাকেও মুদ্রিত কবে দিয়েছেন। বসুন্ধবাব সঙ্গে তাব সম্পর্কটি চেতন-অচেতনেব একাত্মতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। শশীব শোকার্ত চীৎকাবে তাব ঘুম ভাঙে। অর্থাৎ মানুষেব বুকফাটা হাহাকাবে আকাশ বাতাসে যখন চাঞ্চল্য জাগে তখনই প্রকৃতিব জডত্ব মোচন হয়, ঘুম থেকে জেগে উঠে আণুব স্ত্রীও সচেতনভাবে অনুভব কবে সন্তানেব দেহের মৃত্যুর শীতলতা। তাব নীবব অসহায় কান্না মাতা বসুমতীব মত ভাষাহীন, ধ্বনিহীন।

'বোবার শোকার্ত চীৎকার, তার মধ্যে কথা নাই, শুধু একটানা লম্বা বেদনায় তরঙ্গায়িত একখানি হাঁ্যা কণ্ঠস্বর। এমন কান্না আর হয় না।'

আণুর স্ত্রী মাতা বসুমতীর প্রতীকে রূপান্তবিত। বোবা মেয়ের এই কান্না বিশ্বনিখিলে তাই পবিব্যাপ্ত হয়ে যায়। ডাক্তার নিজেকে বিশ্বেব মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিযে শুনতে পায বোবা মেয়ের কান্না।

'সমস্ত পৃথিবীময় ওর কান্না ছডিয়ে পড়েছে। ডাক্তারের মনে হল ও কান্না যেন কখনও থামবে না। চারদিকে কান্না। মানুষ মরছে। মরবে। আর বোধ হয় তাব নিষ্কৃতি নেই। এই তেরো'শ পঞ্চাশেই সব ধুয়ে মুছে যাবে।'

এ কান্নার চরিত্র দেখে মনে হয় জননী বসুন্ধবা যেন কাঁদছেন অনাদিকাল থেকে। ডাক্তারের কথায প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা ইঙ্গিত করে।

'ওই কান্নার মধ্যে থেকে সে শুনতে পাচ্ছে পৃথিবী মায়ের কান্না। তার চিকিৎসক জীবনে অনেক মায়ের অনেক শিশুকে সে মরতে দেখেছে, তাদের কান্নাও সে শুনেছে, কিন্তু এমনভাবে পৃথিবীর বুক থেকে আকাশলোক পর্যন্ত পূর্ণ করে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীত কাল থেকে প্রবহমান শোক-প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন কল্লধারার সন্ধান তাকে দেয় নাই।'

প্রকৃতিব দাক্ষায়ণী মূর্তির আব এক বিস্ময়কব রূপায়ণ 'সন্ধ্যামণি' গল্প। জীবনকে নিয়ে এক ভীষণ ও মধুবের লীলাখেলা গল্পটিকে বিশেষত্ব দিয়েছে। জীবনেব চতুর্দিকে যখন অন্ধকাব, ব্যথা জমে কঠিন হযে ওঠে, তখন এক জ্যোতির্মষ প্রকৃতিসত্তার আবির্ভাব প্রয়োজন হযে পডে। এ জন্য গঙ্গাব বেগবান প্রবাহেব তীরে দাঁড়িয়ে লেখক 'সন্ধ্যামণি' গল্পের ছবি এঁকেছেন। নিযতির ইঙ্গিতে যেন গঙ্গানদীব তীবভূমি একটা বিরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে কেনাবাম চাটুজ্যের অদৃষ্টরথের চক্রাবর্তনেব চিহ্ন অঙ্কিত করেছে। জড-প্রকৃতি এখানে ক্যানভাস্। দিনবাত্রিব প্রহব মুহূর্তভেদে গঙ্গার পরিবর্তনশীল রূপেব অন্তরালে যে মানবভাগ্যের শোচনীষ করুণ পবিণতির উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আত্মগোপন করে আছে লেখক পাঠকেব মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে আগ্রহী। এই চেষ্টা সফল হলেও, গল্পের পরিণামে কখনও তা প্রধান হয়ে ওঠেনি। গঙ্গার সীমাহীন বিস্তৃতির ওপব রৌদ্রছাযার খেলা এবং প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য ও ঔদাসীন্য যেন মানব চরিত্রগুলোব অন্তরে অন্তরে সংক্রামিত হয়ে বিচিত্র গল্পসম্পদ সৃষ্টি কবেছে।

'সন্ধ্যামণি' গল্পে কাহিনী গঙ্গাপ্রধান। ঘটনাগুলো সবই ঘটেছে গঙ্গার তীরভূমিতে। গঙ্গাকে বাদ দিলে ঘটনা মূল কাহিনী থেকে বিছিন্ন হযে পডে। গঙ্গার নিসর্গরূপের বর্ণনাব ভেতব দিয়ে গঙ্গার বিচিত্র সৃষ্টি-প্রবাহেব গোপন উৎস-ভূমিটি কালেব হাতে গড়া ঐক্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

'সম্মুখে মেঘলা আকাশের বুক হইতে মাটির কোল পর্যন্ত অখণ্ড নিবিড় অন্ধকার। নিম্নে আপনার গর্ভে মৃদুস্বরা গঙ্গা রূপার পাতের মত চক্ চক্ করিতেছে। ঘাটের উপরেই প্রাচীন অশ্বথ গাছটার কোনও কোটরে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। তার তীক্ষ্ণ কর্কশরবে সর্বাঙ্গ শির শির করে।'

গঙ্গার অপরিবর্তিত স্বরূপ ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে প্রাচীন অশ্বথের বর্ণনায়। ভারতীয প্রকৃতির প্রতীক হল অশ্বত্থ গাছ। ভারতীয সংস্কৃতির ধারা হল প্রাণপ্রবাহিণী গঙ্গা। লেখক এই দুটি প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের সুখ-দুঃখের সাক্ষী করে অবিনশ্বর জীবনরহস্যেব স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। এছাড়া, নিসর্গের রূপ বর্ণনা-কৌশলের মধ্যে আছে তারাশঙ্করের শিল্প-চাতুর্য। উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে আকাশের কালিমা জলতলে প্রতিফলিত হয়ে যে গাঢ় তমিস্রার সূচনা করে

তা লেখকের চিন্তাধারাকে দিয়েছে মহাকালের উত্তরহীন রহস্যময় ভীষণ ঘোর করালরূপের উপলব্ধি। অপর পক্ষে, গঙ্গার স্রোতবেগে ধরা পড়েছে জীবনের আশ্চর্য ছন্দ। মানুষের সঙ্গে গঙ্গার স্রোতোবেগের একটা অদ্ভুত মিল আছে। যা জীবন্ত এবং চলন্ত তা কখনও থেমে থাকে না। গঙ্গার মত ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে সে কালস্রোতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। আবার, মানব-নিরপেক্ষ গঙ্গা-প্রবাহিণী মহাকালের তরঙ্গবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলেছে অন্তহীন পথে। চলাচলের পথে প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটি প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। আর তার গুপ্ত গহ্বরে লুকিয়ে অশুভ অমঙ্গলের প্রতীক পেঁচাটি যেন জীবনের প্রহর ঘোষণা করছে। জীবনের সঙ্গে মহাকালের চিরন্তন বিরোধের স্বরূপটি নির্ণয়ের জন্যই লেখক গঙ্গাকে ক্ষেত্র-রূপে নির্বাচন করেছেন।

'গঙ্গার মৃদুধ্বনি ছাপাইয়া কখনও দাঁড় ছপ্ ছপ্ করিয়া নৌকা চলে কাটোয়া বাজারের দিকে। নৌকার সঙ্গে চলে তার বুকের ক্ষীণ আলোক, গঙ্গার বুকে চলে তার তরঙ্গকম্পিত প্রতিবিম্ব। দূর শ্মশানঘাটে বোল শোনা যায়—বল হরি, হরি বোল।'

গঙ্গাঘাটের চালচিত্র হল এই। একদিকে বাজার, অন্য দিকে মহাশ্মশান। অর্থাৎ, জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে গঙ্গা অর্থাৎ প্রকৃতি নির্বিকার। গঙ্গা (প্রবাহ) জীবনের প্রতীক। তার বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই। তার যাত্রাপথ অবিরাম। মহাকালের হস্তক্ষেপ তার প্রচণ্ড জীবনীশক্তির ওপর খবরদারি করতে পারে না। পারে না তাকে নিশ্চিহ্ন করতে। জীবনের প্রবল গতিবেগে সে কেবলই এগিয়ে চলে। তাই পর্যুদস্ত মহাকাল যেন ক্লান্ত হয়ে গঙ্গার তীরে বুড়ো অশ্বত্থের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে বিচিত্র জীবনপ্রবাহ। অর্থাৎ, লেখক বলতে চেয়েছেন মৃত্যু মানেই সব শেষ নয়। জীবন বিরাট। মহাকালের রক্তচক্ষুও ভয় দেখাতে পারে না তাকে। জীবনের জয় ঘোষণার জন্য তারাশঙ্কর প্রাণের প্রতীক গঙ্গাকে বেছে নিয়েছেন। 'সন্ধ্যামণি' গল্পে সমস্ত কাহিনীটা তাই গঙ্গাকে নিয়ে। গঙ্গার তীরে এই কাহিনীর সূচনা এবং গঙ্গার ঘাটেই তার পুষ্টি।

মূল কাহিনীতে আছে কেনারাম চাটুজ্যে, কুসুম চণ্ডাল ও পৈরু। কন্যাহারার দুঃখ-শোক কেনারাম চাটুজ্যের এত বড় হয়ে উঠেছে যে, স্ত্রী কুসুমও পর্যন্ত তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে! তারপর থেকে, 'কেনারাম কাহারও কড়ি ধারে না। বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ সে।' কারণ, কেনারামের বিশ্বাস সন্ধ্যামণির বিয়োগ-ব্যথার কোন দুঃখ কুসুমকে স্পর্শ করেনি। তাই কন্যাহারা শোকার্ত পিতা কুসুমের ওপর অভিমান নিয়ে বিবাগী হয়েছে।

গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঐকতানের মধ্যে এদের জীবনের শোক-দুঃখ, ভালোবাসাবাসির একটা বিশেষ স্থান আছে। প্রকৃতির সঙ্গে সেই সম্পর্কটি আস্বাদন করার জন্য এই চরিত্র দুটির মানসিকতায় একধরনের রিক্ততা, নির্লিপ্ততা ও উদার প্রশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে, প্রকৃতির মধ্যে তারা যে পরিব্যাপ্ত সেই কথাটিকে স্পষ্ট করার জন্য গঙ্গাকে সূত্রধর করে দেখানো হয়েছে। গঙ্গার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটি বোঝানোর অভিপ্রায়ে লেখক situation-এর কৌশলে চাটুজ্যেকে দিয়ে সন্ধ্যামণির বয়সী একটি মেয়ের দাহের কাজে তাকে ব্যাপৃত করে জীবন রহস্যের এক নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটন করলেন। গঙ্গার উপকূলস্থ শ্মশানঘাটে জীবনের এক নতুন নাটকের সূত্রপাত হল। চণ্ডাল পৈরু তার একমাত্র দর্শক।

পৃথিবীর আদিম সন্তান পৈরু। তার কথায়, কর্মে, বিশ্বাসে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ। লেখক সুকৌশলে তাকে দিয়ে সূত্রধরের কাজ করালেন। প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের ভেতর সংগতি সুষমা একমাত্র আবিষ্কার করেছে সে। চাটুজ্যের মনে পত্নীর সম্বন্ধে যে অভিমান, সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল, বিশেষ আবেগমধুর মুহূর্তে পৈরু তার নিরসন করে। চাটুজ্যের প্রাণের ভেতর নতুন সুরের রাগিণী বাজে আশাবরীর রাগে। কিন্তু মনের ভেতর জমিয়ে-বসা সন্দেহের অবসান হয় না কিছুতে। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে চুপি চুপি কুসুমের কান্না শুনে এসে বহুদিন পর একটা অসীম তৃপ্তি বোধ করে। এবং একটা নিশ্চিন্ত প্রশান্তি নিয়ে পৈরুর ঘরে শুয়ে রাত কাটায়। ছোট গল্পের suspense রেখে গল্পের শেষ করার সুযোগ ছিল এখানে। কিন্তু লেখক প্রকৃতিবৃত্তে গল্পটির পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য কাহিনীটির সম্প্রসারণ করেছেন। চাটুজ্যে ও কুসুমের মিলনের পথে সন্ধ্যামণির স্মৃতি যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল তার অবসানের জন্য একটা সুন্দর pose-এর সাহায্য নিয়েছেন।

সন্ধ্যামণির হাতে লাগানো একটি ফুলগাছে বহুদিন পর ফুল ধরেছে। ঐ প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুগন্ধে রয়েছে সন্ধ্যামণির কচি হাতের স্পর্শমাখা সৌরভ। সেই ফুলগাছটিকে মধ্যবর্তী করে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন। গঙ্গার ঘাট তাদের মিলনের সাক্ষী। আর ঠিক সেই মুহূর্তে গঙ্গার ঘাটে দোকানীরা পসরা সাজিয়ে হাঁক দেয়—'গঙ্গাজল নিয়ে যান মা।' অর্থাৎ মৃত্যুই চরম পরিণতি নয়। 'জীবনের নিমন্ত্রণ লোকে লোকে নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে'।

'কুসুম সজল বক্ষে প্রত্যাশার হাসি হাসিয়া বলিল—সে আবার আসবে।'

জন্মান্তরবাদের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করে লেখক নিজের প্রগাঢ় জীবন-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই জীবনসত্যের উপলব্ধি একমাত্র প্রকৃতি-প্রীতির সূত্রেই সম্ভব হয়েছে। জীবনের শূন্যতা এবং অপূর্ণতা এই দু'য়ের পারস্পরিক অভিঘাতেই গঠিত হয়েছে নিসর্গ চেতনা।

৬

শ্রমজীবী মানুষের প্রাণলীলাতেও প্রকৃতির মহিমা অভিব্যক্ত। 'ইমারত' গল্পে রাজমিস্ত্রি জনাব তারাশঙ্করের জীবনমন্ত্র উচ্চারণ করেছে। জনাবকে শিল্পী গড়েছেন নিজের অভিজ্ঞতার মাটিতে, ভাবকল্পনার প্রত্যয়-মাধুরী মিশিয়ে।

জনাব জাত শিল্পী। প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্য তার শিল্প-প্রেরণার পাথেয়।

'খোদা তায়লা দুনিয়া তৈরি করলেন—কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন—সমান মেঝের দুনিয়ায় ক্ষেত গড়'লেন—কিনারায় কিনারায় সমুদ্দুর। তাঁর কাছ থেকেই না বড বড মানুষ দামি মগজে ভরে নিয়ে এই সেই বিদ্যা।'

সেই ঐশ্বরিক বিদ্যাকে আয়ত্ত করার স্বপ্ন জনাবের দু চোখে। শ্যামদাসবাবুকে তাই সে বলে, 'মন্দির হবে, দেবতার মন্দির আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উঁচা করে খাড়া থাকবে, সুরুযের আলো পড়ে সোনার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোক ঘুম ভাঙবে সকালে আল্লাকে—ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিরে চূড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে।'

জনাবের শিল্পপ্রবণতা প্রকৃতিরই দান। প্রকৃতিই তাকে নিজে হাতে স্রষ্টা করে গড়েছে। স্রষ্টার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মাধুর্য। আদিম মানুষের প্রাণাবেগে তা সুন্দর, কদর্য কামনায় অসুস্থ কিংবা বিকৃত নয়। শিল্পীর জীবনের প্রকাশ এবং বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীরূপে ভেবেছেন লেখক। অভিজ্ঞতার পাত্রে জীবনের আস্বাদন জনাবকে প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী করেছে সত্য। কিন্তু কখনও পশু করেনি। প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকের গূঢ় তাৎপর্য আরাধনায় বিভোর চোখ দুটি তাকে তন্ত্রাচারী করেছে। নারী তার উপাচার মাত্র। তাই সে বলে,

'রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, হামিনদা, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রাণী সই, মতি নাতবৌ, দাস নাতনী—অহরহ কাজকর্মের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাতে লাগে, চোখে চোখে রাখতে হয়, পায়ে ইঁট পড়লে আহা বলে ভারার ওপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয়, আঁচল দিয়ে, তাদের ওপর দিল না পড়ে উপায় কি?'

জনাবের জীবনে নারীর এই স্নেহ-ভালবাসা, দরদ এবং তার নিকট-সান্নিধ্য প্রকৃতির মতই পরম-রমণীয়। নারী এখানে প্রকৃতিব প্রতীক। প্রকৃতি এবং নারীতে বাইরে ও অন্তরে মিল অনেক। তাই নাবীকে ভালোবাসার ভেতর দিয়ে প্রকৃতির স্পর্শ লাভ কবেছে সে। প্রকৃতপক্ষে লালসা-কামনার উত্তাল জোয়ারে তার জীবনস্রোত প্রবাহিত করে লেখক এই ব্যঞ্জনাকে আরো স্পষ্ট করেছেন। প্রবৃত্তিব অসংযত অতিচার মাঝে মাঝে ব্যাধি সৃষ্টি করে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। বোগমুক্ত হযে আবার প্রকৃতির নিয়মের অধীন হয়। এদিক দিয়ে বন্য প্রাণীব মত আদিম সে। তার জীবনেব সকল ছন্দ যেন বন্য-বর্বব প্রাণাবেগের সুরে বাঁধা।

জনাবেব প্রতি লেখকের একধবনেব দুর্বলতা আছে। প্রকৃতিব শিশুরূপে জনাবকে চিনতে যাতে ভুল না হয সেজন্য একটা চমৎকার কৌশলের আশ্রয নিলেন। উদ্দেশ্য, গল্পটিকে প্রকৃতির ছত্রছাযায পুষ্ট করা। সেজন্য লেখক লিখলেন,

'শ্যামদাসবাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য একটা কথা।'

লেখকেব এই সৃষ্টিপ্রবণতা গল্পবসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বাস্তব পৃথিবী থেকে সরে এসে লেখক কল্পনাব আশ্রয় নিযেছেন। রুগ্‌ণ জনাবকে থামিযে দিয়ে তার কণ্ঠে দিযেছেন স্বপ্নেব বাণী।

রুগ্ন জনাব দেশে ফিরে এসে গ্রামেব বাইরে এক প্রাগৈতিহাসিক বুড়ো বটের তলায আস্তানা গাডলে। বুড়ো বট বলতে এখানে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতিকে বোঝানো হযেছে। প্রাচীন কালে বৃদ্ধেরা যেমন বানপ্রস্থে গমন করত, লেখকও তেমনি জনাবকে বৃদ্ধবয়সে লোকালযের বাইরে, নিরালা বটের ছায়ায একখানা কুঁড়ে দিয়ে তার বানপ্রস্থেব ব্যবস্থা করেছেন। বৃদ্ধ বযসে সংসারে, সমাজে স্থান যখন সংকীর্ণ হযে আসে, অপ্রয়োজনীয হয়ে পড়ে তখন প্রকৃতির কাছেই পায় সে সর্বশেষ আশ্রয়। প্রকৃতিজগৎ কাউকে বর্জন করে না, সকলকেই সমাদব কবে কাছে টেনে নেয়। জনাবের ক্ষেত্রেও সেই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে কোন কষ্ট হয় না। প্রকৃতিব মহিমাকে সর্বদেহে মনে নির্জন অবসরে আবো গভীর কবে অনুভব করার জন্যই যেন এবকম করা হযেছে। এই বটগাছ জনাবের জীবনে অনেক কিছুরই সাক্ষী। তার প্রথম যৌবনের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এখানে। সেই বটেব তলাতেই আজ সে নিঃশক্তি, ক্ষমতাহীন। মনের চঞ্চলতা উত্তেজনার সব শেষ। তবু এখানেই স্বাভাবিক সে। এক অপূর্ব প্রশান্তিতে মগ্ন

হয়ে যায় সে। মনে তার ক্ষোভ থাকে না। কালের প্রহরীরূপে বুড়ো বটগাছ তার একমাত্র সাক্ষী।

আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের মধ্যে সে খোঁজে তার অতীত। আপনার স্বষ্টি-লোককে কালো মেঘের স্তূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। তাব সমস্ত শিল্পকর্ম প্রকৃতিলোকের সামগ্রী হয়ে ওঠে। প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যেব সঙ্গে তার একটা অভিন্নতা স্বষ্টি হয়। কারণ, বিশ্বস্রষ্টাব স্বষ্টি-সৌন্দর্য জনাবের দু-চোখে যে বিস্ময়েব স্বষ্টি করে তাই ছিল তার শিল্পীজীবনের একমাত্র আরাধনা। জীবন সায়াহ্নে, অথর্ব, অকর্ম, জনাব আকাশেব ঘন মেঘের মধ্যে সেই স্বষ্টি-স্বপ্নেব সফল প্রযাসকে বিশ্ব-স্রষ্টার স্বষ্টির সঙ্গে এক করে দেখে এক ধরনেব তৃপ্তি এবং সান্ত্বনা পায।

'শুধু মেঘ। বাহারে। চমৎকার মেঘ। বাঃ শাদা মেঘ যেন ঠিক গির্জার চূড়া হযে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশঃ সরু সূচালো হয়ে মিশে গিযেছে। দুনিযার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি সে ফেরালে এবার। ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টি নেমে আসছে। জনাব তাকালে মাথার উপরে বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদা তায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত। সব ঝাপ্সা হযে গিযেছে এইটুকু ছাড়া।'

গল্পের শেষ এখানে। প্রকৃতির বিশালতাব মধ্যে সমস্ত গল্পটিকে মুক্তি দিযে তারাশঙ্কব এর অসীমতা এবং ব্যাপ্তি দুই এনেছেন গল্পে।

৭

তারাশঙ্করের গল্পে কোথাও প্রকৃতিকে অস্বীকাব কবার উপায নেই। এক নতুন প্রকৃতি-ভাবনা মূর্ত হযে উঠেছে তাঁর গল্পেব আঙ্গিকে। এজন্য ছোটগল্পের শিল্পমূল্য অনেক সময় ব্যাহত হয়েছে। শিল্পী নিজেও সে বিষযে সচেতন।

'জীবনের চাহিদাতেই আইডিয়া অথবা আদর্শের কলম স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে জোড়া যায়। তাতে যদি আমাদের ফলফুল ছায়ার সম্ভাবনা বাড়ে তাতে আপত্তি নেই।' (সাহিত্যের সত্য—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায)।

এইদিক দিয়ে বিচাব করলে তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে শিল্পী হিসাবে আস্বাদনপন্থী। প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতার কঠিন বস্তুশরীরে গভীব প্রত্যয়ের প্রলেপ দিয়ে তাঁর শিল্প-কাঠামো তিনি গড়ে তুলেছেন। তিল তিল কবে সংগ্রহ করা সম্পদবাশি দিয়ে অসংখ্য বিচিত্র উপলব্ধিকে একটি অখণ্ডতা দান করেছেন—যেখানে ছোট-বড, ভদ্র-অভদ্র সব এক।

———

তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রেমেব তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত তো ঘটতেই পারে, কিন্তু প্রেমের গল্প সার্থক যেখানে, সেখানে কলাকৌশলেব বিশেষত্বটাই বোধ হয আসল কথা। এই ভাবনাব সূত্রেই ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে তাবাশঙ্করেব একটু তুলনাব ইচ্ছে জাগে।

তাবাশঙ্করের উপন্যাসেব তুলনায তাবাশঙ্কবের গল্পই আমার প্রিয মনে হয়। 'বসকলি', 'তমসা', 'নাবী ও নাগিনী', 'জাযা', 'রাধারাণী' ইত্যাদি তাঁব অনেক গল্পেবই বিষযবস্তু মূলতঃ প্রেম। প্রেম মানে, ভালবাসা—মানে, স্ত্রী-পুরুষেব দেহ-মনের টান। এবং এই ব্যাপাবেও হযতো মোপাসাঁব ভাবনা—আনাতোল ফ্রাঁস যা সোজাসুজি তাবিফ ক'রে লিখেছিলেন, সেই সিদ্ধান্তই ধর্তব্য। অর্থাৎ প্রেম চিরকালেব বটে, কিন্তু তারও ভাব-ভঙ্গি বদ্‌লায। পঁচিশ বছর পরপর মানুষের বিশ্বাস, আচবণ, মতামত, ভাব-ভঙ্গি—এসবই অন্যান্য প্রসঙ্গেও যেমন, ভালবাসার ক্ষেত্রেও তেমনিই হযতো বদ্‌লে যায়। অর্থাৎ মূলে যে প্রেম স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেরই প্রার্থনা, দেশে-দেশে কালে-কালে সেই ভালবাসাও বিচিত্রভাষী। বলা বাহুল্য, অন্যান্য ভাবনাব মতন সব লেখক প্রেমেব ভাবনাও মোটেই ঠিক একভাবে ভাবেন না। আমাদেব সাহিত্যে ববীন্দ্রযুগের তারাশঙ্কব, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকেই প্রেমের গল্প লিখেছেন। সে-সব গল্পেব স্বাদ বিচিত্র এবং প্রাযশঃই তাদেব আবেদন স্বাদু। তবে প্রেমেব তত্ত্ব সম্বন্ধে মতান্তব স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেমেব তত্ত্বসম্পর্কিত বিচাব-বিশ্লেষণেব উদ্যোগ নয এ বচনা। প্রেমের গল্পেব বীতির দিকটিই দ্রষ্টব্য।

'তাবাশঙ্করেব প্রেমের গল্প' নামে এক সংকলন বেবোয ১৩৩৬ সালে। তাতে বাবোটি গল্প ছিল। ওপরে যে পাঁচটির নাম কবা হযেছে, তদুপবি ছিল তাঁর 'বেদেনী', 'মানুষের মন', 'রাঙাদিদি', 'ঘাসেব ফুল', 'নাবী', 'প্রত্যাবর্তন' এবং 'শেষ কথা'। এই মোট বাবোটি গল্পের সঙ্গে আবো গল্প যোগ করা যেতে পাবতো। কিন্তু প্রকাশক তা করেননি। তাঁরা বারোটি প্রেমের গল্পের একটি গুচ্ছ বেঁধেছিলেন। প্রত্যেকটি গল্পই স্বাদু, সংহত, ব্যঞ্জনাময়। এবং আমাদের এই চেনা পৃথিবী, চেনা ঘর-সংসারই প্রেমের রঙে কী যে রঙীন হয়ে ওঠে, তা বোঝা যায় ঐসব গল্প থেকেও।

সকলেই জানেন, সত্যিকার ভূতের গল্পে অলৌকিকতার আবহাওয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান। প্রেমের গল্পেও কিন্তু আর একভাবে অলৌকিক ভাব জেগে ওঠে, কারণ, সাধারণ বাস্তব জীবনেই প্রেম এক অসামান্য বিস্ময়ের দ্যোতক হয়ে দেখা দেয়। অথবা, বিষয়ের দিক থেকে যাই হোক্, সাধারণভাবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, যে-কোনো সার্থক শিল্পরচনায় রচনাকৌশলের মধ্যেই অসামান্য অলৌকিক বিস্ময়ের ভাব জড়িত হয়ে যায়। সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন জাতিবিভাগ চল্‌তে পারে। যেমন, কবি অমিয় চক্রবর্তী একদা প্রমথ চৌধুরীর গল্প সম্পর্কে ছোট একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রক্রিয়ার কথা তুলে লেখেন—"রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মুখ্যতঃ প্রবাহধর্মী এবং চলোর্মিচঞ্চল"। এ থেকে খুব স্পষ্ট ক'রে কিছু ধরা না গেলেও এর ইঙ্গিতটি বোঝা যায় যখন একই চিন্তাধারায় সেই নিবন্ধেই একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি জানান—"প্রমথ চৌধুরী একান্তভাবেই স্থাপত্যশিল্পী"। কখনো কখনো মনে হয়, তারাশঙ্কর তাঁর প্রেমের গল্পের ব্যাপারে যতো কবিত্বময়, সে-অনুপাতে স্থাপত্যশিল্পী নন। কিন্তু এরকম অভিমতও অকাট্য নয়।

অথবা, তারাশঙ্করকে তাঁর এই প্রেমের গল্পগুলির প্রসঙ্গে রীতির দিক থেকে একই সঙ্গে 'চলোর্মিচঞ্চল' এবং 'স্থাপত্যশিল্পী'—দুই-ই বলতে ইচ্ছে হয়। এই মনোভাবটি একটু বিশদ ব্যাখ্যার সামগ্রী। তাই আদিতেই তাঁর একটি প্রেমের গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রেমের গল্প মিলিয়ে দেখলে সুবিধা হয়। অবশ্য একটি ফুলেই সমস্ত ফুলবাগানের স্বাদ পাওয়া যায়—এ মত সকলে মানবেন না। তবে সমুদ্রের স্বাদ এক চামচে সমুদ্রজলেই কতকটা তো বর্তায়।

১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠের রচনা রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' একটি প্রসিদ্ধ গল্প। পর-পর সাতটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে এই গল্প-বস্তুর ধারাটি ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম থেকেই ঘটনাস্রোত বেশ তরঙ্গসঙ্কুল ছিল। তবে প্রথম পরিচ্ছেদটিতেই সেই অভিপ্রেত ঘটনাগতির সূচনার জন্যে লেখক একটু বেশি জায়গা নিয়েছিলেন, যদিও রবীন্দ্রনাথের উপমা-সৌকর্যের অন্ত ছিলনা সেখানেও। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি নিতান্ত সাধারণ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বাক্যেরও একই প্রকৃতি, যেমন—

> "নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্য-রসের কোনো নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে, এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে

প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটাব মধ্যে নিবাবণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনোরূপ চিন্তা তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।”

এই প্রথম অনুচ্ছেদ দেখে এ-গল্পের ভাষারীতি সম্বন্ধে চলোর্মিপ্রবাহ ধর্মী কথাটি উচ্চাবণ কবতেও ইচ্ছে হয না। এ খুবই সাধাবণ শাদামাটা সাধুবীতির বাংলাভাষাব প্রবাহ—এবং নিবাবণেব সংসাব যেমন ‘সচবাচব’ বকমের, এখানকাব এই উপস্থাপনাও তেমনি মামুলি, এতে বৈশিষ্ট্য শুধু এইটুকু যে, পুবোনো চটিজোড়াব মধ্যে পাদুটো যেমন নিশ্চিন্ত থাকে, নিবাবণেব জীবনেও তেমনি নিশ্চিন্ততার ভাব বোঝবাব জন্যে রবীন্দ্রনাথ চমৎকাব উপমাটিকে কাজে লাগিযেছেন। গল্পটিব পাঠ শেষ হযে গেলে এতে স্থাপত্যের অংশই বরং বেশি বোঝা যায।

এই গল্পেব সঙ্গে তাবাশঙ্কবের ‘নাবী ও নগিনী’ব কতকটা বিষয়গত সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষণীয। দুটিই প্রেমেব গল্প। কিন্তু বিষয-সমাবেশের মধ্যেও অনেক ভেদ স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথেব ‘মধ্যবর্তিনী’তে নিবাবণ-হরসুন্দবী-শৈলবালা, এই তিন পাত্র-পাত্রী, তারাশঙ্কবেব ‘নারী ও নাগিনী’তে খোঁড়া শেখ, জোবেদা, উদযনাগ বংশেব ‘বিবি’ নামে নাগিনী—এই তিন পাত্র-পাত্রী। রবীন্দ্রনাথেব গল্পটিতে শৈলবালাব সঙ্গে নিবাবণেব বিবাহ ঘটে প্রথমা স্ত্রী হবসুন্দবীব উপবোধেব চাপে—এবং গল্পেব দ্বিতীয় পবিচ্ছেদেই হবসুন্দবী শৈলবালাব সঙ্গে নিজের দরদী পতিব বিবাহ ঘটিযে দিযেছে যখন, সেই পবিচ্ছেদেবই শেষদিকে নিবাবণেব মুখ থেকেই সে শুনতে বাধ্য হয—“ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহাব শবীব তেমন সবল নহে”, তৃতীয পরিচ্ছেদে পৌঁছে পাঠক দেখতে পান হরসুন্দরী—“আট বৎসব বযসে বাসরবাত্রে যে শয্যায় প্রথম শয়ন কবিযাছিল, আজ সাতাশ বৎসব পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল।” —এবং “শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখেব স্বাদ পাইল না।” রবীন্দ্রনাথ এই ট্র্যাজিক পরিস্থিতি শুধু বাক্যের চলোর্মিপ্রবাহেব যাদুতে ঘটাতে পেরেছেন,—অবিমিশ্র ভাষাগত আবেদনটুকুই তাঁর এই গল্পের বা তাঁর কোনো গল্পের মুখ্য আবেদন, এরকম কিছু বলা ঠিক হবে না। শৈলবালাকে নিবারণ এতো বেশি মনোযোগ দিযেছে যে, হরসুন্দরীর প্রতি তার যে দৃষ্টিকটু ধরনের উপেক্ষা ঘট্ছে, তার সে-খেযালই ছিল না। এইসূত্রেই রবীন্দ্রনাথেব প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যাটুকু তাঁব স্বভাবসিদ্ধ সার্থক উপমা-সংযোগে উচ্চারিত হয়—

(শৈলবালা) "এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মুহূর্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রেব মধ্যে আত্মবিসর্জন করিযা বোধ করি নদীর একটি মহৎ চবিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোযাবের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া বহে, তবে নদী কেবল নিজেব মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে"।

শৈলবালার এই অতিপ্রেমেব ভুবিভোজ একদিকে,—অন্যদিকে নিবারণের অবস্থা—"সে বেচারা কোনকালে জানিত না মানুষেব ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে। এমন সকল দুর্দাম দুবন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাব-কিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবাবে নযছয করিযা দেয"—এবং তৃতীয পক্ষ হরসুন্দবী অনুভব করে—"জীবনেব সফলতা হইতে যেন চিবকাল কে তাহাকে বঞ্চিত কবিযা আসিতেছে"—ববীন্দ্রনাথ তাঁর পবমাশ্চর্য ভাষায় এবং পবমাশ্চর্য সংক্ষিপ্ত ও উপমাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণেব সাহায্যে গল্পের তৃতীয পরিচ্ছেদের মধ্যেই প্রথম পর্বেব ট্র্যাজেডি দেখিযে দিযেছেন।

পরবর্তী স্তবেব ট্র্যাজেডির জন্যে চার, পাঁচ, ছয—ছোটো ছোটো এই তিনটি সবল, উত্তেজক ও অনিবার্য পরিচ্ছেদ-যোজনাব স্থাপত্যও ববীন্দ্রনাথেবই কীর্তি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেব শেষ দুটি অনুচ্ছেদ তুলে দেখা যাক্। তখন ম্যাকমোরান কোম্পানির হেড্বাবু নিবারণ দ্বিতীযা পত্নীব আদবেব দাবি মেটাতে গিযে কঠিন ঋণজালে আবদ্ধ হযে পৈতৃক বাড়ি বেচে দিযেছেন, তাঁর চাকবটিও গেছে—তাঁর "স্থাবব-জঙ্গমেব মধ্যে বহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী"। ইতিমধ্যে সেই বিধ্বস্ত পবিবারটিকে গলির মধ্যে অন্য একটি ছোটো স্যাঁতসেঁতে নিবাসে আশ্রয নিতে হযেছে এবং শৈলবালা তখন সত্যিই গুরুতব অসুস্থা—

"শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িযা ফেলিত, অবেৎ সময কাঁচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে বাগিযা কাঁদিযা অনর্থপাত কবিত। হরসুন্দবী তাহাকে 'লক্ষ্মী আমার', 'বোন আমার', 'দিদি আমার' বলিযা শিশুর মতো ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইযা

পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।"

এই অপ্রত্যাশিত পরিণামের নাটকীয়তা অণুমাত্র কৃত্রিম বা আরোপিত বা উদ্ভট নয়। জীবনের নাট্যকার এইভাবেই হঠাৎ আলোয় উজ্জ্বল মঞ্চে সমস্ত পাদপ্রদীপ নিভিয়ে, যবনিকা ফেলে দেবার ব্যবস্থা রেখে দেন। তারাশঙ্কর তাঁর 'নারী ও নাগিনী'তে যে খোঁড়া-শেখ চরিত্রটিকে জোবেদা-বিবির সঙ্গে ঘরকন্নায় বেঁধে একটি উদয়নাগ সর্পিনীকে মধ্যবর্তিনী রেখে, পরিণামে সেই সাপিনীর দংশনেই জোবেদার প্রাণান্ত ঘটিয়ে,—সঙ্গে-সঙ্গে সাপিনীকেও মুক্তি দিয়ে উপসংহারের সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে লেখেন—

> "বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শুধ তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।"

রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য গল্পের চরিত্রও সেরকম নয়, পরিস্থিতিও এক নয়, রীতিকৌশলও সম্পূর্ণ অন্য স্তরের। তাছাড়া 'মধ্যবর্তিনীর' ট্র্যাজেডি তো এক স্তরেই পরিসমাপ্ত নয়,—আগেই প্রথম স্তরটি দেখা গেছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরসুন্দরীর পরাজয়ে ও তার প্রতি নিবারণের উপেক্ষায় চিহ্নিত। দ্বিতীয় স্তরের ট্র্যাজেডি শুধু বিষয়-সম্পত্তিহারানো নিঃস্বতার মধ্যেই নয়, সেটুকু গল্পের সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষ দুটি অনুচ্ছেদে ব্যক্ত—

> "একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমতো সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।
>
> হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।"

তত্ত্বের দিক থেকে ভাবতে গেলে, প্রেম—মানে, নর-নারীর ভালবাসা যে স্থায়ী বা অস্থায়ী এক অকাট্য, নৈসর্গিক টান, সে-বিষয়ে সত্যিই কি কোনো

সন্দেহের অবকাশ আছে? তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্পে জোবেদার প্রতি খোঁড়া-শেখের সেরকম কোনো তীব্র টানের চিহ্ন নেই,—এবং 'বিবি' নামে সাপিনীটির প্রতি তার সেরকম কোনো টান ঘটবারও কথা নয়। সেক্ষেত্রে সাপিনী সম্বন্ধে সাপুড়েব পেশাগত আগ্রহ একবকম তীব্র আসক্তিতে পবিণত হয়েছিল বটে। দাম্পত্যের অভ্যাস, বৃত্তির বা জীবিকাব অভ্যাস—জীবনেব অন্যান্য বড়ো বড়ো অভ্যাসগুলোব মতন এসব অভ্যাসও বেশ আশ্রয় হযে ওঠে। 'নারী ও নাগিনী'তে সেই অভ্যাসের আকর্ষণে পড়েই খোঁড়া-শেখ তাব কষ্টের সংসারের চাপ সত্ত্বেও 'বিবি'র জন্যে একটি সোনাব মিনি কিনে এনে 'বিবি'কে পরিযে দিয়েছিল এবং আযনায সেই সাজে সজ্জিত 'বিবি'কে নিজেব মুখ দেখিযেছিল। অপর পক্ষে সর্পদংশনে জোবেদাব মৃত্যু ঘটে গেলে সে হঠাৎ তার দাম্পত্য অভ্যাসের আবাম থেকে আশ্রযচ্যুত হয। ফলে—"বীভৎস ভযঙ্কব মুখ সকরুণ করিযা" জোবেদাব মৃতদেহেব শিয়বে সে কিছুক্ষণ বসেও ছিল। পবিণামে সে ফকির হয়ে যায। সেও কিন্তু সর্বহাবাব যন্ত্রণাতেই, জোবেদাব প্রতি গভীর প্রেমের তাডনায বা বেদনাবশে নয।

এতৎসত্ত্বেও 'নাবী ও নাগিনী' কেন যে 'প্রেমের গল্প' ব'লে গণ্য হবে, তা কিছুতেই বোধগম্য যুক্তিতে ধরা দেয না। এ তো বিশেষ অভ্যাস থেকে হঠাৎ বিপাতিত হবার বৈবাগ্য। বরং 'শেষকথা' গল্পেব ভবতপুবের জমিদাবিব মালিকানা বদলের সংঘর্ষের পবিপ্রেক্ষিতে সাউবাবুদের সঙ্গে হলদীবাডির সাঁই-জমিদাবদেব সীমানা-ঘটিত ফৌজদাবির আবহাওযায ভবতপুবের চাষীদেব চাঁই বৃদ্ধ লালমোহন পাণ্ডে এবং তার পত্নী,—তাবাশঙ্কবেব কথায—"যেমন দেবা, তেমনই দেবী, বুড়ার বুড়ীটি ঠিক ক্ষ্যাপার ক্ষেপীর মত"—সেই দম্পতিব দীর্ঘ সহাবস্থানঘটিত আকর্ষণ একবকম উচ্চতব আশ্রয়-চেতনায পবিণত হযেছিল। সে শুধু একই ঘবসংসাবে সহাবস্থান-জনিত নয,—ঘরসংসারেব প্রাত্যহিক প্রয়োজন-সম্পর্কের অতিশায়ী বুড়া লালামোহনের এক আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বে তার বুড়িটি আত্মনিবেদন করেছিল। জিঘাংসা ও পাপেব পথে নয়,—ক্ষমা, প্রেম, সেবার ও মৈত্রীর পথে—অর্থাৎ পুণ্যেব পথে থাকতে হবে, দীর্ঘজীবনচর্যার মধ্য দিযেই বুড়ির অন্তরে এই বোধ গভীর মূল বিস্তাব করে। লালমোহনের রূপাযণে হয়তো মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ থেকেই তারাশঙ্কর নিজের বোধে সেই জোব পেযে থাকবেন। তা যেখান থেকেই আসুক, সেই আশ্রয়-চেতনা সাধারণ শবীর-রক্ষার প্রবৃত্তি ঘটিত আকর্ষণ নয়,—তা মোটেই জৈব বা শারীবিক টান নয়,—বরং নিঃসন্দেহে তাকে বলা যায়,

এক উচ্চতর মূল্যবোধ। প্রেম যখন সেরকম মূল্যবোধের প্রতিশব্দ হয়, তখন বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, গান্ধী—এবং ভরতপুরের চাষীদের চাঁই বুড়া লালমোহন পাণ্ডে সবাই এক পংক্তিতে পাশাপাশি ব'সে যান। তারাশঙ্করেব প্রেমেব গল্পের এই আবেদনেব দিকটি ধর্তব্য। কোনো মানুষের জীবনে সেই মূল্যবোধের টান যখন জাগে, তখন মৃত্যুও তুচ্ছ হ'যে যায়। বুড়া যখনই বলেছিল লাঠি-সড়কি নিযে প্রতিপক্ষ আসুক না,—বুড়া মরতেই চায,—অহিংসার কাছে লজ্জা পেযে ফিরে যাক্ হিংসা,—তখন বুড়ি তাকে সেই মরবার সংকল্পে কোনো বাধা দেয়নি—এবং সাউবাবুদেব আটকখানায় বুড়া হাসতে হাসতে মরেছিল। বুড়ি বলেছিল—"মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দব।" একে 'অতিশযোক্তি' ব'লে, 'অবাস্তব' ব'লে তুচ্ছ করা কোনো রসিকের ধর্ম নয। তারাশঙ্কবেব 'তারিণী মাঝি'র বিপবীত প্রবৃত্তির প্রতিনিধি এই লালমোহন আর তার বুড়ি।

'সন্ধ্যা-সংগীত'-এব একটি কবিতা মনে পড়ে এই সূত্রে। 'অনুগ্রহ' নামেব সেই লেখাটিতে জগতের প্রভুকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তুমি কি ক্ষমতাব হাসি হেসে অনুগ্রহ ক'রে যুঁই ফুল ফুটিযেছ, নাকি ও তোমার ভালবাসাই ফুটেছে? বলেছিলেন—"ভালোবাসা স্বাধীন মহান/ভালবাসা পর্বত সমান"। তিনি তাঁর কিশোরকালেব সেই কবিতায প্রেম সম্বন্ধে খুবই পরিণত বোধের কথা প্রকাশ করেন। প্রেম যে অনুগ্রহ নয়, ভিক্ষাবৃত্তি নয়, কোনো নিষ্কলঙ্ক হীরকদ্যুতি হিসেবে নর-নাবীর প্রেমেব রূপ যদি কোনো বাংলা গল্পে তিনি ফুটিয়ে থাকেন, তাহলে তাবাশঙ্কর সেই ববীন্দ্র-যুগেব গল্পকার হিসেবে সে আদর্শ কি তাঁর নিজেব কেনো গল্পে অনুসরণ করেছেন? এ বকম প্রশ্নেব তাডনায পডলে আর এক ধরনের সন্ধান বা খোঁজাখুঁজি ঘটতে পাবে। কিন্তু তুলনাব সেই সম্ভাবনাটুকুই এখানে জাগিয়ে দিযে বরং প্রেমের গল্পের অসম্ভব সম্ভাবনাব প্রসঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই সুবিবেচনা।

১৩০০ সালের আষাঢের বচনা ববীন্দ্রনাথের "অসম্ভব কথা" মনে পডে। এই স্মৃতিচারণা প্রেমেব তত্ত্বজিজ্ঞাসার দায়ে পড়ে নয। এ হলো গল্পসৃষ্টির শিল্পবিষযক কৌতূহল-ঘটিত সন্ধান। গল্প শোনার পিপাসা থেকেই রূপকথার জন্ম হয়। এবং জীবনেব বাস্তবেব সঙ্গে গল্পের বাস্তবের প্রভেদ আছে বলেই গল্পমাত্রেই রূপকথা—অসম্ভব কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ লেখাটিতে সেই ইশারাই বেখে গেছেন।

যাঁরা গল্পের আঙ্গিক নিয়ে বেশি মাথা ঘামান, তাঁরা বোধ করি, এই সত্যটি বিস্মৃত হন যে, আঙ্গিক বা টেক্‌নিক্ কোনো রকম কৃত্রিম আবরণ বা বাইরে থেকে

ব্যবহার্য ছাঁচ নয়। সার্থকতা তো ছাঁচের ছাপ নয়। প্রত্যেক সার্থক গল্পই নিজস্ব বেশবাসে-কান্তিতে-লাবণ্যে চিহ্নিত হয়ে আসে। সমালোচকরা সূত্র বানাবার খেয়ালে থাকেন ব'লেই টেক্‌নিকের সাধারণ সূত্র বানাবার চেষ্টা করেন। অথচ কোনো দিদিমার কাছে কোনো শিশু যেমন 'এক যে ছিল রাজা'—এই গল্পসূচনার মুখে নিখুঁত তথ্যজ্ঞানের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে না। পরিণত বয়সের পাঠককেও তেমনি টেক্‌নিক-সম্পর্কিত অবাস্তব ছাঁচ খোঁজবার অবান্তর খেয়াল ত্যাগ ক'রতে হবে। গল্পের চূড়ান্ত আবেদন সুনির্দিষ্ট কোনো পরিণাম-অবসানে নয়,—সেটা পরিণামহীন চিরব্যঞ্জনাতেই। সেই ব্যঞ্জনার মধ্যে একটি পৌনঃপুনিক ধ্বনি হোলো : 'অসম্ভব—এ অসম্ভব'।

তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পের শম্ভু বাজিকরের পুরো ব্যাপারটাই একযোগে বাস্তব এবং অবাস্তব। গল্পের গদ্যপ্রবাহে সেখানে উপমার পরে উপমার ঝংকার বেজে যায়। কঙ্কালীর মেলায় শম্ভু এবং তার বাঘ, বেদেনী রাধিকা,—গোরুর গাড়ি, ঝুলি-ঝাঁপি, মদের বোতল সবই সুচিত্রিত এই কাহিনীতে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে ক্রুদ্ধ রাধিকার সেই প্রথম দিকের সংকল্প—"দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা"—এবং দুই বাজিকর-দলের স্ত্রী-পুরুষ যুগলের আকৃতি প্রকৃতি খুবই চমকপ্রদভাবে বাস্তব, সন্দেহ নেই। প্রতিপক্ষের কিষ্টোবেদের সঙ্গে রাধিকা-বেদেনীর অন্তর্ধানের মূলে জৈব আকর্ষণ। আর্থিক নিরাপত্তাচিন্তা, গতানুগতিক অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে নতুনতর পরিবেশের পিপাসা সবই ছিল। পূর্বপ্রেমের টানটাও মিথ্যে ছিল না। কিন্তু শম্ভু যে রাগের মুহূর্তে ব'লে ফেলেছিল—"ছোকরার উপর বড় যে টান তোর"—কেবল সেই অভিমানটাই রাধিকা বেদেনীর সঙ্গী-বদলের প্রধান কারণ বলতে হচ্ছে হয় না। এ গল্প যথাসম্ভব বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য রেখেও 'অসম্ভব'-ভাবটি তারাশঙ্কর যথার্থ গুণী শিল্পীর মতোই সংশয়াতীতভাবে সার্থক ক'রে তুলেছেন। প্রেম এখানে অনুগ্রহ নয়, উচ্চতর মূল্যবোধসঞ্জাত সমর্পণও নয়। তাকে বলা যায়, গভীর ও প্রবল জৈবতা।

'রাধারানী' আবার অন্য স্বাদের কাহিনী। আঙ্গিকের দিক থেকে সে-গল্পের নিরাভরণ সূচনাটুকু চোখে পড়ে—

> "কোথা হইতে আসিয়া পড়িল এক কালীয়-দমন—অর্থাৎ কৃষ্ণ-যাত্রার দল। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অচঞ্চল পল্লী জীবনের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবটা অনেকটা কোন কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বীর সম্মুখে তপস্যা-ভঙ্গের জন্য প্রেরিত দেবমায়ার মত হইয়া উঠিল।"

গল্পারম্ভের এই প্রথম অনুচ্ছেদটিতে তপস্যা-ভঙ্গের উদ্দেশ্যে দেবমায়ার উপমার উল্লেখটুকুই যথেষ্ট। লেখক হিসেবে তারাশঙ্করের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এই একটি অনুচ্ছেদেই ধরা পড়ে। তবে রবীন্দ্রনাথের কলমেও কি এরকম অনুচ্ছেদ না দেখা গেছে? বিশেষতঃ এই ধবনের সাদৃশ্য-প্রয়োগই রবীন্দ্রনাথের স্মারক। কিন্তু সূচনা দিয়েই তো পুরো গল্পের প্রকৃতি-বিচার চলে না। 'রাধারানী' গল্পের মূলগায়েন যিনি, এ গল্প তাঁরই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার বাল্য-অভিজ্ঞতার কাহিনী। তিনি তখন মুখে অলকা তিলকা এঁকে তাঁর গুরু অধিকারীর দলে রাধা সাজতেন। বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির রাস-যাত্রায় বছরে বছরে সেই দলের বায়না হোতো। মূল-গায়েনের নাম গৌর, আর সেই গ্রামের যে-মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার নাম ছিল রাধিকা। সে-বিয়ের সম্ভাবনায় গৌর-রাধিকা দুজনেরই রোমাঞ্চ হয়েছিল, কিন্তু বিয়ে হয়নি, সম্বন্ধ ভেঙে যায়। 'রাধারানী' গল্পে বাঞ্ছিতকে না-পাওয়ায় উদাস, গভীর বিষাদবোধ আছে। তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পের এই বিষাদের দিকটিও তুচ্ছ নয়। নিঃসন্দেহে 'রাধারানী'ও তার একটি সার্থক প্রেমের গল্প। স্মৃতিচারণার টেক্‌নিক্‌ই সে গল্পের টেক্‌নিক্‌। কিন্তু সে স্মৃতিচারণাও তির্যক ও নিহিত।

যাত্রা-অভিনেতা, পটুয়া, বেদে, বাজিকর প্রভৃতির জীবনের খুঁটিনাটি নানা তথ্যের ভাণ্ডারী ছিলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু আবার বলা দরকার, তথ্যজ্ঞানের সাম্রাজ্য কখনোই কোনো শিল্পীর চূড়ান্ত বাসভূমি নয়। তাঁকে তথ্যের ভিড় উজিয়ে সেই আলোর দিকে উত্তীর্ণ হতে হয়—যার নাম উপলব্ধি। মানব-জীবনে অনেক শারীরিকতা, অনেক রিপুবল, অনেক ইতরতা ও অবান্তরতা পেরিয়ে, তবেই সেই আলোর নিশানা মেলে যেখানে শূন্য ও পূর্ণ সবই এক হয়ে যায়। 'রসকলি' গল্পের মঞ্জরীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সেই আলো-অন্ধকার,—অভাবিতপূর্ব সহজ স্বীকৃতির সেই বিন্দু বা বিস্তারের স্বাদ রেখে গেছেন তারাশঙ্কর। পুলিন যেন বিল্বমঙ্গলের নায়ক। এবং মঞ্জরীর গলায় সেই গানটি—

লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি সেই গরবে আমি গরবিনী।

সেই পরমাশ্চর্য উত্তরণের সংকেত—যার নাম প্রেম। এই গল্পের পরিসমাপ্তির অনুচ্ছেদটি কি বর্ণনা না সুগভীর ব্যঞ্জনা—যেখানে দেখা যায়—গোপিনীর হাতে তার স্বামী পুলিনকে ফিরিয়ে দিয়ে, মঞ্জরী বোধ হয় চিরকালের মতোই চলে

গেল—'নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহাব হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।'

যেমন আদিম রিপুর তীক্ষ্ণতায, তেমনি সর্বস্ব বিসর্জনের অকৃত্রিম আনন্দরূপে তারাশঙ্করের গল্পের প্রেমিক-প্রেমিকারা এইভাবেই চিরায়ত মহিমাব মুকুটমণি হয়ে ওঠে। এই হয়ে-ওঠা কি বানিযে-তোলা ব্যাপার? সার্থকতার কোনো নির্দিষ্ট টেকনিক নেই। 'প্রেমশাস্ত্র' বলে কোনো পুঁথি বানাবার চেষ্টা হাস্যকব। কামশাস্ত্র আছে বটে, কিন্তু প্রেম-দর্শন আর প্রেমের গল্প কখনোই সমর্থক নয়। 'কবি'-তে উপন্যাস-বাহনে এবং 'বসকলি'তে গল্পবাহনে প্রেম সম্বন্ধে তারাশঙ্কবেব নিজস্ব উপলব্ধিই ব্যক্ত হযেছে। বীবভূমের খাঁ-খাঁ মাঠ এবং যে-কোনো সমুদ্রেব প্রগাঢ নীলিমা,যে-কোনো বৃহৎ আকাশেব অবাধ বিস্তাব মঞ্জবীব ঐ শেষ চলে-যাওয়ার রূপে জড়িত হযে আছে। তাবাশঙ্কর ববীন্দ্রনাথেব মতোই বুঝেছিলেন—প্রেম সত্যিই আনন্দের বৈরাগী। কিন্তু এই উপলব্ধির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু-পাঁচীব চরম উপলব্ধিও তাবাশঙ্কব তাঁর প্রেমেব গল্পে অপাংক্তেয় রাখেননি।

'তারিণী মাঝি', 'তমসা', 'জাযা', 'রসকলি' সবই বিশ্বাসযোগ্য। সবই বাস্তব। জীবনে যা বাস্তব অর্থেই বিশ্বাস্য, শিল্পে সেই বিশ্বাসের ক্ষেত্র বেড়ে যায়। সচরাচব না হোক্, পূর্বরাগ, মিলন, মান ও পুনর্মিলন—এই চাব পর্বেব প্রেম নিয়েই গল্পলেখকেব অনুশীলন। বিষযবস্তুব দিক থেকে দাম্পত্য প্রেমের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড' বা 'স্ত্রীর পত্র' দুটি প্রসিদ্ধ গল্পেরই সিদ্ধান্ত হোলো তিক্ত-কষায় বিচ্ছেদাত্মক। দীর্ঘ দাম্পত্য প্রেমেব স্রোত উপলমুখব হলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমের উত্তরোত্তব শীর্ণতাব দিকেই তাব বিশেষ গতি। তাবাশঙ্করের 'শেষ কথা'-র মতন তার 'জায়া' গল্পটিতেও কিন্তু এই ব্যাপাবে তিক্ততার পরিবর্তে —প্রথমোক্ত নিদর্শনে, স্বামী-স্ত্রী উভযেবই মনের মিল—এবং শেষোক্ত উদাহরণে স্ত্রী গৌরীব প্রতি লেখক-খ্যাতিব অধিকাবী অনেকদিনেব অভিমানক্ষুব্ধ রূপহীন শিবনাথেব 'সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ'টুকু লক্ষণীয ব্যতিক্রম। হয়তো এই 'শিবনাথ' স্বযং তাবাশঙ্কবেরই কতকটা অনুমেয় প্রতিচ্ছায়া,—হযতো 'ধাত্রীদেবতাব' শিবনাথই এই 'জায়া' গল্পেও বিদ্যমান, কিন্তু গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে লেখকদের আত্মপরিচয যে কতকটা থেকেই যায়, সে তো জানা কথা। হয়তো 'মানুষেব মন' নামে গল্পটিব স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধেও একই কথা বলা

যায়। দাম্পত্য সমাবেশের এই দুটি কাহিনীতেই স্ত্রীর টাকার ওপর স্বামীর অধিকার সম্বন্ধে স্ত্রীর চড়া প্রতিবাদের নজির আছে। এই প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের অনেক লেখাতেই দেখা যায়। কিন্তু সে অন্য কথা। মানুষের মন যে কী অসম্ভব অবিশ্বাস্য বিপরীত-বিপরীত সব ঘটনা ঘটাতে পারে, প্রেমের সেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর ট্র্যাজেডি-কমেডির উদাহরণ এই 'মানুষের মন'—যাতে মুখরা স্ত্রী সুভাষিণীর বাক্যবাণে স্বল্পবিত্ত, গান্ধীজীর অনুরাগী, খদ্দরধারী, বিদ্বান স্বামী ভবেন্দ্র আহত হয়ে গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হতে বেরিয়েছিল, কিন্তু পথে জিপ্-দুর্ঘটনায় আহত এক বড়ো মিলিটারি অফিসারকে উদ্ধার করবার সুযোগ পেয়ে,—অতঃপর গান্ধীজীর আদর্শ ভুলে, মিলিটারি-ঠিকাদারি পেয়ে, একেবারে আশি লক্ষ টাকার মালিক হ'য়ে চার বছর পরে যখন তার ত্রিশ হাজার টাকার মোটরগাড়িতে চড়ে সেই সুভাষিণীর কাছেই ফিরে আসে, তখন সুভাষিণী ছুটে গিয়ে একলা এক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে চালের কাঠে লাঙলের দড়ি বাঁধে। সুভাষিণীর সেই অবিশ্বাস্য আত্মহত্যার আয়োজনের মুখেই তারাশঙ্করের ঐ গল্পটি শেষ হয়ে যায়।

যেন নাটক এই মনুষ্যজীবন। যেন গল্পের প্লট নদীর বহতা ধারা। প্রেমের গল্পের প্লটেই নাটক নিহিত থাকে। যদি ঘটনার উত্থান-পতন না ঘটে, তাহলে বিষাদ বা সমর্পণের ভাব বা বিরহের বেশ যা-হোক্-তা-হোক্ প্রেমের গল্পে গল্পত্বের বদলে দেখা দেয় কবিতার লক্ষণ,—বড়ো জোর কোনো অক্ষয় সুদূরের মর্মরধ্বনি বা কম্পমান রেখাচিত্র। তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চৈত্রের উদাস দিগন্তরেখার ভাব আছে বটে, কিন্তু 'চলোর্মি'র তরঙ্গসঙ্কুলতাই তাতে প্রধান। আঙ্গিকগত কোনো বিশেষত্বের ছক্ কেটে তাঁর গল্প-প্রকৃতির—এমন কি, প্রেমের গল্পেরও স্বাতন্ত্র্য দেখবার চেষ্টা অবান্তর বলে মনে হয়। পৃথিবীর সব গল্পের ব্যাপারেই যেমন লী-হাণ্টের সেই উক্তিটি তাৎপর্যময়, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। লী-হাণ্ট বলেছিলেন—যাকে বলি বাস্তব, সে কেবল স্থূল বহিরঙ্গের তথ্যধারণা। অন্যপক্ষে, কেবল কল্পকাহিনীর এলাকাতেই তদতিরিক্ত বাকিটুকু পাওয়া যায়—যেখানে তথ্য মিশে যায় রহস্যসঙ্গমে—"Fact is the perception of our grosser and more external shapes of truth, fiction represents the residuum and the mystery. To love matter of fact is to have a lively sense of the visible and the immediate, to love fiction is to have as lively a sense of the possible and the remote."

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেই দূরের মর্মর যেভাবে শোনা যায়, বুদ্ধদেব বসু বা প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা আমাদের অন্য কোনো প্রিয় প্রেমের-গল্পকার কি ঠিক সেইভাবেই তা শোনান ? রীতির দিকে জনে-জনে, রচনায়-রচনায় ভেদ, কিন্তু রহস্যের মহাসমুদ্রে সব নদী গিয়ে একাকার হয়ে যায়।

প্রেমের মানচিত্র বোধ হয় নীল, নীল—আদিগন্ত নীল। ঘটনার শাদা শাদা সরু সরু সমস্ত রেখাই সেই আকাশনীল, সমুদ্রনীল বিস্তারে মুদ্রিত। তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প পড়তে-পড়তে সেই কথাই পুনর্বার মনে আসে।



নাট্যকার তারাশঙ্কর

মানস মজুমদার

১

তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায কথাশিল্পী হিসেবে যতটা পরিচিত, নাট্যকাবরূপে ততটা নন। কথাশিল্পী তাবাশঙ্কব যেন নাট্যকার তারাশঙ্করকে আড়াল করে বেখেছেন। অথচ অনেকগুলি নাটক লিখেছেন তিনি। তার কোনো কোনোটি বিস্ময়কব মঞ্চসাফল্যও লাভ কবেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁব নাটক নিয়ে সামগ্রিকভাবে কোনো আলোচনা হযনি। বর্তমান প্রবন্ধে আমবা সেই আলোচনার প্রয়াসী।

নাট্যাভিনযেব সঙ্গে ·তাবাশঙ্কবেব প্রথম পরিচয মাত্র সাত বছব বযসে। এ পবিচয অবশ্য দর্শক হিসেবে। স্বগ্রাম লাভপুরে ১৯০৫-এ স্থাপিত হলো 'বন্দেমাতরম্' থিযেটাব। গডে উঠলো স্থায়ী মঞ্চ। মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদেব অগ্রণী ছিলেন নাট্যকাব নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায। পেশায তিনি ব্যবসাযী, কিন্তু নাটকেব নেশা অত্যন্ত প্রবল। তিনি নাটক রচনা কবেন, গ্রামের মঞ্চে সে নাটকেব অভিনয হয়, স্বযং অভিনযে যোগও দেন। কলকাতার বডো বডো বঙ্গমঞ্চেব সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কলকাতার মঞ্চে তাঁব কোনো কোনো নাটক সাফল্যেব সঙ্গে অভিনীত হযেছে। 'বাতকানা' প্রহসনটিতো দর্শক সমাজের কাছে তাঁকে প্রায বাতাবাতি বিখ্যাত কবে তুলেছিলো। প্রধানত, নির্মলশিবের আহ্বানে ও প্রযত্নে বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চেব অনেক খ্যাতকীর্তি নাযকের পদধূলি পডেছে লাভপুব গ্রামে। রসরাজ অমৃতলাল বসু, ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায, মন্মথমোহন বসু, তিনকডি চক্রবর্তী, নবেশ মিত্র, রাধাচবণ ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকেই গিযেছেন লাভপুরে। তাঁদের উপস্থিতি সেখানকার নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনাব সঞ্চার করেছে। তারাশঙ্কর এই পরিবেশে বডো হযেছেন, অনুপ্রাণিত হযেছেন। 'আমাব কালের কথা'য় তিনি লিখেছেন—"আমি বাল্যকালে এঁদেব দূবে থেকে দেখতাম। প্রথম যৌবনে ধন্য হযেছি এঁদেব কাছে এসে।"

গ্রামেব মঞ্চে অনেক অভিনয় করেছেন তারাশঙ্কব। কিন্তু শুধু অভিনয়ে তৃপ্ত হতে পারেননি। এক সময় নাট্যকার হবার স্বপ্ন দেখলেন। তৃতীয়

পাণিপথের যুদ্ধ অবলম্বনে লিখলেন 'মারাঠা তর্পণ' নাটক। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল। নাটকখানি মঞ্চে আশ্চর্য বকম জমে গেল।"

"অভিনযের পব নির্মলশিববাবু বললেন, নাটকখানিকে ভাল নকল করে আমাকে দে, আমি কলকাতায দেখাব। আর্ট থিযেটারে দেব।"

স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তারাশঙ্কর—"অভিনয হয, দর্শকে করতালি দেয়, মনে হয় অভিনন্দন জানাচ্ছে নাট্যকাবকে। নাটকের মত অন্য কোন রচনা বোধহয ৰচয়িতাকে এমন নগদ বিদায় দেয না। সুতবাং নির্মলশিববাবুর কথায় আমার চোখে সেদিন বঙীন স্বপ্ন নেমে এল। স্বপ্ন দেখলাম। অনেক স্বপ্ন। দেওযালে দেওযালে আমাব নাম। রঙ্গমঞ্চেব বহস্যপুবীতে প্রবেশাধিকাব। অনেক—অনেক—অনেক।"

আর্ট থিয়েটাবের অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায অবশ্য সে পাণ্ডুলিপি না পড়েই ফিরিযে দিলেন। এ ঘটনায অত্যন্ত ব্যথিত হলেন তাবাশঙ্কব—"‥ এই আঘাত আমাব মুখ ফিরিযে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকেব পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম।"

তারপব অনেকদিন আব কোনো নাটক রচনা কবেননি। বেশ কযেকবছব পর অবশ্য সংকল্প পবিবর্তিত হলো। 'নাট্যনিকেতন'-এব প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশব 'কালিন্দী'র নাট্যরূপদানেব জন্য আমন্ত্রণ জানালে বঙ্গমঞ্চেব এ আহ্বান উপেক্ষা করতে পাবলেন না তাবাশঙ্কর।

২

প্রায বিশটিব মতো নাটক লিখেছেন তিনি। তাব 'কালিন্দী' (১৩৪৮), 'দুই পুরুষ' (১৩৪৯), 'পথেব ডাক' (১৩৪৯), 'দ্বীপান্তর' (১৩৫০), 'বিংশ শতাব্দী' (১৩৫১)' 'চকমকি' (১৩৫২), 'যুগবিপ্লব' (১৩৫৮), 'কবি' (১৩৬৭), 'কালরাত্রি' (১৩৬৪), 'সংঘাত' (১৩৫৮), 'আবোগ্য নিকেতন' (১৩৫২)— এই এগাবোটি নাটক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। এব মধ্যে 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের একাধিক সংস্কবণ অথবা পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' একাঙ্কটি ডঃ সাধনকুমাব ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'একাঙ্ক সঞ্চয়ন' (জুলাই ১৯৬০) গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত। আবও একাধিক নাটক সাময়িকপত্রেব পৃষ্ঠায আত্মগোপন কবে রয়েছে। এছাড়া 'উমানন্দের মন্দির',

'ডাইনীর মায়া', 'অভিশপ্ত' প্রভৃতি একাঙ্ক তিনি বেতারে অভিনয়ের জন্য রচনা করেছিলেন, যেগুলির পাণ্ডুলিপি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। মহাত্মা শিশিবকুমার ঘোষের জীবনী অবলম্বনে একটি নাটকও লিখেছিলেন। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

কলকাতার একাধিক ব্যবসায়ী নাট্যসংস্থা তাঁব কয়েকটি নাটকেব মঞ্চরূপ দিয়েছেন। যেমন 'কালিন্দী' নাট্য-নিকেতন ও ষ্টার রঙ্গমঞ্চে (১৩৪৮, ১৩৫৫) 'দুই পুরুষ' ও 'পথের ডাক' নাট্যভারতী মঞ্চে (১৩৪৯), 'দ্বীপান্তর' কালিকায় (১৩৫৭), 'বিংশ শতাব্দী' ও 'কবি' বঙমহল মঞ্চে (১৩৫১, ১৩৬৪) এবং 'আবোগ্য নিকেতন' বিশ্বরূপা মঞ্চে (১৩৬৩) অভিনীত হয়। 'দ্বীপান্তর' ও 'বিংশ শতাব্দী' ছাড়া অন্য নাটকগুলিব অভিনয় প্রভূত জনসমাদব লাভ করেছিলো। সমসাময়িক পত্রিকাগুলি তাব সাক্ষী।

৩

তাবাশঙ্করেব নাটকগুলি পবিমিত মাপের। দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে অভিনযযোগ্য। 'কালরাত্রি' ও 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' অবশ্য একাঙ্ক নাটক। অন্যান্য নাটকেব তুলনায় আয়তনেও অনেক ছোটো। 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক', 'দ্বীপান্তব', 'কবি' ও 'আরোগ্য নিকেতন' চার অঙ্ক বিশিষ্ট। 'বিংশ শতাব্দী', 'যুগবিপ্লব' ও 'সংঘাত' তিন অঙ্কের। 'চকমকি' দু' অঙ্কের প্রহসন।

'পথের ডাক', 'বিংশ শতাব্দী', 'যুগবিপ্লব' ও 'কালবাত্রি' ব্যতীত সমস্ত নাটকই বীবভূমেব পটভূমিতে বচিত।

৪

নাটকগুলিব বিষয-বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। দুটি জমিদার বংশের বিরোধ ও মিলনকে উপলক্ষ কবে গডে উঠেছে 'কালিন্দী' নাটকটি। জমিদারের সঙ্গে প্রজাব বিবোধ 'দুই পুরুষ' নাটকেব উপজীব্য। জেল-পলাতক নরহত্যাকাবী এক লাঠিয়াল বাগ্‌দীর পারিবারিক কাহিনী 'দ্বীপান্তব' নাটকে পরিবেশিত। 'বিংশ শতাব্দী'তে জনৈক বিজ্ঞান-সাধকের সাধনা ও পরিণাম চিত্রিত। জনৈক বিপত্নীক কৃপণ বৃদ্ধের অর্থলোলুপতা ও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের বাসনাকে আশ্রয় করে 'চকমকি' প্রহসনটি বচিত। 'যুগবিপ্লব'-এব বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত আফগান বাদশা আবদালী আহম্মদ-শাহের ভারত আক্রমণে এ নাটকেব সূচনা, সমাপ্তি তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ে।

'কবি' এক অন্ত্যজ সন্তানের কবি হওয়ার ইতিহাস। অলৌকিকতার প্রতি নায়কের আস্থা ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করে 'কালরাত্রি'র উদ্ভব। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'র বিষয়বস্তু গৃহদেবতার বিগ্রহ রক্ষার জন্য বৈষ্ণবী কৃষ্ণভামিনীর অতুলনীয় আত্মত্যাগ। প্রাচীন ও নবীন সংস্কার-বিশ্বাস-শিক্ষাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত 'সংঘাত' নাটকের বিষয়বস্তু। আর, মৃত্যু-ভয় জয়ের বাণীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকটি।

বিষয়গত দিক থেকে পূর্ববর্তী নাট্যসাহিত্যেব সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই তারাশঙ্করের। তাঁর যোগ ববং সমকালীন নাট্যসাহিত্যের সঙ্গেই। (ব্যতিক্রম 'যুগবিপ্লব' ও 'চকমকি'। 'যুগবিপ্লব' ঐতিহাসিক নাটক। আব 'চকমকি'ব বিপত্নীক বৃদ্ধের পুনর্বিবাহেব বাসনাব সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রহসনেব বিষয়গত যোগ রয়েছে।)

ববীন্দ্রনাথ ও শবৎচন্দ্রেব মতো স্বকৃত একাধিক উপন্যাসেব নাট্যরূপ দিয়েছেন তাবাশঙ্কর। 'কালিন্দী', 'কবি' ও 'আরোগ্য নিকেতন' ত্রয়ী নাটকেব কথা এসূত্রে স্মরণযোগ্য।

স্বরচিত গল্পেরও নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'নুটু মোক্তাবেব সওয়াল' 'দুই পুরুষ' নাটকে রূপান্তরিত। 'দ্বীপান্তব' নাটকেব শেষাংশ 'আখডাইযেব দীঘি' গল্পটিকে স্মরণ করায়। 'পিতাপুত্র' গল্পে 'সংঘাত' নাটকেব আদিবীজ লভ্য।

৫

নাট্যকার তাবাশঙ্কর-সৃষ্ট চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়। প্রথমত, কযেকটি সমধর্মী চরিত্রের উল্লেখ করা যাক। দোর্দণ্ডপ্রতাপ, প্রভুত্বপবায়ণ, ক্ষমতাগর্বী কযেকটি জমিদাব চরিত্র হলো ইন্দ্ররায় (কালিন্দী), শিবনাবাযণ (দুই পুরুষ), ধনদাপ্রসাদ (দ্বীপান্তর) ও ভুবন বায (আরোগ্য নিকেতন)। প্রতিটি চরিত্রই অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত। নব্যশিক্ষিত আদর্শবাদী কযেকটি যুবকের সাক্ষাৎও লভ্য। অহীন্দ্র (কালিন্দী), অরুণ (দুই পুরুষ), নিখিলেশ (পথের ডাক), জ্ঞানদাচরণ (দ্বীপান্তর), শ্যামাদাস (বিংশ শতাব্দী), শশিশেখর ন্যাযরত্ন (সংঘাত), প্রদ্যোত (আরোগ্য নিকেতন) তার দৃষ্টান্ত। এরা নতুন কালের প্রতিনিধি। আদর্শ মাতৃচরিত্রগুলি অল্পবিস্তর 'ধাত্রীদেবতা'র মায়েব (জ্যোতির্ময়ী) ছাঁদে ঢালা। সুনীতি (কালিন্দী) কিংবা জ্যোতির্ময়ীর (পথের ডাক) কথা এসূত্রে স্মরণযোগ্য। বিবাহোত্তর জীবনেও পূর্বতন প্রণযীর প্রতি অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা দেখা

যায় কল্যাণী (দুই পুরুষ), সুনন্দা (পথের ডাক), অনিমা (বিংশ শতাব্দী) ও সুষমা (সংঘাত) চরিত্রে। তারাশঙ্কর-সৃষ্ট কয়েকটি টাইপ চরিত্র হলো—অচিন্ত্য (কালিন্দী), গোপীনাথ মিত্তির (দুই পুরুষ), কুড়োরাম (পথের ডাক), গুরুপদ সাউ (দ্বীপান্তর), কেষ্ট (বিংশ শতাব্দী), বিমল মুখুজ্জে (চকমকি), বিপ্রপদ ও মহান্ত (কবি), দাঁতু ঘোষাল (আরোগ্য নিকেতন) প্রভৃতি।

৬

তাঁর অধিকাংশ নাটকই তীব্র গতিবেগযুক্ত। নাটকগুলি আদ্যন্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। কোনো কোনো নাটকে অবশ্য অতিনাটকীয়তা প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন 'পথের ডাক' নাটকের খনি-অভ্যন্তরের দৃশ্যটি (৩।৪)। খনি-অভ্যন্তরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে সেসব আমাদের বাস্তবজ্ঞানকে আঘাত করে। অথবা স্মরণযোগ্য 'দ্বীপান্তর' নাটকের শেষ দৃশ্যটি (৪।২)। আদালতকক্ষে বিচারকের অস্তিত্ব-বিস্মৃত ধনদাপ্রসাদ ও কালীচরণ যেখানে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করে চলেছে। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'য় নাট্যকার তারাশঙ্করের পরিবর্তে কথক তারাশঙ্করেরই প্রাধান্য দেখা যায়। গল্পরস নাট্যগতিকে ব্যাহত করেছে।

৭

মোটামুটি চরিত্রানুগ সংলাপ রচনার চেষ্টা করেছেন তারাশঙ্কর। সংলাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী ইংরেজী ও হিন্দী ভাষাও এসেছে। বাগ্‌দী, সাঁওতাল, কয়লা শ্রমিক প্রভৃতির সংলাপ রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য সংলাপের দীর্ঘতা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। যেমন—রামেশ্বরের সংলাপ (কালিন্দী), ধনদাপ্রসাদ ও কালীচরণের সংলাপ (দ্বীপান্তর), শিবশেখরের সংলাপ (সংঘাত)। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নাট্যকার তারাশঙ্করকে অপসারণ করে যেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করেরই আবির্ভাব ঘটেছে।

৮

তাঁর সমস্ত নাটকেই গানের ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবহার সুষ্ঠু ও পরিমিত। অবশ্য দুটি নাটকের গান তাঁর রচনা নয়। 'দুই পুরুষ' নাটকে রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া অপর গানগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সজনীকান্ত দাসের রচনা। 'পথের ডাক' নাটকের গানগুলির রচয়িতা অজয় ভট্টাচার্য। 'আরোগ্য নিকেতন'-এ নিজের

লেখা গান ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানের সাহায্যও নিয়েছেন। 'কবি' ও 'কালরাত্রি' নাটক দুটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দুটি নাটকে গানের গুরুত্ব সব চাইতে বেশি। গান ছাড়া এ দুটি নাটকের অস্তিত্বই অচল। গান এ দুটি নাটকের প্রাণ। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'র গানগুলিতে তিনি যেন বাউল বৈষ্ণব মহাজনদের উত্তরসূরী।

৯

একদা বাংলার নাট্যামোদী দর্শক সমাজকে একঘেয়েমির হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন তারাশঙ্কর। বাংলার নাট্যজগতে তাঁর আবির্ভাবকে তাই সমকালীন নাট্য-সমালোচকেরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয় দেখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নাট্য-সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—"At a time when the reputed stage tradition of Bengal seemed to have fallen on evil days, when Bengali stage looked like an absolute degenerate, comes without much flurry and unheralded stage a drama which deserves to be revered and cherished in to-morrow's memory. This is the newly dramatised offering at Natya-Bharati, 'Dui Purush'.

The intrinsic depth and scope of this social drama rings clear and true in every mind with its utter humanity and beauty. Coming from the pen of Tarasankar Banerjee, a foremost figure among the Bengali Literary luminaries of our modern times, the play presents itself as a perfect specimen of a neat drama, masterfully woven by a magic hand, neatly executed with finished touches of productional finesse, and re-created by a nicely co-ordinated band of artistes…" [June 28, 1942, p. 10]

আর 'পথের ডাক' নাটকের অভিনয়-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় বলা হয়েছিলো—"বাঙলা নাট্যসাহিত্যে সম্প্রতি এক নবযুগের সূচনা দেখা দিয়েছে। এপর্যন্ত আমরা একঘেয়ে সামাজিক নাটক ও জরাজীর্ণ পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত চমকপ্রদ নাটক পাঠে অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের

ঘুণ-ধরা বিচারবুদ্ধি বাঙলা নাটকের তাই সত্যকার রূপ বলে ধরে নিয়েছিল। তাই আজ আমরা নতুন ভাবের পরিবেশনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠেছি। এভাবের সাড়া জেগেছে বাঙলা নাটকের নতুন রূপের মধ্যে। নাট্যশিল্পী শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের মধ্যে এনে দিয়েছেন এই রূপের রঙীন ছটা।" [দেশ, বঙ্গজগৎ, ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শনিবার, ৩০ জানুয়ারী, ১৯৪৩]

তারাশঙ্করের নাটকের আর একটি গুণের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তা হলো পাঠযোগ্যতা। মঞ্চে তাঁর নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত। তাতে এগুলির অভিনযযোগ্যতা প্রমাণিত। কিন্তু তাই সব নয়, মঞ্চের বাইরেও এগুলি পাঠক-সমাদর লাভ করেছে। আর তার কারণ এগুলির সাহিত্যগুণ। অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে, তুলনায় নাট্যকার অপেক্ষা কথাশিল্পী তারাশঙ্কর অনেক বড়ো।

১০

নাট্যসৃষ্টির মাধ্যমে সমকালীন যুগরুচিকে তিনি তৃপ্ত করেছেন, দর্শকের অভিনন্দন-ধন্য হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন, নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগোত্তীর্ণ কোনো কিছু কি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন ? তাঁর তিনটি নাটক বোধহয় সে দাবি করতে পারে। নাটক তিনটি হলো—'দুই পুরুষ', 'কবি' ও 'আরোগ্য নিকেতন'। অত্যাচারী প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অভিযান এবং পরিণামে চিরন্তন ন্যায়-নীতি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা 'দুই পুরুষ' নাটকটিকে উত্তরপুরুষের কাছে আলোক-বর্তিকার মর্যাদা দিয়েছে। মানুষের চিরন্তর 'হয়ে ওঠা'র আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ ও স্বপ্নকে ঘিরে গড়ে উঠেছে 'কবি' নাটকটি। নিতাই কবির জীবন-নাটক তাই কোনোদিনই বোধহয় পুরনো হবার নয়। 'আরোগ্য নিকেতন'-এ তারাশঙ্কর মৃত্যুভয়-জয়ের বাণী শুনিয়েছেন। অমৃতের সাধনায় দীক্ষা দিয়েছেন। চিরন্তন কাল ও সমগ্র মানবজাতি তাঁর লক্ষ্য। নাটকটির স্থায়ীমূল্য তাই অনস্বীকার্য।

১১

বাংলার নাট্য-সাহিত্যের প্রতি অসীম মমতা ছিলো তাঁর। এ সাহিত্যের দৈন্যদশা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এ অবস্থা থেকে তাই পরিত্রাণের পথ খুঁজেছেন। বোধহয় খুঁজেও পেয়েছেন। 'আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্য'

প্রবন্ধে বলেছেন—"আমাদের জীবনের পরিধি বাড়ছে, বৈচিত্র্য বাড়ছে স্বাভাবিক-ভাবেই এবং আমাদের নাটকের কাঁচামাল সেইখান থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। পাশ্চাত্ত্য জীবনের কুশপুত্তলিকাকে সাজিযে-গুছিযে রঙ্গমঞ্চের ওপর কসরত দেখানোর মধ্যে আমি শিল্প, সাহিত্য, রুচি, আত্মমর্যাদা অথবা সমাজবোধকে খুঁজে পাইনে।"

"আমাদেব নিজেদের জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা-ঐতিহ্যকে নিযে আমাদের নাটক গডে উঠুক। একমাত্র তা হলেই বাংলা নাটকেব দৈন্য সম্বন্ধে যা নালিশ তা একদিন ঘুচতে পাবে।"

কথাগুলি ভাববাব মতো।

———

তারাশঙ্করের কবি

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

১

কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শবৎচন্দ্রেব পবেই তারাশঙ্কব—আর কোনও নাম নয। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তাবাশঙ্কব একালেব শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। জীবন-অভিজ্ঞতাব প্রাচুর্যে এবং একটি বিশেষ অঞ্চলেব প্রকৃতি ও মানুষেব জীবন-ছন্দ ও প্রাণ-স্পন্দনকে চিরন্তন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত কবাব কৃতিত্বে বাংলা উপন্যাস-জগতে তিনি অতুলনীয। চবিত্র-চিত্রণ ও চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক দিযে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে ধারাটির স্হচনা কবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথে তা বিস্তৃতিলাভ কবেছিল। বঙ্কিম-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক চবিত্র নিয়ে নাড়াঘাঁটা কবার প্রবণতাকে ববীন্দ্রনাথ অচিবেই দমন কবেছিলেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেব ভেতব দিযে চবিত্রের অন্তর বহস্য উদ্ঘাটনেব দিকেই তিনি অধিকতব মনোযোগী হয়েছিলেন। যুগেব নানা পবস্পব-বিবোধী দ্বন্দ্ব-জটিলতায় সমাজ ও পরিবাব যখন দুলছে, তখন অবিমিশ্র সামাজিক বা পাবিবারিক উপন্যাস লেখা খুবই কঠিন। এ সমস্যা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। তাই তিনি দূব অতীতের আধা-সত্য ও আধা-কাল্পনিক তথ্যে পূর্ণ ইতিহাসের উপাদান নিয়ে সম্ভাব্য সত্যেব ব্যঞ্জনাবহ উপন্যাসই বেশী লিখেছিলেন। তাঁব সামাজিক উপন্যাসেব প্রধান পাত্রপাত্রীরাও সব সমাজের উঁচুতলা থেকেই এসেছেন। ববীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরাও সম্ভ্রান্ত পরিবারের, কিন্তু তাদের জীবন-সমস্যা-রূপায়ণে বিশ্লেষণ পন্থার দিকেই তিনি বেশী যত্নবান—বঙ্কিমের মতো অল্পকথায ইশারা-ইঙ্গিতের পথ তিনি গ্রহণ করেননি। তবুও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নরনাবীরা অনেকখানি রবীন্দ্র ভাষাতেই কথা বলেন—কবিজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বাবা তাদের সব আচরণ ও কথাবার্তা বহুলাংশে নিযন্ত্রিত, তাই তাদের আপনজন মনে করতে অসুবিধে হয়। শরৎচন্দ্র একেবারে খাঁটি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘবের সন্তান। তাঁর ও জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের নরনারী আর সমাজের পতিত শ্রেণীর অবজ্ঞাত বহু নারী তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। শরৎ সাহিত্যের দর্পণে মধ্যবিত্ত বাঙালী নিজের প্রতিচ্ছবি দেখল। বিশ্লেষণের বাস্তবতায় গল্প বলার কৌশলে সৃষ্ট চরিত্রগুলির বহু সমস্যার সঙ্গে

আমাদের জীবন সমস্যার সংযোগ ঘটিয়ে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। সহজেই তাঁকে আমরা প্রিয় ঔপন্যাসিক বলেই গ্রহণ করলাম।

এর পরই এলেন তারাশঙ্কর। 'কল্লোল' পত্রিকায় 'রসকলি' গল্পটি নিয়েই তাঁর গল্প উপন্যাসের পথে যাত্রা সুরু। এর ভেতর কালেরও কিছু রূপান্তর ঘটেছে। কাল-ধর্মে সমাজের সবচেয়ে নীচু স্তরের মানুষদের আশা আকাঙ্ক্ষা জীবনচর্যা, সংস্কার-বিশ্বাসকে রূপ দেবার ইচ্ছে তাঁর মনে জেগেছিল। শরৎচন্দ্রের পরেও তাই সমাজ-জীবনের যে-সব মানুষদের চিত্র পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল—সেই অসম্পূর্ণ দিকটি তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তারাশঙ্করের বহু বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারের একটা বড় অংশ তারা জুড়ে থাকলেও তিনি সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষদের কথাও বিস্মৃত হননি। তবে একটি বিশিষ্ট জনপদের বহু শ্রেণীর মানুষের জীবন রূপায়ণে তিনি যতখানি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেই জনপদের বাইরের মানুষদের কথায় ততখানি নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ ও যুগ-পরিবর্তনের নানা চিহ্ন কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের রচনায় প্রথম ফুটে উঠতে থাকে। যুদ্ধ-পরবর্তী দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের উৎকট লোভ তাদের শোষণ-কামনাকে বাড়িয়ে তুলল। মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী বাঙালীর জীবনে তখন চারদিক থেকে সংকট ঘনিয়ে এল। আবার এরই সঙ্গে চলছিল অসহযোগ আন্দোলন ও গুপ্ত বিপ্লবের চক্রান্ত। স্বাধীনতার স্বপ্নে তারা অধীর হচ্ছিল—কিন্তু প্রত্যাশিত ফল লাভ না হওয়ায় তাদের চিত্তেও ক্ষোভ আর হতাশা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। নানা চিন্তা ভাবনায় তাই বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মন অস্থির ও উত্তেজিত। বহুকালাগত জীর্ণ সংস্কার আর জীবনের পুরাতন মূল্যবোধে, ধর্ম ও নীতিবোধে তখন সংশয় দেখা দিয়েছে। এগুলিকে যুক্তির কষ্টি-পাথরে বিচারের প্রবণতা জেগেছে মানুষের মনে। নরনারীর দৈহিক প্রেমের কোনো লোকোত্তর মহিমা তখন আর চোখে পড়ছে না—নিছক যৌন আকর্ষণের ঊর্ধ্বে তাকে নূতন কোনো মর্যাদা দিতে মন চাইছিল না। বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মানুষ তাই হয়ে পড়ছে হতাশায় বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত। এই কালের যন্ত্রণা, জ্বালা, প্রশ্ন, সংশয়, মানুষের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা এবং তার আদিম প্রবৃত্তির নগ্নরূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হোক—এই ছিল তাঁদের মর্মগত কামনা। যুগমানসের এই প্রেক্ষাপটেই তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্প নিয়ে 'কল্লোল'-এ আত্মপ্রকাশ। গল্পটি তারাশঙ্করের উজ্জ্বল কীর্তির চিহ্নবহ নয়—

'কল্লোল' এর সুরে পুরোপুরি এর তার বাঁধা নয়। প্রেমের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটু বেশী রকম স্বাধীনতার কথা মনে রেখে এক বৈরাগীর জীবনে দুই বৈষ্ণবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিরূপে সংকটের সৃষ্টি হয় ও তার অবসান কিভাবে হয় —তারই কাহিনী এ গল্প। প্রেমকলহের চিত্রাঙ্কনে একটু বেশী মাত্রায় বাস্তবতার সুর চড়িয়ে ও সংলাপে তাঁর কানে-শোনা ভাষার আদর্শ রক্ষা ক'রে তারাশঙ্কর এ গল্পে কল্লোল-গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারাশঙ্কর ছিলেন গভীরভাবে মানবপ্রেমিক। অপমানিত উপদ্রুত মানুষের দুর্গতির চিত্রাঙ্কনে তাঁর উৎসাহ ছিল। বিশেষ করে তাঁর চোখে-দেখা সমাজের অবজ্ঞাত মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ও সংস্কারের তাড়নায় চঞ্চল জীবনের আচরণ ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মন চাইত। এই দুই ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্কর কল্লোলপন্থী নন। কল্লোল-গোষ্ঠীর হতাশা, অস্থিরতা বা সংশয় তাঁর মধ্যে ছিল না। নরনারীর প্রেমকে নিছক যৌনলালসা মনে করে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। কল্লোল-গোষ্ঠীর আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও অখণ্ড জীবনবোধের অভাব তাঁর ছিল না। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন খুবই আশাবাদী —তার গৌরবময় আত্মিক-বিকাশেও ছিল তাঁর সুস্থির বিশ্বাস। মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিও ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। পরাধীন ভারতের মুক্তি ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তিনি গান্ধী-পন্থায় জনজাগরণে ছিলেন বিশ্বাসী। চিরাগত ঐতিহ্য সংস্কার বা পুরাতন প্রথার প্রতি তাঁর বিরূপতা ছিল না। যন্ত্রশিল্পের প্রসার, নূতন ভাবধারার অভ্যুদয়কেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু যেখানে পুরাতনের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে নূতনের হয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, সেখানে নূতনের চিত্রাঙ্কনে কোনরূপ কুণ্ঠা না দেখালেও তাঁর প্রাণের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত যে পুরাতনের দিকেই, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই সব ক্ষেত্রে কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দুস্তর।

বাংলা ১৩৩৮ থেকে ১৩৫৮—এই ৪২।৪৩ বছরে তারাশঙ্করের রচিত উপন্যাসের সংখ্যাই শুধু ৬৪। এই বিপুল সংখ্যক উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর ঔপন্যাসিক-মন কিভাবে বিকাশশীল এ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে সে আলোচনা কেউ করেননি। সামগ্রিকভাবে তাঁর চিন্তাধারা উপন্যাস ও গল্পে কিভাবে বিবর্তিত তার ইঙ্গিত অনেকেই করেছেন। তাঁর উপন্যাস জীবনের সূত্রপাত 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে (১৩৩৮) আর সমাপ্তি 'নবদিগন্ত'-এ (১৩৫৮)। তাঁর ঔপন্যাসিক মনকে বোঝবার সুবিধার জন্যে তাঁর সাহিত্যসাধনাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা চলতে পারে (যদিও এই

ভাগ কিছু বিজ্ঞানসম্মত নয়)। 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে ধাত্রীদেবতার পূর্বপর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৩৮-৪৬ প্রথম পর্ব। 'ধাত্রী দেবতার' পর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৪৬-৫৩ দ্বিতীয় পর্ব। আর স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বকে অর্থাৎ ১৩৫৪-১৩৫৮ তৃতীয় পর্ব আখ্যা দেওয়া যায়। প্রথম পর্বে অপরিণতির বহু চিহ্ন থাকলেও মোটামুটিভাবে তার সাহিত্যিক জীবনের প্রায় সকল প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য আভাসিত। দ্বিতীয় পর্বে তিনি রাজনীতিসচেতন ও তাঁর উপন্যাসে পরিণতির লক্ষণ। শেষ পর্বে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের চিত্রাঙ্কনে তিনি মনোযোগী নন—ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মলোকে যাত্রার প্রবণতা। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা'র পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি হল 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৩৩৮), পাষাণপুরী (১৩৪০), নীলকণ্ঠ (১৩৪০) রাইকমল (১৩৪১) প্রেম ও প্রয়োজন (১৩৪২) ও আগুন (১৩৪৪)। তাঁর বিখ্যাত 'কবি' উপন্যাসটি দ্বিতীয় পর্বে বাংলা ১৩৫০এ প্রকাশিত হলেও এর একটি ক্ষুদ্র পূর্বরূপে প্রথম পর্বেই 'প্রবাসী'তে ছোটগল্পের আকারে বের হয়—তখন সে গল্পে বসন্ত চরিত্র ছিল না। এইজন্য এতে পরিণতির সঙ্গে কিছু অপরিণতির চিহ্নও লক্ষণীয়। প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' সম্পর্কে তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন 'এই গল্পটির মধ্যেই (শ্মশানের পথে) আমার ভাবী সাহিত্যিক জীবনের সুর নিহিত ছিল।' জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে শ্মশানের পথে। জীর্ণ পল্লীসমাজ ও জীবন ভাঙনের মুখে। এই গ্রামেরই গোষ্ঠ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে স্ত্রীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে এল শহরে. কিন্তু সেখানে কারখানার অত্যাচারের আর এক মূর্তি—হল ধর্মঘট, তারই প্রাণ হল বলি। এ বলি চৈত্রের ঘূর্ণির মতো ক্ষীণ হতে পারে, কিন্তু তা কালবৈশাখীর অগ্রদূত। 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের বন্দী কয়েদীদের জীবনযাত্রার এক নিখুঁত চিত্র। নানাশ্রেণীর কয়েদীদের বিভিন্নরকম জীবনযাত্রা ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বাস্তবরেখায় অঙ্কিত হয়েছে। আবার এই ঘৃণ্য পঙ্কিল পরিবেশে কোনও একটি কারাবাসীর চরিত্রে মনুষ্যমহিমা দীপ্যমান হয়ে কিভাবে কারাগৃহকে রূপান্তরিত করলো তারও পরিচয় আছে এখানে। আবার দারিদ্র্যের জ্বালায় মানুষের স্বভাবধর্মের বিকৃতি ও ঘৃণ্যজীবন, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া, আত্মহত্যা. নিরুদ্দেশ—প্রভৃতির চিত্র আছে একটি কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসে। 'রাইকমল'-এ একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ রীতি-নীতি ও প্রেমের চিত্র অনেকখানি গীতিকাব্যিক সুরে গ্রথিত করার প্রয়াস। 'আগুন'

উপন্যাসে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দুই বন্ধুর জীবনে প্রেম-সমস্যার আগুন ও তার নির্বাপণে অপর বন্ধুর ব্যর্থ প্রয়াস—ব্যক্তি-সমস্যারই কাহিনী। এই বিশ্লেষণ থেকেই সহজেই অনুমেয় তারাশঙ্করের অপরিণত সাহিত্য পর্বেও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সব প্রবণতাগুলি কিরূপ আভাসিত হয়েছিল। 'রাইকমল'-এর হাত ধরেই 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ও 'মঞ্জরী অপেরা' কিভাবে এসেছে। 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ'-এর সমাজসচেতন মানবপ্রেমিক তারাশঙ্করই 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ এসেছেন। 'আগুন'-এ মন্বন্তর-এরই পূর্বাভাস। পাষাণপুরীর ভদ্র কয়েদীটির আত্মার শিখা পরবর্তীকালে তাকে আরও ধ্যানস্থ করে অধ্যাত্মপথে টেনেছে। 'নবীন-প্রবীণ'-এ সংঘাতের একটা প্রাক্‌রূপ 'আগুন'-এ দানা বাঁধছিল, গ্রামজীবন আর কারখানার বৈপরীত্যে। দ্বিতীয় পর্বে তারাশঙ্কর রাজনীতি সচেতন গান্ধীপন্থী দেশসেবক ও জনজাগরণের উদ্বুদ্ধ—সন্ত্রাসবাদ তাঁর মনোধর্মের অনুকূল নয়। 'ধাত্রী দেবতা'য় তার তৃতীয় পর্বের সাহিত্য-সাধনারও ইঙ্গিত আছে। দেশের মুক্তির পর চরমকে লাভ করা হবে কিন্তু পরমকে নয়—তারই জন্যে দেশমাতৃকার মুক্তির পরও তাঁর সাধনা চলবে পরমের সন্ধানে। দেহগত প্রেম, রূপের মোহ, জীবনের তৃষ্ণা, রাজনৈতিক আলোড়ন তখন আর ঔপন্যাসিকের ভাল লাগছে না—অধ্যাত্মলোকের শান্তিকুঞ্জে তখন মন বিশ্রাম চাইছে—তারাশঙ্করের কণ্ঠের সেই গান 'সপ্তপদী', 'উত্তরায়ণ' প্রভৃতি উপন্যাসে কান পাতলেই শোনা যায়।

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনে মা বাবা ও অঞ্চল-বিশেষের বিশেষ প্রভাব আছে। তিনি নিজেই বলেছেন মা-বাবার প্রভাবের কথা। দুই কালের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার মূলে ঐ জনক-জননী। দেশপ্রীতি ও মানবপ্রেমের মন্ত্র মায়ের কাছেই লাভ করেন তিনি। তাঁর পৌরুষ ও দৃপ্ত সাহসের মূলে পিতা ও কতকটা পিসিমার প্রভাব। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের পাতায় পাতায় তাঁর ৪৪ বছরের বাসভূমির সার্বিক প্রাণস্পন্দন। একজন ঔপন্যাসিকের জীবন-অভিজ্ঞতা যে কতদূর ব্যাপক হতে পারে, জীবনের পাত্রে যে কতো রকমের রস পরিবেশিত হতে পারে তারাশঙ্কর না এলে তা বোঝা যেত না।

২

তারাশঙ্করের কবি উপন্যাসের প্লট সংক্ষিপ্ত, সরল ও জটিলতামুক্ত। হিন্দু সমাজের পতিত ও ঘৃণ্য এক ডোম বংশের ছেলে নিতাইচরণের কবিয়াল-জীবনের কাহিনী। অট্টহাস গ্রামের সন্তান নিতাই তাদের বংশ-পরম্পরাগত দস্যুবৃত্তি ও বর্বরোচিত কুৎসিত জীবনচর্যাকে গ্রহণ করেনি। গ্রামের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে কয়েক বছর সামান্য পড়াশোনা ক'রে, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর আদর্শে কতকটা উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের ভদ্রসন্তানদের মতো সৎ-জীবনযাপনে তার আগ্রহ ছিল। আবার তার মধ্যে একটি সহজাত কবিমনও ছিল। তাই দেবী চামুণ্ডাকে উপলক্ষ ক'রে প্রতি বছব গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় যে মেলার আসরে কবিগান হত, সে তার মুগ্ধ শ্রোতা ছিল। এই কবিগানই তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে কবিয়াল হওয়ার স্বপ্নে বিভোর করে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কবে কিছুদিনের জন্যে গ্রামের ঘনশ্যাম গোঁসাই-এব বাড়ীতে সে চলে আসে মাহিন্দারী করতে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ঘনশ্যামেব নীচতায় ক্ষুব্ধ হযে সে চলে আসে অনেক দিনের পরিচিত বন্ধু বেলওযের পয়েন্টসম্যান রাজার কাছে—আশ্রয় পায় রেলওয়েরই পরিত্যক্ত একটি কুঠরীতে—পেশা হয় কুলিগিরি আর অবসর সময়ে চলে কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তুতি।

কবিয়ালরূপে খ্যাতিলাভে নিতাই-এর বিলম্ব হয না। গ্রামের চণ্ডীমায়ের পূজা উপলক্ষে মাঘী পূর্ণিমার মেলার আসরে বিখ্যাত দুই কবিযাল নোটনদাস ও মহাদেব পালের প্রতিযোগিতার কথা। কিন্তু গত বৎসবের টাকা পয়সা না পাওয়ায় নোটন নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হয় না। এই সুযোগে নিতাই মহাদেবের দলের দোয়ারকির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে মিষ্টি গলায ও নিজের বাঁধা গানে। বন্ধু রাজন আসরেই বলে ওঠে, 'বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ'। তার বউ এর হাসি থেমে যায—শ্যালিকা ঠাকুরঝির ঘোমটাই শুধু খসে না, বেশবাসও অসম্বৃত হয়ে পড়ে। কলকাতাবাসী গ্রামেব চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত বলে ওঠেন—'Son of a Dom—অ্যাঁ, He is a poet'। জমিদার-নায়েব বলেন—'রত্ন রে বেটা রত্ন মাণিকের বেটা মাণিক'। পেশাদাব কবিয়াল মহাদেব নানা অশ্লীল গানে নিতাইকে হারিয়ে দিলেও সেই থেকেই কবিয়ালরূপে তাব প্রতিষ্ঠা—তার জীবনেও নূতন আলো। এই হল নিতাই-এব জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব।

পরবর্তী পর্বে নিতাই-এর জীবনে অফুরন্ত গান রচনার প্রেরণা এল রাজনের শ্যালিকা বিবাহিতা তরুণী ঠাকুরঝির সাহচর্যে। দপ্তরে এখন তার কৃত্তিবাসী

রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান গঙ্গামাহাত্ম্য ও স্থানীয় থিয়েটার-ক্লাবের ফেলে-দেওয়া কতকগুলি ছেঁড়া নাটক। কুলিগিরি এখন আর তার ভাল লাগে না—কবিগান করেই সে রোজগার করবে। তার এ জীবনের এখন সহচরী হল ঠাকুরঝি। রোজ নিতাইকে এক পোযা করে দুধ দিতে আসে সে। তাব ঘরেব জানালা দিয়ে রেল লাইন দুটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে মিলেছে সেখানে রোজ জেগে ওঠে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিন্দু—সেই বিন্দুব ওপর জেগে ওঠে কাশফুলের মতো চলন্ত সাদা একটি রেখা—রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু। এই ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝিব চোখ জুড়ানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ও চোখ দুটির লম্বা টান তার চোখে স্বপ্ন আনে—বড ভাল লাগে ঠাকুরঝির কালো-কোমল শ্রী। নিতাই-এর কবিগানও ঠাকুরঝির খুব প্রিয। প্রতিদিন নিতাই তাকে চা খাওযায, দুটো কথা কয—কতো দুর্লভ-রমণীয সেই মুহূর্তটি। দুজনেই পবস্পব আসক্ত হয। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান রচনা করতে পাবে যে কবিয়াল—তার প্রতি ঠাকুবঝির ছিল সম্ভ্রমবোধ—কিন্তু ধীরে ধীবে সেই বোধ রূপান্তবিত হয ভালবাসায়। ঠাকুরঝিকে রাজন কালো বলে ঠাট্টা করলেও নিতাই-এব কষ্ট হয়—সে গানেব সুরে বলে, ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে।’ ঠাকুবঝির রুক্ষ চুলে জবা-কুসুমও নিতাই-এর কণ্ঠে গান জাগায়—‘কালো কেশে রাঙা কোসম (কুসুম) হেরেছ কি নযনে?’ ঠাকুরঝির চিন্তায় নিতাই অন্যমনস্ক হয়, পথ চলতে হোঁচট খায়, রক্ত ঝরে।

অন্য জাযগা থেকে কবিয়াল হিসেবে গান গাইবার জন্যে নিতাই-এর ডাক আসে। সেখানে গান গেযে পাঁচদিন পর ঠাকুবঝির জন্যে এক ছডা কেমিকেলের হার ও একটি স্টীলের চা খাওয়ার মগ কিনে এনে কবিয়াল বেশে নিতাই ফেরে। তার এই বেশ ঠাকুরঝির মনে নেশা ধরায়—আবার তার ধ্যান ফাগুনেব দুপুরে নিতাই-এর মনে দোলা দেয়।

মাসখানেক কেটে যায়। নিতাই-এর হাতের সম্বল শেষ হযে আসে। সে আর ঠাকুরঝির দুধ কিনতে পাববে না, কিন্তু সে বিনা পয়সায় তাকে দুধ দেবে, তাতেই তার সুখ। নিতাই স্পষ্ট বোঝে ঠাকুরঝি তাকে ভালবাসে—সেও তার প্রতি আসক্ত। মনে তার পাপবোধ জেগে ওঠে। সে তার সুখের সংসার ভাঙবে না; অথচ প্রেম জাগানো প্রাকৃতিক পরিবেশে নিতাই-এর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে—মনে হয় যত পাপই হোক সে তার সঙ্গ চায়। সে না এলে সে বাঁচবে কি করে? মানসিক দ্বন্দ্বশেষে গান গেয়ে ওঠে প্রাণ—

'চাঁদ তুমি আকাশে থাক—
আমি তোমায় দেখব খালি
ছুঁতে তোমায় চাই না কো হে—
সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।'

ঠাকুরঝিকে সে মনেই রাখবে—তার ভালবাসা প্রকাশ করবে না। তার কল্যাণের জন্যই নিতাই মাচণ্ডীকে প্রণাম ক'রে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। এমনই যখন তার মানসিক অবস্থা তখন তার জীবনে এল আকস্মিকভাবে ঝুমুরদলের বসন্ত। সন্ধ্যায় নাচগানের আসরে গান গেয়ে নিতাই দলেব সকলেব প্রিয় হয়ে ওঠে—দলের সবচেয়ে সুন্দরী বসন্তের আকর্ষণ ছিল মারাত্মক ; নিতাই তার কাছে ধরা না দিয়ে পারল না। অসুস্থ বসন্ত একটি রাত্রি নিতাই-এব ঘরে কাটাতে চেয়েছিল—বসন্তের মাথা টিপতে টিপতে যখন তাদের আলাপ চলছে, তখন ঠাকুরঝি জানালার পাশ থেকে সে দৃশ্য দেখে ফেলে – প্রবল ঈর্ষা আর অভিমানে নিতাই-এর দেওয়া হার-খানি ফেলে দিয়ে সে অদৃশ্যভাবে বিদায় নেয। নিতাই-এরও মনের মানুষ আছে জেনে বসন্তও রাত্রিতে ঘর থেকে চলে যায়। মানুষের মন নিযে ভগবানের এই বিচিত্র খেলার চিন্তায় নিতাই গেয়ে ওঠে—'বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন'। দেহব্যবসায়িনী বসন্ত কাসেদ শেখের ছেলে নযানের সঙ্গে রাত্রিতেই বেরিযে গেছে—পরদিন মদে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে এক বটগাছের তলে ধুলিধূসরিত অবস্থায় দেখা যায়। এক সন্ধ্যাব গান শেষে ঝুমুরের দল বিদায় নিল—নিতাইকে তারা দলভুক্ত হতে কতো অনুরোধ করল—কিন্তু নিতাই সম্মত হল না।

এরপরই ভাগ্যদেবতা নিতাই-এর প্রতি বিরূপ হলেন। বসনের সঙ্গে নিতাই-এর অন্তরঙ্গতার বিষয়টি ঠাকুরঝিকে অপ্রকৃতিস্থ করে তুলল—তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। নিতাই-এর জন্যেই তার এই অবস্থা—ঠাকুরঝির দিদি তীব্র ভাষায় নিতাইকে আক্রমণ করল। চোখের জলে নিতাই গ্রাম ছাড়ার সংকল্প করল। রাজন তাকে সাঙা (স্বামী বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিয়ে) করতে বললে নিতাই দুঃখের সঙ্গেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই বলে—'বিশ্বাস কর রাজন আমি কবিগান করি, মন্ত্রতন্ত্র কিছু করি নাই। তবে হ্যাঁ একটা টান—একটা ভালবাসা হযেছিল। তা ঠাকুরঝিকে নষ্ট আমি করি নাই।' ঠাকুরঝিকে নিয়ে ঘর নয়, অমরাবতী সৃজনের যে মানস-পরিকল্পনা কবিয়াল নিতাই-এর মনে জেগেছিল, এইখানেই বড় ব্যথার মধ্যেই তার অবসান। নিতাই-এর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের কথাও এইখানে শেষ।

অতঃপর বসন্তকে নিয়ে নিতাই-এর নূতন জীবন ও ঘরবাঁধার সুখস্বপ্ন ও তার পরিণাম। নিতাই আলেপুরের বায়না নিয়ে চলে যাচ্ছে—সেখান থেকে কান্দরা, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ আবার সেখান থেকেও আর কোথাও। আলেপুরে মুথুরদল যেখানে সাময়িকভাবে বাসা বেঁধেছে নিতাই সেখানেই গেল—পথে যেতে যেতে বসন্তের চিন্তায় তার মনে এল কত গানের কলি। বসন্তও তার কালো মাণিককে পেয়ে সেই রাত্রিতেই অন্য নাগরদের বিদায় করে দিতে চেয়েছিল। দলের নারীদের দেহ-ব্যবসায়, মদ খাওযা একদিকে আর একদিকে ঠাকুরঝির স্মৃতি—নিতাইকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। পবদিন রাধাগোবিন্দের মন্দিরে মোহান্তেব সঙ্গে আলাপে নিতাই-এব মন অপূর্ব প্রসন্নতায ভরে উঠল। ছোটজাতের বংশে জন্মালেও সে হীন নয, মানুষের সবচেয়ে বড পবিচয় তার কর্মে। বেশ্যা-সংসর্গে মানুষ হীন হয না, চিন্তামণি বেশ্যা সাধক বিল্বমঙ্গলের গুরু—মোহান্তের এই কথায় নিতাই-এব চিত্তে এল পবিবর্তন। বসন্তকে তার ভাল লাগল। রাত্রে বসল গানের আসব। অশ্লীলতাবর্জিত গানে নিতাই আসব জমাতে পারল না। পরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মদ খেযে তার নেশায় উন্মত্ত হয়ে অশ্লীল গানে আসর মাত কবে দিল। মদ খেযে বীরবংশী নিতাই-এর বর্বর বংশেব সেই মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি জেগে উঠেছিল—গানশেষে ঘরে ফিরে বসনের হাত চেপে ধরে, বাহুবন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলে—নিম্নশ্রেণীর বসনেরও নিতাই-এর উন্মত্ততা সহ্য কবার শক্তি আছে। তীব্র আবেগে বসন গায—'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম, গরব টুটাব কে?' পরদিন নিদারুণ ঘৃণায় নিতাই-এর মন ভরে ওঠে—সে এখান থেকে পালাবে। কিন্তু বসন্তের আকর্ষণ তো কম নয়—তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হযে গেছে। দর্পিতা বসনের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। তাই আসক্তি আর মুক্তির টানে কতকটা নিরাসক্তভাবেই সে দলে থাকে। নিতাই আর অশ্লীল খেউড় গায় না—বসনও কুৎসিত ভঙ্গীতে আর নাচে না। তবু দু' একদিন দলের স্বার্থে নিতাইকে মদ খেতে হয়—সেদিন সে ভিন্ন মানুষ। বাহুব দোলায় বসন্তকে নাচায়—শিশুর মতো উপরে ছুঁড়ে ধরে, মাথার ওপর তাকে রেখে নাচে—আবার নিজে শুয়ে বুকের ওপব বসনকে নাচতে বলে। আবার যখন সে সহজ শান্ত মানুষ আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রাখে সে। তবু নিতাই উদাসীন: গ্রামের কথা ঠাকুরঝির কথা তাকে বিহ্বল করে। এক একবাব মনে হয় বসনকে নিয়েই সে বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তাকেও কি তার সব ভালবাসাটুকু সে দিতে পারবে? এর পরেও

ঠাকুরঝি। না এই ভাল। প্রবলতম অন্তর্দ্বন্দ্বে নিতাই-এর কণ্ঠে ব্যথা গান হয়ে ওঠে—

—'এই খেদ আমার মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে
(হায়) জীবন এত ছোট ক্যানে।'

কিন্তু চিরবন্ধনমুক্ত নিতাইকে বাঁধবে কে ? বসন্তের অসুস্থতা বাডতে থাকে —বসন্ত রোগে হঠাৎ সে আক্রান্ত হয়। নিতাই সেবা-যত্নে তাকে সারিয়ে তুললেও তার রস-নিটোল দেহ কঙ্কালসাব হযে ওঠে। বসন্ত এখন প্রেমময়ী নারী—মরতে সে চায না। ভগবানেব প্রতিও তার কতো অভিমান। কিন্তু নিয়তি তাকে টানে—ক্ষয়রোগেই সে সবছেডে চিববিদায় নিতে বাধ্য হয়। তখন ঝুমুবদল আলেপুর ছেডে চলে এসেছে কাটোযায়। মবণকে এত কাছে থেকে নিতাই কোনদিন দেখেনি। সেই বসনেব দেহ সৎকার করে ঝুমুরদলের ললিতা ও নির্মলা বসনের জন্য কাঁদে—দলনেত্রী মাসীও একটু কাতর হয়, কিন্তু আর কেউ নয। গভীর শোকে নিতাই-এর মনে হয বুঝি তার কণ্ঠে আব গান জাগবে না। দল থেকে বিদায নিল নিতাই। বসনকে নিয়ে খেলাঘরেব স্বপ্নও তাব ভেঙে গেল। নিতাই কবি। ঠাকুবের নাম-গানে বাকী জীবনটা কাটিযে দেবে। কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, হবিদ্বাব ঘুরে সে হিমালযের নির্জন বুকে আশ্রয় বানাবে। সে কাশীতেই চলে আসে। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ তাব ভলে লাগে না। হিন্দীভাষী কাশীর জনগণেব সঙ্গে তার প্রাণেব ভাব-বিনিময় হবে না। তার বাংলা গানের এখানে সমঝদাব কোথায ? এক বযস্কা বাঙালি মহিলাও তাকে ঘরে ফেরার উপদেশ দিলেন। গ্রামের মাচণ্ডী, বউকথা কও, চোখ গেল পাখী, গ্রামের রাজন, বেনেমামা, বিপ্রপদ, কৃষ্ণচুডার গাছ—আব ঠাকুবঝির কথা তাব মনে পড়ল। গ্রামের নদী-মাঠ, মাঠের ধুলা, কালবৈশাখী, মেঘ, অন্ধকাব, বজ্রবিদ্যুৎ, ধর্মরাজ ঠাকুব—সমস্তই তার মনকে আচ্ছন্ন কবে ফেলল। নিতাই গ্রামেই পথেই ট্রেনে উঠল। গ্রামে এসে নতুন দল গডবে—ভগবানের নাম-গানই গাইবে—বসন্তকে ভোলা অসম্ভব তার পক্ষে। তাকে নিয়েও গান বাঁধবে সে। নিতাই গ্রামে এসে পৌঁছেছে—বিস্মিত নেত্রে তার পরিচিত জনেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বিপ্রপদের মৃত্যুসংবাদে তার চোখে জল এল। তরপর সে এসে দাঁড়ায় তার কতো স্বপ্নের কৃষ্ণচূড়া গছের তলায়। সেখানেই সে রাজনের কাছে মস্তিষ্ক বিকারের ব্যাধিতে

ঠাকুরঝির মৃত্যুর কথাও শোনে—তীব্রতম বেদনায় নিতাই মুষড়ে পড়ে। এ অন্তহীন ব্যথার শেষ কিসে? অবশেষে চিরপথিক কবি কান্নার মধ্যে সান্ত্বনা পায়—সে আছে, সে মরেনি। এখানকাব সমস্ত কিছুর সঙ্গে ঠাকুরঝি মিশে আছে। নিতাই চণ্ডীমাকে প্রণাম করতে চলে রাজনের সঙ্গে—এখানকার ধূলামাটি স্পর্শের জন্য তার চিত্ত যেন লালায়িত।

এই হল 'কবি' উপন্যাসের প্লট। এর প্লট বিপুলায়তন নয়; মাত্র একুশটি পরিচ্ছেদে এব বিস্তৃতি। উপন্যাসের নায়ক নিতাই-চরিত্রের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেই প্লটের অগ্রগতি। ঘটনাগুলির ক্রমান্বযে একের পর এক আগমন—কোথাও কোনো জটিলতা নেই। মূল প্লটেব মধ্যে কোনো শাখা বা উপকাহিনীর অবতারণা কবা হযনি। উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনায ঔপন্যাসিকের নিজের দৃষ্টিকোণ ও নিতাই-এব দৃষ্টিকোণ দুয়েবই সাহায্য নেওযা হযেছে। নিতাই-এর বংশ পরিচয বা তার বাল্যজীবনের কাহিনী বর্ণনায, গ্রামের চণ্ডী, মহান্ত বা জমিদাবদেব কথায়, বিভিন্ন গানেব আসব পরিচিতিতে, ঝুমুবদলের বিভিন্ন চবিত্রের পবিচযদানে কিংবা নিতাই-এর সম্পর্কের বাইরে ঘটনা ও চরিত্র-বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকেরই দৃষ্টিকোণ। শুধু নিতাই-এর নিজস্ব উক্তিগুলি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশে ঠাকুবঝি ও বসনের সঙ্গে তাব উক্তি প্রত্যুক্তিগুলিতে বা অন্য চবিত্রের সঙ্গে তার সংলাপে নিতাই এর দৃষ্টিকোণ অবলম্বিত হযেছে। উপন্যাসেব প্লটেব সবচেয়ে বড় গুণ এর সরলতা, বাস্তবতা ও কৌতূহল-রসসিক্ত পন্থায চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপন। এ সব গুণ এ প্লটে রযেছে। 'আমার কালেব কথা' ও 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে তাবাশঙ্কর স্পষ্টভাবেই জানিযেছেন তাঁর কবিগান ও ঝুমুরগানেব অভিজ্ঞতার কথা। তারাশঙ্কব নিজে লাভপুবের মানুষ—সেই গ্রামেরই প্রাচীন নাম অট্টহাস। সুতরাং নিজেব চোখে দেখা গ্রাম ও তার সংস্কৃতি ও মানুষের কথা বলেছেন। তাই তাঁর কবিয়াল চরিত্রই শুধু নয়—সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র এত জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হযেছে—কল্পনার ওপর নির্ভব করে বা পুঁথিগত বিদ্যার অভিজ্ঞতায় এ উপন্যাসের প্লটের জন্ম নয়। কথকতার ভঙ্গীতে কাহিনী বলতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর মতো রসাল ভঙ্গীতে নাটকীয় মুহূর্ত সৃজন করে অথবা ঘন ঘন নাট্যচমক দান করে গল্প বলার শক্তিও সচরাচর দুর্লভ। কি কৌশলে কবিয়াল-জীবনের অগ্রগতির ইতিবৃত্তকে তিনি রূপ দিলেন এই প্রসঙ্গে তা কতকটা চিন্তা করা যেতে পারে। পূর্বে যে প্লট বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় নিতাই-এর জীবনের কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্ব আছে। নিতাই-এর জীবনের পূর্ব-ইতিহাস ও

তার কবিয়াল রূপে খ্যাত হওয়ার প্রাথমিক কাহিনী শোনানোর জন্যে তারাশঙ্কর সুন্দর নাটকীয় পন্থা অবলম্বন করেছেন। উপন্যাসটি প্লট-মুখ্য নয়—চরিত্র-মুখ্য। তাই চরিত্রের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে প্লট। ছোট ছোট ঘটনায় সৃষ্টি করতে হচ্ছে নাটকীয় উৎকণ্ঠা। 'দস্তুর মতো একটা বিস্ময়'—এই নাটকীয় উক্তিটি উপন্যাসের সূচনায় দিয়ে তারাশঙ্কর নীচ বংশে জন্মেও কিভাবে নিতাই কবিয়াল হল তার ইতিহাস বর্ণনার সুযোগ নিয়েছেন। ঘনশ্যাম গোঁসাই-এর বাড়ীতে রাত্রিকালীন একটি চোরাই কারবারের চিত্রের সঙ্গে নিতাইকে পরিচিত করিয়েই তাকে চলে আসতে বাধ্য করলেন ইষ্টিশানে। কতো স্বাভাবিক পথেই নিতাই-এর আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে এইখানে আগমন। তারপর রাজার সংসার ও ঠাকুরঝির সঙ্গে সম্পর্ক-নিবিড়তা প্রভৃতির কথাও নাট্যোৎকণ্ঠার পথেই বিবৃত। ঠাকুরঝিকে ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাওয়ার কথা যখন নিতাই ভাবছে, তখন নাটকীয়ভাবেই তার বায়না এল ঝুমুরদল থেকে। নাটকীয়ভাবেই ট্রেন থেকে ঝুমুর দলকে প্রথম রাজনের নিয়ে আসা ও বসনের সঙ্গে মেলামেশায় নাটকীয়ভাবেই ঠাকুরঝির অন্তর্ধান। বন্ধনহীন নিতাই-এর বন্ধন খুলবার জন্যেই বসন্তের মৃত্যুর আয়োজন। নাটকীয়ভাবেই কাশীতে অপরিচিতা বাঙালী মহিলার সঙ্গে নিতাই-এর সাক্ষাৎ। আবার গ্রামে তার নাটকীয়ভাবেই উপস্থিতি। পথিকের পথ চলাকে অন্তহীন করার জন্যেই ঠাকুরঝির চিরবিদায়। চরিত্রধর্মী এই উপন্যাসে মূলতঃ নাটকীয় গঠন-প্রণালী অনুসৃত—মাঝে মাঝে গীতিকাব্যিক গুঞ্জন ও কথকতার ঢঙ উপন্যাস-সৌধের দেহে বিচিত্র নকশা কেটেছে।

৩

তারাশঙ্করের বহু গল্প-উপন্যাসের পটভূমিকায় রয়েছে রাঢ়ের একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। এই অঞ্চলেই তাঁর একটি জমিদারবংশে জন্ম ও জীবনের দীর্ঘকাল তিনি এই অঞ্চলের বিশিষ্টতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত। রাঢ়ের এক বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি, সেখানকার একশ্রেণীর মানুষ, তাদের জীবনযাত্রার ছন্দ, সমাজ-পরিবেশ, সংস্কার-বিশ্বাস তাঁর কিছু সংখ্যক উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই বিশিষ্ট অঞ্চলের পটভূমিকা ও সেখানকার একশ্রেণীর নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনকথা তাঁর বহু উপন্যাসের বা গল্পের বিষয়। সে যাই হোক, এই কারণে তাঁকে আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক নামেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু আঞ্চলিক সাহিত্য বা সাহিত্যিক বলতে কি বোঝায়, তা আগে জানতে হয়।

একথা সত্য যে, রাঢ় অঞ্চলে আদিবাসীদের বাস বেশী। এদের যে সমাজ তার সঙ্গে আর্য হিন্দু সমাজের বহু বিষয়েই পার্থক্য। আদিবাসী বলতে এখানে কোল অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডারী, কুবকু, শবর প্রভৃতি জাতিই বোঝায়। রাঢ় অঞ্চলে এখন অবশ্য এদের সংখ্যা কমে আসছে, তবে বায়েন, ডোম, বাগ্দী, লেট, কাহার, বাউরী, ডোম প্রভৃতি এখানকার জাতির মধ্যে তাদের সংস্কৃতিই বিদ্যমান। রাঢ় অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে ঐ আদিবাসীদেব নানা উপাদান ছড়িযে আছে। এখনও যারা সাঁওতাল, কোল, কিরাত প্রভৃতি প্রকৃত আদিবাসী তাদেব সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির যোগ একরূপ নেই। কিন্তু তাদের উত্তরাধিকাব বহন করে চলেছে যে সব জাতি তাদের সংস্কৃতিব ওপব হিন্দু সংস্কৃতিব কিছু কিছু প্রভাব পডেছে। তাবাশঙ্কর যে অঞ্চলে বাস করতেন, সেখানে ঐ শেষোক্ত জাতিদেব সঙ্গেই তাঁব বিশেষ পবিচয হয়েছিল। প্রথমোক্ত জাতিগুলির মধ্যে সাঁওতাল কিরাতেব সঙ্গেই তাঁব পবিচয় ছিল, তবে তা নিবিড নয। সে যাই হোক, বাঢ অঞ্চলে শুধু এই আদিবাসীদেবই তো বাস নয়। ববং সেখানে, অর্থাৎ তাবাশঙ্কবের অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানদেরও বাস আছে এবং হিন্দুদেবই সেখানে প্রাধান্য। আধুনিক হিন্দু-সমাজ থেকে অনেকখানি দূবের এই সব মানুষদের জীবনের চিত্র ও তাদেব অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রকৃতি তাদেব জীবনের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়ে যখন উপন্যাসে দেখা দেবে তখনই কি তাকে আঞ্চলিক বলা হবে? যদি উপন্যাসে তাদের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের ভদ্র হিন্দুসমাজের মানুষেবাও আসেন তাহলে কি প্রাধান্যের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে? অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং তাব জলবায়ু মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রভাবেব বৈষম্য তো একই অঞ্চলেব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা যাবে না। তাহলেও আঞ্চলিক উপন্যাসেব ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে টেনে এনে লাভ কি? তাই আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয ববা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। (তবে সাধাবণ ভাবে বলা যায় যে, কোনও অঞ্চলের প্রকৃতি বহুকালাগত ঐতিহ্য সংস্কার, জীবনাচরণ ও সংস্কৃতি যদি সে অঞ্চলের মানুষের চরিত্রকে একটি বিশেষ রূপদান করে, যদি সে চরিত্র একটা বিশিষ্ট ছাঁচে রূপ পেযে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে কথা বলে এবং সে অঞ্চলের বাইরে যদি সে-ধরনেব চরিত্র-পরিকল্পনা অসম্ভব হয় অথচ জীবনের স্থায়ী ভাবগুলির প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যদি সব অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে তাহলে সে সাহিত্যকে আঞ্চলিক বলা চলে এবং ঐ চিরন্তন বৃত্তির ধর্মে সে সাহিত্যের শিল্পমূল্যও স্বীকৃত হতে বাধ্য) এই সংজ্ঞা

অনুযায়ী তারাশঙ্করের অল্প উপন্যাসই আঞ্চলিকতা আখ্যা পাবে। লণ্ডনের বস্তিপ্রদেশ ও একশ্রেণীর অভিজাত মানুষের চিত্র ডিকেন্সের উপন্যাসে মিলবে। ইয়র্কশায়ারের প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট ও সেখানকার মানুষের কথা ব্রণ্টি ভগিনীদের কিছু উপন্যাসে ফুটেছে। 'এগডন হীথ' অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের ছন্দ হার্ডির উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এঁবা সকলেই আঞ্চলিক সাহিত্যিক এবং এঁদের সকল উপন্যাস এই শ্রেণীভুক্ত এ অনুমান ঠিক নয়। তারাশঙ্কর সম্পর্কেও একই কথা বলতে ইচ্ছে করে। তাঁর 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যাব কাহিনী'কে আঞ্চলিক বলা যায় নিঃসন্দেহে। তাঁর 'কবি' উপন্যাস আঞ্চলিক আখ্যা পেতে পাবে কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়।

এই উপন্যাস, বলা বাহুল্য, বীবভূমেব একটি গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণীর আদিবাসীদের উত্তরাধিকাব-প্রাপ্ত ডোমজাতিব সন্তান-এব কবিয়াল জীবনেব কাহিনী। বাঢেব এই ছোট্ট গ্রামখানিব সব মিলিযে একটা বিশিষ্টতা অস্বীকার কববাব উপায নেই। গ্রামটিব প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠেব অন্যতম। মহাপীঠেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দেবী চামুণ্ডা। প্রতি বছব মাঘী পূর্ণিমায ঘটা করে চামুণ্ডাব পূজো হয়। সেই উপলক্ষে গ্রামে মেলা বসে, কবিগান-যাত্রাগানেব বা ঝুমুবগানেব আসবও হয়। তাই এ অঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষ বাল্যকাল থেকেই এই সব লোকসংস্কৃতিব সঙ্গে পরিচিত হয। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বেশী ভিড হয আসবে। দেবী চামুণ্ডাব ভাব আছে মোহান্তেব ওপর—তিনি যতদূব সম্ভব পূজো বা ঐ উপলক্ষজাত কোনো অনুষ্ঠানেব ব্যয়সংকোচ ক'বে যতটা পাবেন, আত্মসাতেব চেষ্টা কবেন। গ্রামে জমিদাব ও তাব নাযেব, গোমস্তাও আছেন। তাদের দাপটও কিছু কম নয—পান থেকে চুন খসলেই তাঁবা অগ্নিশর্মা হযে ওঠেন। গ্রামে চণ্ডীমাযেব প্রতি সকলেরই ভক্তি। যে-কোনো কর্মে সকল মানুষ চণ্ডীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। গ্রামে ব্রাহ্মণ, বেনে, বৈষ্ণব, মুচি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেব বাস। তাদের কথায় বিশেষত নিম্নশ্রেণীব মানুষদেব কথায় একটি বিশেষ বকমের টান আছে। ক্রিযাপদগুলিকে একটু বিকৃত ক'রে ল, ন, য়, এ বর্ণগুলিকে প্রাধান্য দিযে নির্দেশক সর্বনামে 'উ' এবং 'ও' বর্ণেব প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে ও কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ করে তারা যে ভাষা ব্যবহার ক'রে তার একটা বিশিষ্টতা আছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে চুরি-ডাকাতি বা দস্যুবৃত্তিও কোনো কোনো জাতির বংশগত পেশা। এদের মধ্যে মদ খাওয়াটাও বেশী। দু' তিনটে

বিবাহেও পুরুষ-স্ত্রী কারো বাধে না। গ্রামে একটা ছোট্ট স্টেশন আছে—সেখানকার চায়ের স্টলটি বেশ একটা আড্ডা দেবার জায়গা। পরনিন্দক বেকার মানুষেরাই বেশীক্ষণ আড্ডা দেয় সেখানে। এখানকার স্টলের দোকানদারের কাছে নানা সংবাদও মেলে। এখানকার নীচুজাতের মানুষদের উঁচু জাতের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। তাদের মধ্যে নীচবংশীয় বলে একটা দীনতাবোধও আছে। উচ্চশ্রেণীর মানুষের ঠাট্টায় তারা কখনও উগ্র হয়ে ওঠে না। অন্ত্যজ শ্রেণীব মানুষ ভদ্রলোকদেব প্রণাম ক'রে পদধূলি মুখে নেবাব সময় একটা 'সুপ' শব্দ করে। এদেব পারিবাবিক কলহও মাঝে মাঝে বেশ জমে ওঠে। স্ত্রীদের তারা মারধোর কবে কখনও কখনও নির্মমভাবে। স্ত্রীরাও গালাগালিতে কিছু কম যায় না। এখানকাব মাটি একটু গৈবিক—বর্ষায় এখানকার প্রকৃতি সরস-শ্যামল হয়ে ওঠে, অন্য সময প্রকৃতি একটু রুক্ষ—আকাশে বাতাসে কেমন একটা মন উদাস-কবা ভাব। শীত যেমন একটু বেশী, গবমও তেমনি। তাই এ অঞ্চলেব মানুষেব দেহেব কালো রঙ একটু বেশী রকম কালো—গৌরবর্ণের মানুষদেব লাবণ্যও একটু ম্লান। জীবনযাত্রা মানুষদের সহজ, সরল ও অনাডম্বর। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীব মানুষেরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বা একই গ্রামে দুধ বিক্রী করে। গ্রামসম্বাদে এখানকার বিভিন্ন মানুষদেব পাবস্পরিক সম্পর্ক একটা আত্মীযতাব আবরণে মোড়া—তাই কেউ কাকা, মামা, দোস্ত, ওস্তাদ প্রভৃতি। গ্রামেরও একটা নিজস্ব শ্রী আছে। 'নিমচের জোল', 'উদাসীর মাঠ', 'কালীর পুকুব', 'বাবুদের আমবাগান', 'কালীবাগান'—তালগাছে ঘেরা পদ্ম বা শালুকে ভরা দীঘি, সজনে-নজনে ডাঁটায সাজানো গাছ, লাইনের ধারে ও গ্রামের আশেপাশে বন আউচেব গাছ, চিবোল চিরোল পাতাব ফাঁকে ফাঁকে লালফুলে ভবা কৃষ্ণচূড়াব গাছ—কদম ফুলেবও কি বিচিত্র সমাবোহ। আবার 'বউ কথা কও', 'চোখ গেল পাখী', মধুকুলকুলি, কোকিল প্রভৃতি কতো রকমের পাখীদের কাকলি। এমনই এক অঞ্চলেব বুকে কুখ্যাত ডোমবংশে নিতাই-এর জন্ম। এই গ্রামেবই পরিবেশ নিতাইকে তাব জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে। সে বংশগত বৃত্তিকে গ্রহণ না ক'রে লোকসংস্কৃতিব অন্য ধারাকে গ্রহণ করতে চেয়েছে। গ্রামের চণ্ডীমাতা তার চিত্তে একটি বড় আসন জুড়ে বসেছেন। এ গ্রামের আকাশ-বাতাস, নদী-দীঘি-মাঠ, বাগান, পাখী ও ফুল তার চিত্তে কাব্য-ভাব সর্বদা জাগ্রত রেখেছে। বয়োধর্মে যে যৌবন তার মধ্যে প্রেমের বিকাশ ঘটিয়েছে, তার সঙ্গে প্রকৃতিরও আনুকূল্য যথেষ্ট আছে। তার কবিয়াল-জীবনে

যে ঠাকুরঝি এসেছে এবং যে রাজন ও তার স্ত্রীর সাহচর্য ঘটেছে তারাও এই অঞ্চলেরই মানুষ। তারাশঙ্কর বলেছেন, রাজা জাতিতে মুচি ও অদ্ভুত ধরনের মানুষ, মহাযুদ্ধের সময় মেসোপোটেমিযায় সে কুলিগিরি করে এসেছে, এখন লাইট বেলওয়েব পযেণ্টসম্যান। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, মুখে অনর্গল ভুল হিন্দী, ভীষণ মাতাল, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য অথচ একটি তাজাপ্রাণের অধিকাবী সে। চীৎকাবে ও স্ত্রী-পুত্রকে ঠেঙানোতেও সে ওস্তাদ। তার স্ত্রীর মুখও খুব শাণিত—ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ভাষাতেই তাব ক্রোধ ও গালিগালাজ চমৎকার মূর্তি ধবে। নিতাই-এর সঙ্গে তার বোনের ঘনিষ্ঠতায সে নিতাইকে সহ্য করতে পারে না। ঠাকুরঝিব দেহেব বিশিষ্ট গঠন, খিলখিল হাসি, নিতাই-এব সঙ্গে মান-অভিমান, বসনের প্রতি ঈর্ষা, নিতাই-এর সাহচর্যে আনন্দ ও তাব প্রকাশ—সব কিছুতেই একটা বিশিষ্টতা। এই নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কথায় ও কাজে একটা বিশেষ সমাজের চিহ্নই বর্তমান। এ উপন্যাসে নিতাই যে ঝুমুবদলেব সংস্পর্শে এসেছে তাবাও বীরভূমেবই ঝুমুব। এদের জীবনযাত্রাব ছন্দ তাবাশঙ্কর অতি নিপুণভাবেই বর্ণনা কবেছেন। এই ভ্রাম্যমাণ ঝুমুবদলের নাবীদেব বিশিষ্ট বেশভূষা, ঘৃণ্য দেহ-ব্যবসায, নাচ-গানে পাবদর্শিতা, ইতব ভাবভঙ্গী, অশ্লীল রসিকতা, যন্ত্রসঙ্গীতে কোনো কোনো পুরুষদের তন্ময়তা—সমস্ত কিছুই অঞ্চল-বিশেষেব একটি ঝুমুবদলেব চিত্রকেই বিশিষ্টতা দিয়েছে। রাঢ অঞ্চলেব কবিগান ও ঝুমুবদলের ইতিবৃত্ত ভালভাবেই এখানে মিলবে। এই বিশেষ অঞ্চল থেকে সরিয়ে আনলেই নিতাই-এব জীবনধারা বদলে যাবে—সে অসহায বোধ কববে—কাশীতে তো দেব-দ্বিজে ভক্তিমান, গ্রামেব মাযায় মুগ্ধ, গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আত্মহাবা, রামায়ণ-মহাভাবতেব বসে পুষ্ট, একটা একটা উচ্চতব নৈতিকবোধে দীপ্ত, ব্যবহারে বিনীত, নীচবংশে জন্মের জন্য মনে মনে সংকুচিত অথচ আপন লক্ষ্যে অবিচল এমন একটি বিশিষ্ট কবিযাল ঠিক মিলবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে তাব জীবন-সমস্যার সঙ্গে অন্য যে কোনো অঞ্চলের কবিয়ালের মিল থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক এই ধবনেব কবিয়াল এ অঞ্চলেরই বিশিষ্ট সন্তান। আবার বাতব্যাধিতে খঞ্জ, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ ব্রহ্মণ্যের তেজে দৃপ্ত, দরিদ্র বিপ্রপদকেও অন্যত্র দেখা যাবে না। 'আমার কালের কথা'য় তাবাশঙ্কব বিপ্রপদ যে তাঁর গ্রামেরই একজন চোখে দেখা মানুষ সে-কথা জানিয়েছেন। চণ্ডীমায়ের মন্দির তো এ গ্রামের বিশিষ্ট সম্পদ। সমস্ত গ্রামেব হৃদয়ের ভক্তি সেখনেই ঘনীভূত। তবু ঐ মোহান্ত, জমিদারশ্রেণী,

বেনেমামা, কাশীর ঐ বাঙালী ভদ্রমহিলা, কালা ভূতনাথ এদের সকলের ওপর অঞ্চল-বিশেষের গভীরতর আত্মিক যোগের চিহ্ন স্পষ্ট নয়। নিতাই-এর জীবনে প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে যে সমস্যা তা কোনো অঞ্চল-বিশেষেব কবিয়ালেরই জীবন-সমস্যা নয়। অশ্লীলতা-বর্জিত পদ রচনার প্রযাস এবং প্রকৃত কবি-জীবনের সুরে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার তার সাধনায় মধ্যে কবিয়াল হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর এ উপন্যাস আঞ্চলিক হয়েও এই সব স্থানে সর্বজনীন রসাবেদনে সার্থকতা লাভ করেছে। 'বাংলার একটা অঞ্চলের মাটির গন্ধ' তারাশঙ্করের কবি উপন্যাসে থাকলেও তার আবেদন সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমিত নয়।

৪

'কবি' উপন্যাসের নায়ক কবি নিতাইচরণ। সমগ্র উপন্যাস তারই জীবনের ক্রমবিকাশেব কাহিনী। গ্রামের যে বংশে নিতাই-এর জন্ম তার ইতিহাস বডই কলঙ্কিত। বংশেব সেই ঘৃণ্য চিবাগত ধারায় নিতাই বিরল-ব্যতিক্রম। নিজ জীবনকে এক উন্নত আদর্শে দীক্ষিত করে তার জযযাত্রা। গ্রামের ভদ্রজনদের জীবনযাত্রা বাল্যকাল থেকেই তার মনে রেখাপাত করেছে। গ্রামের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালযে সামান্য কয়েক বছর পডাশোনা করলেও সে নিজ কৃতিত্বেই শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে গণ্য হয়েছে। ঐ বিদ্যালযেই প্রাপ্ত পুবস্কার রামায়ণ-মহাভারত গ্রন্থের আদর্শও তার জীবনের ছন্দকে উঁচু সুরে বাঁধতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। তারপর গ্রামের চণ্ডীমায়েব পূজা উপলক্ষে কবিগান তার জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকবণে পথ নির্দেশ করেছে। এমনিভাবে নিম্নবংশীয় সন্তান নিতাইচরণ বংশের ঘৃণ্য বৃত্তিকে ত্যাগ ক'রে আপন লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তার বাপ নেই, কিন্তু মা আছে। মা ও মামা তাকে বংশগত বৃত্তি গ্রহণে প্ররোচিত করায় সে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কবেছে। জীবনে বড হব, তারিণী মণ্ডলের মতো বিখ্যাত কবিয়াল হব, সৎপথে থাকব—এই ছিল তার পণ। তাই গ্রামের ঘনশ্যাম গোঁসাই-এর বাডীতে মাহিন্দারী তার ভাল লাগেনি। গোঁসাই-এর নীচতা, চোরা কারবারে আসক্তিও নিতাইকেই পাপকর্মে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়াসে তার সমস্ত চিত্ত বিরূপতায় ভরে উঠেছিল। ঠিক এইরূপ মানসিক অবস্থায় সে তার মনের প্রকৃত দরদী বন্ধু রাজনকে খুঁজে পেয়েছিল। রাজনই তাকে ইষ্টিশানের একটি পরিত্যক্ত কুঠরীতে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল, নইলে তার জীবনের ধারা কোন্ মুখী হ'ত কে জানে! এ পর্যন্ত নিতাই-এর জীবন-কাহিনী ঔপন্যাসিকের মুখেই বেশী বিবৃত।

তথাপি মনে হয় নিতাই যেন পিছন থেকে ঔপন্যাসিককে ঠেলা দিযে নিজের পথটিকে চিহ্নিত ক'রে নিচ্ছে। এক হিসেবে নায়করূপেই তাই নিতাই যেন এই অংশের ঘটনাধাবাকে চালনা করছে।

চাবদিনের বিস্মিত জনমণ্ডলীব মাঝখানে নিতাই যেদিন মহাদেব কবিযালের দোযারকিকে হারিয়ে নিজেব কৃতিত্বেব পরিচয় দিল, সেদিন থেকেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে সে একেবারে আপনার মহিমান্বিত আসনটি লাভ কবেছে। তারপর আর কোনো বাধা নেই—জযের আনন্দে সে উৎফুল্ল গর্বিত—নিজের ওপর জেগেছে অসীম আত্মপ্রত্যয—আর তার সকল গানের প্রেরণা-দাত্রীরূপে এসে গেছে যুবতী ঠাকুরঝি। এবপব কাহিনীকে যেভাবে তারাশঙ্কব টেনে নিযে চললেন, তাতে স্পষ্টই অনুমান কবতে পাবি এ উপন্যাসের বিষযবস্তু যেন গীতিকাব্যিক সুবে বাঁধা হচ্ছে। চিরপথিক যাত্রার আনন্দে অধীব নিতাইচবণের গান গেযে গেযে পথ চলা। ঠাকুরঝি আর বসন তার কণ্ঠে অফুবন্ত গান এনে দিযেছে—নিতাইও তাদের আকর্ষণে চঞ্চল হযেছে—কিন্তু তবু নিতাই-এব চলাব শেষ নেই। নিতাইকে পেতে গিয়ে গভীর ব্যথায এই দুই নাবীর জীবন শেষ হযে গেল—নিতাই ছিল তাদেব কত কাছে—তবু দূর। নিতাই-ঠাকুবঝি ও নিতাই-বসন্ত সম্পর্ক বিশ্লেষণ তাই উপন্যাসেব সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক স্থল। নাযক নিতাই-এব জীবনে কিভাবে তারা স্থান কবে নিয়েছিল এবং নিতাই একে একে দুজনের কাছে কিভাবে ধবা দিয়েছিল সে ইতিহাস তারাশঙ্কব নিপুণভাবেই বর্ণনা কবেছেন। ঠাকুবঝির দেহ-মনেব নিটোল স্বাস্থ্য, কালো বঙেব একটা তাজা শ্রী ও তার নিত্য সাহচর্য নিতাই-এব মনে দোলা দিযেছে। তার কণ্ঠে বাববাব গান জেগেছে। কখন অজ্ঞাতে এই ঠাকুরঝি তাব 'মনের মানুষ' হয়ে গেছে।

বাংলার সহজিযা সাধনায় সাধন-সঙ্গিনীব মতো ঠাকুবঝিও নিতাই-এব কবিযাল-জীবনেব সঙ্গিনী হযে উঠেছে। আবার এই ঠাকুরঝিই নিতাই-এর বিশাল মুক্ত নির্লিপ্ত কবিজীবনে সংকট সৃষ্টি কবেছে। নিতাই তাকে গভীরভাবে ভালবাসলেও জানে সে বিবাহিতা—তার সুখের সংসাব। সে সংসার ভেঙে দিযে ঠাকুরঝিকে নিযে নীড রচনাব কথা ভাবতে গেলেই তাব নৈতিক বোধ তীব্র হয়ে ওঠে। অথচ অবশ মনকে বশ করতেও পারে না। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে নিরাসক্ত কবিচিত্তও পীডিত হতে থাকে। এদিকে ঠাকুবঝিও ধীরে ধীরে গভীরভাবে নিতাই-এর প্রতি আসক্ত হয়ে পডে। দুই বিপবীত দ্বন্দ্বে কাতর নিতাই ঠাকুরঝিকে বিয়ে করবে না, কিন্তু তার সাহচর্যের মধ্য দিয়েই সে কবিয়াল

জীবনকে সার্থক করে তুলবে—এই রকম সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করত—কিন্তু মন বড় দুর্বল। যদি পদস্খলন হয়! তাই অনেক ভেবেই ঠাকুরঝির কল্যাণেই গ্রাম ছাড়ার সংকল্প গ্রহণ করে। এদিকে ঠাকুরঝির চিত্ততলে চলেছে গভীর আলোড়ন। সে তার অতিপ্রিয় স্বামীকে ত্যাগ করে নিতাইকেই বরণ করবে—যদিও মুখ ফুটে সে কথা বলার সাহস তার মতো লাজুক মেয়ের নেই। তখন তার যে মানসিক অবস্থা, তাতে অন্য কোনো নারীর সঙ্গে নিতাই-এর বিন্দুমাত্র সাহচর্য সে সইতে পারবে না। ঝুমুরদলের বসন্তের সঙ্গে নিতাই-এর নাচ-গান ও একই কক্ষে তাদের দুজনকে রাত্রিতে আলাপরত দেখে একদিন সে মর্মান্তিক আঘাত পেল। তার সমস্ত সত্তাই যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। এই মানসিক আঘাতে সে হল উন্মাদিনী। নিতাই সে সংবাদ শুনে গ্রাম ছাড়তে উদ্যত, এমন সময় ঝুমুরদল থেকেই ডাক এল—বসন্তের আকর্ষণে নিতাই ঠাকুরঝিকে ভুলতে চাইল। বসন্তও নিতাই-এর কবিয়াল জীবনে বহু গানের জনয়িত্রী। তাকে গ্রহণে কোনো বাধা নেই, কোনো বিপত্তি নেই—বসন্তও তাকে পেয়ে সত্যিকারের প্রেমিকা হয়ে উঠছিল—বেশ্যা বলে বসন্তের প্রতি নিতাই-এর যেটুকু ঘৃণা ছিল, তাও মহান্তও দূর ক'রে দিয়েছেন। নিতাই সর্বস্ব মন-প্রাণ ঢেলে বসন্তকে আপন করে রচনা করতে চাইল। তবু নিতাই মাঝে মাঝে উদাসীন হয—কবিয়াল জীবনের নেশায় তাই সে কখনও কখনও বসন্তের নাগালের বাইরে এসে দাঁড়ায়। আবার গভীরভাবে বসন্তের লীলায় মত্ত হওয়ার কালে ঠাকুরঝির স্মৃতি তার চিত্তে দ্বন্দ্ব আনে। তবু অনেক দ্বন্দ্ব অনেক সংশয় কাটিয়ে সে বসন্তকে নিয়েই ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে—কিন্তু ভাগ্য তার প্রতিকূল। বসন্ত প্রথম থেকেই ক্ষয় রোগগ্রস্ত। তার সাহচর্যে ও সেবায় যত্নে তার অনেক পরিবর্তন এলেও কালব্যাধির আক্রমণ থেকে সে নিষ্কৃতি পেল না। সে চলে গেল। তার স্মৃতিকে মনের মধ্যে লালন করে সে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করল।

নিতাই ভাবল তার কণ্ঠে বোধ হয় গান চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। তাই সে বৈরাগ্য অবলম্বন করে তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করে শেষে নির্জন নিঃসঙ্গ হিমালয়ের বুকেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। তার মনের গভীর আক্ষেপ জীবন কেন এত ক্ষুদ্র। কেন মানুষ তার মনের মানুষকে বেশীদিন ভালবাসতে পায় না। সে চলে যায় কাশী। কিন্তু সেখানে কিছুদিন থেকেই মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে—এক বয়স্কা বাঙালী মহিলার অনুরোধে সে আবার কবিয়াল-জীবন সুরু করবে গ্রামে এসে। অতিশয় প্রিয় এই গ্রাম নিতাই-এর কাছে।

গ্রামের প্রতিটি জিনিস তার কাছে মহার্ঘ—বিশেষ করে যে গ্রামে আছে তার ঠাকুরঝি। গ্রামে এসে দল গড়ে সে ঠাকুরেব নামগানই করবে। কিন্তু গ্রামে এসে সে এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেল—ঠাকুরঝি মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলেই মাবা গেছে। ঠাকুরঝিকে দূর থেকে দেখেও তার কতো সুখ—তার চিন্তা তার চিত্তকে গানে গানে ভবে দেয়, কিন্তু আজ সে সুখ-সৌধটুকুও ভেঙে গেল। চরমতম বেদনাব মধ্যে সে এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা কবল যে, ঠাকুরঝি মরেনি—গ্রামের প্রতিটি বস্তুতে, প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে সে যে মিশে আছে। তাকে স্পর্শ ওখানেই মিলবে। চণ্ডীমাতাকে প্রণাম করে গ্রামেব মাটির পরশই এখন তার একমাত্র কাম্য। এইভাবেই নিরাসক্ত কবিমন আবার গান বাঁধবে—বসন আর ঠাকুরঝি সেই চিরঅন্ধকাব দেশ থেকেই অদৃশ্য প্রেবণারূপে ছায়ার মায়ায় তাকে উজ্জীবিত করবে। গান বা পদ বচনার যে মত্ততা তা নিতাই-এর মধ্যে সর্বদা বর্তমান। এই নেশাই তাকে ক্ষুদ্র সংসাব জীবনের সকল ক্ষয-ক্ষতি ও অসহনীয় দুঃখকে জয় করার শক্তি দেবে। ঠাকুরেব নামগান ও এদেব নিয়ে পদ রচনার আনন্দে তার বুকের তলদেশের গভীর ক্ষতকে সে সারিয়ে তুলতে পারবে। উপন্যাসে কবিয়াল জীবনের ট্র্যাজিডি-রসকে কতকটা ফিকে করে দিয়ে কবি-জীবনের ব্যাপ্তি ও বিশালতাকেই বড কবে তোলা হযেছে। তাই বলতে হয়, এ উপন্যাস খাঁটি ট্রাজিডি হয়নি—এর পরিণাম যদিও বিষাদন্ত। এ উপন্যাসে ট্র্যাজেডি-রসের স্বাদও তাই কিছু ভিন্ন ধরনের। ঠাকুবঝি ও বসন্তের জীবনেই তবে প্রকৃত ট্রাজিডি দেখা দিয়েছে? বসন্ত যে কালব্যাধিতে আক্রান্ত তাতে নিতাই-এব সাহচর্যে না এলেও তাকে মৃত্যু ববণ করতে হত। তাই এক হিসেবে সে নিযতি-অভিশপ্তা নারী। তার মতো বারাঙ্গনাব চিত্তেও নিতাই-এর সাহচর্যে জাগ্রত হযেছিল প্রেম—যেন সে ঘরবাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল—সেই স্বপ্ন ঘনীভূত হচ্ছিল এমন সময় তার ডাক এল—চলে যেতে হল তাকে। প্রেমের পাত্র হাতেব কাছে থাকলেও স্বল্পায়ু জীবন তাকে বিচ্ছিন্ন কবল। নিঃসন্দেহে তাব মৃত্যু ট্র্যাজিক। আর ঠাকুরঝি? নিতাই-এর জীবনেব প্রথম জাগ্রত প্রেমের সে আশ্রয়। দূর থেকে দেখেই নিতাই তাতে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু পাবেনি। তার মাথায় ফুল গুঁজে দিযে, হাতে কৃষ্ণচূড়ার ফুল তুলে দিয়ে হাতখানি আবেগে চেপে ধরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। ঠাকুবঝি বিবাহিতা হলেও সে আরও বেশী করে নিতাইকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। ঠারকুঝি ও নিতাই দুই ভিন্ন জাতের হলেও বিবাহে তাঁদের কোনো বাধা ছিল না, বাইরেব দিক থেকে যেটুকু বাধা তা অতিক্রম করা সহজই

ছিল। রাজন ঠাকুরঝির স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাকে বিয়ে করতেই নিতাইকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু আসল বাধা এল নিতাই-এর অতি প্রবল নীতিবোধ থেকে। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার একটা অসাধারণ সংযম-শক্তি। এই দুই শক্তির সম্মিলন তো ছিলই, আর সকলের ওপরে ছিল নিতাই-এর অনাসক্ত পথ চলাব মন। তাই নিতাই ঠাকুরঝিকে কাছে পেয়েও পায়নি। এই অতিপ্রবল নীতিবোধই এক হিসেবে নিতাই চরিত্রের দুর্বলতা। আর তাব জীবন পথ-পরিক্রমায় ঠাকুবঝিব সামনেই বসনেব সঙ্গে নাচ-গান ও রাত্রে একই গৃহে তারই চোখের ওপর অবস্থান তার error of judgement। এরই জন্য নিতাই-এর জীবনের চেয়ে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ঠাকুবঝিব জীবনে। মনোবিকারে ক্ষণে ক্ষণে নিতাই-এর স্মৃতি তাকে বিভ্রান্ত করতে থাকল। নিতাই-এর গাওয়া সঙ্গীত সে বারবাব গেযে উঠল—শেষে মৃত্যুতে তার প্রবল দেহবিক্ষোভ পরিসমাপ্তি লাভ করল। ঠাকুরঝির জীবন-পবিণাম বসন্তের চেয়েও মর্মান্তিক। কিন্তু এই দুই নারী কেউই উপন্যাসেব নায়িকা নয়—উপন্যাসটি নায়কপ্রধান। তাই এদেব জীবনের ট্র্যাজিডি বিচাবসঙ্গত নয। ট্র্যাজিডিব বস-পরিণাম খুঁজতে হবে নিতাই-এর জীবনকে কেন্দ্র ক'বেই। ট্র্যাজিডি নাযকরূপে নিতাই-এর জীবনের আসল দুর্বলতা ও তাব বিচার ভ্রান্তিব কথা বলেছি। ঠাকুরঝির মৃত্যুতে নিতাই-এর বেদনা নিশ্চযই বসনের মৃত্যুর চেযে অধিক। বসনেব মৃত্যুর কারণ নিতাই নয়, কিন্তু ঠাকুরঝির মৃত্যুব জন্য নিতাই দাযী। নীতিবোধ-সচেতন নিতাই একথা কি ভুলতে কোনদিন পারবে? তারাশঙ্কর অবশ্য এ দিকটিকে গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি নিতাই-এর কবি-স্বভাবকে বড ক'রে তুলে তার ব্যথার দিকটিকে একমাত্র সত্য করেননি। তাঁর বক্তব্য মোটামুটি এইরূপ: কবিয়াল নিতাইচরণের জীবন অনন্ত প্রসারিত। অজস্র গান রচনা ক'রে গানের নেশায় বুঁদ হয়েই তার পথ চলা। 'দুনিয়া ভোর বায়না' আসে তার। ঠাকুরঝিকে ছেড়ে সে খালেপুরের ঝুমুরদলে গেছে, কিন্তু সেখানেও তার থাকার কথা নয়। বসনের বাঁধনে কিছুকাল সে ধরা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তার মৃত্যুতে তার মোহমুক্তি হয়েছে—সে এখন তীর্থে তীর্থে ঘুরে শেষে মনুষ্যহীন হিমালয়ের কোথাও আশ্রয় বানাবে। তার পথ চলার পথে প্রেরণাদাত্রী-রূপে ক্ষণিকের জন্যে কেনো নারী আসতে পারে, কিন্তু প্রতিদিনকার ঘরকন্নার কাজে তাকে গৃহিণী করা চলে না তার। রবীন্দ্রনাথের 'সাজাহান' কবিতার সেই অনন্তের আহ্বানে চতুর্দিকের নিমন্ত্রণে ছুটে চলা মহাজীবনকে প্রেমের পাষাণ-মন্দিরে বাঁধবার প্রয়াসে যে ব্যর্থতা এখানেও তাই। ঠাকুরঝির প্রেম ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষের

অবিবেচনাপ্রসূত এক সকরুণ ভ্রান্তি। কবিয়াল বেঁচে রইল—ঠাকুরঝির স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতার মতো চিরকাল নিতাই-এর গান রচনায় প্রেরণা দেবে। ঠাকুরঝির কায়া নয়, ছায়াখানি নয়নের আগে রেখেই তো নিতাই চলতে চেয়েছিল, তবু সেখানে ভয় ছিল কায়ার মায়ায় পদস্খলনের—এখন তো আর তার কায়া নেই, কাজেই নির্বিঘ্নে চলবে তার কবিয়াল জীবনের ধারা। ঠাকুরঝির ব্যথা দুঃসহ হলেও তার নিরাসক্ত কবিজীবনে সান্ত্বনায় রূপান্তরিত। তাই বলতে হয়, 'কবি' উপন্যাসে কবির জীবনে ট্র্যাজিডির মেঘ ঘোর করে নামেনি। আর সেই জন্যই কি এ উপন্যাসের নাম 'কবিয়াল নিতাইচরণ' না দিয়ে 'কবি'? নিতাইচরণ প্রকৃতপক্ষে কবি নয়, কবিযাল। কবির কবিত্বশক্তি ও অনাসক্ত জীবন কবিয়ালের থেকে অনেক বেশী—কবিযালেব প্রতিভা তুলনায় নিম্নস্তরের। নিতাইচরণ সাধারণ কবিয়াল নয়। অশ্লীল গান রচনায় তার উৎসাহ নেই। অশিক্ষিত শ্রোতার মনোরক্ষাও সে করতে চায না। রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ কথাবই সে ভক্ত। কবিযাল-জীবনেও সে এক ধরনের সাধনা বলেই গ্রহণ করেছে—তার জীবনের ছন্দও প্রকৃত কবিব মতো। অনুভূতি শক্তির প্রখরতাও তাব তীক্ষ্ণ। প্রকৃতিব বিচিত্র রূপ, চণ্ডীমাতার মহিমা এক নারীর দেহ নয, তার লাবণ্য যেভাবে তাকে উদ্বুদ্ধ কবেছে এবং ভক্তিমূলক গানে যেভাবে সে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে তাতে তাকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি বলে অনেক সমযেই মনে হয়। 'দস্তরমতো বিস্ময'কর তার জীবন। তাই উপন্যাসের নাম 'কবি'। এমন নিরাসক্ত পথিককে তো দুটি বাহুব ডোরে ধরে বাধার প্রয়াস বিড়ম্বনা। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাকে বাঁধতে গিয়ে নবকুমারের জীবনের যে পরিণাম ঠাকুবঝিরও তাই নয় কি? যে কাব্যিক স্বরে উপন্যাসটি বাঁধা, তাতে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু তবু মনে হয, নিতাই-ঠাকুরঝির সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'বে নিতাই-এর জীবনে ট্র্যাজিডি ঘনঘোর ক'বে তুললেই ভাল হত। এ প্রশ্ন জেগে থাকবে শিল্পীর মনেও। তাই কবি নাটকে এই দিকটিই সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত। ঠাকুরঝির জন্য গভীরতম ব্যথার গানেই নাটকটির শেষ। নিতাই-এর গ্রাম বা গ্রামের মাটিপ্রীতির কথা সেখানে নেই। কাশীর কথাও নেই—বসনের মৃত্যুর পর সোনার মেডেলটি ঠাকুরঝিকে দিতে তার ছুটে আসা। কিন্তু তার মৃত্যুসংবাদ শুনে সে কেঁদে উঠেছে—বিষণ্ণ হাসির মধ্যেও ঘোরতর নৈরাশ্যে গেয়ে উঠেছে—

'এই খেদ মোর মনে
ভালবেসে মিটিল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে
হায় জীবন এত ছোট ক্যানে'। (৪।৪ পৃঃ ৯৭)

৫

'কবি' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার তের বছর পর বাংলা ১৩৬৪ সালে তারাশঙ্কর-এর কাহিনীকে নাট্যরূপ দান ক'রে 'কবি' নাটকটি লেখেন। উপন্যাসের ঘটনা বিশ্লেষণের বিস্তৃতি, কাহিনীব কতকটা মন্থর গতি ও বহু চরিত্রের ভিড স্বল্পায়তন নাটকে প্রত্যাশিত নয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় দীর্ঘতা, অর্থগূঢ মন্তব্য, ব্যাখ্যা ও অনেকখানি গঠন-শৈথিল্যও নাটকে থাকাব কথা নয। এখানে থাকবে দ্বন্দ্বময় ঘাত-সংঘাতে ভবা গতিশীল প্লট, একান্ত প্রাসঙ্গিক কুশীলব ও একটি বিশেষ রস-পরিণাম-মুখী ঘটনার সজ্জা। মোট চার অঙ্কের 'কবি' নাটকটিতে একুশটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কে চারটি, দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি, তৃতীয় অঙ্কে ছয়টি ও চতুর্থ অঙ্কে চারটি দৃশ্য আছে। উপন্যাস ও নাটকেব প্লটে মোটামুটিভাবে ঐক্য থাকলেও ছোটখাটো ঘটনার সংযোজন, বর্জন গ্রহণ কিছু কিছু পবিবর্তন ও চরিত্রগত পার্থক্যও নাটকে লক্ষ্য কবা যায। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিতাই-এব পূর্ব-জীবনের ইতিবৃত্ত অনাবশ্যক বোধেই নাটকে বর্জিত। নাটকের প্রথম অঙ্কেব প্রথম দৃশ্যেই দুই পথিকের সংলাপের মধ্য দিয়ে কবিয়ালরূপে নিতাইকে পবিচিতকরণের বিষযটি উপন্যাসে নেই। প্রধান চরিত্রের দিকে প্রথমত দৃষ্টি আকর্ষণেব জন্যেই এই ঘটনার প্রযোজন হয়েছে। উপন্যাসে বসন্তেব মৃত্যুর পব নিতাই-এর বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমাব বাসনা, কাশীযাত্রা ও সেখানকার বিস্তৃত অভিজ্ঞতাব কথাও নাটকে নেই। নিতাই-এর কবি-জীবনের ট্রাজিডিকে স্পষ্ট ক'বে তোলাব প্রয়োজনেই এই অংশের বর্জন। নাটকে ঠাকুরঝি চবিত্রটিকে পূর্ণতা দানের চেষ্টা আছে। মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটবার পব নিতাই-এর অবর্তমানে তাব শূন্যঘরে ঠাকুরঝি একদিন এসেছিল এবং আকস্মিকভাবে রাজনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎও হয়েছিল—এ চিত্র কিন্তু উপন্যাসে নেই। ঠাকুরঝির মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণটিকে নাটকে বেশী স্পষ্ট করা হয়েছে। উপন্যাসে যেখানে ঠাকুরঝির নিজ সংসার পরিচয়ের আভাস, নাটকে সেখানে তার স্বামী বৃন্দাবন ও শাশুডী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সামনে এসেছে। ঠাকুরঝির মনোবিকারের সংবাদ পেয়ে রাজন ও তার স্ত্রীর

(ঠাকুরঝির দিদি) তার বাড়ীতে যাওয়া, চিকিৎসাকালীন ওঝার হেঁয়ালি ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রকৃত তথ্য বের করার জন্যে ওঝার শারীরিক নির্যাতনকালে রাজনের বাধাদান ইত্যাদি প্রসঙ্গও উপন্যাসে অনুপস্থিত। রাজনের স্ত্রীর চরিত্রও নাটকে বেশী সজীব। বোনের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসায় নিতাইকে একটু বেশী গালিগালাজ, বোনের অসুস্থতাব সংবাদে তাকে দেখতে যাওয়া, বারবার তাকে 'ছুট্‌কী' বলে ডাকে—তার মানবিক দিকটিই বেশী উদ্‌ঘাটিত। রাজনের স্ত্রী ও ঠাকুরঝির নাম হয় যথাক্রমে রমা ও শ্যামা, তা উপন্যাসে জানা যায় না। ঝুমুরদলের চিত্র অবশ্য নাটকে বেশ সংক্ষিপ্ত—তবে বসন, মাসী নির্মলা ও ললিতার চিত্রাঙ্কনে নাট্যকার অমনোযোগী নন। তবুও গোষ্ঠীগত পরিচযের অন্তরালে ঝুমুবদলের প্রত্যেকেবই চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টবেখায় নাটকে অঙ্কিত নয়। বসনেব সঙ্গে নিতাই-এব ঘনিষ্ঠতার সকল স্তরগুলিও এখানে দেখানো সম্ভব হয়নি। বসনের মৃত্যুতে নিতাই-এর অতিরিক্ত শোককাতরতার চিত্রও এখানে বর্জিত। ঠাকুরঝি-নিতাই-এব সম্পর্কটি উপন্যাসে কতকটা রহস্যমণ্ডিত—এখানে সেই রহস্যমযতাকে যথাসম্ভব দূব করাব চেষ্টা আছে। নাটকের সূচনাতেই বিষাদের সুবে নিতাই গান ধরেছে—

"(আহা) আমি ভালবেসে এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখেব জলে রে।"

এই বেদনার সুরেই যেমন নাটকেব আবম্ভ, তেমনি ভালবাসার অপরিতৃপ্তি ও জীবনে আয়ুর ক্ষীণতাকে বিষয় ক'রে নিতাই-এর গানেই নাটকের অবসান। উদ্ধৃত বহুশ্রুত প্রথম গানটি ঠাকুরঝি মনোবিকারের কালে গেয়েছে এবং দ্বিতীয় গানটি গেযে নিতাই কাটোয়ার প্রতিযোগিতাব আসরে সোনার মেডেল পেয়েছিল এবং এ গান শুনে বসনের সমস্ত চিত্ত হাহাকার করে উঠেছিল। নাটকের প্লটে দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আছে। অতিপ্রিয় আত্মীয়-স্বজনদেব সঙ্গে নিতাই-এর বিচ্ছেদে প্রথম তার জীবনে দ্বন্দ্বের সূচনা। নাটকেব প্রথম অঙ্কে মেলার আসরে কবিয়ালরূপে নিতাই-এর প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে—মহাদেব কবিয়াল নিতাইকে জাত ও বংশ তুলে গাল দেওয়ায় তার কাকা ও এক জ্ঞাতি মহাদেবকে মারতে চায়—নিতাই ও রাজনের বাধায় তা সম্ভব হয় না। তখন নিতাইএর ছেঁড়া রামায়ণ ও মহাভারত ফেলে দিয়ে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যায়; এঘটনা উপন্যাসে না থাকলেও নিতাই-এর মনে আত্মীয়-ছিন্ন হওয়ার একটি

ব্যথা-ঘন দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করার জন্যে আনা হয়েছে। প্রথম অঙ্কেই ঠাকুরঝি এসেছে ও নিতাই কতকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ ক'রে রাজনের স্টেশনের কুঠরীতে আশ্রয় পেয়েছে। তারপরই নিতাই-এর জীবনে দ্বন্দ্ব এল ঠাকুরঝির প্রতি আকর্ষণ, প্রণয়ের গাঢ়তা ও বিচ্ছেদের সূত্র ধরে। নাটকের প্লটকে দ্বিতীয় অঙ্কে বেশ জটিল করে তোলা হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনার সাহায্যে। নিতাই-এর বাসায় একই কক্ষে বসন ও নিতাইকে গানের আসর-শেষে লক্ষ্য করে ঠাকুরঝির নিতাই-এর দেওয়া হারখানি জানলা দিয়ে অদৃশ্যভাবে ফেলে পলায়নে। তৃতীয় অঙ্কে ঠাকুরঝির মস্তিষ্ক-বিকৃতি, চিকিৎসার চেষ্টা ও তার আচরণ একদিকে, অন্যদিকে বসনের সঙ্গে নিতাই-এর গাঁটছড়া বন্ধন। বসনের কথায় মদ খেয়ে অশ্লীল গান গেয়ে রাত্রে নিতাই বমি করে ও পরদিন ভোর না হতেই সুটকেশ হাতে ঝুমুরদল থেকে বিদায় নেওয়া ও ঠাকুরঝির টানে নিতাই-এর চলে যাওয়ার ধারণায় বসনের বিদায় দেওয়ার দৃশ্যটি বেশ দ্বন্দ্বময় হয়ে দেখা দিয়েছে। শেষে ঠাকুরঝির স্মৃতি ভুলতে ও বসনের ক্ষয়-রোগের কথা শুনে নিতাই মমতায় ভালবাসায় বসনের সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধেছে। কিন্তু ঠাকুরঝির কথা তখনও তার মন থেকে নির্মূল হয় নি। চতুর্থ অঙ্কে বসনের মৃত্যু, প্রতিযোগিতার আসরে স্বল্পবৃত্ত জীবনে প্রেমে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস জনিত নিতাই-এর গান, মেডেলপ্রাপ্তি ও একেবারে গ্রামের স্টেশনসংলগ্ন শূন্য গৃহে তার প্রত্যাবর্তন, ঠাকুরঝির মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণ ও আক্ষেপপূর্ণ গানের মধ্যে দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কেই ঠাকুরঝি-নিতাই সম্পর্কের নিবিড়তা ও সম্পর্ক ছিন্ন করার আয়োজন—তৃতীয় অঙ্কে ঠাকুরঝির মানসিক বিকারে দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ—দ্বন্দ্বমুক্তির প্রয়াসে নিতাই-এর গ্রামত্যাগ ও বসনের আকর্ষণে ধরা দেওয়া—সেখানে বসনের মৃত্যু আবার তাকে ভুলে যাওয়া ব্যথার দেশেই টানে। ঠাকুরঝির মৃত্যুতেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান। নিতাই-এর জীবনের দ্বন্দ্ব যদি আগাগোড়া ঠাকুরঝির সম্পর্ক ধরেই প্রবাহিত হত, নাটকটি ট্র্যাজিডি হিসেবে উচ্চমূল্য লাভ করত। কিন্তু এখানে দ্বন্দ্ব ত্রিমুখী এবং তার ফলে মূল দ্বন্দ্বের তীব্রতা কতকটা মন্দীভূত। তবুও উপন্যাসের চেয়ে এখানে কবিয়াল জীবনের ট্র্যাজিডি অধিকতর প্রশংসনীয়।

৬

তারাশঙ্কর তাঁর চোখে-দেখা ঝুমুরদলের চিত্রই অঙ্কন করেছেন। সাঁওতালী ঝুমুর বা মানভূমের ঝুমুরদল নয়—বীরভূমেরই তারাশঙ্করের অল্প বয়সে দেখা ও শোনা ঝুমুরদলের গান থেকেই এর প্রায় সমস্ত উপাদান সংগৃহীত। দলটিতে লোকজনের সংখ্যা বেশী নয়—পুরুষদলে চার জন ও মেয়েদলে তিন জন। বসন্ত, নির্মলা ও ললিতা—এই তিন যুবতী ও দলনেত্রী মাসী। আর বসন্ত ছাড়া তিন জন নারীরই মনের মানুষ যথাক্রমে বেহালাদার, প্রধান দোহার ও মহিষের মতো বিরাটকায় এক ব্যক্তি। বাজনদার ঢুলী তাবও স্বভাবগুণে ভালবাসার কোনো জন নেই। সে যাই হোক, মেয়ে-পুরুষ নিযেই ঝুমুরেব দল। ঢোল, টিনেব তোরঙ্গ, কাঠেব বাক্স, পোঁটলা—আসবাবপত্র তাদের অনেক। মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষগুলিরও একটি বিশিষ্ট ছাপমারা চেহাবা। অনেক ঝুমুরদলে একজন কবিয়াল থাকে, এদেবও ছিল কিন্তু সে আসেনি কোনো কারণে। নাচ-গানেব আসবে এই দলে প্রথমে মেযেবাই গান শুরু কবে খেমটার অনুকবণে। মেযেদেব পরে দোয়ারেরা সেই গান পুনবাবৃত্তি কববে—তখন মেযেবা নাচবে। বিচিত্র হাব-ভাবের মধ্যদিয়ে দেহ দুলিযে চোখ ঠেরে নানা অশ্লীল গানই এবা বেশী গায—তাতেই তাদেব অর্থাগম হয় বেশী। দলনেত্রীই সব—তাব অনুগ্রহেই আর সকলেব দলে অবস্থান। দু' চারটে ভাল পালাগানও তাবা দর্শক বুঝে গায। এই দলের সব নারীই দেহব্যবসাযিনী—এবা প্রচুর মদ খায়, রাত্রিতে দেহ-ব্যবসাযের আসর বসে, পরস্পর বা বিভিন্ন নাগবদেব সঙ্গে কলহ হয। এই ঝুমুর-দলের পুরুষ ও নাবীদেব যে পরিচয় তাবাশঙ্কব দিযেছেন তাতে প্রতিটি চরিত্রই দলগত বৈশিষ্ট্যেরও উর্ধ্বে আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়েছে।

প্রথমেই বেহালাদারেব কথা। বেহালা বাজানোই তার কাজ—কিন্তু বেহালাব সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আপন মনে তন্ময় হয়ে তাব বেহালা বাজানো বিস্ময়কর। সে সুর বাঁধে—সে বাঁধা যেন আব শেষ হয় না। সুববেঁধে একবার ছড়ি টেনে আবার তারবাঁধা কানটায় মোচড দেয। তাব কেটে যায়—আবার তখন নূতন তার পরাতে বসে সে। ছড়িতে রজন ঘষে—বেহালাখানাকে নিয়ে ঝাড়ে—মাঝে মাঝে বার্নিশ মাখায। রাত্রি একটু গভীব না হলে বেহালা তার জমে না। একটা অদ্ভুত বাজনা সে বাজায়—লম্বা টানা সুর—সুরটা কাঁপে। মাঝে মাঝে এমন একটা কোমল খাদে সে সুব নামিয়ে দেয় যে, সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম ক'রে ওঠে—মনে হয় যেন সমস্ত নিঝুম হয়ে গেল—চাবদিক হিম হয়ে গেল।

রাত্রিতে নির্মলাকে নিয়ে তার মদের আসর বসে। বেহালাদারও মাঝে মাঝে রসিকতা করে—নির্মলার অনুরোধে নিতাই মদ খেতে রাজী না হলে সে বলে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকেই (বসনকে) ডাক, কান টানলেই মাথা আসবে।" নিতাই ঝুমুরদলে ভদ্র গান গেয়ে যখন পরাজয় বরণ করে তখনও রসিক বেহালাদার বলেছিল—'তা বটে। তবে রঙেরই আসর যখন, তখন রঙ না গাইলে হবে কেনে বল ?' বেহালাদার আবার অদ্ভুত খেয়ালী। বসন্তরোগে আক্রান্তা বসন্ত যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে তখন নির্মলার ঘরে চলেছে তার বীভৎস উৎসবের আসর। তবু সে ওস্তাদ বাজিয়ে। তার বেহাগের আমেজে চারদিকে অন্ধকার জমাট হয়ে ওঠে—সব হারানোর হাহাকার যেন কথা কয়। উপন্যাসের নায়ক নিতাই বেহালাদারের কাছে বাজনাটি শিখতে চেয়েছিল—কিন্তু বসনের মৃত্যু তাড়াতাড়ি দল ছাড়তে হল বলে সে তা শিখতে পারেনি। বসনের মৃত্যু তার চিত্তে কোনো দাগ না কাটলেও তার শবদাহের শেষে নিতাই-এর সঙ্গে সে কোনো রসিকতা করেনি। নিজের নীচতার পরিচয়ও দেয়নি। বরং ঢুলীর রসিকতায় সে ধমক দিয়েছে ও করুণ রাগিণীতে নিতাইকে সে গান শুনিয়েছে।

দোহার হল ললিতার মনের মানুষ। তর্ক করা তার স্বভাব। ঢুলির সঙ্গে যখন-তখন সে তর্ক জুড়ে দেয়। হাতে তাল দিতে দিতে সে বলে—'এই—এই—এই ফাঁক।' ঢুলি অবশ্য তার কথা গ্রাহ্যও করে না। বসনের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ পুরুষেরা কেউই ছোঁয়নি—তখন তারা সব আপন আপন জাত সম্বন্ধে সচেতন। তার্কিক দোহার নিতাইকে তখন বলেছে—'ওস্তাদ, যা করছে ওরাই করুক। করলে তো অনেক। আবার কেনে ?' আবার বসনের দেহ দাহ করে পরদিন নিতাই ফিরে এলে দোহার রসিকতা করে বলে—'আমি বলি ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল।'

ঢুলিটা তো চোর। তাই তার ভালবাসার জন নেই। ভালবাসার জনের টাকা-পয়সা চুরি করে সে। হা-হা করে হাসে, বাজনা বাজায়—মধ্যে মধ্যে মদ খায়। বেহালাদার ও দোহারের জন্যে মদ বয়ে আনে। ঘুম পেলেই বিছানা পেড়ে শুয়ে পড়ে। তবে বাজনদার সে খুব ভালো—যেমন তার তালজ্ঞান, হাতটিও তেমনি মিঠা। দলের প্রতি তার একটা টানও আছে। কতবার চুরি করে দল ছেড়ে পালিয়েছে, কিন্তু আবার এসেছে। অতিশয় চরিত্রহীন ঢুলি। রাত্রে বাজনা বাজায় সে, কিন্তু দিনে ঘুরে বেড়ায় নারীর সন্ধানে। বসনের মৃত্যুতে সেও এতটুকু চঞ্চল হয়নি—কোন্ দলে ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে

বেহালাদার ও দোহারের সঙ্গে সে আলোচনায় সেও যোগ দিয়েছিল মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই। নিতাইকে সে কটাক্ষ করে বসনের সম্পর্ক ধরে। পয়সার প্রতি তার অতিরিক্ত লোভ। নিতাইকে সে বলেছিল—'বসনের কাপড়-চোপড় বিক্রী হয়ে গেল'—'গহনা দু'এক পদ রেতে খুলে লাভ নাই কেনে, বল দেখি? এমুনি মুখ্যামি করে ছি!'

মহিষের মতো বিরাটকায় লোকটা প্রৌঢ়া মাসীর মনের মানুষ। লোকটা অদ্ভুত। সে কথাবার্তা বলে না। আমড়ার আঁঠিব মতো সৌষ্ঠবহীন রাঙা চোখ মেলে কেবল চেয়ে দেখে। রাক্ষসের মতো তার খাওয়া। সমস্ত দিনটা প্রায় ঘুমোয়। রাত্রে আকণ্ঠ মদ গিলেও ঠায় জেগে বসে থাকে। তাব সামনেই থাকে একটা আলো আর একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। এই পথে-পাতা ঝুমুবদলেব নারীদের দেহলোভে যারা আসে তাদের দৃষ্টি এ লোকটিব উপর না পডে পারে না। তাকে দেখে অভদ্র মাতাল খরিদ্দাররা অনেকটা শান্ত হয়। নির্বিকার উদাসীনের মতো মদের বোতল নিযে ভাম হয়ে বসে থাকে লোকটা।

প্রৌঢ়া মাসীও অদ্ভুত ধরনের মেয়ে। সে-ই দলনেত্রী। উন্মত্ত একপাল বুনো ঘোড়াকে রাশ টেনে চালিয়ে নিযে যাচ্ছে সে। তাই তাব ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে। গৃহস্থালী নিয়েই অধিকাংশ সময ব্যস্ত। কি করে অর্থাগম হবে তার জন্যে তার সব সময় ভাবনা। অথচ মুখে হাসিটি লেগেই আছে। রান্নাশালাব চালায় সে কখনো কখনো তেলেভাজা ভাজে আবাব কখনো বা সুপুরি কাটে। মুহূর্তেই চোখ দুটি রাঙা হয়ে ওঠে। এমন গম্ভীর হয মাঝে মাঝে যে, দলের সব লোক ভীত হয়—আবার হেসে ওঠে। পেটে তার গানের ভাণ্ডার—মুখে অনর্গল ছড়া। নিতাই তাকে মাসী বলে। নিতাই-এর অতিশয ভদ্র ব্যবহাবে তার প্রতি তার একটা ক্ষীণ দুর্বলতা ছিল। বসন নিতাইকে ধরে রেখেছে বলে সে বসনকে একটু বেশী ভালবাসত, তাছাডা তার দলের এই সবচেয়ে সুন্দরী নারীর দ্বারা অর্থাগম বেশী হত বলেও ছিল তার প্রতি দুর্বলতা। বসনের অসুখের জন্যেও তার কিছু অধিক মমতা থাকতে পারে। বসনের মৃত্যুতে দুফোঁটা চোখের জল সে ফেলেছিল। তবু অর্থই তার জীবনের সর্বস্ব। বসনের মৃত্যুর পর সে তার কাপড়-চোপড় বিক্রী করেছে—তার গয়নাগুলো খুলে নিয়েছে এবং দলে নতুন মেয়ে আনার কথাও চিন্তা করেছে।

নির্মলা ও ললিতা ঝুমুরদলেরই রূপোপজীবিনী। দুজনেরই আবার দলের মধ্যে মনের মানুষ আছে। দুজনেই হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা করতে নিপুণ।

নিতাইকে নির্মলা বলে দাদা এবং ললিতার সঙ্গে নিতাই-এর ঠকুরঝি-সম্পর্ক। তবু নির্মলাই নিতাইকে একটু বেশী ভালবাসে। মদ খেয়ে বমি করার পর নিতাই যখন অসুস্থ তখন নির্মলা তার ঠাণ্ডা আর নরম হাতে তার মাথা টিপে দিয়েছিল। নির্মলা নিতাইকে ঠাট্টা করলেও বসনের মৃত্যুব পর সে কোনো রসিকতা করেনি—কিন্তু ললিতা করেছিল। নিতাই-এর বিদায়ে নির্মলাই কেঁদেছিল, ললিতা নয়। যথার্থ বোনের ভালবাসা নিতাই তার কাছেই পেয়েছিল। নিতাই বলেছে—'নির্মলা চিরদিন ভাল, মায়ের পেটের বোনের মতই ভাল।' বসনের মৃত্যু অবশ্য তাদের দুজনকেই সমান আঘাত করেছে—বসনেব প্রতি তাদেব দুজনেবই ছিল ভালবাসা। তাবা দুজনেই দেহোপজীবিনী, তাদের জীবনের প্রেম তাই শরতের মেঘ, আসে চলে যায়—যদি বা কোনটা কিছুদিন স্থায়ী হয—তবে হেমন্তের শীতের বাতাসের মতো দেহোপজীবিনীর দুর্দশার আভাস আসামাত্রই তা চলে যায। বসন্ত রোগ নির্মলার তিনবার ও ললিতার দু'বাব হয়েছে। বসন্তের চিতার দিকে চেয়ে তাদের মনে নিজেদের পরিণাম চিন্তা জেগেছে। দীর্ঘদিন বাঁচলে তারাও মাসীর মতো দলনেত্রী হবে—কিন্তু এ সুখের চিন্তা তাদের মনে বেশীক্ষণ স্থাযী হয় না। নিরাশার কল্পনাতেই তাদের কেমন যেন সুখ।—তারাও এমনিভাবে মরবে, মাসী বেঁচে থাকবে।

ঝুমুরদলের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রধান চরিত্র বসন্ত। ক্ষয়রোগগ্রস্তা হলেও বসন্ত অপরূপ সুন্দরী। দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী। অদ্ভুত তার চোখ দুটি। বড় বড় টানা দুটি চোখের সাদা ক্ষেতে ছুরির ধার। সেই শাণিত দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুটি সর্বদা চঞ্চল—যেন দুটি মরণজযী কালো ভ্রমর। অপরূপ তার হাসি। খিলখিল ক'রে যখন সে হাসে তখন সর্বাঙ্গ যেন হেসে ওঠে। তার হাসিব ধারে মানুষের মনের মুন কেটে টুকরো টুকরো হয়ে ধুলোয় লুটোয়। ঝুমুরদলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েই সে শুধু নয়, তার নাচ ও গান বিস্ময়কর। যেদিন থেকে সে আমাদের চোখের সামনে এসেছে সেদিন থেকেই অসুস্থ। তবু একটু সুস্থবোধ করলেই তার দলগত ভূমিকা সকলের ওপরে। আর এই জন্যেই দলনেত্রীর সে সবচেয়ে প্রিয়।

নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী বসন্ত। সকলেই তাই, তবু সকলেরই আছে মনের মানুষ। কিন্তু বসন্তের স্বভাবে এমন একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যে, তার কোনো মনের মানুষ নেই। তার খাওয়ারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—মাছ ছাড়া সে ভাত খায়

না। 'চা দাও ভাই, ময়ে গেলাম মাইরি'—এই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কথা নিতাইকে বলেই সে প্রথম আমাদের সামনে আসে। রসিকতায় সে নির্মলা ললিতাকেও ছাড়িয়ে যায়। নিতাই তার অসুস্থতার কথা শুনে ঠাণ্ডা মেঝেতে কিছু পেতে দিতে চাইলে সে ঠাট্টা করে বলেছিল—'ওলো, নাগর আমাব পীরিতে পড়েছে। দরদ একেবারে গলায গলায়।' মাসী নিতাইকে বিযে করার প্রস্তাব দিলে সে বলেছে, 'ওই কালো কুচ্ছিৎ মা-গ'।

সমাজের নিম্নস্তরের নাবী বসন্ত লেখাপড়া কিছুই জানে না। কিন্তু সংগীত-ব্যবসাযিনী হিসেবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি এবা রক্ষা করে চলে। পালাগানের মধ্য দিযে পুরাণ-জ্ঞান কিছু এদের হয—এদেব ঠাট্টা-পরিহাসে পুরাণেব অনেক প্রসঙ্গ থাকে—এবা পুরাণ-কথা কিছু কিছু বুঝতেও পারে। প্রশংসা-নিন্দা সহজেই উপলব্ধি কবতে পারে। এই জাতেবই মেযে বসন্ত।

উপন্যাসেব নাযক ধীবে ধীবে ঠাকুবঝিকে ছেড়ে এই বসন্তের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। বসন্তেব মধ্যেও পবিবর্তন দেখা দেয, অন্য নাগরদেব সাহচর্য আর তেমন তার ভালো লাগে না—নিতাই তাব এখন 'কালো মাণিক'। নিতাই-এর নিবিড সান্নিধ্যে এই দেহব্যবসাযিনীবও সুপ্ত ক্ষুধিত চিত্ত হাহাকাব ক'রে ওঠে—একটি পুরুষের চবণে নিজেকে নিবেদনেব তাব কাঙালপনা দেখা দেয। বসন্তের মধ্যেও প্রকৃত প্রেম জাগ্রত হয। নিজেব অসুস্থতাব জন্যে সে ভাবে তাব জীবন কতো সীমিত। ভালবাসাব জনকে কাছে পেযেও সে কেঁদে ওঠে—দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নিতাইকে বলে—'কেন তুমি দলে এসেছিলে, তাই আমি ভাবছি—মবতে আমার ভয ছিল না কিন্তু আব যে মরতে মন চাইছে না।' তার ভালবাসার প্রকাশে আদিম সংস্কৃতির চিহ্ন আছে।

মদে বেহুঁশ নিতাই-এর মধ্যে যখন বীববংশী বর্বরতা সকল শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে—আবেগেব তাডনায সে বসন্তের হাত চেপে ধবেছে, তখন ক্ষণিকেব জন্যে তার সংক্রামক ব্যাধির কথা ভেবে নিতাইকে নিবৃত্ত করতে গিযেও আর এক প্রবোচনায় তার বাহুবন্ধনে ধরা দিযে চুম্বনে চুম্বনে মাতিয়ে তোলে সে।

বসনের সখীপ্রীতি সবচেযে বেশী, তাই তার মৃত্যুতে নির্মলা-ললিতা না কেঁদে পারেনি। আবার দীন-দুঃখীর প্রতি তাব যে কত মাযা নিতাই-এব সঙ্গে মন্দিরে যাওযার পথে তার প্রমাণ মিলেছে—আব সেইদিনই নিতাই-এর সঙ্গে তার গাঁটছড়া-বন্ধন।

কিন্তু বসন্তের জীবনের কামনা অপরিতৃপ্ত। নিতাইকে নিয়ে তার নীড় রচনা হল না—কালব্যাধি তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছে। ভগবান তাকে রূপ ও বুকভরা ভালবাসা দিয়েছেন, কিন্তু তা চরিতার্থ হল কই? তাই ভগবানের ওপরও তার কতো অভিমান।

৭

সবশেষে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের ভাষা-সংলাপ বর্ণনা ও স্টাইল সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। উপন্যাসের প্রধান কথা চরিত্রচিত্রণ। তাই চরিত্রগুলির স্বভাবধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ঔপন্যাসিককে ভাষা ব্যবহার করতে হয়। উপন্যাসের চরিত্রগুলি যখন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পৃথক তখন ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মুখে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাই প্রত্যাশিত। তবে কতকগুলি চরিত্র যেখানে বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত সেখানে তাদের মুখে অনেকখানি ভাষাগত ঐক্য থাকবে। আবার উপন্যাসে বর্ণিত পাত্রপাত্রী যদি ঔপন্যাসিকের নিজ সমাজভুক্ত না হয়, তাহলে পাত্রপাত্রীদের ভাষার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষার পার্থক্য থাকবে। যেখানে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে চলেছেন কিংবা চরিত্র-বিশেষের অন্তর-রহস্য বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছেন সেখানে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব ভাষাই ব্যবহার করবেন, তবে সে ভাষার সঙ্গে উপন্যাসের ভাববস্তুর একটা সাধারণ সঙ্গতি প্রত্যাশিত। আর এসব ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব স্টাইল-লক্ষণে ভাষা অন্বিত হওয়া দরকার। সহজেই লক্ষ্য করা যায় 'কবি' উপন্যাসের ঝুমুরদল, ঠাকুরঝি ও তার দিদির ভাষা এবং তারাশঙ্করের ভাষা এক নয়। যে টাসুটিভাবে উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে মিল রেখেই তারাশঙ্করের ভাষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ভাষায় সাধারণত কবিত্বের মায়াঘোর নেই—শব্দের লীলা-বিলাসও নেই। অকারণ ভাবালুতা ও কোমলতায় তাঁর ভাষা ললিত-লবঙ্গলতাও নয়। তাঁর নিজস্ব ভাষায় তৎসম শব্দের কিছু বাহুল্য। ধ্বনিগম্ভীর তৎসম শব্দ মাঝে মাঝে এনে তিনি ভাষাকে আভিজাত্য দান করতে চান—তবে সর্বত্র এ প্রয়াস নেই। কবিত্বপূর্ণ উক্তিতে সাধারণত তাঁর আসক্তি নেই—কিন্তু কবি উপন্যাসটির সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে ভাষাকে কাব্যধর্মী করতে হয়েছে। তারাশঙ্করের ভাষায় তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। তিনি ছিলেন অসামান্য স্থিতধী পুরুষ। আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকে জীবনের পর্বে পর্বে তাঁর বলিষ্ঠ অগ্রগতি। অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার, মানবপ্রীতিতে প্রসন্ন,

একটি অঞ্চলের জীবন ও প্রকৃতির রূপ, সুর ও ছন্দের দ্রষ্টা ও শ্রোতারূপে অভ্রান্ত, মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, তার অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী তারাশঙ্করের ছিল একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব। বীরভূমের উষর-ধূসর-রুক্ষ প্রকৃতি তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর ছায়া ফেলেছিল। তাই তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ভাষায় দৃঢ়তা, ঋজুতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে কতকটা রুক্ষতা। তাই তাঁর ভাষা সর্বত্র মসৃণ নয়—যত্নকৃত পারিপাট্যসাধনে তাঁর আগ্রহ নেই। তৎসত্ত্বেও জীবনের তপ্ত স্পর্শে তা দীপ্যমান। তাঁর সংলাপগুলি যথোপযুক্ত ও চরিত্রপ্রকাশক। চরিত্রের মুখের বুলির আশ্রয়ে তা উদ্দীপ্ত ও প্রাণময়। তবে সাধারণভাবে তাঁর ভাষা ইঙ্গিতময় ও অলংকৃত নয়—ভাষার নাট্যচমক থাকলেও তার গতি কতকটা মন্থর। তাঁর বর্ণনাশক্তি পর্যবেক্ষণ-শক্তির নৈপুণ্যে অপরূপ। ঝুমুরদলের নারীদের দেহ-ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা, নিতাই-এর কোলে বসনের মৃত্যু, বসনের মৃত্যুর পর শ্মশান দৃশ্য, নিতাই-এর বৈরাগ্যময় জীবনের শূন্যতা, বৈশাখের দ্বিপ্রহর, বর্ষার আগমন, রাত্রির স্তব্ধতা, নদীর চলমানতা, চলন্ত ট্রেনের শব্দ প্রভৃতি বর্ণনায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ঠাকুরঝির মাথায় রৌদ্রচ্ছটা-প্রতিবিম্বিত দুধের ঘটিটির চিত্র বর্ণনায় বিশেষ মৌলিকত্ব আছে।

———

ধাত্রীদেবতা ঃ তারাশঙ্করের এক পর্ব

নির্মলেন্দু ভৌমিক

১

তাবাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৪৬) আত্মজীবনী-মূলক, বোমান্স-রস-নির্ভর, নীতি-নিষ্ঠ, বাজনৈতিক-আদর্শ-গর্ভ, দীর্ঘ উপন্যাস। তারাশঙ্করেব প্রতিভাব স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা, স্বস্তি ও তৃপ্তির স্থান হল উপন্যাস, —'ধাত্রীদেবতা'য সেই ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রথম সফলতা। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলেই এব একটি পৃথক মর্যাদাও আছে। এই উপন্যাসেব অনেকটাই বাস্তব জগতেব সত্য ঘটনাকে অবলম্বন কবে রচিত,—এবং এই রচনাটি সম্পর্কে তারাশঙ্কব নিজে যত কথা বলেছেন, অন্য কোনো রচনা সম্পর্কে তত কথা বলেন নি।

'ধাত্রীদেবতা'ই তাবাশঙ্করকে প্রথম 'তারাশঙ্কর' করে তুলেছে,—রচনাবীতিতে, বিষয়বস্তুতে, তাঁব নিজস্ব তত্ত্বে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু বৃহত্তব সাফল্যের জন্যে এ প্রারম্ভ মাত্র, প্রান্ত নয়। যুগের হাওয়া অনুযায়ী তারাশঙ্কর সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত হযে ট্রেড্-ইউনিযানিজ্ম-এর আদর্শেব দিকে ঝুঁকে 'চৈতালীঘূর্ণী' লিখে ফেলেছিলেন, নাগরিক মানবতাবাদের মোহে পড়ে 'পাষাণপুরী'ও রচনা কবেছিলেন। কিন্তু সেটা যে তাঁব নিজের পথ নয়, অল্পদিনেই তারাশঙ্কর তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'রসকলি'ই অভ্রান্তভাবে তাঁর সাহিত্য-জীবনের পথ-নির্দেশের নিশ্চিত ধ্রুবতারা। অবশ্য, 'চৈতালীঘূর্ণী'র রাজনৈতিক চেতনাই 'ধাত্রীদেবতা'য পুষ্টতর, অথবা, 'পাষাণপুরী'র কারা-জীবনের সত্যাগ্রহকারীরাই যে 'ধাত্রীদেবতা'র রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সংগুপ্ত,—এ কথা বলে বোঝাবার দরকার আছে বলে মনে করি না।

'রসকলি'র মধ্যে যে অঞ্চল-চেতনা এবং তার পশ্চাতে তারাশঙ্করের রাঢ-বঙ্গের একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষ-নিসর্গ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ইতিহাসের প্রতি প্রেম-মমতা, যা তাঁর বিশেষত্ব,—তা কিন্তু 'চৈতালীঘূর্ণী' বা 'পাষাণপুরী'তে স্পষ্টভাবে নেই।

তারাশঙ্করের এই আঞ্চলিকতাবাদ মোটামুটিভাবে তিনটি খাতে প্রবাহিত—প্রথম ধারায় রয়েছে, রাঢ়ের অভিজাত তান্ত্রিক সাধনার ধারা,—তার উজ্জ্বল ও

অবক্ষয়িত—এই দুটি বিপরীত ছবি ধরা পড়েছে জমিদারী সভ্যতার মধ্যে। 'ধাত্রীদেবতা'য় তারই সূচনা। দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে মধ্যবর্তী সমাজের বৈষ্ণব চেতনার ধারা, 'রসকলি'তে যার প্রথম প্রকাশ এবং 'রাইকমলে'র মধ্য দিয়ে এক বিচিত্র পরিণতি যার 'রাধা'তে। তৃতীয় ধারায রয়েছে সমাজের অন্তেবাসী আদিম মানুষেরা, যাকে বলা যায় 'ব্রাত্যতন্ত্র'—রাঢ়ের কাহার-বাগ্দী-ডোম-বাউরিদের জীবনতন্ত্র। 'কবি', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' প্রভৃতিব মধ্য দিয়ে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য যার রমণীয় পবিণতি।

তারাশঙ্করেব এই আঞ্চলিকতাবাদ দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি হল—সমাজ বিবর্তনে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভূমিকা, অপবটি হল—একটি বিশেষ 'কাল-চেতনা' বা 'যুগ-চেতনা' বা একটি 'প্রজন্ম-চেতনা'। যেন তাঁর আঞ্চলিকতাবাদ নিরালম্ব কিছু নয়, যেন তার একটি বিশেষ সময-সীমা বা সময়গত পটভূমিকা আছে। এই সময বা কাল বা যুগ আবার দ্বিমুখী : একটি মুখ তার অতীতের দিকে, অপরটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে জড়িযে। তারাশঙ্কর অনেক গ্রন্থেব নাম-চয়নে পর্যন্ত এই সময-যুগ-কাল ও প্রজন্মেব প্রত্যক্ষ ছাযা আছে। যেমন : 'দুইপুরুষ', 'বিংশ শতাব্দী', '১৩৫০', 'মন্বন্তর' (এবং লক্ষণীয—শেষ রচনার নামও দেওযা হয়েছে, 'কলকাতা '৭১')।

ভাল করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, ওপরের এই 'অর্থনৈতিক বিপর্যয়' এবং 'সময়-যুগ-চেতনা' আসলে একই চিন্তার এপিঠ-ওপিঠ, একই ভাবনাব দুটি দিক। দুটিই একসঙ্গে জড়িযে আছে। কি ভাবে—তাই বলি।

তারাশঙ্করেব মন বিলীযমান সামন্ততন্ত্রের অতীত গৌরবে যেমন গর্ব অনুভব করে, তেমনি, কালবিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য নিয়মে সেই কাল গিযে নবতর কাল আসন্ন হলে তাকেও গ্রহণ করে। নবতর কাল তখনই আসন্ন যখন পূর্ববর্তী সামন্ততন্ত্রের কাল বিগত বা গতপ্রায়। তারাশঙ্কর এই সন্ধিক্ষণকে বেছে নিয়েছেন তাঁব আলোচ্য বিষয় হিসেবে। তাঁর সব মানুষ এই সন্ধিক্ষণের মানুষ : হয় অতীতের গৌরবেব সঙ্গে অতীতেরই অস্তেব সন্ধিতে, নয অতীতের অস্তের সঙ্গে বর্তমানের উদয়ের সন্ধিতে। সন্ধিলগ্নের মানুষ মাত্রই সংঘর্ষের মানুষ। 'ধাত্রী-দেবতা'য় সেই সন্ধিক্ষণ ও সংঘর্ষের প্রথম উপস্থিতি।

এইখানেই তারাশঙ্করের অর্থনৈতিক চিন্তার কথা ওঠে। সমাজ যে বিবর্তিত হয়ে নবতর হয়ে ওঠে, তা কোন্ শক্তির ফলে? সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনে। তারাশঙ্কর অর্থনৈতিক বিবর্তন বা বিপর্যয়কেই সমাজ

বিবর্তনের মূল শক্তি হিসেবে লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে সমাজের বিবর্তনের ক্রমটি এই : জমিদার—কৃষক—শ্রমিক। জমিদারী প্রথা ভেঙে গিয়ে কৃষক সম্প্রদায়ের উদ্ভব, কৃষকও আবার অর্থনৈতিক কারণে শ্রমিক বা মজুর হয়। কৃষকের আবার দুটি রূপ : একটি নিছক হল-কর্ষণকারী চাষী ; অপরটি কৃষিকর্মকে নির্ভর করেই গড়ে-ওঠা একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সমাজ , এ মধ্যবিত্ত লেখা-পড়া-জানা, শহুরে, চাকুরীজীবী ইন্টেলেক্‌চুয়াল্ নয়। এ মধ্যবিত্ত সামান্য লেখা-পড়া-জানা সুদখোর মহাজন, তেজারতি কারবার করে যে সম্প্রতি ফুলে ফেঁপে উঠে বিগত যুগের প্রভু জমিদারকেও গ্রাহ্য করে না, 'গণদেবতা'র ছিরু বা শ্রীহরি পাল কিংবা 'রসকলি'র মোহান্ত যার সুন্দর নিদর্শন। এই সুদখোর মহাজনই আরও এক ধাপ বিবর্তিত হয়ে ব্যবসাদার ও শিল্পপতিতে পরিণত।

এই সব কটি স্তর-বিবর্তনের ইঙ্গিত 'ধাত্রীদেবতা'র মধ্যেই প্রথম ধরা পড়েছে। শৈলজা দেবী প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় সামন্তসভ্যতার প্রতীক, যিনি মাটির ওপর প্রভুত্ব করেন 'দাপ' বা দর্প নিয়ে, অনমনীয় ও অটল ব্যক্তিত্বে। এই জমিদারের ঘরেই বাঁধল স্वবিরোধ , অধস্তন পুরুষ শিবনাথ 'প্রপার্টি ইজ্ থেফ্‌ট' জেনে সেই জমিদারী সভ্যতাকেই পরিত্যাগ করে, পুরুষানুক্রমিক স্বত্বকে ত্যাগ করে চলে এল ময়ূরাক্ষীর তীরে নিজেই চাষবাস করতে। অর্থাৎ জমিদার শিবনাথ হল কৃষক শিবনাথ। শিবনাথ কেবল কৃষকই হয় নি, অর্থাভাবে সে যেখানে ঘরের ধান বেচে দেয় (জমিদাররা যা কল্পনাই করতে পারেন নি , কিংবা গৌরীর ভাষায় : "হ্যাগা, ধান বিক্রি করলে কেন বলতো ? ছি, ধান বিক্রি করে তো চাষাতে।") সেখানে সে একজন চাষী গৃহস্থে পরিণত হয়েছে। এ হল শিবনাথের বিবর্তনের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে শিবনাথই বিবর্তিত হয়েছে শ্রমিক বা মজুরে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসেরই পরবর্তী কাহিনী নিয়ে তারাশঙ্কর "জায়া" নামে একটি ছোটো গল্প লিখেছেন। ওই গল্পটিতে শিবনাথের পরবর্তী স্তর-বিবর্তনগুলো স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। জেল থেকে ফিরে এসে শিবনাথ ভদ্রলোকের পোশাক পর্যন্ত ছেড়েছে, নগ্ন গাত্রে নগ্ন পায়ে থাকে। তার চেহারাও হয়েছে চাষার মতো, অনেকেই তাকে বাড়ীর ভৃত্য বলে ভুল করে। ফলতঃ, ভাগ্নীর বিবাহে শিবনাথ অপরের জুতো বহন করেছে। নিজের হাতে সে রাজমিস্ত্রীর কাজ ক'রে তার মজুর বা শ্রমিক সত্তাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই যে তারাশঙ্কর শিবনাথের চরিত্রের এই স্তর-বিবর্তন প্রদর্শন করেছেন, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। 'চৈতালী ঘূর্ণী'র ট্রেডইউনিয়ানিজ্‌ম্‌ তারাশঙ্করের ভুল

পথ বলেছি, কিন্তু সেখানেও তারাশঙ্কর কৃষক থেকে শ্রমিক হবার পরিবর্তনটি দেখিয়েছেন, তবে অর্থনৈতিক পটভূমিকা 'ধাত্রীদেবতা'তে আরো স্পষ্ট এবং বৃহৎ। কয়লার ব্যবসায়ী রামকিঙ্কর বাবু ও কমলেশ অর্থনৈতিক বিবর্তনের আর এক স্তর। অর্থাৎ জমিদার থেকে কৃষক এবং কৃষক থেকে ব্যবসায়ী এই স্তরটি তারাশঙ্কর এখানে দেখিযে দিয়েছেন।

এবং সেটি দেখিযেছেন একটি বিশেষ সময়-কাল-যুগ-প্রজন্মের পটভূমিকায়। পিসিমা শৈলজার যুগ ও কাল শিবনাথের সঙ্গে মেলে না, আবার শিবনাথেব কাল-চেতনার সঙ্গে রামকিঙ্কব-কমলেশের কাল মেলে না। তিন জনের সঙ্গেই তিন জনেব বিরোধ। এই বিরোধ বা সংঘর্ষে মানব-চরিত্র পর্যালোচনা করেছেন ঔপন্যাসিক রূপে তাবাশঙ্কব।

এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে তারাশঙ্কর প্রখর ও আদিম, প্রাচীন ও স্থূল এক মানব-শক্তিকে খুঁজেছেন। এই মানবশক্তি কখনো নিছক দেহে-শরীরে রক্ত-মাংসের আদিম মানুষ—যা কেবলি শক্ত-সমর্থ-দৃঢ়-হিংস্র একটি প্রাণ নিযে বেঁচে থাকতে চায়, কখনো বা একটি বড়ো আদর্শ নিয়ে সে মানুষেব মধ্যে ভাবের সম্রাট হতে চায। এখানেও বিরোধ—এই মানবশক্তিব চেতনায।

'ধাত্রীদেবতা'য় এই কালচেতনা ও বিবোধ-প্রদর্শনের প্রথম প্রয়াস। সে জন্যেই উপন্যাসটি একটি সতর্ক বিশ্লেষণের বিষয়।

২

নায়ক শিবনাথকে ঘিরে যেমন তারাশঙ্করের সমাজ-বিবর্তন ও অথনৈতিক বিপর্যয়ের চিন্তা ধরা দিয়েছে, তেমনি এই চরিত্রটিকেই অবলম্বন করে তাঁর স্বদেশপ্রেম, রাজনীতিচর্চা ও আদর্শবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিবনাথের অথবা স্রষ্টা তারাশঙ্করের মনে এই দুই দিকের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, আসলে, এই দুই দিক মিলিয়েই তারাশঙ্করের চিন্তার পরিপূর্ণতা। শিবনাথের চরিত্রে দ্বন্দ্ব আসেনি বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন, তাঁরাও এর উত্তর এখানেই পাবেন।

শিবনাথ মানবপ্রেমিক, সেবাপরায়ণ, দেশব্রতী। তার স্বদেশ-সাধনা ও সেবাপরায়ণতা—একে অন্যের নামান্তর। দেশ-সেবার পেছনে আছে দেশমাতৃকার রূপ-মূর্তি। দেশ-মাতৃকা পূর্বে ধন-ধান্যে-পুষ্পে-শস্পে পরিপূর্ণা ছিলেন, আজ তিনি হৃতসর্বস্বা, রিক্তা, ভীষণা। অর্থাৎ 'মা যা ছিলেন' এবং

'মা যা হইয়াছেন,'—অতীত ও বর্তমানের মাতৃরূপের ভিন্নতা। আদর্শবাদী শিবনাথ যেন বর্তমানের নগ্ন, রিক্ত, শ্রীহীন মাতৃরূপকে পুনরায় অতীতের পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করবে ভবিষ্যতে আপন প্রযাস ও সাধনায়। ভবিষ্যৎকে নির্মাণের জন্যই অতীতকে নিরীক্ষণ, বর্তমানের মাতৃরূপের শ্রীহীনতা আসলে সমাজ-বিবর্তনে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষের দুর্দশা। সুতরাং ভবিষ্যতের দেশ গঠনের পশ্চাতে তারাশঙ্করের অতীতচারণা একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। এইজন্যই তাবাশঙ্কর বর্তমানে অবক্ষযিত সামন্ততন্ত্রের যে গৌরবের দিনগুলি ছিল, তার জন্যে নিশ্বাস ফেলেছেন, অস্তবেলায় মধ্যাহ্নকে স্মবণ করেছেন। তাবাশঙ্ববেব অতীতচারণা এইভাবে তাঁর দেশচর্চা এবং অর্থনীতি চর্চার সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে।

শিবনাথেব মনেব মধ্যে এই বোধটি তার জননী জ্যোতির্ময়ী সুন্দরভাবে সঞ্চারিত কবে দিয়েছিলেন। 'দেশ' একটি আইডিয়া, তার আসল প্রকাশ দেশবাসীর অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার ওপব :

> মা বলিলেন, দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতিব মধ্যে, শহবেব মধ্যে। তুই আমাদেব পটো-পাড়াটা দেখেছিস শিবু?…
>
> …আমাব বিয়ের পরও আমি দেখেছি শিবু, ওই পটো-পাডার কি চলতি। বড বড জোযান পট দেখিযে গান কবত, মাটির পুতুল বেচত মেয়েরা। যে জায়গা দিনরাত্রি হাসি গান আনন্দে মুখর হয়ে থাকত, লক্ষ্মীব কৃপায় সুন্দব হয়ে থাকত, সেই জাযগা আজ কি হয়েছে। ওইখানে ভেবে দেখ্, মা কি ছিলেন, কি হয়েছেন।

সুতরাং অর্থনৈতিক ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা ও দেশচর্চা এক হয়ে গেছে এইখানে। এবং একই কারণে তারাশঙ্কর অতীতচারী হয়ে উঠেছেন।

অতীতের প্রতি একটি মোহময মমতাবোধ এবং শ্রদ্ধা-সন্নত মনোভাব তারাশঙ্করের প্রথম রচনা—কাব্যগ্রন্থ—'ত্রিপত্র' (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬) থেকেই লক্ষ করা যায়। প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। বাকী কবিতাগুলির মধ্যে 'আমারতীর্থ' এবং 'শারদোৎসব' কবিতা দুটি বিশেষ মূল্যবান। 'আমারতীর্থ' কবিতায় তিনি তাঁর

'পূর্বপুরুষ' এবং উধ্বর্তন 'সপ্তপুরুষ'-এর কথা বলেছেন, যাঁরা সর্বপ্রকারে শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

আমার দেবতা	পূর্বপুরুষ	চরণ-রেণুকা-ঢাকা ॥···
মধুর শরতে	জগদ্ধাত্রী	বিবাজেন ঘরে-ঘরে।
পল্লীবাসীর	বুকভরা সেই	ভক্তি আস্থা তরে ॥
শিশুদের যেথা	প্রথম শিক্ষা	সপ্তপুরুষ নাম।
দেবতার স্তুতি	আধ মধুস্বরে	বিশ্বের প্রাণারাম ॥···

উদ্ধৃত অংশে 'দেবতা' ও 'জগদ্ধাত্রী' শব্দ দুটি লক্ষণীয়। জগদ্ধাত্রীর একটি ঐশ্বর্যময়ী রূপ কল্পনা করা হয়েছে, যিনি পল্লী গৃহস্থের বাস্তুতে ধরা দিতেন একদা, এবং পুরুষানুক্রমিক বাস্তুভিটেয় শিশুরা জীবনের 'প্রথম শিক্ষা' লাভ করত। তখন জগদ্ধাত্রীর এই 'ধাত্রী' রূপ তাদের ভক্তি নিয়ে 'দেবতা' হয়ে সত্যকারের "ধাত্রীদেবতা" হয়ে যেত। এই জন্যই অতীতযুগটার সঙ্গে পিতৃপুরুষের সংস্কার ও সমৃদ্ধি তারাশঙ্করের মনে মিশে গেছে।

শুধু তাই নয়, অতীত তারাশঙ্করের মনে একটি নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারও। তাই 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পিসিমা কেবল একজন ব্যক্তিবিশেষ নন, তিনি বিগত একটি যুগ। প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখার মতো।

এই উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে শিবনাথ তাব পিসিমার প্রতি যে উক্তি করেছে, কোনো সমালোচকই তা স্বীকাব করে নিতে পারেন নি। শিবনাথ বলেছে: "সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু, সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি,···তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে।" সকলেই বলেছেন, পিসিমার চরিত্র ও কর্মাবলী এই উক্তির পোষক নয়,—এ উক্তি অকারণ এবং উচ্ছ্বাসময়।

কিন্তু তারাশঙ্করের অতীত চেতনা, 'বাস্তু' চেতনা এবং যুগসংস্কারকে মনে রাখলে এই উক্তির আসল তাৎপর্য বোঝা যাবে। সমস্ত উপন্যাসটিই যে তিনি পিসিমা নামক একটি ব্যক্তি-শরীর নাম দিয়ে একটি যুগ বা কাল বা সংস্কৃতির আলোকে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন, তার প্রথম প্রমাণ সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকাতে (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৪১) উপন্যাসটি যখন অংশতঃ বের হয় তখন এর নাম ছিল—'জমিদারের মেয়ে'। এই জমিদারের মেয়েই শৈলজা, তাঁরই শাসন ও বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে শিবনাথকে প্রত্যক্ষ করতে

চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। সুতরাং শিবনাথ হঠাৎ উচ্ছ্বাসের আতিশয্য বশতঃ পিসিমার প্রতি এই উক্তি করে নি।

দ্বিতীয়তঃ পিসিমা একটি যুগ, একটি কাল। তাঁর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তারাশঙ্করের পিতৃপুরুষের, তাঁর অতীতযুগের সকল গর্ব ও গৌরব। উপন্যাসের শেষদৃশ্যে সেই পিতৃপুরুষের প্রতিভূ ও প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র পিসিমাই উপস্থিত ছিলেন। এই জন্যই শিবনাথের উক্তির মধ্যে 'বাস্তু'র প্রসঙ্গ এসেছে। এ যেন একা পিসিমাকে লক্ষ করে গোটা পূর্ব-পুরুষের প্রতি উক্তি, দেশমাতৃকা যখন ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা ছিলেন।

আমার এই মন্তব্যের পরিপোষক হিসেবে তারাশঙ্করের 'কৈশোর স্মৃতি' গ্রন্থের এই কথাগুলো স্মরণ করা যেতে পারে :

> · বাবার মহাপ্রয়াণেব পর আমার পিসিমা অতীতকালেব মহিমার মত আত্মপ্রকাশ করলেন। সূর্যাস্তেব পরও যেমন পৃথিবীর বুকে তার উত্তাপ বিকীরিত হয় তেমনি ভাবে আমার বাবার প্রভাবের মতই তিনি আমাদের সংসাবের সর্বক্ষেত্রে আসন নিযেছিলেন। আমার জীবনে যাঁদের প্রভাব রক্তে মাংসে, মেদে মজ্জায, চিন্তনে মননে ধাতুগত হযে আছে তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনের তিনি একজন, বাবা—মা—পিসিমা। - পৃ. ১০

অতীতের প্রতি তারাশঙ্করেব মনোভাব তাঁর স্মৃতিকথামূলক অপর রচনা 'বিচিত্র' (জ্যৈষ্ঠ ১৩ ২) গ্রন্থেও জানিয়েছেন,

> জীবনে বংশগত শিক্ষায় অতীতকে পুরাতনকে অসম্মান করতে কোন কালেই পাবি না বা পারতাম না। জানতাম বুঝতাম—অতীতই এখানে এনে পৌছে দিয়েছে। পিতৃপিতামহের পথই এসে আমার পথে নব কলেবর লাভ করেছে।—পৃ. ৩০

শিবনাথ জমিদারীপ্রথাকে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু প্রাচীন মহিমা ও সংস্কৃতিকে দূর করে ঠেলে দিতে পারে নি। কেননা, ওই প্রাচীনতার মধ্যেই যেন দেশপ্রেমিক শিবনাথ দেশমাতৃকার ঐশ্বর্যময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। এইভাবে শিবনাথের দেশচর্চা ও প্রাচীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এক সূতোয় গাঁথা হয়ে গিয়েছে।

৩

শিবনাথকে তারাশঙ্কর দুদিক থেকে বড়ো করে কৈশোর থেকে যৌবনের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। একদিক হল—শিবনাথের আইডিয়া বা তত্ত্বের দিক, থিয়োরীর দিক, অপরদিক হল—কর্মের দিক, প্রযুক্তির দিক, প্র্যাকটিসের দিক।

শিবনাথের থিযোরীর দিকটি এসেছে তার পড়াশোনা থেকে। যে বোধ থেকে 'উল্‌ফ' শব্দের অন্যান্য প্রতিশব্দ জানবার বাসনায় সে অভিধান খোলে, সে একই বোধ থেকে পাঠ্যপুস্তকে ধৃত ক্যাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী থেকে কর্তব্যপরায়ণতা শেখে। কুষ্ঠরোগীর পরিচর্যা-রত মানুষটির মধ্যে সেবাপরায়ণতার মহাপ্রাণতা খোঁজে। তার এসব পড়াশোনা উত্তরকালের জীবনের সূচনা করেছে। তারপর শিবনাথের জীবনের থিযোরী এসেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে।

এই তিনজনই তখন ভারতীয় রাজনীতি চর্চার তিনটি স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। শিবনাথকে 'ধাত্রী' হিসেবে যাঁরা গড়ে তুলে দেবত্বের অমর মহিমা লাভ করেছেন, এই তিনজন তার মধ্যে তত্ত্বের দিক থেকে প্রধান। এ বিষয়ে তারাশঙ্কর নিজেই তাঁর 'কৈশোর স্মৃতি'তে লিখেছেন,—

> তখন [১৯১১।১২ সালে] বাঙলাদেশে ছেলেদের কৈশোরের কল্পনায় সার্থক জীবন ভাবতে গেলেই তিনটি স্বর্ণসিংহাসন ভেসে উঠত। ·
>
> হয় বিবেকানন্দের মত দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী, নয় বঙ্কিমের আদর্শে সাহিত্যিক, নয় ক্ষুদিরামের আদর্শে শহীদ হওয়াই ছিল বাঙালীর ছেলের কৈশোরের স্বপ্ন।—পৃ. ৪-৫।

শিবনাথের কাছে তেমনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'ই শিবনাথকে প্রতিক্ষণে পথপ্রদর্শন করেছে। তার জীবনের প্রথম উপন্যাস এটি, একদিন সারারাত জেগে জ্যোতির্ময়ী তাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। "…'আনন্দমঠ' তাহার জীবনের আনন্দ।" একটু বড়ো হতেই শিবনাথ নিসর্গ জগতের মধ্যে জীবনের প্রশ্ন-উত্তরকে দেখতে শিখল, মাকে তখন বলেছে, 'মাঠ দেখি, নদী দেখি, আকাশ দেখি।'

> মা বলিলেন, মাঠে একা কি ভাবিস শিবু,…। শিবু মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আনন্দমঠে'র সেইখানটা মনে আছে মা—মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন? আমি তাই দেখতে চেষ্টা করি মা।

জ্যোতির্ময়ীই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পটো-পাড়ার আর্থিক অবনতির মধ্যেই 'মা যা হইয়াছেন'। যেদিন পিসিমা শিবনাথকে জোর করে সেরেস্তায় বসিয়ে দিলেন সেদিন: "শিবনাথ একেবারে আপনাব ঘরের মধ্যে গিয়া উঠিল। টেবিলের উপর তাহার প্রিয় বই দুইখানি পড়িয়া আছে—'আনন্দমঠ' ও 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'।" বিবেকানন্দের 'বীরবাণী'ও তাকে আকর্ষণ করে, ঘরে তাঁর ছবিও রেখেছে সে। এইসব গ্রন্থের পটভূমিকায শিবনাথের মন এই ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে,

> কিশোর মন তাহাব শবতের আকাশেব বলাকাব মত পক্ষ বিস্তার কবিয়া এক সুদীর্ঘ যাত্রায যেন উডিযা চলিয়াছে। উত্তবোত্তব উর্ধ্বে উঠিযা সে বোধ করি নিবন্তর সন্ধান করিতেছিল কোথায় মানসলোক।

শ্মশানকালীর পূজোব বাতে আবাব 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গ এসেছে। আক্ষরিক অর্থে পূজাস্থানটি শ্মশান, কিন্তু সুশীল ও পূর্ণের বোমাণ্টিক উচ্ছ্বাসেব ফলে 'শ্মশান' শব্দটি একটি আলঙ্কাবিক ব্যঞ্জনা লাভ কবে বৃহত্তর অর্থ নিযে গোটা দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতীক হযে উঠল। সেই মুহূর্তে শিবনাথের ধ্যান,

> শিবনাথের মনে পডিযা গেল, সে বলিল, 'কালী—অন্ধকাব সমাচ্ছন্না কালিমামযী। হৃতসর্বস্ব এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্র শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনাব শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন। মা যা হইযাছেন।'

বর্তমানের এই অবক্ষযিত ও বিপর্যস্ত মাকে 'মা যাহা হইবেন'—তাই সাধন করবাব জন্য শিবনাথের পরিকল্পনা। 'শিবনাথ' নামটিও লক্ষণীয়। কালী যে 'শিব' বা মঙ্গলকে পদদলিত করেছেন, 'শিবনাথ' সেই কল্যাণ-শক্তির প্রতীক। সেই 'শিবে'র জাগরণ বা উন্মেষই এই গ্রন্থের কথা-কাহিনী।

এই মাতৃসাধনার প্রধান উপকরণ ভক্তি, 'আনন্দমঠে'ব প্রাবম্ভেই তা আছে।

> সুশীল বলিযাছিল, দেশ কি বাইরে শিবনাথবাবু? দেশের বসতি মানুষের মনে, মাটি মা হয়ে ওঠেন ওই ভক্তিব স্পর্শে, মৃন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন ওই সাধনায়।

ডোমবউকে নিযে শিবনাথের জীবনে যে কলঙ্ক নেমে এসেছে, তাকে সহ্য করবার শক্তিও সুশীল 'আনন্দমঠ' থেকেই শিবনাথকে নিতে বলেছে। কলকাতার

মেসে বসেও শিবনাথকে 'ভক্তি'র কথা শুনিয়েছে সুশীল। শিবনাথের দাম্পত্য জীবনের নীরসতাও তাকে 'আনন্দমঠে'র দিকেই নিয়ে গেছে : 'গৌরী তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, সেই মুক্তির মহিমাতেই সে মহামন্ত্র পাইয়াছে, 'বন্দেমাতরম্, ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্'।

'বন্দেমাতরম্' গানটিতে দেশের নিসর্গছবি ফুটেছে। একটি জ্যোৎস্নাময় রাত্রি, চারিদিকে গাছে ফুল ফুটেছে। একটি পুলকিত, শান্ত অবস্থা,—মা যা ছিলেন। 'ধাত্রীদেবতা'য় এরই অনুসরণে প্রাকৃতিক ও ভৌতিক জগতে 'মা যা হইয়াছেন'-এর পরিচয় : তাই রৌদ্রাক্ত দিবস, নীরস ধরণী, এবং ভয়াবহ কলেরার মারণ নিয়ে ধরা পড়েছে।

শিবনাথের ওপর 'আনন্দমঠে'র প্রভাবের এই সব স্পষ্ট জায়গাগুলো ছাড়া অস্পষ্ট জায়গাগুলোকেই লক্ষ করবার আসল বিষয়। যেমন, 'ধাত্রীদেবতা'র মাতৃরূপের পরিকল্পনায়। 'আনন্দমঠে'র প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে যে তিনটি মাতৃমূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে—তার মধ্যে প্রথমটি 'জগদ্ধাত্রী'র মূর্তি, তিনি 'অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা,'—'মা যা ছিলেন'। আমি আগেই দেখিয়েছি, 'ধাত্রীদেবতা'র 'ধাত্রী' শব্দটি তারাশঙ্কর 'জগদ্ধাত্রী' শব্দ থেকেই নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবীচৌধুরাণী'র মূল চরিত্রগুলো ক্রমেই পূর্ণতা থেকে পূর্ণতরতার দিকে, মহৎ থেকে মহত্তরতার দিকে ধাবমান, যেন একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ক্রমবিকশিত। ঠিক একই রীতি শিবনাথের মধ্যেও দেখা যায় ; শিবনাথকে যেন একটি লক্ষ্যের দিকে তার সব ধাত্রীদেবতারা নিয়ে চলেছেন। তফাতের মধ্যে এই, শিবনাথ দেহকামনার অধীন এবং গৃহী, —সন্তান সম্প্রদায় তা নন।

তৃতীয় প্রসঙ্গটি 'আনন্দমঠে'র সশস্ত্র বিদ্রোহ নিয়ে। 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীরা অস্ত্রবলে সাফল্য লাভ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র সে সাফল্যকে চির-প্রতিষ্ঠা দেন নি, 'বিসর্জন' এসে 'প্রতিষ্ঠা'কে সরিয়ে নিয়ে গেছে। গ্রন্থের 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম নিজেই লিখেছিলেন : 'সমাজ-বিপ্লবের অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।'

অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লব 'আনন্দমঠে'ই অবমানিত হয়েছে। বিপ্লব বা বিদ্রোহের ফল হিসেবে ত্বরায় আনীত স্বাধীনতা বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য ছিল না।

ইংরিজি শিক্ষা-সংস্কৃতির সারভাগ নিয়ে দেশ যখন মানসিক ভাবে প্রস্তুত হবে তখনই 'দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া' দেখা দেবেন। ব্রহ্মচারীকে মহেন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?' ব্রহ্মচারীর উত্তর : 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।' অর্থাৎ দেশপূজার মন্ত্রে আচণ্ডাল সবাইকে যতদিন সচেতন করা না যাবে, ততদিন দেশের প্রকৃত কল্যাণ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কারণেই সন্ন্যাসীদের সাধনার সঞ্চয়কে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছেন।

শিবনাথ যে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে অহিংসা নীতি গ্রহণ করলে সে কার প্রভাবে? স্পষ্টতঃ অহিংসা নীতি মহাত্মা গান্ধীর বটে, কিন্তু শিবনাথকে এখানে গান্ধীবাদ প্রভাবিত করেনি বলেই মনে হয়। ১৯২১ খ্রীঃ আগে ভারতীয় রাজ-নীতিতে গান্ধীর প্রভাব স্পষ্টরূপে পড়েনি এবং 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পটভূমি হল প্রথম মহাযুদ্ধের, যদিও ১৯২১ সালের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। শিবনাথের অহিংসা মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মতবাদের দ্বারাই প্রভাবিত, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যেন অস্পষ্ট। সশস্ত্র সমাজ-বিপ্লব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনচেতনায় নবতর দীপ্তি ও শক্তি অর্জন করে একদা ভারতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে স্বীকার করেন নি—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে শিবনাথও সে পথ থেকে যথাসময়ে সরে এসেছে।

বাঙলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পিগণ বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। 'আনন্দমঠ', 'চার অধ্যায়', 'পথের দাবী'র কথা সকলেরই মনে হবে। 'ধাত্রীদেবতা' এই ধারারই পরিণতি,—গুণী পাঠকমাত্রই জানেন, সন্ত্রাসবাদ এই সব উপন্যাসে কোন্ পরিণতি লাভ করেছে। 'গোরা'র দেশচেতনাও শিবনাথকে স্পর্শ করেছে।

তারাশঙ্করের চিন্তায় রবীন্দ্রমননকে খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। 'রসকলি' (বৈশাখ ২৫, ১৩৪৫) গল্পগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'জীবনের প্রথম রচনা কবিগুরুর হাতে সমর্পণ করিলাম।' 'কৈশোর স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন,

> রবীন্দ্রনাথের—'এবার ফিরাও মোরে'—কবিতাটি ছিল আমার পরম প্রিয়। আমার আত্মার বাণী। কবিতা লিখতাম। বিপ্লবের পথে

> অগ্রসর হতে হতে মনে মনে বলতাম 'ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা।' গান গাইতে পারি না, তবুও তখন গাইতাম —'একলা চলরে'। পৃ ৮

ওই 'কৈশোর স্মৃতি'তেই লিখেছেন, তাঁর গ্রামের স্কুলের থার্ডমাষ্টার নীলরতন বাবুই 'ধাত্রীদেবতা'র রামরতন মাস্টার। এঁরই রবীন্দ্রানুরাগ তারাশঙ্কর বা শিবনাথে সঞ্চারিত।

> প্রিয় কবি ছিলেন তাঁর রবীন্দ্রনাথ।·· রবীন্দ্রনাথের গল্প বলতেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তিনি ভাল ক'রে পড়েন নি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ।—পৃ. ৬৭

'ধাত্রীদেবতা'র বামরতন মাস্টার 'কথা ও কাহিনী'র উল্লেখ করেছেন। শিবনাথের জীবনের বিশেষ বিশেষ সমস্যার প্রসঙ্গে ববীন্দ্র-পঙ্‌ক্তি একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী—'যাত্রা কব, যাত্রা কব,··· বন্দবের কাল হল শেষ.' অনুসারে শিবনাথ নতুন কবে যাত্রা কবেছে, তার পরম নৈরাশ্যে রবীন্দ্রনাথই আশার আলো জ্বালিযে দিযেছেন : 'বাত্রিব তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?' [এই পঙ্‌ক্তিটি তাবাশঙ্কবকে বিশেষ নাড়া দিত মনে হয়, তাঁর 'তামস তপস্যা' উপন্যাসের নাম এখান থেকেই নেওয়া] রবীন্দ্রনাথের আদর্শেই শিবনাথ শিক্ষা বিস্তারেব উদ্দেশে নাইট্ স্কুল স্থাপন কবেছে, আপন অর্জিত অর্থ দিয়ে খামাববাড়ীর কৃষকদেব জন্য সমবায ব্যাংক স্থাপনেব পবিকল্পনা করেছে ।

শিবনাথের মন বিশ্লেষণ করবার সময তাবাশঙ্কব তার মনকে মানসপথযাত্রী 'বলাকা'র উল্লেখ কবেছেন অস্পষ্টভাবে। ববীন্দ্রনাথের কাছে পদ্মা যেমন একটি আইডিয়া হয়ে উঠেছে, শিবনাথেব কাছে তেমনি ময়ূরাক্ষী এক গভীর আদর্শের প্রতীক, ক্ষণে ক্ষণে এ নদী যেন বাস্তবের সীমা হারিয়ে উধাও হযে যেতে চায় :

> নদীর বুকের বালির উপর দাঁড়াইযা ময়ূরাক্ষীর গতিপথের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, ময়ূরাক্ষী চক্রবাল সীমায় অবনমিত আকাশের বুক হইতে নামিয়া আসিতেছে—আকাশগঙ্গাব মত।···
>
> ···শিবনাথ প্রতি সন্ধ্যায় ময়ূরাক্ষীগর্ভের উপর এমনই করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।···

...এখানকার প্রতিটি চেনাজানা বস্তুও এই রহস্যের আবরণের মধ্যে অজানা অচেনা হইয়া উঠিতেছে।...

রবীন্দ্রকল্পনায় স্বদেশকে ছাপিয়ে যে এক বিশ্বজনীন মূর্তি বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে, শিবনাথেরও আদর্শ তাই :

মাটিব ভিতর সে মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিয়াছিল। দেখিতেও পাইয়াছে, কিন্তু যে মূর্তিতে সে মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল, এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। মায়ের এ মূর্তি যেন গৃহস্থবধূর মূর্তি, ক্ষুদ্র গণ্ডি-ঘেরা একখানি বাডির ভিতব এ মা সন্তান পালন করেন, স্নেহে বিগলিত শান্ত সলজ্জভাবে পবম মমতায সন্তানকে বুকে আঁকডাইযা শুধু ধরিয়া রাখেন। তাহার মনে পডিযা যায—'সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী, রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি।' এ মা, সেই মা। বিরাট মহিমায যে মা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আপন মহিমাব দীপ্তিতে আকাশ-বাতাস জল-স্থল ঝলমল করিয়া দাঁডাইবেন, সে মূর্তিতে মা কবে ধরা দিবেন?

রবীন্দ্রনাথ যে ভাবততীর্থেব পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে আ-চণ্ডাল সকল মানুষের মিলন আছে। শিবনাথও তাই বাবে বাবে শূদ্রেব শক্তি ও শিক্ষার কথা বলেছে।...'চারিদিকে শুধু শূদ্র—শূদ্র আব শূদ্র। সমগ্র জাতিটাই যেন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইযাছে।' শিবনাথ এই দৃষ্টি খুলে দিযেছেন সাঁওতাল পরগণাব সেই অজ্ঞাতনামা মহানাযক। কিন্তু মহানায়কের মতবাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই প্রকারান্তরে উপস্থিত :

দেশ স্বাধীন হলে শাসনতন্ত্র পবিচালনা করবে কে?... পরিচালনা করবে ভদ্রসম্প্রদায়, এই শিক্ষিত সম্প্রদায়, দেশের উচ্চবর্ণ যাবা তারাই, দেশের ধনী যারা তারাই।... স্বাধীনতা বলতে আমি কি বুঝি জানিস্? —এস্ট্যাব্লিশ্‌মেণ্ট অব এ গবর্নমেণ্ট অব দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপ্‌ল, নট ফর দি সেক অফ দি পিপ্‌ল। অনুগ্রহ নয, দান নয়, তেত্রিশ কোটির দাবির বস্তু গ্রহণ করতে ছেষট্টি কোটি হাত আপনা হতে এগিয়ে আসা চাই।

মহানায়ক যে মধুর হাসিতে মরণ বরণ করেছিলেন, কেন জানি না, আমার মনে হয়—তিনি সে শক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই কাছে। যেন, 'মরতে

মরতে মরণটারে, শেষ করে দে একেবারে।' যেন, 'জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।' যেন, 'আমার জীবনে লভিয়া পরাণ জাগো রে সকল দেশ।'

অসহযোগ আন্দোলন এবং চরকা আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। তেমনি স্বাধীনতার উদ্দেশ্যও তাঁর কাছে ভিন্ন ছিল। তিনি চেয়েছিলেন আগে শিক্ষা ও মানসমুক্তি এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভবতা, তারপর রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সন্ত্রাসবাদকে তিনি নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই সমর্থন করেন নি। এজন্য ভারতীয় বাজনৈতিকদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়েছিল। শিবনাথকে যখন চরকা আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে নামতে দেখি, তখন তার পথ রবীন্দ্রনাথের 'পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে।'

এইখানেই সুশীলের কথা ওঠে। মনে হয়, সুশীলের মধ্যে একটি বিবর্তনের আভাস আছে, বিশ্লেষণ করে লেখক তা দেখান নি। তার সেবাপবায়ণতা তাকে মানবতাবাদী করে দেখিয়েছে। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের বক্তৃতা কালে সে শিবনাথকে বলেছিল : 'জ্ঞানে বিজ্ঞানে বঞ্চিত রাখাই যে পবাধীনতার ধর্ম।' এরমধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই আদর্শ আছে, সেই দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার প্রশ্ন। এই সুশীলের মধ্যে কী ঘটল যে সে সন্ত্রাসবাদী হযে উঠল ? 'আনন্দমঠে'র 'ভক্তি-বাদ'ও যেন আর তাকে নাড়া দেয না। কলকাতার মেসে বসে শিবনাথের সঙ্গে আলোচনা কালে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে প্রসঙ্গটি উঠেছিল,—বিচিত্র মিষ্টি হাসি হেসে 'বলব, আর একদিন' বলে সুশীল তা এড়িয়ে গেছে। আবার বহুদিন পরে, ময়ূরাক্ষীর তীরে, গভীর রাত্রিতে শিবনাথের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়েছে রবীন্দ্রবাণীতে : "একলা চলো রে।" সুশীলের পরিবর্তনটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হলে ভারতীয় রাজনীতির একটি অধ্যায সম্পর্কে তারাশঙ্করের মতামত জানা যেত।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রাদর্শ ব্যতীত শিবনাথের দেশসাধনার অন্যান্য দিকগুলি সমসাময়িক রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক রাজনীতি, অন্যান্য আদর্শমূলক গ্রন্থ-পাঠ ইত্যাদি—এইভাবে শিবনাথের তত্ত্বাদর্শের থিয়োরীর দিককে গড়ে তুলেছে। থিয়োরী বা তত্ত্বাদর্শে শিবনাথকে এইভাবে গড়ে অতঃপর তারাশঙ্কর তাকে কর্মজগতের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে সরাসরি নিক্ষেপ করেছেন এবং বাস্তবজগতের

সেই প্রয়োগক্ষেত্রেব মধ্যে শিবনাথের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এইভাবে শিবনাথ তত্ত্বে ও কর্মে—উভয়দিক দিয়েই গড়ে-বেড়ে উঠেছে। এটাই তারাশঙ্করের উদ্দেশ্য ছিল। শিবনাথের 'ধাত্রী' বলতে তাই পৃথিবীর তত্ত্ব ও কর্ম, ঘর ও বাহিব, সকল দিক থেকে পাওয়া সকল প্রকার শিক্ষা ও মতাদর্শ,—ব্যক্তি বিশেষ মাত্র নয়।

আসলে শিবনাথই শিবনাথেব চরম ও চূড়ান্ত মূর্তি নয়। একটা মহৎ ও বৃহৎ চরিত্রেব বীজ মাত্র সে। তাকে কেবলি নানা পরীক্ষা ও সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করে কেবলি বড়ো কবে, প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে, নবতর ও বৃহত্তর কোনো প্রয়োজন সাধনেব উদ্দেশ্যে। শিবনাথই ক্রমবিকশিত হয়ে 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে'র দেবু ঘোষে রূপ নিয়েছে, সেই-ই 'সন্দীপন পাঠশালা'য় দেশের মধ্যে আলোক-সন্দীপনের ভূমিকা নিয়েছে। আবো পববর্তী কালে একটি যুগপুরুষ রূপে আবির্ভূত হযেছে। শেষ জীবনে তাবাশঙ্করেব একটি 'মহা-উপন্যাস' লিখবার ইচ্ছে হয়েছিল, মহাভারতেব মতো তা বিশাল, গোটা ভাবত তার পটভূমিকা। শিবনাথ যেন সেই মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ক্রমবর্ধমান নায়ক। সুতরাং শিবনাথকে বিচ্ছিন্ন ও স্বযংসম্পূর্ণ একটি চরিত্ররূপে বিচার না করে, তারাশঙ্করের গোটা সাহিত্যেব পটভূমিকায় বিচার করলে, চরিত্রটিব মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে, তা বড়ো হয়ে দেখা দেয না।

শিবনাথকে এই জন্যই তারাশঙ্কর কযেকটি সন্ধিস্থলে স্থাপন কবেছেন। সে কিশোর, বয়ঃসন্ধিতে জৈবদেহে সে উপস্থিত। জ্যোতির্ময়ী এবং শৈলজার বিপরীত ও যুগ্ম প্রভাবের আলো-ছায়াময় টানাপোড়েনের সন্ধিস্থলে সে স্থাপিত। তাব জীবনের অপর সন্ধিস্থল—পারিবারিক ও রাজনৈতিক, ঘর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অঞ্চল। প্রাচীন সামন্ত সভ্যতা, স্বাধীন কৃষিবৃত্তি এবং নবোত্থিত ব্যবসায়ী এই তিনের ত্রিভুজদ্বন্দ্ব শিবনাথকে আলোড়িত করেছে। সন্ত্রাসবাদ ও অহিংসনীতি—এই দুইয়ের সন্ধিতেও তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের দ্বন্দ্ব, পিসিমার সঙ্গে গৌরীর দিদিমার দ্বন্দ্ব—এই সন্ধিস্থলগুলো শিবনাথের ঘবোয়া জীবনেব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। পরিশেষে, নিজে জমিদারের সন্তান হয়ে নিজেই সেই সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছে সে।

এতোগুলো দ্বন্দ্ব ও সন্ধিস্থলে শিবনাথকে রেখে তারাশঙ্কর তাকে কর্মজীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন ক্রমে-ক্রমে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই তিনি চরিত্রটিকে বড়ো করে তুলেছেন। এইগুলোই শিবনাথের জীবনের

'ধাত্রী'-রূপা শক্তি। শিবনাথের চরিত্রকে অনেক সময়েই ভাবসর্বস্ব, কল্পনা বিলাসী বলে অনেকের মনে হতে পারে। গ্রন্থের বেশিরভাগ ঘটনাই হয়তো শিবনাথের কর্ম ও আবেগ থেকে উৎসারিত হয় নি,' ববং বাহির থেকে একের পর এক মিছিল-করে-চলে-আসা ঘটনা প্রবাহ দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, হয়তো অনেক ঘটনা তার মনে উপযুক্ত রেখাপাত করে নি বলে তা পরিহার্য বলেও বিবেচিত হতে পারে,—কিন্তু সে জন্যে লেখককে দোষারোপ করবার আগে চরিত্রটির পরিকল্পনাকে মনে রাখতে হবে।

জ্যোতির্ময়ী এবং শৈলজা জ্যামিতিক প্যাটার্ন অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে বিজয়ী ও বিজিত হয়েছেন—শিবনাথের ওপর প্রভাব বিস্তার করা নিয়ে। শিবনাথকে বিবাহ দেওয়া, জমিদারী সেরেস্তায় বসানো, ঘোড়া কিনে দেওয়া—ইত্যাদিতে শৈলজা জয়ী। আবার, হেডোলের বাচ্ছা ফিরিয়ে দেওয়া, প্রজাদের খাজনা এক টাকা করে মকুব করে দেওয়া, শৈলজার নামে শিবনাথের পত্র না লেখা, জমিদারী সেরেস্তায় আর না বসা এবং কলকাতায় পড়া প্রভৃতি ঘটনায় জ্যোতির্ময়ী জিতেছেন। কলেরার সেবাকর্ম সম্বন্ধে শৈলজা স্বাভাবিক কারণেই প্রথমে বিরোধিতা করেছিলেন, পরে এবং একমাত্র এই এক জায়গাতেই জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে তিনি ঈষৎ একাত্ম হতে পেরেছিলেন—তাও ক্ষণস্থায়ী একাত্মতা। জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যুতে এই দ্বন্দ্বের সমাপন। অতঃপর শৈলজার প্রতিপক্ষ গৌরীর দিদিমা হয়েছেন।

জ্যোতির্ময়ী ও শৈলজার সম-শক্তিসম্পন্ন বিপরীত ধর্মী আকর্ষণে শিবনাথ কিন্তু দ্বন্দ্ব-মথিত হয় নি। না হওয়াটাই স্বাভাবিক, একজন কিশোরের সে বোধ ও বুদ্ধি কোথায়,—ব্যক্তিত্ববোধ, আপন মতের প্রতি আসক্তি এবং মর্যাদা বোধ না এলে দ্বন্দ্ব তো আসতেই পারে না। দুই নারীর প্রভাবের বিপরীত ভঙ্গিতে সে যন্ত্রবৎ চালিত হয়েছে, যেন এক টুকরো লোহাকে মাঝখানে রেখে দুদিক থেকে সমান শক্তির দুটি চুম্বকের আকর্ষণ।

কলেরার সেবাকর্ম অবলম্বন করে শিবনাথ প্রথম ঘর ছেড়ে বাইরে এল। কলকাতায় পড়তে এসে তার জীবন-সীমা আরো প্রসারিত হল। সন্ত্রাসবাদের গোপন হিংস্রপথ দিল তাকে নতুনতর অভিজ্ঞতা। ডোমবউকে কেন্দ্র করে যে কলঙ্ক আপতিত হল তার জীবনে, তা মানুষকে চিনবার জন্যে তাকে দিল দৃষ্টি : মানুষ যেমন কুটিল, তেমনি কৃতজ্ঞতায় মহান্। এই কলঙ্কের কথা শুনে শিবনাথ ঘরে দরজা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তখনও সে পূর্ণাঙ্গ মানব হয়ে ওঠেনি

বলেই। সুশীলের চিঠি এল, তাতে লেখা : গ্রাম 'ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেশের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবেন।' শিবনাথ জীবনের ও দেশের বিশ্বরূপ দেখতে লাগল। মেসে থাকতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সংবাদ পেল, গ্রামের ছেলে শিবনাথ মুহূর্তে গোটা ইউরোপে মানসভ্রমণ করে এল, দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ল তার বিশ্বের দিকে। এরই ফল হিসেবে, আরো পরবর্তী কালে, শিবনাথকে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস-পাঠক রূপে দেখি, সে তখন পুরোপুরি 'বিশ্ববাসী'। জারের পতন, তুর্কি বিপ্লব তার রক্তে-রক্তে পুলকপ্রবাহ বইয়ে দেয়। এই বিশ্বপরিক্রমা-শেষেই শিবনাথ নিজের জমিদারী পরিত্যাগ করে ময়ূরাক্ষী-তীরে কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে গেছে, সে মাটির কাছা-কাছি চলে এসেছে। রামরতন মাষ্টারের উক্তি : 'ক্ষুদ্র এই বিষয়টুকুর গণ্ডির মধ্যেই বন্ধ করে রাখবি নিজেকে ?' শিবনাথ ক্রমেই প্রসারিত হয়ে দুটি বৃহত্তের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে : প্রথমতঃ, ময়ূরাক্ষীর তীরে আদিম ধরণীর কোলে, যা বিরাট ও মহান্, দ্বিতীয়তঃ, জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে জনতার মধ্যে বিরাটকে অনুসন্ধান করায়। শিবনাথ মাটিকে পেয়েই মানুষকে পেল, নির্জনতা থেকে জনতায় এল।

দুটি মৃত্যুর দৃশ্য শিবনাথকে অভিজ্ঞতায় বিশেষ পুষ্ট করেছে। সাঁওতাল পরগণায় মহানায়কের মৃত্যু এবং জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যু।

শিবনাথ সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দলের প্রথম সারির কর্মী নয়, তবু তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল পূর্ণের সহকর্মী হিসেবে। একি নিছক টেরোরিজম্ সম্পর্কে শিবনাথের মোহভঙ্গ করাবার জন্যেই ? সেটা একটা উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো অন্য উদ্দেশ্য লেখকের ছিল। হাসিমুখে মরণকে বরণ করার যে প্রচণ্ড শক্তি, তাই কি সঞ্চারিত করা নয় ? সেই রাতেই যখন পূর্ণ ও শিবনাথ পথ চলছিল, তখন ওদের সম্মুখে এসে পড়ে একটা বিষধর সাপ। এই সাপ পূর্ণের বিবেক, এবং পূর্ণর মনের মধ্যে বিবেকদংশনজাত বিক্ষিপ্ত চিত্ত থেকে উৎসারিত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধই শিবনাথের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া। এইজন্যই তো একটি আতিথেয়তার ছবি—অপরিচিত এক সাঁওতালের অযাচিত করুণার ধারা, দুধের পবিত্রতা নিয়ে ওদের কাছে হাজির হল। এই হত্যা-দৃশ্য শিবনাথকে মানুষ সম্পর্কে উচ্চতর ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করল।

জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যু অনেকের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। আমি তা মনে করি না। জ্যোতির্ময়ীর দেবার যা কিছু ছিল শিবনাথ নিঃশেষে তা গ্রহণ করেছে, লৌহখণ্ড অগ্নির উত্তাপ প্রথমে নিজের মধ্যে সংহরণ করে

নেয়, পরে সেই সংগৃহীত উত্তাপই সে বিকীরণ করে। শিবনাথেব সংহরণ পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল, এইবার বিকীরণের পালা। তাকে স্বাধীন এবং পূর্ণ হবার জন্য পরীক্ষা দিতে হবে—একা বিশ্বের সম্মুখীন হতে হবে, মায়ের অভিভাবকত্ব ছাডাই। তাই জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যু এবং প্রায সঙ্গে সঙ্গে পিসিমার কাশীবাস শিবনাথকে সরাসরি জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন করল। লেখক এই তো চেয়েছিলেন। 'ধাত্রী'রা শিশুকে কতখানি বড়ো করল, তার একটি পরীক্ষার দরকার ছিল। শরীরী সত্তার মধ্যে জোতির্ময়ী যতখানি বডো, মৃত্যুব মহনীয়তায় তিনি শতগুণে বড়ো হয়ে গোটা দেশ-সত্তাব মধ্যে ছড়িযে পডলেন। দেশ যে মা, তাই মায়ের মৃত্যুর পরই শিবনাথ তাঁকে পেল আপন ধ্যানদৃষ্টিতে। তারাশঙ্করের অনুপম বিশ্লেষণে শিবনাথেব এই মাতৃদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে।

শিবনাথকে 'ধাত্রী' রূপে যাঁরা লালন করেছেন, তাঁদেব মধ্যে গৃহশিক্ষক রামরতন এবং সন্ন্যাসী গোঁসাই বাবা, এই দুজনেব কথাও বলতে হবে। বামবতন প্রথম দিকে ততখানি সক্রিয ছিলেন না, জ্যোতির্ময়ীব মৃত্যুব পর যতখানি হযেছেন। রামরতনেব আদর্শ জ্যোতির্ময়ীর জীবিত থাকতে রামবতন নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠলেন, যেন জোতির্ময়ীই বামরতনের মধ্যে প্রকাশিত হলেন।

গোঁসাই বাবা সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁর আচবণ সর্বদা সন্ন্যাসীর মতো নয়। সন্ন্যাসী হযেও তিনি সৈনিক জীবনকে ভুলতে পারেন নি, সৈনিক হযেও স্বর্ণখণ্ডের লোভ তিনি জয় করতে পারেন নি। সন্ন্যাসী হযেও তিনি শিবনাথেব অকাল-বিবাহ সমর্থন করেছেন এবং জমিদারী সেরেস্তায শিবনাথকে বসতে দেখে পবিতুষ্ট হযেছেন। এ সবই যেন সন্ন্যাসীব পক্ষে অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক। তাঁব সেবাপরায়ণতা এবং যুদ্ধের গল্প বলা অবশ্যই শিবনাথকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু তারাশঙ্করের প্লটের বাঁধুনিব দিকে তাকালে সন্ন্যাসীর এই বিপরীত আচরণকে অনেকক্ষেত্রে মেনে নেওয়া সহজ না হলেও অসম্ভব হয় না। বামবতন এবং গোঁসাই বাবা—কেউই শিবনাথকে নতুন কিছু দেন নি। রামরতন যা দিয়েছেন, তা জ্যোতির্ময়ীর কাছেই পেয়েছে শিবনাথ, গোঁসাই বাবার বিপরীত আচরণগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছেন শৈলজা। এইভাবে দুটি নারীকে দুটি পুরুষের মধ্য ভ'রে দিয়ে তারাশঙ্কর প্লটের মধ্যে অদ্ভুত বাঁধুনি এনেছেন একদিকে, অপরদিকে শিবনাথের জীবনের ধাত্রীরূপগুলোর মধ্যে সংহতি এনেছেন। তাই

জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যুর পরই বামরতন সক্রিয়, পিসিমা কাশীবাসী হবার পর বাড়ির চাবির গোছা শিবনাথ গোঁসাই ব্যবার হাতেই তুলে দিয়ে গিয়েছিল।

শিবনাথের জীবনের আসল 'ধাত্রীদেবতা' কে? আগেই বলেছি, ব্যক্তিবিশেষ কেউ নয়। শিবনাথের পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-সংস্কাব, তার পড়াশোনা, বঙ্কিমচন্দ্র-ববীন্দ্রনাথের মতাদর্শ, সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতি একদিকে যেমন তার তত্ত্বগত 'ধাত্রী', অপরদিকে তার বাস্তব ও পারিবারিক কর্মজীবন থেকে উৎসারিত ছোটো-বড়ো, ভালো-মন্দ নানা ঘটনা তার প্র্যাকটিক্যাল 'ধাত্রী'। অথবা, অন্যভাষায় বলা যায়, জ্যোতির্ময়ী থিয়োরী, শৈলজা প্র্যাকটিস। এঁরা সকলেই নানাভাবে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে শিবনাথকে বড়ো করে তুলেছেন। কিন্তু এককভাবে কেউই 'ধাত্রী'র মর্যাদা যেমন পাবেন না, তেমনি শিবনাথেব প্রকৃত 'ধাত্রী' এখানেও নেই। এঁবা সবাই শিবনাথের মানসকে জাগ্রত করেছেন, তার উন্মেষ ঘটিযেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত রূপ দিতে পাবেন নি। শিবনাথ যখন বড়ো হয়েছে তখন মাষ্টার রামরতনের কথাতে সে পথ খুঁজে পায় নি, বলেছে, 'আমি পথ খুঁজছি'। সকলেব মিলিত শিক্ষায শিবনাথ যে সচেতন ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হযে এক ধ্যানময় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল,—তার সেই আপন ব্যক্তিত্বই শেষ পর্যন্ত তার প্রকৃত 'ধাত্রীদেবতা' হয়ে উঠেছে, তারই নির্দেশে শিবনাথ ময়ূরাক্ষীব তীর ছেড়ে জনতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে।

৫

এই শিবনাথকে কেন্দ্র করে একটি গণচেতনার ইঙ্গিতও তাবাশঙ্কর দিয়ে গেছেন।

নীচ ও অন্ত্যজ মানুষদের মহত্ত্ব প্রদর্শন 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে একাধিক বার করা হয়েছে। এইসব মানুষের মহত্ত্বই শিবনাথেব মনে তাদের প্রতি প্রীতি জাগিযেছে। যেন শিবনাথ কৃপা বা করুণা করে, অভিজাত ঘরের সন্তান হয়েও, নীচ-অন্ত্যজ মানুষকে প্রীতি জানায় নি, তারা আপন মহিমা-মহত্ত্ব প্রদর্শন কবেই শিবনাথেব প্রীতি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নিয়েছে। এইখানেই গণশক্তির প্রতি তারাশঙ্করের আসল শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, মানবশক্তির প্রতি তাঁর প্রেম-মমতার প্রকাশ। এখানেই তিনি 'আধুনিক' ও 'গণতান্ত্রিক'।

এই জন্যই শিবনাথ বলেছে: 'বিশ্বাস করি আমি মানুষকে।' সাঁওতাল পরগণার মহানায়ক পূর্ণকে বলেছিলেন, গোটা ভারত জুড়ে অনার্য এবং শূদ্র

অশিক্ষিত এবং অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে শতশত বৎসর ধরে, তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন করা উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের প্রতি এই প্রীতি-বিশ্বাস শিবনাথ এই মহানায়কের কাছ থেকেও পেয়েছে।

এই জন্যেই শিবনাথের একজন আদর্শ মানুষ যে রামরতন মাষ্টার, তিনি অ-ব্রাহ্মণ, শূদ্র। শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও শিবনাথ এতদিন উচ্চবর্ণের গরিমায় রামরতনের পাদস্পর্শ করেনি ; জীবনের এক বিশেষ দিনে জাতির বাধা অতিক্রম করে সে তাঁকে প্রণাম করেছে।

নীচ মানুষের কয়েকটি মহত্ত্বের দৃষ্টান্তও এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন, কিশোর শ্যামুর সেবাপরায়ণতা, গাঁজাখোর লোকটির মৃতদেহ সংকার-প্রবণতা, ভোলা মুচির দাম্পত্য প্রেমের নিষ্ঠা দেখে শিবনাথের কেঁদে ফেলা, ডোম-বউয়ের কৃতজ্ঞতা-বোধ, সাঁওতাল মাঝির অতিথি সংকার, খোনা মেয়েটির পতিপ্রেম।

এই সব মহত্ত্ব শিবনাথের জীবনের একএকটি সমস্যার লগ্নে প্রদর্শিত হয়েছে এবং শিবনাথ এই সব দৃষ্টান্ত থেকে জীবনের পাঠ বা শিক্ষা নিয়েছে। সুতরাং শিবনাথের 'ধাত্রী' বলতে এই সব নীচ মানুষের মহত্ত্বকেও গণ্য করা যায়।

ইতরশ্রেণীর খোনা মেয়েটির পতিপ্রেম অভিজাত ঘরের বধূ গৌরীর পতি-নিষ্ঠার বিপরীত কাষ্ঠায় অবস্থিত। যে রাতে এই ঘটনা ঘটে, সেই রাতেই রামরতন মাষ্টার বোলপুরের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা এনে শিবনাথের সম্পত্তি রক্ষা করলেন। এইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই বৃদ্ধ মোড়ল প্রজা পঞ্চানন শিবনাথের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যে আপন পুত্রবধূর গায়ের গয়না শিবনাথের হাতে তুলে দিয়েছে, গ্রামের সব প্রজাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এনেছে। এই সব ঘটনার পর লেখকের মন্তব্য :

> সহসা তাহার মনে হইল, দুঃখ দারিদ্র্য, স্বার্থপরতা লোভ, মোহের ভার হিমালয়ের ভারের মত মনুষ্যত্বের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, সেই ভার ঠেলিয়াই মনুষ্যত্বের আত্মবিকাশ অহরহ চলিয়াছে। কঠিন মাটির তলদেশ হইতে মাটি ফাটাইয়া যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমনই ভাবে সে যুগে যুগে ঊর্ধ্বলোকে চলিয়াছে, এই ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াই চলিয়াছে।…
>
> …আজিকার দিনটা তাহার জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। এমন দিন আর বোধ হয় কখনও আসিবে না। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আজ যেন মানুষের জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ;…

এই 'মনুষ্যত্বের আত্মবিকাশ' এবং 'জাগরণ' ঘটেছে নীচ অবহেলিত মানুষকে কেন্দ্র করে। শিবনাথ যেমন তাদের মহত্ত্ব থেকে জীবনের পাঠ নিয়েছে, তারাও তেমনি শিবনাথকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে। এই পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে 'ধাত্রীদেবত' 'গণদেবতা' হয়ে উঠেছেন। অভিজাত-অনভিজাতের ভেদরেখা ঘুচে-মুছে গিয়ে এক নতুন গণশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। সেই মিলনের ফলে :

> আবার মা হইবেন সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা কমলা কমলদল বিহারিণী। এ রূপ মায়ের অক্ষয়রূপ, এ রূপের ক্ষয় নাই, শত শোষণে, পরাধীনতার অসহ বেদনাতেও এ রূপের জীর্ণতা আসিল না।

৬

যে গণশক্তিব আবির্ভাবের কথা এইমাত্র বলা হল, সেই গণশক্তিকে তারাশঙ্কর এক আদিম প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন। এই আদিম প্রাণশক্তির মধ্যে একদিকে একটি নগ্ন-বর্বব-হিংস্র মনোভাব, অপবদিকে একটি সারল্য আছে। তখন মানুষগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলে মনে হয। মনে হয়, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূখণ্ডের নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষগুলো একাত্ম। এই জন্যই তারাশঙ্কবের সাহিত্যে নিসর্গ জগতের বর্ণনা মানুষের বিকল্প হিসেবে ধবা দিয়েছে। শুধু নিসর্গ জগৎই নয, মানুষের বিকল্প হিসেবে মনুষ্যেতর পশু-প্রাণী পর্যন্ত এসেছে। তারাশঙ্করের রূপক-উপমার মধ্যে এই কাবণেই পশু-পাখির প্রাধান্য। আসলে তারাশঙ্কব নিজে মাটির কাছাকাছি ছিলেন, মাটিব মতো পুবোনো ও প্রাচীন জিনিস আব কি আছে। এই মাটিই তাঁর অতীতসংস্কার, তাই প্রাগৈতিহাসিক বন্য মানুষ, সেটাই ধবা পড়ে নিসর্গের বর্ণনায।

অনেকেরই ধারণা—এই সরল-বন্য হিংস্র-আদিম প্রাণচেতনাকে তারাশঙ্কর বীরভূমেব কাহার-বাগদি-ডোম-বাউরিদের মধ্যেই কেবল দেখেছিলেন। তা নয়। তাঁর অভিজাত চরিত্রগুলোর মধ্যেও এই আদিম প্রাণপ্রবাহকে লক্ষ করা যায়। আমার মনে হয়, নিম্ন ইতর মানুষের সেই আদিম প্রাণশক্তিকে যেখানে তারাশঙ্কব অভিজাত মানুষের মধ্যেও দেখেছেন, সেখানে মানুষকে তিনি ইতর-ভদ্র এই দুই কোঠায় ভাগ না করে সকল মানুষকে একটি আঞ্চলিক চেতনা প্রবাহের অধীন করে দেখে দৃষ্টির অখণ্ডতার পরিচয় দিয়েছেন; এবং তারাশঙ্করকে যখন

'আঞ্চলিক শিল্পী' বলে নির্দেশ করা হবে, তখন এইখানেই তাঁর আঞ্চলিকতার আসল সুরটিকে ধরে নিতে হবে।

যেমন, অভিজাত ঘবের সন্তান শিবনাথ। শিবনাথ আদর্শবাদী চরিত্র বটে, কিন্তু সাধাবণ বাঙলা উপন্যাসের তথাকথিত নায়কের মতো দেহ-কামনার উর্ধ্বস্থিত একটি চবিত্র নয। যখনই চরম আদর্শবাদ এবং সেই আদর্শেব জন্য শিবনাথের মনে সমস্যা এসে দেখা দিযেছে, আশ্চর্য, ঠিক তখনই এবং ততবাবই, প্রায আঙ্কিক নিযমে, গৌবীকে তার মনে পড়ে গিযেছে। এ মনে পড়া প্রেমেব অতি সূক্ষ্ম দেহোর্ধ্ব এক নিরালম্ব অনুভূতি নয়, তা সাধারণ কামনা-বাসনার রঙ দিযে রাঙানো। একদিনের একটি ঘটনাকে এব সুন্দব নিদর্শন বলে গ্রহণ কবা যায।

শিবনাথ তখন দিশেহারা, রামবতনকে বলেছে 'আমি পথ খুঁজছি'। 'সে অন্যমনস্কভাবেই ঘুবিযা ঘুরিযা বাড়িটাব সর্বস্থান যেন সন্ধান কবিযা ফিরিতে আরম্ভ করিল, কোথায কোনখানে এ অস্থিরতাব সান্ত্বনা লুকাইযা আছে।' সেইদিন শ্রীপুকুবেব ঘাটে অক্লান্তভাবে সাঁতার কাটায এবং উদ্দামভাবে ঘোড়া চাপায তার দেহ-মনেব অস্থিবতা চবম রূপ নিযেছিল। উচ্চ-মহান চিন্তাব পাশেই গৌরীর সঙ্গে এক শয্যায় শযনেব সম্ভাবনায তাব দেহেব 'শোণিত কণিকাগুলি যেন উত্তাপে উত্তেজনায় কুঙ্কুমের মত ফাটিয়া' পড়তে চাইল। এইখানে শিবনাথের মধ্যে যে আদিম দেহচেতনা দেখানো হযেছে, তাই-ই অভিজাত হওয়া সত্ত্বেও তাকে যেন পুরানো-প্রাচীন মাটির জগতের মধ্যে নিয়ে গেল। সবচেযে বড়ো কথা, আদর্শবাদী শিবনাথ এবং দেহ-চেতন শিবনাথ— এ দুই শিবনাথের মধ্যে দ্বন্দ্ব না আসা। এই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থাই তার মনের আদিমতা ও সারল্যের সূচক। এইখানেই শিবনাথকে আমি 'আঞ্চলিক' বলতে চাই।

এই জন্যেই শিবনাথ তার মনের অস্থিবতা ও জীবন জিজ্ঞাসায কাতর হয়ে অনেক সমযেই বীবভূমের নিসর্গ জগতেব মধ্যে ডুবে গিযেছে। এ উপন্যাসের বহুস্থলেই আঞ্চলিক প্রকৃতিচিত্র নায়কের মনের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে, গ্রন্থের প্রাবম্ভ থেকেই এটি লক্ষ করা যাবে। লেখক জমিদাবপুত্র শিবনাথকে জমিদারী পরিত্যাগ করিয়ে ময়ুরাক্ষীর তীরে কেবল কৃষাণই করেন নি, রাঢ়ের আদিম মানুষের দেহচেতনা ও প্রাণবন্যাকেও ভরে দিযেছেন তাব মধ্যে।

কিংবা, এই অভিজাত সন্তানকে বিচারও কবা হযেছে যেখানে অনভিজাত মানুষের দৃষ্টিকোণ দিয়ে, সেখানেও এটি স্পষ্ট। ডোমবউ নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার

আত্মীয়-পরিজনের সবাই পরম সারল্য নিয়ে শিবনাথকেই অপরাধী বিবেচনা করেছে। যে কাজ তারা নিজেরা করতে পারত, তাব দায়-দায়িত্ব শিবনাথের ওপরেই চাপিয়ে দিযে তাবাই উচ্চ-নীচের ভেদরেখা মুছে দিয়েছে।

এই আদিম প্রাণ যে পশুব মতো সরল ও সবল তা তাবাশঙ্কবের কয়েকটি উপমা-রূপক ও বর্ণনার মধ্যেও ধরা পড়েছে। তার দৃষ্টান্ত এই :

রামবতন মাষ্টাব বাড়িব পরিচাবক সতীশেব কাছে বেশি পবিমাণে স্নানের জন্য তেল চেয়ে বলেছেন : 'বেশি করে আনবি, বলবি, মহিষাসুরের মত দেহ, সেই উপযুক্ত দাও।' এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, তাবাশঙ্করেবই কোনো চরিত্র আপন শবীবেব বিশালত্ব বোঝাতে গিযে নিজেই বলেছেন : আমাব চেহারা তখন ভাগলপুরী গাইয়েব মতো।

নাযেব এবং কেষ্ট সিংযেব দ্বন্দ্বেব চিত্র : 'নাযেব ও কেষ্ট সিং আরক্ত নেত্রে দুই যুদ্ধোদ্যত পশুব মত গর্জন করিতেছে।' বোগাক্রান্ত ফ্যালার বর্ণনা : 'প্রকাণ্ড জোযান, মাটিতে পড়িযা আছে একটা সদ্য-কাটা গাছের মত।' ফ্যালার জলতৃষ্ণা : 'সে তৃষ্ণা যেন মিটিবাব নয়, ওই দগ্ধ প্রান্তরেব তৃষ্ণাব মত যেন একখানা মেঘ সে নিঃশেষে পান করিতে পাবে।' বামজী গোঁসাই ভোলার কাছে গরম জল চাইলে : 'ভোলা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া আপন মনেই বলিল, দেখ, ব্যাটা শেয়ালমাবাব খেযাল দেখ।'

ডোম-বউ জল খাচ্ছে : 'মেযেটা পশুর মত মুখ ডুবাইয়া মালসায চুমুক দিতেছে।' বাড়ির কৃষাণদেব কেষ্ট সিং বলেছে : 'একেবারে এসে খাবার ধানের জন্যে রাঘব-বোযালের মত হাঁ কবে দাঁড়ালে?'

বনপ্রান্তে সাঁওতাল মাঝির বর্ণনা : 'ওই গাছের কাণ্ডের মত বিশাল কালো এক মূর্তি গাছের তলায় অন্ধকারে মিশিযা দাঁড়াইয়া আছে।'

নিত্য-ঝির গুড়-মাখানো বিচিত্রিত মুখটি যেন এযুগের চেহারার উপর আদিম যুগের অকলঙ্ক ছাপ।

কিংবা ধানের মাঠে জল নিযে বিবদমান দুটি চাষীর ছবি : জলের জন্যে ক্ষণপূর্বে পরম ক্রোধে যে কোদাল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, ক্ষণপরে সেই লোকটিরই অবস্থা : 'লোকটি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।' ক্রোধ ও আত্মসমর্পণের দুই বিপরীত কোটীতে আকস্মিকভাবে গতায়াতের ফলেই চাষীটি আদিমতার সারল্যে ভূষিত হযেছে।

একটি ক্ষুধার্ত স্ত্রীলোকের বর্ণনা : 'তাহার মনে হইল, লক্ষ লক্ষ যুগের ক্ষুধা ওই মেয়েটি উপরে জ্বলিতেছে।'

এবং এই পরিবেশেই শিবনাথ আবার যেন বসুন্ধরার মধ্যে, আদিমতার মধ্যে ডুবে যেতে চায় :

> ···প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট—এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া এ সমস্ত বর্জন কবিতে পারিত। জীবিকা ? এতবড় বিস্তীর্ণ দেশ—মা ধরিত্রীর প্রসারিত বক্ষ, তাহারই মধ্যে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে স্তন্যপায়ী শিশুর মত মায়ের বুক হইতে রস সংগ্রহ করিত।···

'আগুন' উপন্যাসে হ্নুট হামসুনের 'গ্রোথ্‌ অফ্‌ দি সয়েল'-এর স্বপ্ন-বিভোরতা, 'পাষাণপুরী'র একেবারে প্রারম্ভেই ধরিত্রীচেতনা, প্রভৃতিকে স্মরণ করলে শিবনাথের এই উক্তিকে তারাশঙ্করের সাহিত্য-ভাবনার একটি বিশিষ্ট দিক বলে মেনে নিতে পারা যায় সহজেই ॥

———

গ্রামবাংলার চালচিত্র ঃ গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম

বিজিতকুমার দত্ত

এক সময়ে বাংলার গ্রাম ছিল এক একটি ইউনিট। বিশেষ দেবতা অথবা দেবী ছিলেন সেই গ্রামের অভিভাবক। তাঁকে আশ্রয় করে পল্লীজীবনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। গ্রামের প্রধান শাসন করতেন, কর্মে প্রেরণা দিতেন। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাঁশবাগানের অপরপ্রান্ত সম্বন্ধে পল্লীবাসীর কৌতূহল ছিল সীমিত। পল্লীগ্রাম ছিল পরিবর্তনবিমুখ, আত্মতৃপ্ত, গোষ্ঠীবদ্ধ। গ্রামজীবনে সুখদুঃখ আনন্দ-শোক ছিল অদৃষ্টনির্ভর। এই গ্রামের সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সবই ছিল। জীবনের মূল্যবোধও পল্লীবাসীর কাছে কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার-আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে জীবনবোধের যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তার ঢেউ পল্লীজীবনেও লেগেছিল। আপাতদৃষ্টিতে সেই পরিবর্তন স্পষ্টগোচর না হলেও ওপার গঙ্গায় চর জেগে উঠছিল জলের নীচেই। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে, গল্পে এই কালান্তরের ভূমিকা করেছেন। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে নবকালের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। অন্ততঃ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর স্বদেশপ্রাণ বাঙালী যুবকের এক অংশ দেশের মুক্তি এবং মঙ্গলচিন্তায় কোন্ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিল সে সংবাদ এই উপন্যাসে প্রকাশিত। গণদেবতায় চার্লস মেটকাফের উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে। তারাশঙ্করের কাছে পল্লীজীবন মেটকাফের বিশ্লেষণের মতই মনে হয়েছিল। তবে মেটকাফের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও বড় কম নয়। কালান্তরের সূচনায় গ্রাম এবং গ্রামজীবন কতকটা অবহেলিত এবং উপেক্ষিত ছিল। গ্রামীণ ব্যবস্থা অনড় অচল হয়েছিল তখনও। যুগান্তরের ঝড় এই গ্রাম ব্যবস্থার উপর কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসে নি। এক জাতীয় অবোধ আনন্দে গ্রামের দিন চলে যেত। উৎপাদন যেটুকু হত গ্রামের প্রয়োজনেই তা নিঃশেষিত হয়েছে। শাসন যেটুকু প্রয়োজন তার জন্য গ্রামেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে। মেটকাফ তুলনা করেছেন এক একটি গ্রামকে এক একটি ক্ষুদ্র রিপাবলিকের সঙ্গে।[1] গ্রাম যেন একটি স্টেট। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের জমিদারী ব্যবস্থার পত্তন হল। ইতিহাসের টানেই পরিবর্তন এল। গুরুতর

পরিবর্তন দেখা দিল যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে। রেলওয়ে স্থাপিত হবার পরই গ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের মিলন-বিরোধ ঘটতে আরম্ভ করল। কালান্তরের এই চিহ্ন গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে। এই উপন্যাসে ভাঙনের ছবি। গড়ার কথা আছে বটে। তা কেবল লেখকের অভিপ্রায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ অভিপ্রায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দিয়ে গড়া। এ স্বপ্ন উপন্যাসের প্রতিপাদ্য নয়।) পঞ্চগ্রামের সূচনায় তারাশঙ্কর বলেছেন, 'পঞ্চবিংশতি গ্রাম-সমাজ অবশ্য বর্তমানকালে কল্পনার অতীত। কিন্তু এককালে ছিল। গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রাম, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, বিংশতিগ্রাম, পঞ্চবিংশতিগ্রাম—এম্‌নি ভাবেই গ্রাম্য-সমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল, বহুপূর্বে শতগ্রাম, সহস্রগ্রাম পর্যন্ত এই বন্ধনসূত্র অটুট ছিল। তখন যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য। এখন যাতায়াত সুগম হইয়াছে, কিন্তু সম্পর্ক-বন্ধন বিচিত্রভাবে শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজ অবশ্য সে সব নিতান্তই কল্পনার কথা, তবে পঞ্চগ্রাম-বন্ধন এখনও আছে। মহাগ্রাম আজই নামেই মহাগ্রাম, কেবলমাত্র ন্যায়রত্নের বংশের অস্তিত্বের লুপ্তপ্রায় প্রভাবের অবশিষ্টাংশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া মহৎ বিশেষণে কোনমতে টিকিয়া আছে। গোড়াতে যে ইউনিট-সর্বস্ব গ্রামের কথা উল্লেখ করেছি, কালে সেই গ্রামগুলিই এরকম মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যে পঞ্চগ্রামের কথা তারাশঙ্কর বলেছিলেন তাও ভাঙনের মুখে। দ্বারকা চৌধুরী দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সে প্রসঙ্গ স্মরণ করেছে। কেমন করে কঙ্কণার জমিদাররা কাঁচা পয়সার জোরে 'টিকিয়া থাকা' সমাজকে বিনষ্ট করলে সে কথা ভেবে চৌধুরী মহাশয় বিভ্রান্ত। কেমন করে ছিরু পাল টাকা দাদন দিয়ে কঙ্কণার জমিদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নববাবু হতে চেয়েছে সে কথা চৌধুরী ভেবে পাননি। এই নবজমিদার-বিলাস-ব্যবস্থা তারাশঙ্কর উপন্যাসে এঁকেছেন। কঙ্কণার জমিদারবাবু গ্রামে আসে স্ফূর্তি করতে, অর্থসংগ্রহে, 'ঈশ্বরবৃত্তি' নিতে। ধান বেচে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। বুঝতে পারি, অর্থনীতির মৌল পরিবর্তন ঘটেছে গ্রামজীবনবিন্যাসে। গ্রামের উৎপাদন রীতিকে বলতে পারি 'এসিয়াটিক মোড অব প্রোডাকসন'। তারাশঙ্কর তাঁর আত্মজীবনীতে মার্কসবাদে অংশত আস্থা স্থাপন করেছেন। তিনি অর্থনীতির পরিবর্তনের সূত্রটিকে অনুধাবন করেছেন। কিন্তু 'যান্ত্রিক অর্থনীতি'কে মানতে পারেননি তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর ভাঙনের কথা বলেছেন কিন্তু 'এসিয়াটিক মোড' থেকে রূপান্তরের চিত্র উপস্থাপন করেননি।) এই রিপাবলিক বা স্টেট কিভাবে, কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে সেকথা উপন্যাসে নেই। বোধ করি থাকা সম্ভব নয়। দ্বারকা চৌধুরীর,

দীর্ঘনিশ্বাসে এজন্য ক্ষোভ জন্মায়, প্রতিবাদস্পৃহা জাগ্রত করে, এই পর্যন্ত। বিপ্লবেও তারাশঙ্কব বিশ্বাসী। কিন্তু তার স্বরূপ উপন্যাসে অনুদ্‌ঘাটিত। মেটকাফ চেয়েছিলেন গ্রামীণ ব্যবস্থার অপরিবর্তন। মার্কস্‌-ও এসিয়াটিক মোডকে ধনতন্ত্রের পূর্বরূপ বলেছেন। যাই হোক, বেণ্টিঙ্কের সময় থেকেই ধীবে ধীরে, 'দেশে নতুন পঞ্চাযেৎ সৃষ্টি হল—ইউনিযন-বোর্ড, ইউনিয়ন কোর্ট, বেঞ্চ, তারা ট্যাক্স দিযে বিচাব কবছে, সাজা দিচ্ছে'। এই বোর্ডেব-কোর্টেব কর্তাব্যক্তিরা প্রকারান্তরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সমাধা কবলে। কঙ্কণাব জমিদারদের দেখে তিনকডি অবাক হযে যায়। ধান বেচে টাকা নিযে সহরে চলে যায এরা। গ্রামেব মধ্যে স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয স্থাপনে উৎসাহ দেখায বটে কিন্তু গ্রামের সঙ্গে এদের নাডীব যোগ নেই। ধান ঋণ দেওযাব ঝামেলা জমিদার পছন্দ করে না। সুতবাং চাহিদা ও জোগানের এই পরিবর্তন গ্রামের আকৃতি এবং প্রকৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসবে সন্দেহ নেই। তারাশঙ্কব একের পব এক ধ্বংসের ছবি এঁকেছেন। ধ্বংস এই পবিবর্তনের সূচক। নাগিনী কন্যার কাহিনীতে নাগু ঠাকুরের তণ্ডবলীলায় সেই করুণ অথচ বাস্তব রূপটিকেই পরিস্ফুট করে।) হাঁসুলী বাঁকেব উপকথায এই অনিবার্য করুণ চিত্রটি অপরূপ, 'বাঁশ কাটছেই। আজ একটা পাশ একেবারে সাফ হযে হাঁসুলী বাঁক মিলে গেল—দূর দেশান্তবের সঙ্গে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথাব শেষকালে শুধু গাছবাটার শব্দ। মানুষেরা চন্ননপুরে চলে গিয়ে শহরে বাজারে রাজপথে চলমান দ্রুতধাবমান জনস্রোতেব মধ্যে মিশে গিয়েছে। স্থানু স্থাবর বনস্পতি। যারা সর্বপ্রথম গড়েছিল হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ছাযাচ্ছন্ন শান্ত-তন্দ্রালু গ্রামখানি, তারাই যাচ্ছে এবার, তারা হচ্ছে বিগত। তারই মধ্যে বসে আছে সে যুগের শেষ মানুষ বনওয়ারী স্থাবরের মত।' প্রচণ্ড সংগ্রামে বিধ্বস্ত বনওয়ারীর কালের সমাপ্তি ঘোষণা করে তারাশঙ্কর পল্লী-জীবনের গৌববময অথচ ধ্বংসোন্মুখ কাহিনী শেষ করলেন। (পঞ্চগ্রামেও লেখক একই কথা বলেছেন, 'দেবু তাহাদের দিকে পিছন ফিরিল। নাঃ আর নয়। সকলকে হাত তুলিয়া দুর হইতে নমস্কার জানাইয়া শেষ বিদায় লইল। সে আর ফিরিবে না। সে জানে ফিবিলেও আর সে পঞ্চগ্রাম দেখিতে পাইবে না। এখানকার মানুষের পবিত্রাণ নাই। জীবনের গাছেব শিকডে পোকা ধরিয়াছে। পঞ্চগ্রামের মাটি থাকিবে—মানুষগুলি থাকিবে না। পাতা ঝরা গাছের মত, বসতিহীন পঞ্চ-গ্রামেব রূপ তাহার চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠিল।' তারাশঙ্করের উপন্যাসে কারুণ্য ও বেদনা মিশ্রিত। বিগত কাল তাঁর উপন্যাসে স্মৃতিভারে স্বপ্নময়।

(উনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসে পল্লীপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীপ্রকৃতির চকিত উদ্ভাস লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে বাংলার কৃষকদের সমর্থনে অনেক কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিতে পল্লীজীবনের রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াস এখন থেকেই দেখা দিল।) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রমেশচন্দ্র ইত্যাদির উপন্যাসে পল্লীর বাস্তবভিত্তিক রূপ স্থান পেলে। এসব উপন্যাসে গ্রাম্যকথা নিবিড় মমতায় আঁকা হয়েছে। সেকালেব পাঠক কখনও 'সুখ অতি সহজ সরল' এই কল্পনার চিত্রে মুগ্ধ হয়েছে অথবা অন্ধকাব জীবনের জন্য কারুণ্য প্রকাশ করেছে। রমেশচন্দ্র তাঁর দুটি উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারকেব ভূমিকা নিয়েছিলেন। তারই ফাঁকে তিনি পল্লীর মানুষের সারল্য, অকপট স্নেহ এবং মমতার কথা বলেছেন। তারকনাথের উপন্যাসে দারিদ্র্যভার গুরুতর। পল্লীপ্রসঙ্গ সেখানে বিস্তৃতি পায় নি। আসল কথা পল্লীসমাজ তাব ভালোমন্দ মিশে বাঙালীর চিত্তে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ জাগিয়েছিল তার টানটোন এসব উপন্যাসে চিত্রিত হল। বস্তুত গ্রাম্যকথা এবং গ্রাম্যবার্তা সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোভাব তখন পর্যন্ত দুই কোটিতে আন্দোলিত। রবীন্দ্রনাথ 'পল্লীগ্রামে' যে সজীবতার স্পর্শ পেয়েছিলেন তাতে আমরা মুগ্ধ হই। এমন কি 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-ভাবনায় মুগ্ধ হই কখনও বা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে জীবনের অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পল্লীমানুষের বীণার যে ধ্বনি তা একটিমাত্র তারেব। সপ্তস্বরা বীণার ঐকতান এ জীবনে নেই। রবীন্দ্রনাথই তাঁর ছোটগল্পে পল্লীসমাজকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ গোচর করলেন। পল্লীমানুষেব জীবনে যে মূল্যবোধ তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন তিনি। মৃত্যুর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলাদেশ এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস, সেখানকার মানুষ যারা—সাঁওতাল—সত্যপবতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদেব আমি।' তাঁব এই ভালোবাসা পদ্মার শ্যামল প্রান্তরেও বিস্তৃত হয়েছিল। শবৎচন্দ্রের উপন্যাসে ভাগ্যবঞ্চিত পল্লীসমাজের কথা। তাঁর উপন্যাসে পল্লীসমাজ ক্লান্ত, শ্রীহীন, ভ্রষ্ট। 'পণ্ডিতমশাই'-তে দৈবাহত মানুষের যে বিকৃতি মাবী-কে কেন্দ্র করে দেখা দিল শরৎচন্দ্র তার নিষ্ঠুরতার দিকটি চিত্রিত করলেন। 'পল্লীসমাজে' গ্রাম্যদশাদলির ঘৃণ্য রূপটিকে অনাবৃত করলেন তিনি। কিংবা গঙ্গামাটিতে রাজলক্ষ্মীর পবিত্রতার শোষণমন্ত্রেও

গ্রামজীবনের অঙ্গার যখন ধৌত হয় না তখন এর জড় কোথায় তা আমরা ভাবতে আরম্ভ করি। এই পল্লীসমাজের বিষবৃক্ষের মূল অনেক গভীরে প্রসারিত। তবে ডালপালা মেলে সে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারই ছায়ায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে। (তারাশঙ্কর গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে যে পল্লীগ্রামের চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে ক্ষীয়মান পল্লীপ্রকৃতি যেমন রূপায়িত তেমনি পল্লীর সনাতন ভাবধারার প্রতি নিবিড় মমতাও উদ্ভাসিত। উপন্যাস দুটিতে পল্লীগ্রাম নাগরিক সভ্যতার সামনে চ্যালেঞ্জ রূপে উপস্থিত। কালিন্দী উপন্যাসে চিনির কলের প্রতিষ্ঠা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথার রেল ইঞ্জিনের অনলনিঃশ্বাসী রূপ উপন্যাসগুলির প্রেক্ষাপট।) শেষ পর্যন্ত উপকথার মানুষগুলি 'মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙল বাঙের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল গাঁইতে নিয়ে।' গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম ও সিউড়ীর গঞ্জ, নব উদ্ভূত বণিকসমাজ পল্লীর মানুষকে আকর্ষণ করেছে। কাঞ্চনকৌলীন্যের টানে রাঙামাটির পথ ছাড়িয়ে পল্লীবাসী এসে দাঁড়াচ্ছে ধনতন্ত্রের রাজপথে। বলা বাহুল্য, গ্রামের মানিটাইজেসনের ফল তীব্ররূপ ধারণ করলেই এরকম অবস্থা দেখা দেয়। গঞ্জের ব্যবসায়ীরা যেমন পুঁজির নূতন নূতন দিগন্ত আবিষ্কার করেছে তেমনি তাদের আগ্রাসন নীতিও গুরুভার হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর এরকমই মনে করেছেন। শ্রীহরি পাল সিউড়ীর গঞ্জে এই নূতন ব্যবস্থার পরিচয় পেয়েছে। একদিকে ভূমিনির্ভরতা অন্যদিকে যন্ত্রের গতিশীলতা। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই টানাপোড়েন আবর্ত সৃষ্টি করেছে। তারাশঙ্কর এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে বন্দরের কাল শেষ হয়েছে কিন্তু যন্ত্রের টান তার উপন্যাসে দাবাগ্নি সৃষ্টি করেনি। কালিন্দীর চিনির কলের মালিকের শাবী-সংবাদে অথবা ইন্দ্ররায়ের হীরামুক্তমাণিক্যের কাছে নতিস্বীকারে তারাশঙ্করের প্রীতিপক্ষপাত কোন দিকে বোঝা যায়। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে অংশনের তাৎপর্য অলিখিত। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে যতদূর এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তারাশঙ্কর তার থেকে অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁর অভিপ্রায়ও তা ছিল না।

একথা সকলেরই জানা তারাশঙ্কর জমিদারী ব্যবস্থার যে চিত্র এঁকেছেন তা পতনদশার। জমিদারদের সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ambivalent। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চক্রবর্তীর এই সমালোচনা যথার্থ বলে মনে হয়। তারাশঙ্করের জমিদারদের প্রতিনিধিস্থানীয় জলসাঘরের রাবণেশ্বর রায় এবং বিশ্বম্ভর রায়। এদের পৌরুষ, ধর্ম, ক্ষমতা, দম্ভ গল্প দুটিতে বিকিরিত। এই বিকিরণ অস্তরাগের। অস্তরাগের বর্ণচ্ছটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বটে কিন্তু বুঝতে পারি, এ ইন্দ্রধনু ক্ষণকালের। তুফানের

হ্রেষাধ্বনি আর গাঙ্গুলির মোটরগাড়ির হর্ন যে বৈপরীত্যের সূচনা করে তারাশঙ্করের উপন্যাসে তারই ভূমিকা।

গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে জমিদার নেই কিন্তু জমিদারতন্ত্র আছে। এখানেই তারাশঙ্কর জনগণকে তার স্বরূপে প্রকাশ করলেন। অনিরুদ্ধ, পাতু, তারিণীচরণ, পদ্ম, দুর্গা, রহম শেখ, ইরসাদ, দেবু, তিনু, স্বর্ণ, জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষ এমন কি পাতু বায়েনের বিড়ালস্বভাব স্ত্রী এই দুই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দীতে শিবনাথ, ইন্দ্ররায়, রামেশ্বর শৈলজার মুখ্য ভূমিকা। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে মুখ্য ভূমিকা জনগণের—পল্লীবাসীর। এবং চণ্ডীমণ্ডপ হয়েছে তার প্রাণকেন্দ্র। বিভূতিভূষণে চণ্ডীমণ্ডপের যে চকিত রূপ উদ্ভাসিত তাতে সনাতনী ধারায় প্রকাশ—তারাশঙ্করে বিবর্তনের উঁচু-নীচু রেখা। চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে তারাশঙ্করের অভিমত প্রাণধানযোগ্য, 'ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ এমনি ভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য-বিচার হইত, সংকীর্তন হইত, পাশা-দাবাও চলিত। গ্রামখানির সলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা। গ্রামে কাহারও কোন কুটুম্ব স্বজন আসিলে —এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়া কর্ম—অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সবই এইখানে অনুষ্ঠিত হইত। কালগতিকে ধূলার অবলেপনে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে দেখা যায়।' এই চণ্ডীমণ্ডপের সজীবতা ও স্বতশ্চাঞ্চল্য নিয়ে গ্রাম তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। তারাশঙ্কর দেখেন এই প্রাচীন সমাজজীবন উন্মূলিত। কেন্দ্রনিযামক এই সজীব বস্তুটি মৃতপ্রায়। সুতরাং যে বন্ধনে যুগপৎ শাসন ও ক্ষমতা ছিল সে বন্ধন ছিন্ন। মানুষও বিপর্যস্ত এবং দিগ্‌ভ্রান্ত। অনিরুদ্ধ কামার শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে একে আঘাত করছে। যদিও সে শক্তি যতটা আঘাত করে ততটা নির্মাণক্ষম নয়। অনিরুদ্ধ শ্রীহরি ঘোষের নষ্টামিকে সকলের চোখে ধরিয়ে দিয়েছে। তার বাগানের গাছ ধ্বংস করেছে, পদ্মকে ফেলে দুর্গাকে নিয়ে ফুর্তি করেছে, শেষে জেলে গিয়ে সঙ্গী জুটিয়ে কলের মজুরি করেছে। সেখানেও সে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়নি। যাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল সে পালিয়েছে। আবার সে গ্রামে ফিরে এসেছে। নিষ্প্রাণ গ্রামীণ জীবনকে জাগিয়ে তোলবার সে চেষ্টাও করেছে। কিন্তু তার পরিণাম কি হতে পারে আমরা জানিনা। লেখকও বোধ করি দৃঢ়নিশ্চিত নয় বলে অনিরুদ্ধের হয়ে ওঠার কাহিনী গড়ে তুলতে পারলেন না। আর একদিক থেকে অনিরুদ্ধ চরিত্রটি

নঙর্থক। কেননা তার প্রতিবাদ একটা সত্যের কথা জানায় বটে কিন্তু অপর সত্য যেখানে তার উত্তরণ তাকে সে করায়ত্ত করতে পারেনি। সে দেখিয়ে দিয়েছে নগর পুড়লে দেবালয়ও আগুন থেকে রক্ষা পাবেনা, কিন্তু নূতন দেবালয়ের ইঙ্গিত তার কর্মে পাইনা। এদিক থেকে 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র করালীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।' অনিরুদ্ধের পরিণতি করালীচরিত্রে। কিন্তু করালীর উত্তরণও অনির্দিষ্ট।

তারাশঙ্কর আর একটি চরিত্র এঁকেছেন তিনকড়ির। ভল্লাদের কাহিনী প্রকাশে তারাশঙ্কর গ্রামের সাধারণ জীবনবিন্যাসের আর এক দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করলেন এখানে। তিনকড়ির শিবপূজার কাহিনী এবং তার ব্যর্থতাবোধ নানা ভাবে উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত তিনকড়ি শেষ পর্যন্ত যে পথকে ধিক্কার দিয়েছিল সে পথকেই জীবিকার উপায় করে নিল। এখানেও মূল্যবোধের পরিবর্তন। তিনকড়ি তার কন্যা স্বর্ণকে দেবুর আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। লেখকের আদর্শবাদ তিনকড়ির কারুণ্যকে ঈষৎ পুরস্কৃত করল স্বর্ণের প্রতিষ্ঠা দিয়ে।

দ্বারকা চৌধুরীর ঘটনা কিঞ্চিৎ স্থান জুড়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের আরম্ভে তাকে দেখি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নবসৃষ্ট জমিদারের ভাঙ্গনের দশায়। যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জীর্ণ রূপ তার আষ্টেপৃষ্ঠে তথাপি তিনি তখনও গ্রামের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। এই নিঃস্ব জমিদার বিত্ত হারিয়েছে, দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে কিন্তু মান-মর্যাদা বিসর্জন দেয়নি। একবার তাঁকে ন্যায়ের জন্য সকলের সামিল হতে দেখি। কিন্তু চৌধুরী অতীতের গুরুভার বয়ে চলেছেন। দিন-যাপনের গ্লানি নিয়ে তিনি শুধু ঋণশোধ করে চলেছেন। যে ইষ্টদেবতাকে পূজা করেছেন সেই দেবতাও এখন বাদী। দেবতার উপকরণ জোগানোই চৌধুরী মহাশয়ের এখন অসাধ্য। সুতরাং নূতন মহাজন-জমিদার শ্রীহরি ঘোষের কাছে যে তিনি দেবতা বিক্রয় করে দিয়েছেন। এখানেও দেখি ধ্বংসের করুণ রূপ। প্রবল আঘাতে জর্জরিত মানবাত্মার হাহাকার।

ন্যায়রত্ন এই উপন্যাসে দলছুট। তিনি সত্যে অবিচল, ধর্মরক্ষায় কঠোর, কর্তব্যে আন্তরিক। সনাতন ঐতিহ্যরক্ষায় পুত্রও ক্ষমা পায়নি তার কাছে। কুলবৃত্তি তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৌত্র বিশ্বনাথের ভ্রষ্টাচার কিন্তু তাঁকে বিচলিত এবং পরিণামে বিপর্যস্ত করে ফেললে। পৌত্রবধূকে নিয়ে তিনি কাশীবাসী হলেন। যুগের দাবী তাঁর পক্ষে মেটানো সম্ভব ছিল না। শৈলজা

(ধাত্রীদেবতা) নাস্তির সঙ্গে থাকা সম্ভব নয় জেনে কাশীবাসী হয়েছিলেন। যদিও তাঁর ফেবার কাহিনী সেই উপন্যাসে আছে, কিন্তু উপন্যাসের সেটি অপরিহার্য অঙ্গ নয়। ন্যায়রত্নের কাছে দেবু যে গল্প শুনতে পেলে সেই ধর্মরক্ষার টানেই ন্যায়রত্ন বেঁচে ছিলেন। ধর্ম যখন বিলুপ্ত তখন তার প্রয়োজনও ফুবিযেছে। এখানেও তারাশঙ্কর প্রাচীন ধর্মবোধের সঙ্গে শিল্পকারখানাভিত্তিক রাষ্ট্রনীতিব দ্বন্দ্বেব স্হচনা দেখেছেন। এবকম দ্বন্দ্বের আরও জটিল, আরও ঘনিষ্ঠ এবং বিস্তৃত পরিচয় পাই 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থে। জীবনমশাযের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রসম্মত নিদান হাঁকার সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের রীতিনীতির বৈপরীত্য তাবাশঙ্কর এখানে উপস্থিত করেছেন। জীবনমশায়ের পুরনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে যে কঠিন সংগ্রাম সেখানেও পুত্রের স্নেহ অপেক্ষা শাস্ত্র বড হযে উঠেছিল। কিন্তু জীবনমশায় প্রাচীন-নবীনের মেলবন্ধন করিযেছিলেন শেষ পর্যন্ত। ন্যাযবত্নেব সংগ্রাম আপোষহীন। সে জন্য তাঁর পরাজয় করুণ এবং মর্মান্তিক। লেখকেব প্রীতিপক্ষপাত ন্যায়বত্নের প্রতি। ন্যায়রত্নের জীবনজিজ্ঞাসা, তাঁর ধর্মবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা, চরিত্রবল গৌরবশিখরে আরূঢ। তাবাশঙ্করেব এই চরিত্র রূপায়ণে স্মৃতিরোমন্থনের উল্লাস আছে। স্মৃতিব শিখরে পৌছে আমরা বিশালতার মুখোমুখি হই, অভাবনীয়ের চকিত স্পর্শ পাই। এই স্মৃতিচারণায় বাস্তবতার অভাব আছে। অতিনাটকীযতাও অনুপ্রবিষ্ট এবং রোমান্সের দীপ্তি দুর্লক্ষ্য নয়। ন্যায়রত্নের অন্তর্দ্বন্দ্ব আভাসিত কিন্তু তা কর্মে রূপাযিত নয়। ন্যায়রত্ন যে প্রশ্ন পাঠকেব কাছে উপস্থিত করেছেন তার মূল্য কম নয়। পরিবর্তন কাম্য কিন্তু পরিবর্তন ঐতিহ্যবিমুখ হতে পারে না। তারাশঙ্কর পবিবর্তনের পক্ষপাতী হযেও ঐতিহ্যের অমোঘ শাসনকে স্বীকার করেন। সে স্বীকৃতি দেবুব চরিত্রে। সে স্বীকৃতি পল্লীবাসীর শ্রদ্ধাবোধে। ন্যায়রত্নের পৌত্র-বধুকে শকুন্তলা সম্বোধনে প্রাচীন তপোবন আদর্শের ইঙ্গিতই পাই। তপোবনের খাণ্ডবদাহন তারাশঙ্করকে উদ্বিগ্ন করেছিল নিশ্চযই। ন্যায়রত্ন বলেছেন, 'সত্যকার রাজ্যভ্রষ্ট রাজা আমি। আমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি সচেতন। এখানে রয়েছি ভ্রষ্ট রাজ্যের মমতায় নয়, সে আর ফিরবে না—সে কথাও জানি। তবু রয়েছি আমার কাছে যে গচ্ছিত আছে লুপ্তসম্পদ। কুলমন্ত্র, কুলপরিচয়, কুলকীর্তির প্রাচীন ইতিহাস। তোরা যদি নিস্ হাসি মুখে মরব। না নিস্ তাও দুঃখ করব না। সব তাঁকে সমর্পণ করে চলে যাব।'

গণদেবতা উপন্যাসে অসংখ্য মানুষের ভিড় আছে কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক চরিত্রের অভাব। এমন কি পঞ্চগ্রামে পৌছেও নায়কের পূর্ণতা নিয়ে

কোনো চরিত্র বিকশিত নয়। কেউ কেউ উপন্যাসটির ত্রুটি নির্দেশে নায়ক-হীনতাকে বড় করে দেখেছেন। নায়কবিহীন হওয়াতে উপন্যাসটি শিথিলবন্ধ, কেন্দ্রচ্যুত। অসংখ্য ঘটনা, চিত্র, বর্ণনা এবং তারই পটভূমিকায় স্থাপিত মানুষগুলি যেন বটগাছের ঝুরির মত, কিন্তু মূল গাছটি সেখানে নেই। উপন্যাসটির এরকম বিচার আপাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হতে পাবে। কিন্তু লেখকেব অভিপ্রায় অনুধাবন করলে এ বিচার যথার্থ মনে হবে না। উপন্যাস দুটিতে দেবনাথই নাযকেব উপাদান-উপকরণে সমৃদ্ধ। চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালার পণ্ডিত দেবনাথ নিজেব উন্নতিব সঙ্গে গ্রামেব উন্নতির কথা চিন্তা করেছে। কেউ গ্রামেব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ স্বপ্ন রচনা করেছে। চলমান গ্রামীণ জীবনে দেবুব সক্রিয় ভূমিকা দুর্লক্ষ্য নয়। শ্রীহরির কূটচালের কাছে সে মাথা নত কবেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে অনিবার্য সেখানে প্রতিবাদীর ভূমিকায সে দৃপ্ত। তালপাতা কাটার ঘটনা নিযে বিরোধে, ধর্মঘটে উৎসাহদানে, ক্ষুদ্র প্রলোভন জয করবার শক্তিতে, খোঁযাব থেকে গরু ছাডিযে আনাব জন্য আপ্রাণ চেষ্টাতে, বন্যা-মাব তে সেবাকার্যে দেবুকে স্বতন্ত্র্য মহিমায স্থাপিত কবেছে। দেবনাথের চবিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষাতেও লেখক অত্যন্ত মনোযোগী। বিপুল পবাজযের সামনেও তার শান্ত অথচ দৃঢ মনোভাব সমবেদনার উদ্রেক কবে। গ্রামবাসীরাও দেবু পণ্ডিতের কাছে তাদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। দেবুব নিষ্ঠা আন্তরিকতায় পল্লীবাসী অভিনন্দন জানিযেছে গান রচনা করে। এ যুগেব নূতন ঘেঁটুগান রচিত হযেছে যার নাযক দেবনাথ। দেবু পণ্ডিতেব জীবন জগন ডাক্তাব বা হবেন ঘোষালেব খাতে প্রবাহিত না হওয়ার মূলে তারাশঙ্কর নৈতিক প্রভাব দেখিয়েছেন ন্যাযরত্নের—আর স্বাদেশিকতার মন্ত্রে তাকে দীক্ষিত করেছে ডেটিনিউ যতীন। কিন্তু এত সত্ত্বেও দেবু উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, দেবু যে ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়েছে সে তাব নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র। যে-সব প্রবল ঘটনার অভিঘাত গ্রামবাসীদের উপর নেমে এসেছে সে-সবের সঙ্গে যুদ্ধ করে নূতন কোন পথ আবিষ্কার করতে সে পারেনি। চৌধুরী মশায়ের বিগ্রহ বিক্রয় ব্যাপারের নীরব সাক্ষী সে। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের কাছে সে উৎসাহ পেয়েছে কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেবার মত শক্তি সে সঞ্চয় কবতে পারেনি। অনিরুদ্ধের উদ্গীরণকে সে বিদ্রোহানলে পরিণত করতে পারত কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধা নিয়ে সে কেবল হা-হুতাশ করেছে কিংবা পরোপচীকির্ষু মন নিয়ে কামার-বউকে আশ্রয় দিয়ে সে তার কর্তব্য শেষ করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকেও রক্ষা করতে পারেনি।

আসল কথা, দেবু সমস্যার বাহ্যরূপ অনুধাবন করেছে কিন্তু সেই সমস্যার জটিলতা বুঝতে পারেনি। সে-জন্য সে গ্রাম ছেড়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে যায়। শ্রীহরির প্রতি তার ঘৃণা আছে কিন্তু তার বাগান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে দুঃখিত হয়। এমন কি শ্রীহরির ফসলের অংশীদার যে পল্লীবাসী হতে পারে এমন অসম্ভব চিন্তাও তার মনে স্থান পায়। এতে বুঝতে পারি তার সংশয় ঘোচেনি। গ্রাম্য পণ্ডিতের উচ্চাশা নিয়েই সে ক্ষান্ত হয়েছে। ন্যায়রত্ন আর বিশ্বনাথ এই উপন্যাসের দুই কোটি। দেবু এই দুই কোটিতে আন্দোলিত। ন্যায়রত্নের ধর্মরক্ষায় দার্ঢ্য তাকে চুম্বকের মত টানে, অন্যদিকে বিশ্বনাথের বিপ্লবচিন্তা তাকে মুগ্ধ করে। দেবু এটা বুঝতে পারে না যে ন্যায়রত্নের কাল অতিক্রান্ত আবার বিশ্বনাথের পরীক্ষায় নবীনত্ব সম্বন্ধে তার জ্ঞান নিতান্তই প্রাথমিক। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেবুকে জেলে যেতে হচ্ছে বীরের সম্মানে কিন্তু সেইটি উপন্যাসে আরোপিত। যেমন দেখি শিবনাথ চরিত্র পরিকল্পনায়। আসলে দেবনাথ-চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্করকে বারবার গোরা'র-চরিত্র পরিকল্পনা প্রভাবিত করেছে। কিন্তু গোরার মত সার্বভৌম ব্যঞ্জনা এই চরিত্রটিতে নেই। গোরার চরিত্রে অসামান্যতা এসেছে তার আত্মবিশ্বাসে, অনমনীয় দৃঢ়তায় এবং কর্মোত্তেজনায়। দেবুর চরিত্রে সেই উত্তেজনার অভাব। এই উপন্যাসের পঞ্চগ্রাম অংশে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে তারাশঙ্কর কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এসকল তথ্য বহিরঙ্গ রূপটিকেই উদ্ভাসিত করেছে অন্তরঙ্গ পরিচয় অনুদ্ঘাটিত।

(একদিক থেকে এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র ছিরুপাল। পাল থেকে ঘোষ পদবীতে ওঠার যে আগ্রহ তারাশঙ্কর নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে দেখি যে, জমিদারসুলভ কতগুলি গুণ অর্জনে সে ব্যাকুল। অপরদিকে সে তার পশ্চাৎপটকে মুছে ফেলার যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে তাতে উপন্যাসোচিত বাস্তবগুণে চরিত্রটি সমৃদ্ধ হয়েছে। পাতু বায়েনের পিঠে দড়ি দিয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার করতে সে দুর্দান্ত ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী জমিদার। গ্রামে আগুন লাগিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দ পায় সে। দুর্গার প্রতি লোলুপতা তার কমেনি। আবার পদ্ম'র প্রতি সে নূতন করে আকর্ষণ অনুভব করে। পদ্মকে আয়ত্তে আনতে না পেরে সে জ্বালা অনুভব করেছে। পদ্মর শাণিত কাটারি তাকে পিছিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে-ই জয়ী হয়েছে। কর আদায়ে সে অকরুণ। কিন্তু ছিরুর মধ্যেও নূতন শোষকের চরিত্র পরিস্ফুট নয়। কিংবা বলা যায়, তার উত্থানপ্রয়াস তেলহীন

সলতের দপ্ করে জ্বলে ওঠার মত ক্ষণদীপ্ত। কঙ্কণার মুখুজ্জেরা অনুপস্থিত জমিদার আর ছিরুপাল নবোদ্ভূত মহাজন-জমিদার।

তারাশঙ্কর নায়কের সন্ধানে মনোযোগী হবার প্রযোজন বোধ করেন নি। ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর প্রত্যক্ষচিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসে অথবা পল্লীসাহিত্যে অনাবিষ্কৃত ছিল। পল্লীপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে কতদিক থেকে অভিভূত করেছিল সে-কথা সকলের জানা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীর দুর্দশাভাবকে কখনও লঘু করে দেখেননি। তারাশঙ্করকেও গ্রামের দুই রূপ আকর্ষণ করেছে, 'পল্লীর প্রতিটি ঘর জীর্ণ, শ্রীহীন, মানুষগুলি দুর্বল। চারিপাশে কেবল জঙ্গল, খানায় খন্দে পল্লীপথ দুর্গম।...আশ্চর্য! ইহার মধ্যেই মানুষ বাঁচিয়া আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন—এ বাঁচা প্রেতের বাঁচা। অথবা ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর দিন গণনা করিয়া বাঁচা। তিল তিল করিয়া ইহারা চলিয়াছে মৃত্যুর দিকে—একান্ত নিশ্চেষ্টতার ভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে'। পল্লীবাংলার এই রূপ শরৎচন্দ্রও দেখেছিলেন। তারাশঙ্কর তারই ব্যাপক রূপ পরিস্ফুট করেছেন এই উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আকর্ষণ রমা-রমেশ, বৃন্দাবন-কুসুম, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত, পল্লীবাংলা পটভূমি। তারাশঙ্করের এই পটভূমিই লক্ষ্য। এজন্যই তিনি পল্লীর পথঘাট, যানবাহন, গৃহপালিত পশু, খানাখন্দ, মারী-বন্যা, চণ্ডীমণ্ডপ, পালা-পার্বণ, ধানকলাই, খরা-অতিবৃষ্টি বর্ণনায় অতি মনোযোগী, অক্লান্ত। লেখক গ্রাম্যবার্তার কথক। অন্যদিকে তাঁকে পল্লীবাংলার অন্যরূপ মুগ্ধ করেছে। 'গন্ধে, গানে, বর্ণচ্ছটায় পল্লীর এ এক অনিন্দ্য রূপ। কবির কাব্যের মতই এই গন্ধে, গানে, বর্ণচ্ছটায় যেন একটা মাদকতা আছে, কেমন একটা হাতছানির ইশারা আছে'।

এই উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারেও তারাশঙ্কর পল্লীর এই দুই রূপের দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। বিষয়ভাবনায় যেমন ভাষা ব্যবহারেও বাংলা উপন্যাসে বস্তু-ধর্মিতার প্রকাশ বহুকাল আগেই ঘটেছিল। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাস্তবতা এসেছে চরিত্রকে কেন্দ্র করে এবং সে চরিত্রের টানে উদ্ভূত ঘটনার আশ্রয়ে। কল্লোলের লেখকবৃন্দ মূলত রোম্যান্টিক। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে বস্তুজগতের সন্ধান করেছিলেন তা অংশত বইয়ের জগতের। তারাশঙ্করের উপন্যাসেও রোমান্টিক প্রবণতা উপেক্ষিত নয়। কিন্তু সে রোমান্টিসিজম উৎকল্পনা-ঘেঁষা নয়। পল্লীর যে চালচিত্র তিনি উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন তাতে আতিশয্য নেই, কল্পনার অতিবিস্তারও নেই। এই রিয়ালিজম বাংলা

উপন্যাসে তারাশঙ্করের জন্য অপেক্ষিত ছিল।। আত্মনির্ভর গ্রাম যখন ব্রিটিশ শাসনে (সম্ভবত তার কিছু আগেই) ভেঙে পড়ছিল তখন সেখান থেকে কবিতাও অংশত বিদায় নিয়েছিল। তারাশঙ্কর উপন্যাসে নিরাভরণ ভাষা ব্যবহার করে গ্রামবাংলার রিক্ত শ্রীহীন রূপটিই পরিস্ফুষ্ট করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রভাব তারাশঙ্করের এই পর্বের উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তিনি যেন জোর করেই কবিত্বকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। দেবনাথের বিন্দুর অশরীরী মূর্তিভ্রমের বর্ণনায়ও তারাশঙ্কর যথাসম্ভব রোম্যান্টিকতা পরিহার করেছেন। এতে উপন্যাসের ভাষায় পরিমিতিবোধ প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। অথচ তারাশঙ্করকেও বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা গ্রাম হাতছানি দিয়েছে। চৈত্র-লক্ষ্মীর তিলফুলের কর্ণাভরণসজ্জা, মহুয়া ফুলের মাদকতা, পৌষলক্ষ্মীর আবির্ভাবে গ্রামের উল্লাস-উতরোল, দধিমুখো গরু কেনার স্বপ্ন, ষষ্ঠীর বিচিত্র রূপ এই উপন্যাসে বিস্তৃত হয়েছে। প্রকৃতির সমারোহ তারাশঙ্করকে চকিত করে তোলে। বসন্তের আবির্ভাবের যে বর্ণনা তারাশঙ্কর গণদেবতায় দিয়েছেন তাতে যুগপৎ গ্রামবাংলার শ্রী ও শ্রীহীনতার প্রকাশ লক্ষণীয়, 'পলাশ গাছে ফুল ধরিয়াছে, লাল টকটকে ফুল। একটি বাড়ীর চালের মাথায় অজস্র সজিনার ডাঁটা ঝুলিয়া আছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে দীঘির পাড়ের রিক্তপত্র শিমুল গাছটিতেও লাল রঙের সমারোহ। তাহারই পাশে একটা উঁচু তালগাছের মাথায় বসিয়া আছে একটা শকুন'। ব্রতগীত কথকতার দর্পণে পল্লীপ্রকৃতির প্রকাশ। তারাশঙ্কর উপন্যাসে এই কথকতার ভঙ্গী গ্রহণ করলেন। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে তার আভাস, পরবর্তী উপন্যাসে নাগিনীকন্যার কাহিনী ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় তার পরিপূর্ণ রূপ। প্রবাদ-প্রবচন এবং আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করে চরিত্রের বাস্তবতা এবং পরিবেশের প্রত্যাশিত বাস্তব রূপ অঙ্কনে তারাশঙ্কর দক্ষ শিল্পী। গ্রামবাংলার উপকথা রচনায় তারাশঙ্কর যে চলিষ্ণু জীবনযাত্রার চিত্র এঁকেছেন সেখানে মানুষেরই প্রধান ভূমিকা। তিনি গণ-কে উপন্যাসে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাদেরই তারাশঙ্কর দেবতা বলেছেন। সেই দেবতাই তারাশঙ্করের আরাধ্য।

চতুর্থ সম্রাটের সূর্যাস্ত

শ্যামসুন্দর মাইতি

১

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু খুব শেষের দিকে রচিত উপন্যাসগুলির উপর ভিত্তি করে তারাশঙ্করের ওই কালেব মন ও শিল্পের সঙ্গে পরিচয়-সাধন।

মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে প্রবন্ধের নামকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। তাবাশঙ্করের মৃত্যুব অব্যবহিত পরে ১৩৭৮, ২আশ্বিন 'আনন্দবাজাব পত্রিকা'র রবিবাসরীয আলোচনীতে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে এক সমালোচক যে আলোচনা করেছিলেন, তাতে তিনি তাঁকে 'চতুর্থ সম্রাট' এই আখ্যায ভূষিত কবেছিলেন, বলেছিলেন '…এই দক্ষতায় বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর তাবাশঙ্কবই চতুর্থ শিল্পী, যিনি জীবনকে সিংহাসনে বসাতে পেরেছিলেন।' বাংলাসাহিত্যে তাবাশঙ্করের এই স্থান-নির্দেশ কোন প্রকার বিতর্কের সুযোগ রাখে নি।

চার সম্রাটের মধ্যে দীর্ঘতম আয়ুলাভের বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী যিনি হয়েছিলেন, তিনি পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ—বেঁচেছিলেন আশি বৎসর। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থানাধিকারের গৌবব তারাশঙ্কবেব—তিনি বেঁচেছিলেন তিয়াত্তর বৎসর। শরৎচন্দ্রের আয়ুষ্কাল ছিল তেষট্টি বৎসর। সবচেয়ে কম বেঁচেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাত্র ছাপান্ন বৎসর।

লেখকেব মন ও শিল্পের মূল্যায়নে তাঁর জীবনকালের বেশ একটা গুরুত্ব আছে। কারণ তিনি যত বেশী দিন বাঁচেন, যদি তাঁর সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকে তবে ততই তাঁর শিল্পকলার বৈচিত্র্যসাধনের সুযোগ তিনি পান।

'বৈচিত্র্যসাধন' কথাটির দ্বারা আমি কি বোঝাতে চেয়েছি, সেটা বলা দরকার। একটা সাধারণ প্রতীতি, বয়স যতই এগিযে চলে, শিল্পকলা ততই পরিণতি পায়। এটা একটা প্রতীতিমাত্র, অভিজ্ঞতা বলে, একথা সর্বথা সত্য নয়। পক্ষান্তরে দেখা যায়, সাধারণত মধ্য বয়সেই প্রতিভা পরিণত রূপ পেয়ে যায়। এরপর তিনি যতদিন বাঁচেন, তাঁর শিল্পকলার প্রসাধনে ও পরিমার্জনে তিনি দিন

কাটিয়ে দেন। এটা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, করেছিলেন তারাশঙ্করও। দীর্ঘতর আয়ু শিল্পীকে শিল্পের ক্ষেত্রে নানান পরীক্ষার সুযোগ দেয়। তারাশঙ্কর তাঁর তিয়াত্তর বছরের জীবনের শেষ ভাগটি এই পরীক্ষার কার্যে ব্যয়িত করেছিলেন।

১৮৯৮ থেকে ১৯৭১—বিংশ শতাব্দীর ত্রি-চতুর্থাংশব্যাপী জীবনধারা তারাশঙ্করের। এই সুদীর্ঘকালে এমন সব ঘটনা ঘটেছে, যা গুরুত্বের গৌরবে পূর্ববর্তী শতাব্দীকে দিয়েছে ম্লান করে। প্রথম ঘটনা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত; দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫; তৃতীয় ঘটনা, ভারতের মুক্তিযজ্ঞের পূর্ণাহুতি—ভারতের স্বাধীনতা অর্জন—১৯৪৭। প্রথম সম্রাটের রাজত্বকালে ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্বোধন হয়েছিল, তার গৌরবময় পরিসমাপ্তি ঘটে চতুর্থ সম্রাটের রাজত্বকালে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অসহযোগ আন্দোলন এই দুই-এ বিরচিত পশ্চাৎভূমির উপর তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনার সুর। এই দুই ঘটনা তাঁর ‘ধাত্রীদেবতা’র দুই কেন্দ্রশক্তি। তাঁর চোখে তখন আদর্শবাদের মায়াঞ্জন। মাতৃভূমির শৃঙ্খল-মোচনই তখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, যার জন্য কাবাবরণ পর্যন্ত তিনি করেছিলেন। কিন্তু এত গেল ভাঙার দিক। গড়ার ব্যাপারেও তিনি অনবহিতচিত্ত ছিলেন না, অন্তত তার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। দেশের রাজনৈতিক মুক্তি এবং অর্থ নৈতিক মুক্তি যে পরস্পরের পরিপূরক—একের অভাবে অপরটি যে ব্যর্থ হতে বাধ্য—এ সচেতনতা তারাশঙ্করের মধ্যে প্রথমাবধি ছিল। তবে এই অর্থ নৈতিক মুক্তিসাধন-রূপ গঙ্গা আনয়নের ব্যাপারটা তিনি মার্কস-প্রবর্তিত সহিংস শ্রেণীসংগ্রাম পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে চাননি, চেয়েছিলেন বিশুদ্ধ ভারতীয় পন্থায়—প্রেম-ভালবাসার দ্বারা হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে। গান্ধীজীর ট্রাসটিসিপ তত্ত্বে হয়ত তিনি বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু অর্থনৈতিক সমতা স্থাপনের জন্য ধনিককুলের সম্পূর্ণ বিনাশ চাই—এধারণাও পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। তা যদি হত, তিনি শিবনাথের মাধ্যমে ময়ূরাক্ষীর তীরে চরভূমির উপর কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করে লক্ষ্মীর কমলাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন না। অথচ ওই সময় যে তিনি মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা তাঁর প্রধোন আবৃত্তি থেকে জানা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯, সেপ্টেম্বর-এ। কিন্তু ১৯৪১, জুন নাগাদ জার্মেনী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের কাছে এ যুদ্ধ ছিল নিছক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং এ সম্পর্কে আমাদের শ্লোগান ছিল ‘Not a man, not a pie for this imperialistic war.’ কিন্তু জার্মান-

বাহিনীর রুশ ভূমিতে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধের প্রকৃতি রাতারাতি বদলে গেল আমাদের কাছে। যা ছিল নিছক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তা হয়ে দাঁড়াল খাঁটি 'জনযুদ্ধ'। ইংরেজ সরকার আপদ্ধর্ম হিসাবে এতদিনের বে-আইনী ঘোষিত কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার উপর থেকে তুলে নিল সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা। ফল হল, বাঁধা-ভাঙা বন্যার মত সাম্যবাদী চিন্তাধারায় সমগ্র দেশ গেল প্লাবিত হয়ে। এই উত্তাল জল-তরঙ্গের প্রথম শিকার হলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সাহিত্যিকগণসহ। এই সময়ে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার লক্ষণ হল ভাবতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার এবং তার বদলে সাম্যবাদী চিন্তাকে গ্রহণ ও সেই অনুযায়ী আচরণ। লেখকের অর্থনৈতিক সাফল্যও এই মনোভাবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। একজন লেখক হিসাবে তারাশঙ্করও জাগতিক সাফল্যের জন্য এই পরধর্মকে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। জনপ্রিয়তার প্রলোভন এড়ান যায়, যায় না আর্থিক সাফল্যের সুনিশ্চিত সুযোগকে। তাঁর এই সময়ের লেখাগুলি—যেমন 'মন্বন্তর' প্রভৃতি—তাঁর এই নবধর্মে দীক্ষিত হবার স্বাক্ষর বহন করে। তারাশঙ্করেব শিল্পী-জীবনে কোন ভ্রান্তি যদি কোন দিন এসে থাকে, তা এসেছিল এই কালে, এই পথে।

কিন্তু অচিরেই এই 'মোহ আবরণ' খুলে গিয়েছিল তাঁর। ১৯৪১, ডিসেম্বরে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্প্রসারিত হল পশ্চিম গোলার্ধ থেকে পূর্ব গোলার্ধে। চতুর্দিকে বিপর্যয়েব মধ্যেও ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীর ন্যূনতম দাবীও মেনে নিল না। অগত্যা ১৯৪২, আগষ্টে তিনি তাঁর যুগান্তকারী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করলেন। ওদিকে বিধ্বস্ত ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় অংশ থেকে জন্ম নিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ঘরে-বাইরের এই মুক্তি-সংগ্রাম এশিয়া মহাদেশে যে-সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত যেত না, তার ভিত্তিকে দিলে নড়িয়ে। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই ঘরে-বাইরের মুক্তি-সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিল বটে, কিন্তু সেটা যে আদৌ একটা সাময়িক ব্যাপার, পরবর্তীকালের ইতিহাস তা দিল সুপ্রমাণিত করে। কেননা আমরা দেখতে পাই, ১৯৪৭, ১৫ আগষ্টের মধ্যরাত্রে কবির ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণিত করে 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা ইংরেজ এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।' আজীবন মাতৃভূমির মুক্তি-সাধক তারাশঙ্করের সংবিৎ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এই ঘটনার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।

তারাশঙ্করের রচনাবলীকে, তাদের যথোচিত মূল্যায়নের জন্য উপরিউক্ত

তিনটি ঐতিহাসিক পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রথম পর্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্ব স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত—এই পর্বের স্থায়িত্বকাল মাত্র আট-নয় বৎসর, তৃতীয় পর্ব অবশিষ্ট জীবন-কাল।

প্রথম পর্ব স্বধর্মপালনের যুগ। এইকালে তারাশঙ্করের প্রতিভা স্বপ্নদৃষ্টিতে ভারতাত্মাকে অবলোকন করেছিল। বিচারণা নয়, অনুভবই ছিল এই দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টিতেই তাকুণ্য সত্যকে দর্শন করে এসেছে চিরকাল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হলেও 'ধাত্রীদেবতা', 'কবি' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি এই কালেই রচিত হযে গিয়েছিল, অন্তত জন্ম নিযেছিল কবির জন্মভূমিতে।

দ্বিতীয় পর্ব অন্ধকাবেব যুগ, স্বধর্মচ্যুতির যুগ। তারাশঙ্কবকে যতদূব জেনেছি —তাঁর সৃষ্টিব মাধ্যমে, তাঁব সঙ্গে কথা বলে, তাঁর স্বীকৃতি ও প্রত্যয থেকে— তাতে দেখেছি, তিনি ভারতীয, যাকে বলে 'কাযমনোবাক্যে' সেইভাবে ভারতীয়। তাঁর শোণিতে-শিবায ভারতীয় সাধনার ধাবা প্রবহমান ছিল। তিনি শুধু মহৎ শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন মহৎ মানুষও। এ বোধ আমাব এসেছিল শুধু তাঁর লেখা পড়ে নয, তাঁর সঙ্গে কথা বলে। এ সংসারে মহৎ শিল্পী অনেক আছেন। মহৎ মানুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয। কিন্তু একাধারে মহৎ শিল্পী ও মহৎ মানুষ সত্যই বিরল। তারাশঙ্কর ছিলেন এই বিরলদেব অন্যতম। আশ্চর্য, এই মানুষেরও ভ্রান্তি এসেছিল, এই মানুষও হয়েছিলেন শাশ্বত আদর্শ থেকে চ্যুত। এটা কিন্তু নূতন নয়। বহু মানুষেরই জীবনে এটা ঘটেছে। বস্তুত আমাদের জীবনে এমন ক্ষণ আসে, যখন আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি যে অর্থহীন, তা প্রমাণিত হয়ে যায়। 'Doctrine, theory, metaphysic, morals—how should these help a man at the last counter? Men forge themselves these weapons, and glory in them, only to find them an encumbrance at the hour of need.' তাবাশঙ্কবের ক্ষেত্রে ঠিক এইটাই ঘটেছিল। সে যাই হক্, এই স্বধর্ম-চ্যুতির ফল কি হযেছিল তাঁর জীবনে? পরধর্ম গ্রহণ করলে যা হয়, তাই-ই হযেছিল। হযেছিল 'ভয়াবহ', অতিশয় 'ভয়াবহ'। শিল্পী হিসাবে অপমৃত্যু ঘটেছিল তাঁর এই কালে। এই সময়ে রচিত লেখাগুলি তাঁব শিল্পী-জীবনের ব্যর্থতার পবিচয় বহন কবে। এই কালে রচিত 'মন্বন্তর' উপন্যাস সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

বলেছেন, 'মন্বন্তর গ্রন্থে ঔপন্যাসিক আদর্শচ্যুতির রেখাটি সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়।'

তৃতীয় পর্ব সংবিৎ ফিরে পাবাব যুগ। এই যুগে, আমবা দেখতে পাই তারাশঙ্কর স্বধর্মে এবং স্বক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হযেছেন। এদিক থেকে প্রথম পর্বের সঙ্গে এই পর্বেব মিল আছে। আবার অমিলও যে নেই, তা নয়। অমিলটা বয়স এবং বয়সজনিত নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। তখন ছিলেন তরুণ, এখন হয়েছেন প্রবীণ। তখন দেখতেন অনুভূতি দিয়ে, এখন দেখেন বিচারণার মধ্য দিয়ে। ফলে অস্থিবতাব স্থলে এসেছে স্থৈর্য, উন্নাসিকতার পরিবর্তে সহিষ্ণুতা, চাঞ্চল্যেব পবিবর্তে ধৈর্য। এই স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য যে শুধু বযোবৃদ্ধিজনিত, তা নয, কযেকটি বহির্জাগতিক কারণও ছিল এর পিছনে।

প্রথম, আইনতঃ তাঁকে চতুর্থ সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত না করা হলেও, তিনিই যে তা, এটা কার্যতঃ স্বীকৃত হযে গিয়েছিল এই কালেই। দ্বিতীয়, প্রথম পর্বের আর্থিক অধীনতা থেকে এখন তিনি পূর্ণ মুক্ত হযেছিলেন। বই-এর বিক্রয় বেড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছিল প্রাপ্ত বযালটির পরিমাণও। বই-এর বিক্রয় বাডাব কাবণ প্রাক্-স্বাধীনতা কালে ছিল যুদ্ধের কল্যাণে প্রচুর কর্মসংস্থান, এবং তজ্জনিত জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি। আর উত্তর-স্বাধীনতা কালে সাধারণ পাঠাগারেব সংখ্যাবৃদ্ধি ও বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পুস্তক উপহারের রেওযাজ সম্প্রসাবণ। এ ছাডা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নানা পুবস্কার-পাবিতোষিক সামাজিক স্বীকৃতির সঙ্গে লেখকদের আর্থিক দিকটাকেও কিছুটা সুনিশ্চিত কবেছিল। সর্বোপরি চলচ্চিত্রে রূপাযণেব সম্ভাবনা লেখকদের সম্মুখে খুলে দিযেছিল 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বাব।' লক্ষ্মীর এই ত্রিবিধ দানেই ধন্য হলেন তাবাশঙ্কর। সর্বশেষে 'জ্ঞানপীঠ' পুবস্কাব এসে চতুর্থ সম্রাটের কোষাগারকে দিল পূর্ণ কবে। রবীন্দ্রনাথ ত নযই, শরৎচন্দ্রও বোধ হয় এত পান নি। কেননা তাঁব কালে অর্জনের দ্বিতীয় সূত্রটি যথা সরকবী পুরস্কারপারিতোষিক, উন্মোচিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যাও বা পেযেছিলেন, তার সবটাই আহুত হয়েছিল বিশ্বভারতীব কর্মযজ্ঞে। জীবনকে নিরুদ্বেগ রাখার মত অবশিষ্ট ছিল না কিছুই। তিনি ত শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন কর্মীও।

মৃত্যুর পূর্বে, তাই আমরা দেখি, তারাশঙ্কর অর্থে ও খ্যাতিতে ভারাক্রান্ত। এখন তিনি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন, যখন মম্-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে

স্বচ্ছন্দে তিনিও বলতে পারেন 'I have been one of the lucky ones. I have often wondered at my good fortune.'

তারাশঙ্করের শেষ দিকের মন ও শিল্পের বিচারে এই আর্থিক সাফল্যের দিকটা সতত স্মরণে রাখতে হবে। নইলে বিচার ভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ ব্যবহাবের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, আব পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার ষষ্ঠেন্দ্রিয়-রূপী অর্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। 'I had found that money was like a sixth sense without which you could not make the most of other five.'—এই উক্তি তত্ত্ব নয়, তথ্য, অভিজ্ঞতাই এর উৎস। সেই ষষ্ঠেন্দ্রিয়-রূপী অর্থ—সামান্য পরিমাণে নয়, বিপুল পবিমাণেই হয়েছিল তাঁর করতলগত। সুতরাং চতুর্থ সম্রাটেব অস্তাকাশে ফুটে উঠল পরিতৃপ্তির স্বর্ণাভা।

কিন্তু সবই ব্যর্থ হযে যেত একটির বিহনে, যদি না তাঁর প্রতিভার শিখা অনির্বাণ থাকত। তারাশঙ্কবের সমগ্র রচনার পরিচয় সাধন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। নইলে প্রথম থেকে শেষাবধি তাঁর বচনার বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রতিপন্ন করে দিতাম তাঁর প্রতিভা আমৃত্যু পূর্ণ দেদীপ্যমান ছিল। 'কবি' ও 'ফরিয়াদ' তুলনা করুন, আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধ হবে। তিনি নিজেও তা জানতেন। ওই কথা স্মরণ করিয়ে এবং তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করে একখানি পত্র দিযেছিলাম ১৯৬৩, জুন নাগাদ 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত 'গল্প নয় গল্প' নামে একটি গল্প পড়ে। তার উত্তরে ওই সনের জুলাই-এ আমাকে যে পত্র তিনি দিযেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন 'তুমি লিখেছ "আপনার প্রতিভার দেদীপ্যমানতা দেখে বিস্মিত হলাম।" হাঁ-এক বিচিত্র আশীর্বাদে এই শেষ জীবনেও বহ্নি আমার প্রজ্বলিত আছে।'

সুতরাং আয়োজনের কোন অভাবই রইল না। অর্থ ছিল না, অর্থ এল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বরাবরই ছিল সেটা আরও বাড়ল। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের জীবনে যা ঘটে, তাঁর জীবনে ঘটল না সেটা, অর্থাৎ ফুরিয়ে গেলেন না তিনি। স্বাস্থ্য ভগ্ন, তবে একেবারে অকেজো হয়ে যান নি। সুতরাং শুধু জীবনকেই তিনি সিংহাসনে বসালেন না, নিজেও বসলেন সেখানে। সবে মিলে যে ফলশ্রুতিটি সৃষ্টি হল, সেটা এই যে, তিনি সবের মধ্যে থেকেও সবের থেকে দূরে সরে রইলেন। এক অসামান্য প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির দ্যুতি তাঁর আনন থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ডকে যদি তারাশঙ্করের এই সময়ের

মুখছবি আঁকতে দেওয়া হত, তাহলে তা তাঁরই আঁকা মম-এর ছবির মতই হত —সেই নিরাসক্ত, সমর্পিত, শান্ত মুখছবি। ধীরে ধীরে এই প্রশান্তি পর্যবসিত হল বৈরাগ্যে এবং নিস্পৃহতায়। যে অর্থের আগমন হেতু জীবনেব এই নিরুৎকণ্ঠা, সেই অর্থকে তিনি যেন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। যে খ্যাতির জন্য কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, সেই খ্যাতিব ভার তাঁর কাছে দুর্বহ ঠেকছিল এখন। লেখাই যদি লেখকের জীবন-কথা হয—যেটা কিনা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ—তাহলে দেখা যাবে, শেষেব দিকের রচনায় তাঁর এই মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং সেখানে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর রূপান্তরিত হয়েছেন নাট্যকার তারাশঙ্কবে।

জীবনকে কবি-শিল্পীবা দেখে থাকেন দুভাবে। এক দেখা, জীবনে বিলীন হযে জীবনকে দেখা। এই দেখায দর্শকের দূরে থাকা চলে না, তাঁকে নেমে আসতে হয জীবনেব ঘূর্ণাবর্তে, নিতে হয এর কোন না কোন একটি ভূমিকা। ফলে এই দেখায নিস্পৃহ জীবন-দর্শন সম্ভব হয় না। জীবনেব সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, মহত্ব-ক্ষুদ্রত্ব—সবেরই ডাকে সাড়া দিতে হয তাঁকে। স্থির দৃষ্টিতে জীবনের অখণ্ড, সামগ্রিক রূপ-দর্শন তাঁব পক্ষে অসম্ভব হয। সর্বত্রই তিনি আবিষ্কার করেন অনৈক্য ও অসামঞ্জস্যের অস্তিত্ব। এ দেখায সহিষ্ণুতা নেই, ক্ষমা নেই, নেই গ্রহণ। কিন্তু এমন একটা জিনিষ থাকে, যা একে বিভূষিত করে চরম সন্ধানে। সেটা হচ্ছে প্রেম। প্রেমেব সমস্ত লক্ষণে এ দেখা চিহ্নিত। সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বে তারাশঙ্কব এই দৃষ্টিতেই জীবনকে দেখেছিলেন। এ দৃষ্টি ঔপন্যাসিক দৃষ্টি। এই দেখার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'কবি' উপন্যাসটি। অপর দেখাটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে দর্শক জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে দাঁড়িয়েই জীবন দর্শন সম্পন্ন করেন। ফলে এর কোন উত্তাপ তাঁর দেহকে স্পর্শ করতে পারেনা। দূর থেকে দেখার দরুণ জীবনের ভগ্ন খণ্ড রূপও তাঁর চোখে পডেনা, পড়ে তার অখণ্ড, সামগ্রিক রূপটি—দূর থেকে দেখলে বনভূমিকে যেমন দেখায়। এ দেখা তখনই দেখা সম্ভব হয়, যখন মানুষ সব কিছু জেনে ফেলে। সুতরাং এ দেখায় কোন জিজ্ঞাসা থাকে না। জগৎ ও জীবনের সর্বত্র ঐক্য ও সামঞ্জস্য দর্শন এ দেখার বৈশিষ্ট্য। এ দৃষ্টির অধিকারী হলে দর্শক বীতরাগ, বীত শোক, বীত-সবকিছু হয়ে উঠেন। To know all is to pardon all.—এই বাণীই তখন হয়ে উঠে তাঁর জীবন-বাণী। পরমতম প্রজ্ঞার অধিকারী হলেই মানুষের এই স্থিতধী রূপটি ফুটে উঠে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, এই দৃষ্টিকে যেন ব্রাউনিং-এর 'Pipa's Song'-এর 'All is right

with the world'—এই উক্তির সঙ্গে এক করে দেখে না ফেলি। ব্রাউনিং-এর উক্তি জড জগতের নিয়ম সম্পর্কে, সুতরাং তা বড়ই অগভীব। কিন্তু বিচিত্র, যেখানে এর শক্তি, সেখানেই এর অশক্তি। নিরাসক্ত বলে এ দৃষ্টিতে প্রেমেব প্রলেপ নেই। এ দৃষ্টির অধিকারী যেমন কাউকে দূরে ঠেলে দেন না, তেমনি বুকে জড়িয়েও ধরেন না কাউকে। এ দৃষ্টি জ্ঞানীর দৃষ্টি, প্রেমীব নয়। এই দৃষ্টিকেই উদ্দেশ্য কবে মোহিতলাল বলেছিলেন'—যদি তা (অর্থাৎ এই দেখা) মানি, তবে যে প্রেম সাকার হয়ে—রূপ ধারণ করেই, শূন্যকে ক্রমাগত পূর্ণ করে তুলছে—সেই প্রেমকে অস্বীকার করতে হয়, নাস্তিক হতে হয়। আমার এই কান্নাই ভাল, সান্ত্বনা চাই নে।' জীবনেব শেষেব দিকে তাবাশঙ্কর এই দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর শেষ দিকের বচনাগুলি তাঁব এই নবার্জিত দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে। তারাশঙ্কর এই কালে কেবল শিল্পী নন, কবিও—তবে সাধারণ অর্থে নয়, ঋষি অর্থে, যে অর্থে উপনিষদকার কবি শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আমার এই উক্তির সমর্থন পাই তাঁব স্বকৃত আত্মপরিচয় থেকে, যা তিনি আমায় জানিয়েছিলেন পত্রযোগে। তিনি লিখেছিলেন '—একটা কথা এখানে অবাস্তর হবে না, যে ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ হিসেবে পত্র লিখছি। সাহিত্য-বচনা আমার সাধনা নয়। আমার আসল সাধনা জীবনসাধনা। সাহিত্যের পথ আমার সাধনার যোগের পথ। আমাব মতে এইটেই ভারতীয সাহিত্যিকদের ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। পূর্ণতার সাধনাই সাধনা। সেই সূত্রে আমি কোন মিথ্যা কথা বলি নে।' এই সব নয়, একটু বিরতি দিযে আবার বলছেন—'সাহিত্য আমার কাছে শুধু মনোবম রচনা নয়, মনোরঞ্জিণী অবসব-বিনোদিনী নটী নয়, সে আমার কাছে শাস্ত্রের স্থলাভিষিক্তি, সে হতাশাব বেদনাব শাসন থেকে ত্রাণ করে, সে আমার কাছে যোগিনী তপস্বিনী। স্রোতোধারার সঙ্গে তুলনা করলে সে আমার কছে শুধু প্রবহমানা জলধারা নয়, সে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, তাতে অবগাহনে শোক দুঃখ হতাশাব গ্লানি থেকে মুক্তি হয় পাঠকের। রবীন্দ্রনাথের কাছে তার পূজার গীতি নিবেদন থেকে এ দীক্ষা আমি নিয়েছিলাম। প্রথম দীক্ষা বঙ্কিমের উপন্যাসে। ৺মোহিতলাল আমার সাধনার উপগুরু।' এই হচ্ছেন তারাশঙ্কর। উচ্চতায়ও যেমন, নম্রতায়ও তেমনি নিঃসঙ্গ উদাহরণ।

শিল্পীর দৃষ্টির সঙ্গে দ্রষ্টার দৃষ্টি সম্মিলিত হওয়ায় তারাশঙ্করকে একটি অভিনব পরীক্ষায ব্রতী হতে হয়েছিল জীবনের শেষ দিকে। 'হতে হযেছিল', বললাম এই জন্য যে, এই দুই দৃষ্টির সম্মিলনে তাঁর কবি-চিত্তে এমন একটা তড়িৎ-শক্তির সঞ্চার হযেছিল, যাব তাড়নাতেই তিনি এই পরীক্ষাব কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, এর পিছনে তাঁর শিল্পীমনের প্রেরণা অন্ততপক্ষে অনুমোদন ছিল না। 'Poetry is the criticism of life.'—কবি-সমালোচক আর্নলডের এই উক্তিটি সাহিত্য-রাজ্যের একটি সর্ববাদীসম্মত এবং সুপরিচিত সত্য। মাটি বিনা যেমন মূর্তি হয় না, তেমনি সাহিত্য হয় না জীবন ছাড়া। কিন্তু এই জীবনকে সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে আনেন কি ভাবে? নিশ্চয়ই অনিবার্যভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নয়, যদিও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপস্থিতি থাকে না, এমন নয়। যেমন, যিনি প্রেমের মহত্তম চিত্র এঁকেছেন সাহিত্যে, সেই Shakespeare-এর জীবনে প্রেমেব তীব্র অনুভূতি হয়েছিল বলে জানা যায় না। রাজা যেমন 'কর্ণেন পশ্যতি', তেমনি একটি বিশেষ ক্ষমতাব বলে কবি-শিল্পীরা অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করেন এবং কবান। এই বিশেষ ক্ষমতাটি হচ্ছে তাঁদের কল্পনাশক্তি, যার সাহায্যে তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই পাবেন জীবনের ছবি আঁকতে। এ সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথেব একটি চমৎকার উক্তি আছে: 'কবি আপন দুর্দম্য ক্ষমতায় বিশ্বরহস্য মন্থন করিয়া মানবের হৃদয়ে আনন্দ বিতরণ করেন।' এই 'দুর্দম্য ক্ষমতা'টি, না বলে দিলেও চলে, আমাদেব ঐ কল্পনা-শক্তি। তারাশঙ্করও তাই করেছেন। তাঁব বিচিত্র চরিত্রগুলি সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করার পূর্বে জন্ম নিয়েছিল তাঁর মনোলোকে, বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায় নয। কিন্তু শেষের দিকে পূর্বোক্ত দৃষ্টি দুটির সম্মিলনে তাঁর চিত্তে এই বাসনা জেগেছিল, এখন থেকে তিনি তারই শিল্পরূপ দেবেন, যা ঘটেছে বাস্তব জগতে বা বাস্তব জীবনে।

কবে থেকে তিনি এই পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন, তা আমার জানা ছিল না। আমি জেনেছিলাম আমাকে লেখা তাঁর পত্র থেকে। এই পত্রে তিনি লিখছেন '—গত আশ্বিনের আগের আশ্বিন থেকে [এই আশ্বিন সম্ভবত ১৩৪৭-এর আশ্বিন] একটি পরীক্ষা করেছি। একটি গল্প 'কয়েক ফোঁটা রক্ত' বর্তমানে 'এ্যাকসিডেণ্ট' নামক গল্পগ্রন্থে রয়েছে—তা থেকেই এ পরীক্ষার শুরু। 'গল্প নয় গল্পের' প্রথম অংশ ওতেই স্থান পেয়েছ। অবশ্য নূতন ভাষায় লেখা। প্রথম ছত্র

থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যা ঘটেছে তাই লিখেছি—বাহিরের এবং মনেব দুই অবিকল সত্য।' এই পরীক্ষার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অবশ্য 'নবকল্লোলে' প্রকাশিত 'গল্প নয় গল্প' পড়ে। যা পড়ে ঐ সম্পর্কে আমি তাঁকে চিঠি না লিখে পারিনি এবং যে চিঠির উত্তর তিনি দিয়েছিলেন অসীম স্নেহভরে এবং অত্যন্ত আয়াস স্বীকাব করে, কেননা চিঠিখানি ছিল অতি দীর্ঘ। এই চিঠিটি তাঁর সাহিত্য ও অন্যবিধ চিন্তার মূল্যবান দলিলরূপে পরিগণিত হবে।

'গল্প নয় গল্পে' এমন একটি বস্তুর পরিবেষণা ছিল, যা আমার কাছে অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকেছিল। আমাব ধাবণা হযেছিল, এর উপস্থিতি গল্পটির অপূর্ব শিল্প-সৌন্দর্যকে ক্ষুন্ন করেছে। ঐ ধারণাব বশবর্তী হযে ঐ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে একখানি পত্র দিযেছিলাম। শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হইনি, আমার বক্তব্যের সমর্থনে **'A likely ımpossıbılıty is always preferable to an unconvincing possıbilıty '**—অ্যারিস্টটল-এর এই উক্তিটিও উদ্ধৃত করেছিলাম। হয়ত ভেবেছিলাম, এব দ্বারা তাঁকে চমকিত করা যাবে এবং এরিস্টটল-এর নাম শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হযে 'ভুল হয়ে গেছে' বলে অ্যাপলজি চেযে বসবেন তিনি। কিন্তু চমকিত হননি তিনি। উল্টে চমকিত কবেছিলেন আমাকে। যে অননুকরণীয় ভাষায় এবং অকাট্য যুক্তিতে তিনি আমার অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে আমার সমস্ত বাচালতা গিয়েছিল স্তব্ধ হয়ে, আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম যে, আমি শিল্পনীতি শেখাতে যাচ্ছি তাঁকে, যিনি বাংলা সাহিত্যের 'চতুর্থ সম্রাট'। আমি বিস্মৃত হযেছিলাম, অ্যারিস্টটল-এর উক্তির মূল্য যদি কোথাও থাকে, তা একাডেমিক জগতে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নয়। আডাই হাজার বছরেব আগেকার শিল্প-নীতি একালের শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিশেষ করে একালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্পকে। মানুষ পাল্টেছে, সমাজ পাল্টেছে, পাল্টেছে জীবনধারা। শুধু কি শিল্পনীতিটাই একই থেকে যাবে ?

যাই হোক, আমার অভিযোগের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, '—ব্যাকরণ অনুযায়ী তোমার কথাতো অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু ব্যাকরণের সঙ্গে স্রষ্টা শিল্পীর বিরোধটা নদী ও তটের মত। তট বন্ধন ব্যতিরেকে নদীর স্রোত সমুদ্র সঙ্গমে রসতীর্থে পৌছতে পারে না, সে ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে মেশে। আবার

তট-বন্ধন যদি পাথরের হয় তবে নদী স্বাচ্ছন্দ্য হারায়। তবে দেখতে ভাল লাগে। নদী বার বার তট ভেঙে তট গড়ে নেয়। একথাও ত সত্য, অভ্যস্ত ব্যাকরণ অনুযাযী নদীর নতুন ভাঙনের বাঁকা-চোরা তট স্বীকার করতে দ্বিধা হয়, আবার পবে সেইটাকে স্বীকাব কবতে হয, নতুন রচনার ব্যাকরণ পুবনো ব্যাকরণে নিজের স্থান বাব বাব করে নিযেছে, নিচ্ছে। এক্ষেত্রে দুটি ধাবা আছে। আমি সত্যের ধারাকে অনুসরণ করেছি।—'

এ যেন গান্ধীজীব 'experiment with truth'। প্রভেদ এই মাত্র, গান্ধীজীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও পথ উভযই ছিল এক ও অভিন্ন, যথা জীবন। আর তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে দুই-ই ভিন্ন, লক্ষ্য জীবন, পথ সাহিত্য।

তবে আমার এ পত্রালাপেব ফল একটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। যেমন এর পর সত্যের ধারাকে অনুসবণ কবে যখনি তিনি কিছু লিখতে গেছেন, তখনি 'unconvincing possibilty'র অভিযোগ যাতে পাঠক-মহলে উঠতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক হযেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'অভিনেত্রী' রচনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। পাঠক যদি এতে অসম্ভব বা অবাস্তবের গন্ধ পান এজন্য আগে ভাগে তাঁকে স্মবণ করিয়ে দিচ্ছেন 'গল্প উপন্যাসের চলিত ব্যাকরণ মতে বোধ কবি দোষ হযে গেল। ব্যাকরণ লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং পাঠককেও খানিকটা এলোমেলো গল্প বলার গোলমালে ফেলা হচ্ছে। গল্প উপন্যাসের কথকতা বেশ সাজিযে গুজিয়ে করা উচিত। আমি বলতে এসেছি এই বাপ্পা বোস বা ইন্দুর কাছে শোনা একটি গল্প (না গল্প নয, একটি ঘটনা এবং তার সঙ্গে একটি জীবনকথা) বলতে বসেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত নিজের কথা ও বাপ্পা বোসের কথা বলে চলেছি। পাঠকের কাছে একটু মার্জনা চেয়ে নিযে এ সম্পর্কে একটু কৈফিয়ৎ দিতে চাই। সেটা হল এই গল্পটি আমি শুনে লিখছি। অসম্ভব সম্ভবেব দায বাপ্পা বোসের। তবে আমি যখন লিখছি তখন নিন্দার ভাগী অবশ্যই আমাকে হতে হবে। আমি কিছুটা বিচার করে নিয়েই লিখছি। আমি এসব ঘটনার কথা জানি। এদের আমি চিনি।' কৈফয়ৎটি পড়ে মনে হচ্ছে আমার অভিযোগের সুর এখনো তাঁর কানে বাজছে, তাই আগে থাকতেই সতর্ক হয়েছেন।

২

তারাশঙ্কর দেহত্যাগ করেন ১৩৭৮-এ। তাঁর মৃত্যুর পর ঐ সনেরই পূজা সংখ্যা 'নবকল্লোলে' 'একটি কালো মেয়ের কাহিনী' এবং 'উলটো রথে' 'সুতপার তপস্যা' প্রকাশিত হয়েছিল। তার পূর্বে ১৩৫২-এর পূজা সংখ্যা 'নব কল্লোলে' 'অভিনেত্রী' এবং ১৩৬০-এর পূজা সংখ্যা 'নবকল্লোলে' 'ফরিয়াদ' প্রকাশিত হয়েছিল। তারাশঙ্করের শেষদিকের রচনাব পবিচয়ে এই লেখাগুলিকে আমরা আশ্রয় কবব। স্থানাভাব-বশত এর বেশী লেখা নেওযা সম্ভব হবে না। তাও ওই একই কারণে এদের বিশদ আলোচনা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

'ফরিয়াদ' 'অভিনেত্রী' ও 'সুতপার তপস্যা' —তিনটি রচনার মাধ্য প্রথম ও শেষেরটি আমাদের জাতীয় জীবনেব পশ্চাৎভূমির উপব প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তাব দুই অনুচর—পঞ্চাশের মন্বন্তব এবং তিপান্নব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম —এই তিন মহাঘটনা পলিস্তব বচনা করেছে 'ফরিয়াদের'। 'সুতপাব তপস্যা' রচিত ১৩৭৬ সালে পশ্চিম বঙ্গে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর। একে একালেব ছিযাত্তবের মন্বন্তবও বলা যেতে পাবে। 'ফরিযাদেব' ঘটনাগুলি যখন ঘটেছে, তখন আমবা স্বাধীন হই নি। আর 'সুতপাব তপস্যা'ব ঘটনাগুলি সেই কালেব, যাব কিছু পবেই আমবা আমাদেব স্বাধীনতাব রজতজয়ন্তী পালন কবেছি। 'অভিনেত্রী'ব পশ্চাৎভূমি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি জীবন। তবে তিনটির মধ্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র বযেছে—সেটা আমাদেব সাংস্কৃতিক জীবনেব যোগসূত্র।

গঠনের দিক থেকে তিনটিকেই একই গোষ্ঠীভুক্ত কবা যেতে পারে। তিনটিতেই দুটি কবে কাহিনী-ধারা আছে। একটি মূল কাহিনীর, অপরটি শাখা কাহিনীব। কিন্তু বিচিত্র এই, শাখাকাহিনীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মূলকাহিনী 'প্রজাপতিব মৃত্যু' বরণ করেছে। এগুলিতে উপন্যাসের পবিচিত লক্ষণগুলি একান্তই অনুপস্থিত। এগুলি যেন স্মৃতি-চারণ, তবে জনান্তিকে নয়। 'ফরিয়াদে' চাঁপা আত্মকথা শুনিয়েছে লেখকরূপী সুধাংশুবাবুকে। বাপ্পা বোসের শ্রোতা স্বয়ং লেখক। ছদ্মবেশধাবণেব প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি তিনি এখানে। 'সুতপার তপস্যা'য় সুব্রতর একখানি চিঠি তার জীবন-কাহিনী.বহন করে এনেছে।

তিনটি কাহিনীতেই তারাশঙ্কবের নব-গৃহীত সত্যেব ধারানুসরণের চেষ্টা আছে। 'অভিনেত্রী'তে এর স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। 'ফরিয়াদে'এরূপ স্পষ্ট স্বীকৃতি না থাকলেও এতে এত বেশী পরিমাণ 'সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেনস' আছে, যার

দ্বারা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করা যায়, এও ওই শ্রেণীর রচনা। যেমন এক, প্রচুর সন তারিখের উল্লেখ। দুই, তাৎকালিক জাতীয় জীবনের নানা স্বনামধন্য ব্যক্তির পরোক্ষ অপরোক্ষ নামোচ্চারণ এবং তিন, চাঁপাব স্বীকারোক্তি।

এই রচনার সন্নিবিষ্ট কাহিনীগুলির ঘটনা-কালের ব্যাপ্তি ১৯১০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত। অর্থাৎ এ কাহিনী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাহিনী। যে সকল বরেণ্য ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে এতে, তাঁরা আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রের। গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র যেমন রয়েছেন, তেমনি আছেন শিশির ভাদুড়ী, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কাজীসাহেবও (কাজী নজরুলাম)। এমন কি অতি সাম্প্রতিক কালের সুচিত্রা মিত্র এবং সুপ্রভা সবকারও আছেন। 'সুনীতি মিত্তিব' এবং 'সুচরিতা সরকাব' যে এঁরাই, তা বোধ হয়, না বলে দিলেও চলে।* সব শেষে চাঁপার স্বীকাবোক্তি'—বিয়াল্লিশ সালে সাইক্লোন হয়ে বাংলাদেশ ভাসিযে দিয়েছিল, উডিয়ে দিযেছিল—সাবা কলকাতা শহরে মেদিনীপুরের আর চব্বিশ পরগণার মানুষেবা এসে ফ্যান আব এঁটোকাঁটা ভিক্ষে কবে বেডাচ্ছিল—পথের ধাবে পডে মবছিল।—এদেশেব সে-বালকে আপনি জানেন না—সে-কালে আমাব মত অনেক মেযে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিক্রী হযে গেছে। হয় তো সকল কালেই হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের কালের মত এমন কবে মা বাপের সংসারের পেটের দাযে হাট বসিয়ে মেযে কখনও বিক্রী হয নি।—'

সুধাংশুবাবুব নিজের অভিজ্ঞতাও এর কম সমর্থন নয়। ১৯৪৩ সালের পূজা সাহিত্যে লেখাগুলো আজও বেঁচে আছে। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের গীতা বলে মেযেটির ঠিক এই কথা। প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার' গল্পের সেই কটি মেয়েব বিলাপের মত সকরুণ আক্ষেপের সঙ্গে চাঁপার এই কথাগুলির এতটুকু গরমিল নেই। সেই সমযের বাংলা দেশের এইসব হতভাগিনীদের মর্মান্তিক বিলাপ এবং সহস্র মুণ্ড রাবণের মত কালোবাজারী অর্থশক্তিতে বলীয়ান মানুষের সে অত্যাচার নিষ্ঠুবতম সত্য বলেই, এই মুহূর্তে সুধাংশুবাবুর মনে পড়েছে। 'চিত্রায়' জয়নাল আবেদিন সাহেবের কালো কালিতে আঁকা ছবিগুলি মনে পডছে। শুধু সাহিত্য-শিল্প কেন তাঁব নিজের ওকালতির ইতিহাসে তাঁর সেরেস্তার খাতার পাতায পাতায়

* ঐকালে অভিনীত কয়েকটি নাটকের উল্লেখ একে বাস্তব চরিত্র প্রদানে বিশেষ সহায়তা করেছে। এই নাটকগুলি হচ্ছে 'মোগল পাঠান', 'দেবলাদেবী', 'আলমগীর' ও 'সীতা'।

এমনি ছোট বড় কেসের কথা আছে।' এ সেই কাল, যে কালে, ১৯৬০ পর্যন্ত রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত মহা আবির্তাবের সব পুণ্য ফুৎকারে উড়ে গেছে। কোন্ মহাশূন্যে ধুলো হয়ে উড়ে হারিয়ে গেছে।'

'ফরিয়াদের' কাহিনী-বিন্যাস অতি জটিল। এর আরম্ভ হয়েছে শেষ পর্যায়ের ঘটনা দিয়ে। চাঁপা এসেছে, সুধাংশুবাবুর কাছে তাব ছেলে নীলুকে ফাঁসি থেকে বাঁচাবার জন্য। এটি মূল কাহিনী। কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী। যে মুহূর্তে চাঁপার আত্মকথা বলা আরম্ভ হল, সেই মুহূর্তেই সমাপ্তি ঘটল এই মূল কাহিনীর। চাঁপার আত্মকথা শাখা-কাহিনী কিন্তু রচনাটির যত কিছু আকর্ষণ ও আবেদন, তা এই শাখা-কাহিনীতেই। তৃতীয় কাহিনী দাঙ্গার রাত্রের কাহিনী, যেদিন চাঁপা সুধাংশুবাবুকে তার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুব হাত থেকে। চতুর্থ কাহিনী চাঁপার বাবা শিবেনের কাহিনী। সময়ের কালানুক্রমে এটি সর্ব-প্রথম-ঘটনা কাহিনী হতে পারে।

সমালোচকেরা মম্-এর শিল্প-কর্ম সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাবাশঙ্করের শিল্প-কর্ম সম্পর্কেও তাই বলা চলে। তাঁরা 'The Painted Veil' উপন্যাসখানির উল্লেখ করে বলেছেন 'The Painted Veil is probably the only novel that Somerset Maugham based on a story rather than a character.' 'ধাত্রীদেবতা' সম্পর্কে আমরাও এই কথা বলতে পারি। একমাত্র এই উপন্যাসেই আমরা একটি সুগঠিত আখ্যানের সাক্ষাৎ পাই। অন্যত্র চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে।

'ফরিয়াদের' চবিত্রগুলি এই : এক, এডভোকেট সুধাংশুমোহন চক্রবর্তী—লেখকই ছদ্মবেশে সুধাংশুবাবু, দুই, নিত্যরঞ্জনবাবু, তিন, শিবেন ভট্টাচার্য, চার, শিবেনের স্ত্রী চাঁপা, পাঁচ, রত্নমালা, ছয়, চাঁপার স্বামী প্রণব চক্রবর্তী, সাত চাঁপার ছেলে নীলু; আট বরেন মল্লিক। এই আটটি চরিত্রের প্রথমটি দর্শক বা শ্রোতা, দ্বিতীয়টি প্রতিবেদক, বাকিগুলি নাটকের পাত্র-পাত্রী।

প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন-ধর্মে জীবন্ত। তাদেব বিশদ আলোচনার স্থান এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলে রাখি, চাঁপা এবং তার ছেলে নীলুর চরিত্র-চিত্রণে লেখক এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন—যেমন, রূপ বা চেহারার বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্রের রূপায়ন। একটি মেয়ের রূপ-বর্ণনায় এত শক্তি নিয়োজিত করতে

তারাশঙ্করকে এর আগে খুব বেশী দেখেছি বলে, মনে হয় না। এই চরিত্র-অঙ্কনে যেন তাঁর তিনটি উদ্দেশ্য ছিল, এক, জীবনের নিদারুণ অসহায় রূপ প্রদর্শন, দুই, নারীর বিশিষ্ট দুঃখ-বেদনার ছবি আঁকা, তিন, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের প্রকাশ যে একমাত্র বিপর্যয়ের মধ্যেই সম্ভব হয় তা প্রমাণেব চেষ্টা। এই তিন উদ্দেশ্যই তিনি সুসাধিত করেছেন। এমন কি এখনও বলা যেতে পারে, এই চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি তাঁর পূর্ব চরিত্রগুলিকে—যেমন 'কবি'র 'বসন' চরিত্র—তিনি অনেক পশ্চাতে ফেলে এসেছেন। এই রচনার একটি বিশিষ্ট সম্পদ এর ষ্টাইল। এমন অভিভূত হয়ে রচনা, বোধ হয়, একমাত্র 'কবি' ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসে তিনি কবেন নি। একটু উদ্ধৃত কবছি। 'সামনে বারান্দার বাইরে পথের উপর বর্ষার রাত্রি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মধ্যরাত্রির দিকে এগিয়ে চলেছে, রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর পোস্টে বালব নেই, কেউ চুরি করেছে অথবা মিউনিসিপালিটির যারা আলো দেয়, তারাই ওটা দেয় নি। পবেব পোস্টটাব আলো থেকে একটু আলোব আভাস অন্ধকাব শূন্য মণ্ডলে জেগে বয়েছে, তাঁর ঘরের ভিতরের কিছুটা আলো বাবান্দা পার হয়ে গিযে তার সঙ্গে মিশেছে, সেই সংযোগস্থলের আভাসিত শূন্য মণ্ডলে দেখা যাচ্ছে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা নির্জন হয়ে গেছে।'

চাঁপা-চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। এখানে অর্থাৎ 'অভিনেত্রী'তে উদ্দেশ্য যেন একটি—শেষেরটি, দেখান, কেমন করে পরমতম সৌন্দর্য-শতদল চরমতম বিপর্যয়ের মধ্যে ফুটে উঠে। আমি বিনোদিনীর কথা বলছি যে নিজের নাম নিজেই দিয়েছিল—'বউবিনী'—আর যার নাম বাপ্পা বোস দিয়েছিল 'রতি।' লেখকও ঐ নাম দিয়েছিল। চাঁপা হয়েছিল দেশকালের শিকার আর বিনোদিনী হয়েছিল তার নিজের প্রবৃত্তির শিকার। বিবাহিত জীবনে সে যা পাওয়ার আশা করেছিল, তা সে পায় নি। তারপর সে বিধবা হল। তার বুকের পুঞ্জীভূত কামনা বাইরে আসতে চাইল কোন পুরুষকে আশ্রয় করে। সামনেই ছিল বাপ্পা বোস, সেই হয়ে দাঁড়াল তাব কাছে বাঞ্ছিত আশ্রয়-তরু। বাপ্পা বোসও চেয়েছিল তাকে বক্ষে আশ্রয় দিতে। কিন্তু আশ্চর্য, লতাও এল না, তরুও গেল না। এরপর চিরদিন চিরমানুষের জীবনে যাই হয়, তাই হল। আশ্রয়হীন লতা আশ্রয়ের আশায় যাকে সামনে পেল, তাকেই ধরল জড়িয়ে। কিন্তু কোথাও আশ্রয় পেল না। এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়ে স্থানান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ল একেবারে আশ্রয়হীন। তারপর জীবনে যে মিলন হয় নি, সে মিলন হল অভিনয়ে। কিন্তু বাইরে মেলা হল না। আবার সে চলে গেল আশ্রয়

হারা হয়ে। এবার যখন বাপ্পা তাকে দেখল, তখন সে 'ক্ষত-বিক্ষত প্রহার জর্জর দেহ নিয়ে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।' বিনোদিনীর চরিত্র-অঙ্কনে লেখক শ্রেষ্ঠ কবিত্বের সঞ্চার করেছেন। বিনোদিনী চাঁপা ছিল না—ছিল জ্বলন্ত বহ্নি। তাই কেউ তাকে জড়িয়ে থাকতে পারে নি। চাঁপা ছিল শান্ত সরোবর; তাই তাতে অবগহান করেছিল ববেন মল্লিকের মত মহাপাপী দীর্ঘ পনের বৎসর ধরে—মৃত্যু পর্যন্ত। বরেন মল্লিকের আবির্ভাব না ঘটলে সে পারত প্রণবকে নিয়ে একটি সুখ-শান্তির নীড় রচনা করতে। কিন্তু নিয়তি তাকে তা করতে দেয় নি।

'অভিনেত্রী'র ষ্টাইল আরও কবিত্বপূর্ণ। বাপ্পা বোসেব কাহিনী বলা শেষ হওযার সঙ্গে সঙ্গে রাত ভোর হল। পূর্বাকাশে ফুটে উঠল নবোদিত অরুণের রক্তিমাভা। তাকে স্বাগত জানিযে লেখক উচ্চারণ করলেন জীবনেব মহামন্ত্র। 'আকাশে আলো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল। উষার প্রকাশে—হিবণ্ময পাত্রের কথা মনে হল। বলতে পারব না কেন হল। পাখীদের কলকাকলী প্রকৃতিব হাসির মত বেজে চলেছিল।' লেখক বলতে পারেন নি, কেন হল। কিন্তু আমরা পারি বলতে। তিনি যে এইমাত্র জীবনের মহারূপ দর্শন শেষ করেছেন। আর তিনি যে ভারতীয সাধক সম্প্রদায়েব বংশধর।

কিন্তু এই উপন্যাসেব একটি বিরল গৌরব, এতে তারাশঙ্কর কবি হিসাবে আত্ম-প্রকাশ কবেছেন। বৈকুণ্ঠপুরেব বড়বাবুর ছদ্মনামে 'বিজযিনী' নাটকেব রচয়িতা তিনিই। 'কবি' উপন্যাসের ছোটছোট কবিতাগুলি যেমন কবি হিসাবে তারাশঙ্করের পরিচয় বহন করে, এখানে নাটকীয় সংলাপগুলিও তেমনি এই ইঙ্গিত বহন করে, ব্রতী হলে তিনি উত্তম 'ড্র্যামাটিক পোইট'ও সৃষ্টি করতে পারতেন। একটু উদ্ধৃত করছি :

মনে হল চন্দ্রচুড ললাটের চন্দ্রকলাখানি—
তোম্ৰার অধর-ওষ্ঠে করিতেছে খেলা।
পরক্ষণে মনে হল—নহে-নহে-নহে।
মদন-দহন করা রুদ্রের ললাট বহ্নি—
চকিত আভাসে যেন খেলিযা মিলায়ে গেল
মৃত্যুনীল শিখার নর্তনে।

—এই রচনাটি যেন তারাশঙ্করের শিল্পী-জীবনের শেষ 'Swan song' 'টেমপেস্ট'এ শেক্সপীয়র যা করেছেন, বঙ্কিম যা করেছেন 'রাজসিংহে', তারাশঙ্কর 'অভিনেত্রী'তে তাই করেছেন। তিনজনেই এই তিনটি রচনায় আশ্রয় করেছেন প্রেমকে, এবং প্রেমের কণ্ঠলগ্ন রোমান্সকে। তবে শেক্সপীয়রে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার অবসানে প্রকৃতির শান্তরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বঙ্কিম-তারাশঙ্করে সে দুর্যোগ-রজনীর আর অবসান হল না। এঁরা জ্বাললেন প্রেম-দীপ, মৃত্যুর আঁধার-যবনিকার অন্তরালে।

'সুতপার তপস্যা' এবং 'একটি কালো মেয়ের কথা' তারাশঙ্করের সর্বশেষ উল্লেখ্য রচনা বলে বিবেচিত হতে পারে। উপন্যাস দুটি রচিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এবং প্রকাশিত হয়েছিল মৃত্যুর অল্প পরে। উভয় রচনাই উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ বাস্তব ঘটনাকে বাস্তবানুযায়ী শিল্পরূপ-দানের একটা প্রয়াস। পার্থক্য শুধু এই, ব্যক্তি-জীবন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এখন তিনি তা নিবদ্ধ করেছেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে।

আমরা বলেছি, তারাশঙ্কর আজীবন সত্যানুসন্ধানী। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর সাহিত্য-সাধনা হলো জীবন-সাধনা এবং ঐ জীবন-সাধনার লক্ষ্য পরম সত্যকে লাভ। কোন সত্য-লাভেই তিনি তৃপ্ত হতেন না। সত্য কথা বলতে কি, আজীবন সন্দেহ-দোলায় তিনি দুলেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সাম্যবাদী চিন্তাধারায় যখন দেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি তার অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। 'মন্বন্তরে' তার সাক্ষ্য আছে। পরে আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ মানসিকতা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটুট ছিল, কোন দিন ত্যাগ করে যায় নি তাঁকে। তাই ১৯৭১-এ খুনোখুনির রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ যখন রক্তাক্ত হতে লাগল, তখন আর পাঁচ জনের মত তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গেই দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন নি। ভেবে দেখেছিলেন, এর ভিতর কোন মহত্তর জীবন-সত্য আছে কিনা। 'সুতপার তপস্যা'য় সুব্রতর যে পরিবর্তন, তা ঐ সত্য-সন্ধানেরই মানসিকতা-সঞ্জাত।

সুব্রত কি ছিল? সে ছিল এমন এক রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, যে দল দ্বান্দ্বিক জড়বাদে বিশ্বাসী ছিল না। ভারতীয় ঐতিহ্যে এবং আস্তিক্য-বুদ্ধিতে সে দল বিশ্বাসবান ছিল। সে বলছে 'ভুলে গিছলাম, তোমার দাদারা আলাদা পারটির লোক। আমি অন্য পারটির ছেলে। তোমার দাদারা বউদিদিরা যে পারটির মেম্বার, সে পারটির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য মারাত্মক।' এ পারটি যে

কংগ্রেস পারটি নয়, তা সুনিশ্চিত। কেননা সে বলছে 'ও দিকে ইউনাইটেড ফ্রনট তৈরী হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয়বাবু, সহকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু। এ ছাড়া সব অকংগ্রেসী দল থেকে একজন না একজন। আমার পারটি মন্ত্রীত্ব পায় নি। ডেপুটি মিনিসটারিত্ব পেয়েছিল। সভ্যও মাত্র দুজন।' সম্ভবতঃ এ পারটি প্রজা সোস্যালিসট পারটি।

সে যাই হোক, এ পারটির মেম্বার হয়ে সে জাতীযতাবাদে বিশ্বাসী ছিল, বিশ্বাসী ছিল ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের আদর্শে। এ সম্পর্কে তার একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি, সে বলছে 'ন্যাশানালিটিতে আমি ইণ্ডিযান, জাতিতে আমি ভারতীয়, এটা ভুলব কি করে? হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান—এ জাত আমিও ঠিক মানি না, এ জাতের থাক উঠিয়ে দেবার আন্দোলন করলে আমাকে ভলেণ্টিয়ার পাবেন—কিন্তু ভারতীয় জাতিত্বকে ওঠাতে গেলে যে স্বাধীনতাকে আবারও জলে ডোবাতে হয়। ন্যাশান্যাল থেকে ইনটারন্যাশানাল হওযা আমার ধাতে ঠিক সয় না।' একথা সুব্রতর? না, সুব্রতর জবানিতে একদা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক তারাশঙ্করের? আর তার আস্তিক্য বুদ্ধির প্রমাণ তার মা প্রভাময়ী দেবীর সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা।

কিন্তু সেই সুব্রত গেল পালটিয়ে। একদা যে বিশ্বাস করত অহিংস মানব-ধর্মে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'আমি আর অহিংসায বিশ্বাস করি না, সুতপা। হিংসাই সত্য। প্রকৃতি ওইটেকেই দিয়েছে—দেহের প্রদীপে শক্তির তেলে চুবিয়ে শলতে করে ব্যবহার করতে। ওতেই শিখা জলে। সেই শিখাকে ঘরে লাগাও ঘর জলবে—গ্রাম জলবে—বন জলবে—দেশ জলবে। অহিংসা আজ আমার কাছে ভ্রান্তি, নিছক ভ্রান্তি।' রাজ্যব্যাপী হানাহানির প্রতাপ এমন ভাবে সেদিন চলেছিল যে, বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকেও বলতে শুনেছি, একটা সত্যের জোর না থাকলে এটা সম্ভব হত না। তারাশঙ্করও এই হিংসার দাপাদাপির মাহাত্ম্যে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু হিংসাকে তিনি শেষ কথা বলে মেনে নিতে পারেন নি। তা যদি পারতেন, তাহলে নবজন্ম ঘটাতেন না তিনি উগ্রপারটির মেম্বার সুতপার স্বামীর। সুব্রতর 'মৃত্যু'র পূর্বে সুতপা কি ছিল? 'শ্যামপু করা চুল—অত্যাধুনিকা মেয়ে, সুতপা। সে সুতপা প্রদীপ্তা, আলোর সঙ্গে তুলনা করলে—বলতে হবে হ্যাজাক লণ্ঠনের মত।' আর আজ? সুব্রতর 'মৃত্যুর' পর? 'এ সুতপা আশ্চর্য একটি বিষণ্ন বৈরাগ্য সর্বাঙ্গে মেখে শান্ত হয়ে বসে রয়েছে।'

এ তো গেল দেহের পরিবর্তন। মনের দিক থেকে কি তার কোন পরিবর্তন হয় নি? সে দিক থেকে কি.সে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে? না, মোটেই না। চূড়ান্ত পরিবর্তন ত হয়েছে সেখানেই—যাকে বলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তাই।

সুব্রতব 'মৃত্যুর' পূর্বে সে ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসী ছিল না। বিশ্বাসী ছিল না বললে খুব কম কবেই বলা হবে। ওইসব জিনিসে তার অবিশ্বাস ত ছিলই, তদুপরি ছিল প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা। তাই শ্বাশুড়ি যখন তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কুলদেবতা গোপালের মূর্তিটি তাকে দিযে বলেছিলেন 'আমার দিদি শ্বাশুড়ী গোপালকে কুলুঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা করে সেবা করে সন্তান কোলে পেয়েছিলেন। তিনিই এই নিযম কবে গেছেন যে, বউ মেযে যে-ই পোয়াতি হবে, সে গোপাল-সেবা কববে সন্তানের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত।' তখন সে মূর্তিটিকে নিলেও বাপের বাড়ী আসবার সময় সঙ্গে কবে আনে নি। বাপের বাডীতে এসে শ্বাশুড়ীকে সে লিখেছিল 'গোপাল মূর্তিটি আমি ফেলে এসেছি। আপনি নিযে গিয়ে যেমন আপনাব কাছে ছিল, তেমনি করে রাখবেন।' মূর্তিটিকে বাপের বাড়ীতে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে সে শ্বাশুড়ীকে লেখেনি।

আরও আছে। ঠাকুব-দেবতার ভোগ বা প্রসাদকে গ্রহণ করতেও তার তীব্র অনিচ্ছা ছিল। এই অনিচ্ছার মূলে তার পারটির ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ যে কাজ করেছিল, তা না বললেও চলে। সুব্রত লিখছে 'মা সংসারের সব থেকে ভাল খাদ্যটুকু বাডির ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তোমাকে খেতে দিতেন, আমাকে দিতেন না। তুমি এই প্রসাদটুকু খেতে চাইতে না। ওই তুলসীর পাতা—ওই হাতে নাডা-ছোঁযা খাদ্য—তা ছাডা আমি যতটা বুঝেছি, এই প্রসাদ নামক কাণ্ডর প্রতি তোমার একটা বিতৃষ্ণা ছিল। চরণোদক আমাদের বাড়ীতে আমরা ছেলে বেলা থেকে খাই। তুমি প্রথম দিনই বলেছিলে—আমাব মাথায দিন। আমার এক মামাতো দাদা তীর্থে গিয়ে চরণোদক খেযে ব্যাসিলারী ডিসেনট্রিতে পড়েন —তাতেই মারাও যান। ও খেতে আমার কেমন ভয় করে।' সেই সুতপা আজ কি করছে? 'সুতপা উঠল সেবা-সমিতির অফিস থেকে। গোপালের আরতি হবে। গোপালের ভোগ হবে। তারপর তাঁর শয়ান হবে।'

সুব্রত ও সুতপার এই পরিবর্তন আসলে তারাশঙ্করের আর একবার আত্ম এক মহৎ জীবন-জিজ্ঞাসা। কোনটা সত্য? হিংসা না অহিংসা? কারও কণ্ঠে ত কম জোর নেই। সুব্রত যখন সোচ্চারে বলছে 'সেকাল হলে আমি কালাপাহাড়

হয়ে সর্ব প্রথম আমার বাড়ীর ওই শালগ্রাম শিলা আর গোপাল মূর্তি দুটোকে জলে ফেলে দিতাম। আমি নতুন করে পলিটিক্যাল পারটি তৈরী করব। নূতন পৃথিবী। নগ্ন সত্য হবে ভিত্তি। একটা ব্লাডবাথের মধ্য দিয়ে হবে নতুন দিনের সানরাইজ।' তখন সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে স্বতপা 'পালাচ্ছে। এখান থেকে স্টেশন। সেখান থেকে অনেক দূরে—অনেক দূরে—অনেক দূরে কোথাও। যেখানে নূতন কালের প্রভাত হবে।'

দুজনেই স্বপ্ন দেখছে নবীন সূর্যোদয়ের, দুজনেরই কণ্ঠে প্রত্যয়ের বাণী। কিন্তু কারটা সত্য? একই বিষয়ে কি দুটো সত্য থাকতে পারে? হিংসা-অহিংসা, প্রেম-ঘৃণা, আস্তিক্য-নাস্তিক্য—কার পিছনে সত্যের শক্তি? তারাশঙ্কর এর কোন উত্তর দিয়ে যান নি। শুধু প্রশ্নটাকে এক মহা-জিজ্ঞাসার চিহ্নে রূপান্তরিত করে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছেন জীবন-রঙ্গ ভূমি থেকে। তিনি বলছেন 'বিচিত্র মানুষের মন। এই মানুষের মন অহরহ গড়া-পেটের মধ্য দিয়ে চলেছে কোন এক অজানা দিগন্তেব মুখে। সেইটে তার ধর্মেব স্বর্গ, শিক্ষাব স্বর্গ, এর আর শেষ নেই। মানুষও বোন কালে সেই স্বর্গে পৌছায় না। তাই তার খোঁজারও শেষ নেই, আস্ফালনেরও শেষ নেই। চলতে চলতে অনুভব করে, এ পথেব শেষে যে স্বর্গই থাক, তাকে যেন সে ঠিক চায় নি। তবুও মানুষের মন এই পথেই সুখ খোঁজে, সান্ত্বনা খোঁজে।'

এ যেন গান্ধীজীর বিখ্যাত জীবন চর্চা—experiment with truth। কোন নির্দিষ্ট সত্যে তিনিও পৌছাননি। কোনদিন একথা বলেন নি, আমার সিদ্ধান্তে ভুল নেই—আমার লব্ধ সত্য সর্ব সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বে, সেখান থেকে সরে আসবার কোন উপলক্ষ্য কোনদিনই ঘটবে না। জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত consistent থাকার মধ্যে কৃতিত্ব হয়ত আছে, কিন্তু স্বাভাবিকতা নেই। পরিপ্রেক্ষিত বদলায়, অভিজ্ঞতা বাড়ে, সত্যেরও স্থান-চ্যুতি ঘটে। এ সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন—The opinions I have formed and the conclusions I have arrived are not final. I may change them tomorrow, I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could do. In doing so I have sometimes erred and learnt by my errors. Life and its problems have thus become to me so

many experiments in the practice of truth and non-violence.' তারাশঙ্করও সারাজীবন একই পথে চলেছিলেন—সে পথের লক্ষ্য সত্যলাভ। তাই বারে বারে তিনি মত পালটেছেন। কোন মতকে শেষ কথা বলে জড়িয়ে আঁকড়ে থাকেন নি। কেননা একমাত্র experiment-এর মধ্য দিয়েই সত্যকে পাওয়া যায, যদি সত্যই তা প্রাপ্তব্য হয়।

শুধু 'সুতপার তপস্যা' নয়, তাঁব শেষদিকের বহু রচনায এই সংশয় প্রতিফলিত। তিনি যেন কোন কিছুকে শেষ সত্য বলে গ্রহণ করতে পারছেন না। Maugham তাঁর 'The Summing up' প্রবন্ধে যা বলেছেন, তাবাশঙ্করের এই লেখাগুলি সম্পর্কে ঠিক তাই বলা চলে। Maugham বলেছেন—'Everything I say is merely an opinion of my own. The reader can take it or leave it. If he has the patience to read what follows he will see that there is only one thing about which I am certain, and this is that there is very little about which one can be certain.'

তারাশঙ্করেব সঙ্গে আলোচনায তাঁর এই সত্য-সন্ধানী মনের পরিচয সুস্পষ্টভাবে পেযেছি। যখনই চিরন্তন ভাবতীয় আদর্শের প্রসঙ্গ উঠেছে, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার মত সামান্য ব্যক্তির বক্তব্যও শুনেছেন, বেশ অনুভব করেছি, শুনতে শুনতে তিনি যেন আশ্বস্ত হচ্ছেন, সম্ভবত এই ভেবে যে তাঁর জীবনাদর্শের আর একজন সমর্থক মিলল। কিন্তু হিংস্র রাজনীতিকে ধিক্কার দিয়ে যখন কিছু বলেছি, তিনি মনোযোগ সহকারে তা শুনেছেন বটে, কিন্তু বুঝতে আমার বিলম্ব হয় নি যে, আমার কথা তাঁব চিত্তে খুব একটা রেখাপাত কবতে সমর্থ হচ্ছে না। হিংসার সপক্ষেও কিছু বলার আছে, তাঁর নীরবতার মধ্যে তাই যেন ফুটে উঠেছে।

রাজনীতি ও রাজনীতিকেব এমন স্পষ্টোল্লেখ কেউ কোন দিন করেছেন বলে মনে হয় না। ১৯৬০ এবং তার আগেকার রাজনৈতিক পশ্চাৎভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। কি এই রাজনৈতিক পশ্চাৎভূমি? এর দুটো রূপ আছে। একটা জাতীয় অপরটা আন্তর্জাতিক। জাতীয় পশ্চাৎভূমিরও দুটো রূপ আছে, একটা কেন্দ্রীয়, অপরটা রাজ্যীয়।

প্রথমে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পশ্চাৎভূমির প্রসঙ্গে আসা যাক।

এক, 'দুর্ভাগ্য, বাইরে ঘনিয়ে উঠল প্রচণ্ড দুর্যোগ। দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলছি নে। প্রাকৃতিক নয়—রাজনৈতিক। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ

বাঁধল। একটা পারলামেণ্টে আইন পাশ হয়ে গেল বিশেষ ক্ষমতা বলে। এদেশের অধিবাসী যারা তাদের পক্ষে ভারতের বর্তমান সীমান্ত-রেখায় সংশয় প্রকাশ করা দেশদ্রোহিতার অপরাধ বলে গণ্য হবে। সংশয় প্রকাশ করার অর্থটার মধ্যে কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না। ছিল চীন অথবা ভারতবর্ষকে সমর্থনের প্রশ্ন। আইনের বলে কাগজে কাগজে এই ধরণের ভারতকে অসমর্থন করার মত আলোচনা বন্ধ হল। চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়ে মন্তব্য প্রকাশও বন্ধ হল। কিন্তু মুখের আলোচনা বন্ধ হল না।' এই উল্লেখের মধ্যে তারাশঙ্কর ধিক্কার জানিয়েছেন তাদের, যারা চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষে ভারতকে অসমর্থন জানাচ্ছিল। আমরা সেকেন্দাব বর্ণিত 'বিচিত্র দেশের' অধিবাসী কিনা, তাই আইন করে স্বদেশের বিরুদ্ধে কথা বলা আমাদের বন্ধ করতে হয। এ ঘটনায তারাশঙ্কর গভীর মর্মাহত হয়েছিলেন।

দুই, পণ্ডিতজী মারা গেলেন। লোকে বলে পারলামেণ্টেব স্পেশাল সেসনে চীন-ভারত-সংঘর্ষ সংকট সম্বন্ধে তাঁর যে একটি ষ্টেটমেণ্ট দেবার কথা ছিল—সেই ষ্টেটমেণ্ট নিযে চিন্তা করতেই তাঁব মৃত্যু ঘটে। তিনি সহ্য করতে পারেন নি। সারা ভারতবর্ষ হায় হায় করে উঠেছিল। পণ্ডিত জওহলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষে এই ভাবে বুকে ব্যথা ধরে কত জন অজ্ঞান হযে গেছে—কি মারাই গেছে—তা আমি জানি না—তবে বেশ কিছু লোক যে গেছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। তাবা সকলেই কংগ্রেসের লোক, তা আমি বলব না, তবে কংগ্রেসেব লোকই বেশী, এবং তারা পণ্ডিতজীব স্নেহ-ভাজন কংগ্রেসী। যাবা ঠাট্টা করেছিল—তারা যে বিরোধী মানুষ এবং তাদের অধিকাংশই যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোক—তাতেও আমার সন্দেহ নেই।' এ প্রসঙ্গের উত্থাপনের হেতু মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মত মানুষের মৃত্যুকে ঠাট্টা করার লোকের অভাব হয় না এই 'বিচিত্র দেশে', সেটুকু জানান।

তিন, 'জওহরলাল নেহেরু চলে গেছেন। কেন্দ্রে এসেছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী, সৎ লোক, শান্ত লোক—কিন্তু, মৃদু মানুষ। জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দিতে জানেন না। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে বাঁধল ভারতবর্ষের সংঘর্ষ। পাকিস্তান আক্রমণ করলে ভারত সীমান্ত, কিন্তু হঠতে হল। ভারতবর্ষের সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতরে প্রবেশ করলে। জানুয়ারী মাসে তাসকেনদে রাশিয়ার আহ্বানে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের জিতপালাটা আপসে মিটিয়ে নিতে গিয়ে—প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী মারা গেলেন। ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী হলেন।'

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস—নেহেরু থেকে ইন্দিরা পর্যন্ত—কত কম কথায় কত নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্কর। এ যেন রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, একটা জাতির আত্মিক অধোগতির করুণ বর্ণনা।

এবার আসুন রাজ্য-রাজনীতির ক্ষেত্রে দৃক্‌পাত করি। সেখানে কি দেখি? বাংলাদেশে বিধান রায়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের শূন্য স্থান যেন পূর্ণ করতে পাবেন নি।

এর ফলে সেখানে ঘটল কি? 'তাব উপর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের আসবে বাজ্যহীন রাজা-রাজপুত্র, জমিদারীহীন জমিদার-জমিদার-নন্দনদের সমাবেশের মাঝখানে বসে কংগ্রেস-সভাপতি হাস্যে পরিহাসে আস্ফালনে—সংস্কৃতির পৃষ্ঠ-পোষকতাব অভিনযে—দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেব সেবা-কর্মের আয়োজনের মধ্যেও লুকানো অহঙ্কাবে ও মমতাহীনতায—সাধাবণ মানুষের যে বিরূপতা এবং বিদ্বেষ অর্জন কবেছিলেন, সে ঘটনা ঐতিহাসিক এবং তার ফলে যে বিস্ফোরণ আসন্ন তাও ঐতিহাসিক এবং তা সব দলই বুঝেছিল।' সমকালীন ইতিহাসের কথা কেউ লিখে বাখছেন কিনা জানি না, কিন্তু তখনকার পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসেব এমন বাস্তব বর্ণনা আর কেউ দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

এই কংগ্রেসী কুশাসনের যে চিত্রটি তারাশঙ্কব আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা একমাত্র তাঁবই মত প্রতিভাশালী লেখকের পক্ষে সম্ভব। 'হঠাৎ দেশে দপ্‌ করে আগুন জ্বলে ওঠাব মত আন্দোলন মাথা-চাডা দিয়ে উঠল। চালের দর ক' বছর ধরেই লাফিয়ে লাফিযে বেড়ে আসছিল। ধান-চালের ব্যবসাদারেবা যে চক্র তৈরী করলে—সে চক্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার ভাঙতে পারলে না বা ভাঙলে না। জোতদাবদেব সঙ্গে, ধান-চালের মহাজন কলওয়ালাদের সঙ্গে, ওঁদের আঁতাত যেটা সেটা প্রমাণ কেউ কবে নি, কিন্তু না কবলেও এটা প্রমাণিত সত্য থেকেও বড় সত্য—বেশী সত্য। রাজনৈতিক মিছিল আর সভার তো শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে ইস্কুলে ছাত্র-আন্দোলন চলছে। খাদ্য-আন্দোলন হচ্ছে তীব্র থেকে তীব্রতর। পনের-ষোল টাকা মণ থেকে পঞ্চাশ টাকা চালের মণ যখন হল, তখন আগুন জ্বলল—তারপর চাব টাকা সের একশ ষাট টাকা মন হল চালের। আগুন আর নিভল না। কলকাতা শহরে সপ্তাহে সপ্তাহে ট্রাম-বাস বন্ধ হচ্ছে, ব্যারিকেড দেওযা হচ্ছে। ট্রামে-বাসে আগুন লাগছে। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে পথের দুধার। বিপ্লব বিপ্লব।' ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে

ফ্রানসের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল। ডিকেন্স তার এক জীবন্ত বর্ণনা তাঁর 'A Tale of Two Cities'-এ দিয়ে গেছেন। তারাশঙ্করের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বর্ণনা আমাদের সেই বর্ণনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুই, অজয় মুখার্জির নবরূপে আবির্ভাব। 'হাওড়ায় নেমে অজয় মুখার্জির কলকাতা-প্রবেশের সেই আশ্চর্য মিছিল দেখে সব ভুলে গিয়েছিলাম। অজয়বাবুর সেদিনের জীপের উপর দাঁড়ানো মূর্তি দেখে মনে হয়েছিল, এ মানুষটি হয়ত পারবে। দু-দু জায়গায় আজয়বাবু জিতেছেন। আবামবাগ—তমলুক। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেন হেরে গেছেন আরামবাগে। সেনের সমর্থনে কে যেন বলেছিল, অজয়বাবুকে বঙ্গোপসাগবে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। অজয়বাবু কিন্তু পারেন নি। পারেন নি বললে ভুল বলা হয়। পারতে দেওযা হয় নি। দলীয় রাজনীতি দাঁডিয়েছিল অন্তবায় হযে। এই ভাবে চলল চার বৎসর ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত। এই চাব বৎসরে সারা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড সংঘাত-সংঘর্ষ চলছেই চলছেই চলছেই। একটা আগ্নেযগিবির মত অগ্ন্যুদগাব করছে চার বৎসর ধরে। একটা ঘনশ্যাম নিবিড বন যেন চার বৎসর ধরে নিরন্তর জ্বলছে। চার বছরে তিন তিনটে নির্বাচন গেল। শাসন-শৃঙ্খলা জীর্ণ-মরচে ধরা শেকলের মত টুকরো টুকরো খান খান হযে গেল। বামপন্থীরা মিলিত হল, দেশ উচ্ছ্বসিত হল প্রত্যাশায়, চারিদিকে নানান অভ্যুত্থান হল। অবনত জাতি ও শ্রেণী যারা, তারা উঠতে চাইল, শোষিত বঞ্চিত যারা, তাবা উঠতে চাইল। এর উপরে হল সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি। এরই মধ্যে পারটিতে পারটিতে বিরোধ পরিণত হল বিবদমান দুটো হিংস্র প্রাণীর রক্তাক্ত প্রাণঘাতী সংঘর্ষে। হত্যা—হত্যা আর হত্যা। খুন—খুন—খুন। মানুষে মানুষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়। দলে দলে। পারটিতে পারটিতে। রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ মানুষের আনুগত্য দখল করবে সামরিক শক্তির পরিচয় দিযে। অজয়বাবু জ্যোতিবাবুতে বিরোধ হল। মিনিসট্রি ভাঙল। ভেঙে দিলেন অজযবাবু। জ্যোতিবাবুর দল দাবী জানালে, তারা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে। বিরোধী হল প্রায় অন্য সব দলেরা।' এইভাবে চার বৎসরের অবসান হল।'

তিন, এল ১৯৭০। একটা নূতন দলের অভ্যুত্থান ঘটল। এরা আরও ভয়ঙ্কর, আরও রক্ত-পিপাসু। 'একটা দলে পড়ে গেলাম। দুরন্ত দুর্ধর্ষ মানুষের দল। তাদের সঙ্গে কাজ করলাম কিছু দিন। রাইফেলের গুলীতে অনেক দূরের

মানুষকে আমি লক্ষ্যভেদ করেছি—অনেকগুলি মানুষকে আমি হত্যা করেছি। অন্ততঃ পঞ্চাশটা।'

'সুতপার তপস্যা'র রাজনৈতিক পশ্চাৎভূমির পরিচয় সাঙ্গ করলাম। এই এই বর্ণনা তারাশঙ্কর তাঁর হৃদয়ের রক্তে এঁকেছেন। বেদনা, ক্ষোভ ও নৈরাশ্য এই বর্ণনার প্রতিটি ছত্রে। দেশকে কি ভালবাসাই না তিনি বেসেছিলেন। তাই সংসার থেকে বিদায় নেবার কালে চতুর্দিকের নৈরাশ্যঘেরা পরিবেশ তাঁর কবি-হৃদয়কে মথিত করেছিল। সেই মন্থন-লব্ধ অশ্রুধারায় তারাশঙ্কর 'সুতপার তপস্যা ব রাজনৈতিক পশ্চাৎভূমিটি এঁকেছেন। অন্যেরা যখন যৌন ব্যাপাবকে উপন্যাসের বিষয়-বস্তুকে উপজীব্য করে বিদ্রোহের চূড়ান্ত করছেন, তখন সমস্ত কোলাহলের মধ্যে আত্ম-বিলুপ্ত পরম দুঃখে চরম নৈরাশ্যের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তারকনাথ সেন তাঁব 'What is a Great Novel ?' শীর্ষক প্রবন্ধে আক্ষেপ করে গেছেন এই বলে 'Here at home, could we not have a great novel of the mighty endeavour at national reconstruction going on since August 15, 1947 ? Surely there is room for at least one.' জাতীয় পুনর্গঠন নিয়ে কোন উপন্যাস রচিত হয় নি সত্য। তবে বেঁচে থাকলে তিনি দেখে যেতেন জাতীয় বেদনা নৈরাশ্য নিয়ে একটি সত্যকার 'great novel' রচিত হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে এই 'সুতপার তপস্যা' 'Range, breadth and sweep, amplitude and spaciousness, totality of appeal' মহৎ উপন্যাস রচনায় যা যা প্রয়োজন সবই এতে আছে, শুধু আকারে এটি বৃহৎ নয়। কিন্তু 'গোস্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ' এখানেও তাই হযেছে।

এই উপন্যাসে দ্রষ্টা এবং ঐতিহাসিক হিসাবে তারাশঙ্করের কবি-মানসেব যে প্রতিফলন ঘটেছে, তার পরিচয় সমাপ্ত করলাম। এবার স্রষ্টা শিল্পী হিসাবে তাঁর যে পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই তার আলোচনা করে এই উপন্যাস-পরিচয় শেষ করব।

তারাশঙ্কর নিজের যে পরিচয়ই দিন না কেন, একথা বিস্মৃত হলে চলবে না, তিনি মূলতঃ কবি। এই জগৎ ও জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দর্শন করেছেন, তা শিল্পীর দৃষ্টি এবং সৌন্দর্য-সৃষ্টিই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস ধন্য হযেছে চরিত্র-সৃষ্টিতে। এই চরিত্রগুলি হচ্ছে সুতপার বাবা বিজয় ভূষণ দাশগুপ্ত, সুব্রতর মা প্রভাময়ী দেবী, সুতপা ও সুব্রত।

বিজয়বাবু নামকরা ব্যারিস্টার। তবে উপার্জনের দিক থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীর আইনজীবী ত ননই, দ্বিতীয় শ্রেণীরও নন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব 'রাজনীতি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ' হিসাবে। সোস্থালিজম থেকে কম্যুনিজম পর্যন্ত সকল ইজমের আধুনিকতম আকার প্রকার ভাবভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর মত রাশিয়া চীন পর্যন্ত বিস্তৃত।' সম্ভবতঃ বিজয়বাবুর চরিত্র আমাদের সমকালীন কোনো রাজনীতি-তত্ত্ব বিশারদের। ঠিক ধরতে পারছি না, কে ইনি। সে যাই হোক, এর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু রাজনীতি-শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে নয়, অভিজ্ঞ জীবন-যাত্রী হিসাবেও। বহুপঠিত এই মানুষটির অর্জনও যেমন বিপুল, দানও তেমনি—বলাবাহুল্য এ দান ও অর্জন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে। তিনি স্থিতধী। কোন বিষয়ে সহজে বিচলিত হন না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই উক্তিটিতে, যেটি তিনি করেছিলেন সুব্রতর এই প্রশ্নের উত্তরে। 'সুতপাকে আমি না বুঝে আকর্ষণ করেছিলাম। অথচ আমার তো ওকে সুখী করবার মত শক্তি নেই। এ ভুল কি সংশোধন করা যায় না?' বিজযবাবু উত্তর দিয়েছিলেন 'ভুল হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের বিবাহ শুধু দেহে দেহে নয়—তার সঙ্গে মনে মনেও। এবং বিবাহের সার্থকতা তাব বংশবক্ষায, তা কোন মতে প্রাণধারণেই শেষ নয়—প্রেমে তাদের পৌছতে হয়।' তারপর ডিভোরসের ইঙ্গিত দিয়ে সুব্রত যখন বলেছিল 'কিন্তু আর কোন পথই বা আছে বলুন?' তখন বিজয়বাবু যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে বাজনীতি শাস্ত্রজ্ঞের নয়, জীবন-পথের বহুজ্ঞাত, বহুদৃষ্ট ব্যক্তির পরিচযই পাওযা যায। তিনি বলেছিলেন, 'আছে ভালবাসার পথ। ভালবাসাকে বড করে তোল, সুব্রত, তোমাব হাত ধরে, মিনতি করছি। একথা তুমি ভেবো না।' এ পথ চীন, রাশিযার পথ নয়, পথ নয় আমেবিকারও। এপথ ভাবতেব পথ। অথচ এ পথের কথা উচ্চারিত হযেছিল তারই কণ্ঠে যাঁর রাজনীতিশাস্ত্র-জ্ঞান ছিল বাশিয়া, চীন পর্যন্ত বিস্তৃত।

অথচ বীতবাগ, বীতভয়, বীতক্রোধ বলে তিনি যে শুষ্ক হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তা নয। তা যদি হতেন, তাহলে সুব্রতর মৃত্যু সংবাদে অমন বিহ্বল হযে পডতেন না। 'দাশগুপ্ত সাহেব প্রথম সংবাদটা শুনে ডেকেছিলেন বড় পুত্রবধূকে। এত বড় মানুষটা—এত পাণ্ডিত্য, এত স্থিরতা—সব যেন এক মুহূর্তে একটা আচমকা দমকা বাতাসে আলো নিভিযে দেওয়ার মত এক বিপুল বিহ্বলতার অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে গিয়েছিল।' সুব্রত তাঁকে প্রণাম করতে তিনি যখন বলেছিলেন 'তুমি আমাকে প্রণাম করছ কি হে? তোমরা যে ব্রাহ্মণ, আমরা বৈদ্য—' তখন তার উত্তরে সুব্রত যা বলেছিল, তার মধ্যে বিজয়বাবুর

চরিত্রটি সুন্দর ধরা দিয়েছে। সুব্রত বলেছিল 'আপনি এ যুগে সত্যিকারের এক জন ঋষি, আপনাকে প্রণাম করব না ?'

প্রভাময়ী দেবীকে বিজয়বাবুর 'counterpart, বলা যেতে পারে—অবশ্য জ্ঞানের দিক থেকে নয়, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে। তিনি ছিলেন 'শহরের মেয়ে এবং প্রথম যৌবনে স্বামী যখন কনসপিরেসি কেসের আসামী হয়ে জেলে যান, তখন থেকে তিনিও দেশের কাজে দীক্ষা নিয়েছিলেন তবে তাঁর কাজ ছিল সমাজ-সেবা, চরকা ও গান্ধীজীর বাণী প্রচার।' তবে ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতির আঙিনা থেকে সরে এসেছিলেন। সুতপা যখন বধূ হয়ে তাঁর গৃহে এল, তখন রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কংগ্রেসের লোকেরা যখন তাঁকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফিরে আসার অহ্বান জানিয়ে বলেছিল 'আবার আপনি আমাদের মধ্যে আসুন।' তখন তিনি যে কারণ দেখিয়ে বলেছিলেন 'না। আমি আর পলিটিকসের মধ্যে নেই।'—তার মধ্যে ভাবতাত্মার চিরকালের মর্মবাণী সংস্কৃত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন 'দেশ আমার মা, ভগবান পিতা, বিশ্বপিতা। এবার তাঁর সেবার সময় হয়েছে।'

এমন যে মানুষ, তিনিও পুত্রবধূকে ভালবাসতে চেষ্টা করেও পারলেন না। অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক মতপার্থক্য, যা বিষিয়ে ওঠা ক্ষতের মত সমস্ত পরিবার জীবনটাকে দিয়েছিল বিষাক্ত করে। দোষ যে তাঁরও ছিল, সেটা সুব্রতই বলছে। 'আমাদের বাড়ীতে আমার মা তোমাকে ভালবাসতে চেষ্টা করলেন প্রাণপণে—কিন্তু আশ্চর্য, পারলেন না। দোষ কার—সে নিয়ে প্রশ্ন বড় নেই, সেটা আমার মায়ের।' কিন্তু পুত্রবধূকে ভালবাসতে চেষ্টা যে তিনি কত আন্তরিকতার সঙ্গে করেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে সুব্রতর এই উক্তিটিতে—'মা সংসারের সব থেকে ভাল খাদ্যটুকু বাড়ির ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তোমাকে খেতে দিতেন, আমাকে দিতেন না।' অর্থাৎ পুত্রের চেয়ে পুত্রবধূকে তিনি দেখতেন অনেক বড় করে।

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের চরমতম প্রকাশ ঘটেছিল যখন তিনি সুব্রতকে বলেছিলেন 'বউমা যদি ফসল ভাগের ব্যাপারে নামে, তাহলে বলো, আমার সঙ্গেই আগে বোঝাপড়া হবে। আমাদের জমিই কৃষাণী ভাগে বিলি আছে। চাষী পায় এক ভাগ, আমরা পাই দু ভাগ। শুধু তাই নয়, সুব্রত, তোর বৌকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বল, যারা সমিতি খুলছে, তাদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তাদেরও সব ওই এক ভাগ।'

কিন্তু তাঁর তেজস্বিনী মূর্তির সব চেয়ে মহিমাময় প্রকাশ ঘটেছিল, যখন তিনি পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন 'ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাত—নিম না ছাড়ে আপন পাত।' শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সুতপা প্রশ্ন কবেছিল 'কেন এ কথা বললেন?' প্রভাময়ী সুতপার প্রশ্নে ঘাবড়ে যান নি। ধীর স্থির অথচ গভীর প্রত্যয় ও তেজের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'স্বামীজীর বাণী পড়ে শোনাচ্ছিলে। স্বামীজী বলেছিলেন—ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ—ভাবতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর—তোমাকে আজ আমি সহস্র ধন্যবাদ দিই। তবে সেদিন তোমাব সে তেজস্বিতা আমার অত্যন্ত কটু ঠেকেছিল—নিদারুণ ঔদ্ধত্য বলে মনে হযেছিল, তুমি মুহূর্তে তোমাব স্বরূপেব সকল আবরণ টেনে ফেলে দিয়ে বলেছিলে আমি ঈশ্বব মানি না, দেব-দেবী দূবেব কথা।'

কিন্তু পুত্রবধূকে তিনি সমস্ত অন্তর দিযে ভালবাসতেন। তাঁর একমাত্র পুত্র, তাঁর পুত্রেব মত পুত্র সুব্রতর ভালবাসার পাত্রকে তিনি প্রাণ-মন-আত্মা সব দিযে আপন করতে চেযেছিলেন। কিন্তু পাবেন নি। উভয়ের আদর্শগত পার্থক্য এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁব এই আপন করার সাধনাব পথে প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁডিয়েছিল। যদি পুত্রবধুকে তিনি ভাল না বাসতেন, তাহলে সুতপা যখন বলেছিল, খুব সহজ করে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তাকে (অর্থাৎ সুব্রতকে) যেতে বাবণ কববেন। বলবেন, আমি বারণ কবেছি। আমাকেও যেন আর আনতে না যায় সে। আমি আর আসব না ফিরে।' তখন তিনি চীৎকার করে বলে উঠতেন না 'বউমা।' তারপব যখন সুতপা আরও যোগ করল 'খোকা আব তার মীমাংসা যদি একান্তই করতে হয়, তাহলে তা হবে কোর্টে', তখন তিনি বুকে হাত দিয়ে শুযে পডেছিলেন এবং তাতেই ঘটেছিল তাঁর মৃত্যু।

সুতপা ও সুব্রত চরিত্র আপন আপন পথে সহজভাবে ফুটে উঠে নি। তারা ফুটে উ'ছে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও সংঘাতেব মধ্য দিয়ে।

সুতপা ও সুব্রতর মধ্যে কোন মিল ছিল না—না বাইরে, না ভিতরে। অর্থাৎ মনের দিক থেকে যেমন কোন মিল ছিল না, আদর্শ ও আচরণের দিক থেকেও তেমনি অমিল ছিল। 'তোমার রাজনৈতিক মতামত তোমার দাদাদের বউদিদিদের সঙ্গে এক—সে না হও তুমি পারটি মেম্বার। এটা আমি তো জানতাম আর আমি তোমার দাদাদের পারটির সব থেকে বড় শত্রু যে পাবটি, সেই পারটির মেম্বার না হলেও—ওই পারটির মতই ছিল আমার জীবন-সত্য এবং ওই পারটির গতির ধারাই ছিল আমার চলার ছন্দ-গতি। এদিক

দিয়ে তুমি উত্তর মেরু, আমি দক্ষিণ মেরু ; তোমার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই—দিন আর রাত্রির মত আমরা পরস্পরের বিপরীত—তোমার সঙ্গে আমার মিল হয় না—হতে পারে না—এ কল্পনা অবাস্তব—অসম্ভব, এর ফল বিষময়—বিষময় হতে বাধ্য, তবুও তোমাকে জয় কববার জন্য ব্যাকুল হলাম আমি। ওটা জীব-ধর্ম। জীবন জীবনের সঙ্গে মেলে, কিন্তু নারী-পুরুষের দেহ ধরে মিলতে হয়।' জয় সে করেছিল। 'তোমাকে আমি জয় করলাম।'

কিন্তু কেমন করে সুব্রত সুতপাকে জয় করেছিল। এবিষয়ে সুতপার বাবা বিজয়বাবুব একটা কথা তার বিশেষ কাজে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন 'এক থেকে দুই হযেই তো সব হল না। বিরহ-মিলন, মান-অভিমান চাই, দেহে-দেহে এক হওয়া চাই। তাই পুরুষকে দেখলেই নাবীদেহে নারীবুকে দোলা লাগে—নারীকে দেখলে পুরুষ চমকে জেগে ওঠে।' সুব্রতও তেমনি করে জেগে উঠেছিল। 'আমি তেমনি কবে জেগেছিলাম এবং মনে মনে জয় করবার সংকল্প কবেছিলাম তোমাব মনকে।' নারীব হাত চেপে ধরে 'তুমি আমার' বলা তার পক্ষে সহজ ছিল না। কারুর কারুব পক্ষে অবশ্য সম্ভব ছিল। যেমন 'পুরাকালে পারতেন কৃষ্ণ অর্জুনের মত বীবেরা, আর একালে পারে যারা মস্তান, তারা।' সুব্রত সেকালেব কৃষ্ণ-অর্জুনও ছিল না বা একালের মস্তানও ছিল না। সুতবাং হাত না বাডিযে মন জযের পথেই তাকে এগোতে হল। 'সুতরাং তোমার দিকে আমার হাত বাব বার প্রসারিত হতে চাইলেও প্রসারিত হতে দিই নি। মন মনেব পথে এগিযেছিল—তোমাব মনকে জয় কবতে চেষ্টা কবেছিলাম।' চেষ্টাই সে করেছিল এইমাত্র, কিন্তু জয় সে করতে পারে নি। সুতপার মন অজেয়ই থেকে গিয়েছিল তার কাছে। তা না হলে তাদের মিলন এমন মর্মন্তুদ বিচ্ছেদে পর্যবসিত হত না। বাইরে তারা মিলেছে, দেহের ক্ষুধা পর্যন্ত মিটিয়েছে কিন্তু মনের ক্ষুধা কেউ কারুর মেটাতে পাবে নি। মনের ক্ষুধা না মিটিয়েও দেহের ক্ষুধা মেটান চলে এবং সেটাই ঘটছে আমাদের জীবনে অহর্নিশ। সুব্রত তার চিঠিতে লিখছে 'একটি পুরুষ আর একটি নারী। সুতপা, এরা রাত্রে যে মিলনে মিলিত হয়—সেটি মেলে দুটি দেহের সেতুবন্ধের উপর দাঁড়িয়ে। দিনের মিলন মনে মনে। যত বিরোধ তখনই প্রমাদ ঘটায়। মানুষ ছাড়া প্রাণী-জগতে দেহ-মিলনের পরেই একরকম পালা শেষ। মানুষ ঘর বাঁধে দিনরাত্রি এক সঙ্গে বাস করবে বলে।' নর-নারীর দেহ-মনের মিলন সম্পর্কে এমন কথা এমন ভাবে অন্য কোন বাঙালী লেখক করেছেন বলে জানি না। এতে যেমন আছে গভীর

অন্তর্দৃষ্টি, তেমনি আছে স্থির প্রজ্ঞা। তারাশঙ্কর 'ফরিয়াদে' বরেন মল্লিকের সঙ্গে চাঁপার দৈহিক মিলন সম্পর্কে এমন একটি জীবন-সত্য উচ্চারণ করেছেন, যা এ সম্পর্কে আমাদের এক নূতন জগতের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেয়।

যাই হোক, মনের মিলন হল না বলে শেষ পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই বিচ্ছেদ সুতপাকে কতটা লেগেছিল, লেখক তা বলেন নি। কিন্তু সুব্রতর আক্ষেপের অন্ত ছিল না। প্রথম আক্ষেপ, সে সুতপাকে হারাল। দ্বিতীয় আক্ষেপ, তার স্বপ্নাদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। 'আক্ষেপ আমার, তোমাকে পেলাম না। না—আরও আক্ষেপ আছে—সে আক্ষেপ সেই বিচিত্র বহু ঝাড়-লণ্ঠনে আলোকিত সেই যাত্রাব আসরের মত বহু বিচিত্র আদর্শের আলোয় উজ্জ্বল—সমাজ ও পৃথিবীর জন্য।'

চবম নৈরাশ্য, শেষ পর্যন্ত তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল পবম অধঃপতনেব দিকে। হত্যার মধ্যে সে কোন অপরাধ দেখল না। ঈশ্বর, ধর্ম, শাস্ত্র, তীর্থ সমস্ত কিছুই মিথ্যা—এ সত্য সে লাভ করল। একমাত্র সত্য বলে মনে হল রাজনীতিকে—তাও সে অহিংস রাজনীতি নয়, সহিংস রাজনীতি। যেদিন সুতপা সুব্রতব দেওয়া অধিকারটা পায়ের ষ্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্যানডেলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেদিনই সে সন্ন্যাস নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ঈশ্বব-সন্ধানে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেবে। সে উদ্দেশ্যে সে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছে, পড়েছে শাস্ত্র, কিন্তু যা চেয়েছিল, তার কিছুই পায় নি সে। 'বদ্রীনাবায়ণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুবেছি সুতপা। শাস্ত্র পড়েছি। চার বছরের দুটো বছর ঘুবেছি, ঘুরেছি, ঘুরেছি। কিন্তু পাই নি কিছুই। সত্য কথা তোমাকে বলব—মিথ্যা মনে হয়েছে, ঈশ্বব, ধর্ম, শাস্ত্র, তীর্থ—সব। সব। আবার টানলে সেই রাজনীতি—। যে ছিল পরম আস্তিক সে রূপান্তরিত হল ঘোর নাস্তিকে।' সুব্রতর এই কথাগুলি আদৌ তারাশঙ্করের চির-সংশযী চিত্তের অভিব্যক্তি মাত্র। এই আজীবন সত্য-সন্ধানী মানুষটির সত্য-সন্ধানে কোন দিন বিরতি ঘটে নি। জীবনের শেষতম লেখাটিতেও তার সাক্ষ্য তিনি রেখে গেছেন।

তারাশঙ্করঃ দেশ, কাল

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

১

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে তাঁর সমসাময়িক প্রায় সত্তর বছরের দেশ-কালের ইতিবৃত্ত জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ বিংশশতাব্দীর এই ভারতবর্ষের ও বাঙলাদেশের নানা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে পটভূমিকা ও নাটকীয়তা জুগিয়েছে। গল্প রচনার নতুন যে পদ্ধতি বিংশ-শতকের গোড়ায় বাঙলা উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ (আপাততুচ্ছ ঘটনা-নির্ভর অন্তর্নাটকীয়তা এ যুগের কথাসাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু তারাশঙ্কর ঘটনার নাটকীয়তাই ভালোবাসেন), বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কাহিনীর গতিবেগ সঞ্চার, নানা অবজ্ঞাত সামাজিক সমস্যার অবতারণা, নানা সামাজিক স্তরের বিপর্যয়, গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে গ্রামের জীবনপট ও লৌকিক সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ—সবই তারাশঙ্করের রচনায় অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু শুধু সমকাল ও সমকালীন স্বদেশই তারাশঙ্করের বিষয়বস্তু নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাদেশের যে ঐতিহ্যের পটভূমিতে ধীরে ধীরে তাঁর সমকালের পরিবর্তনগুলি এসেছে সে ঐতিহ্যও তাঁর বিশেষ প্রিয় বিষয়। সেই ঐতিহ্যের ক্রম-বিলুপ্তির জন্য তিনি গভীরভাবে আহত এবং যতখানি শিল্প-জনোচিত আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সেই ঐতিহ্যকে তিনি উন্মোচন করেছেন—সমকাল ও সমকালের স্বদেশকে ততখানি ব্যাপক বৈচিত্র্যে ও প্রাণস্ফূর্তিতে ধরতে পারেন নি।

শিক্ষিত মহলে সমাজবাদী চিন্তার বিকাশ উনিশ শতক থেকে এদেশে ধীরে ধীরে ঘটছিল। অন্যদিকে তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপ্রধান ভারতীয় জনজীবনে শিল্পের প্রভাব বাড়ছিল এবং শিল্পের প্রভাবের ফলে গ্রামীণ জীবন-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসছিল। ব্রিটিশপূর্ব আমলে গ্রামজীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। জমিদারের শাসনে সেই জীবনের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো। ব্রিটিশ আমলে জমির ওপর ব্যক্তির স্বত্বভোগের অধিকার এলো। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে জমিদারের স্বত্বভোগে জমি রইল। কোনো অঞ্চলে কৃষকদের স্বত্বভোগে জমি রইল। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজস্ব

আদায়কারীরা হয়ে গেল জমির মালিক। অন্য অঞ্চলে কৃষকদের স্বত্বভোগের জমি রইল—যাকে বলে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থাই কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যবস্থা—জমির ওপর গ্রামজীবনেব যৌথ দায়িত্ব—নষ্ট করে দিয়েছিল এবং কিছুটা ব্যক্তিতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার সূচনা করেছিল। এর ফলেই স্বত্বভোগী কৃষক এবং জমিদারের আবির্ভাব হয়েছিল গ্রামজীবনে, বিশেষতঃ পূর্বভারতের গ্রামনির্ভর অর্থ নৈতিক জীবনের স্বয়ংনির্ভর গ্রামজীবনের যৌথ দায়িত্বের দিন চলে গেল।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভাবতে যাতায়াতের পথ তৈরি কবলেন। বিশেষতঃ রেলপথ নির্মাণ করে তাঁরা নতুন শিল্পনির্মাণে ও প্রসারে মনোযোগী হলেন। নীল, চা, কফির চাষ শুরু হলো। তুলো আর পাটের শিল্পও বাড়তে লাগলো। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প (রেলপথ নির্মাণ ও মেরামত ছাড়া) বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলেই ভারতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও আধুনিকীকবণ ঘটলো না। লোহা ও অন্যান্য কিছু শিল্পের সূচনা দেখা গেল মাত্র। ভারতবর্ষকে মূলতঃ কৃষি-নির্ভর রাখাই হলো শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধেব পর নিজেদের স্বার্থেই শাসকগোষ্ঠী বুঝলো অবাধ বাণিজ্যনীতি চলবে না। বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতি (বিশেষতঃ জাপানের) ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে প্রতিযোগীর মনোভাব নিয়ে এসেছিল। তাই সক্রিয়ভাবে শাসকগোষ্ঠী ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য এগিয়ে এলেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে শিল্পের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার কথা স্পষ্টতঃই বলা হলো। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের আওতায় শিল্পবাণিজ্য প্রসারের দায়িত্ব থাকায় যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতির অভাবে শিল্প-প্রসারে বিঘ্ন ঘটলো। যদিও যুদ্ধের পর বিশের দশকে লোহা, ইস্পাত, তুলো, চিনি, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা হলো এবং কিছুটা সরকারী সাহায্য পেয়ে শিল্পগুলির প্রসার ঘটলো, তবু শিল্প-সম্প্রসারণে সরকারী পূর্ণমনস্কতা ছিল না। বিদেশী দ্রব্য কেনাবেচার যে স্বাধীনতা ভারতীয় বাজারে ছিল, ভারতীয় দ্রব্যের কেনাবেচার সুযোগ ততটা ছিল না। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভোগ্যপণ্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে অন্যদেশের ওপরেই নির্ভর করতে হতো বেশি। সংরক্ষিত শিল্পগুলির প্রসার হলেও যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবের জন্য আধুনিক শিল্পায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তুলো আর পাট শিল্পই

কিছুটা বৃহদায়তন হয়েছিল এবং ওই দুটি শিল্পেই ভারতের শ্রমিক সংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগ মানুষ নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও যন্ত্রপাতি, মোটর, রেলওয়ে এঞ্জিন, জাহাজ ও বিমান ইত্যাদি মৌলিক শিল্পগুলির প্রসার ঘটেনি। অন্যদিকে আবার যুদ্ধের প্রয়োজনে ইস্পাত, পাইপ ও টিউব-শিল্পের ওপর সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া হলো। তবু মৌলিক শিল্পগুলির সম্পূর্ণ প্রসার ঘটলো না।

স্বাধীন হবার পর ফিস্‌ক্যাল কমিশন ট্যারিফ বোর্ড বসিয়ে শিল্পসংরক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করলেন। পরে ট্যাবিফ বোর্ডের বদলে ট্যারিফ কমিশন বসিয়ে (১৯৫২) অনেক নতুন শিল্পে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হলো। পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি বেখেই এই ব্যবস্থা হলো। ভারতীয় শিল্পব্যবস্থার দূবপ্রসারী পরিবর্তনই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। খাদ্য-উৎপাদন বাড়ানো এবং আগামী পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ আয়ের পথ সৃষ্টিও এর উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেমন কৃষির ওপর জোর ছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেমনি মৌলিক ও ভারী শিল্পেব ওপব ঝোঁক পডলো। তৃতীয় পরিকল্পনায় আবার খাদ্যের স্বযংনির্ভবতা ও কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থাব ওপর ঝোঁক পডলো। এ চাডাও কতকগুলি মৌলিক শিল্পের ওপব নজর রাখা হলো।

ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা প্রচণ্ড-পবিমাণে বেড়ে চলেছে। তাতে কৃষি ও শিল্পদ্রব্যেব উৎপাদনবৃদ্ধির উপকারটুকু ভোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই লোকসংখ্যার অধিকাংশই এখনও গ্রামবাসী। শহরের লোকসংখ্যার অন্তত সাড়ে পাঁচগুণ লোক গ্রামে বাস করে (১৯৫২ সালেব গণনা অনুযায়ী)। বেশির ভাগ মানুষই চাষী কিংবা ক্ষেতমজুর এবং সে তুলনায় কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্যা অল্পই। তবে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত হিসেবে দেখা যায়, কলকারখানার শ্রমিক-সংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে।

সমাজচিন্তার অগ্রগতি বেড়েছে ঠিকই। চিন্তাবিদ্ হিসেবে যে লেখক সমাজবাদী প্রগতিশীল, সেই লেখক যখন সাহিত্যসৃষ্টিতে নেমেছেন তখন স্বভাবতই সে চিন্তার ছাপ পড়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা কথাসাহিত্যে তার প্রভাব খুবই বোধগম্য। বঙ্কিমের উপন্যাসে সামাজিক শাসন ও প্রেমের রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব দেখান হয়েছে, যদিও শেষপর্যন্ত সামাজিক শাস্ত্রশাসনই তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। বহুবিবাহ-পীড়িত সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচার ও নারীর নিঃসহায় আশ্রয়ভিক্ষু সহনশীল রূপ

বঙ্কিমের উপন্যাসে পেয়েছি। আনন্দমঠের মতো আদর্শপ্রাণিত রোম্যান্সের সূচনাতেই যে বাস্তব দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছি তা সামাজিক শোষণেরই ফল, জমিদারী ব্যবস্থায় কৃষক ও ক্ষেতমজুর-শোষণের চরম রূপ—কিছুটা ব্রিটিশ শাসনের অনবধানতাবশতঃ এবং কিছুটা লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে খাদ্যোৎপাদনের অভাবশতঃ। দ্বিতীয় কারণটি শাসনের দ্বারাই কিছুটা দূর করা সম্ভব। বঙ্কিমের এই বীভৎস বর্ণনাব সার্থক তুলনা চলে বোধহয় তারাশঙ্করের 'তিনশূন্য' গল্পের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে প্রচলিত সামাজিক ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে অনেক চরিত্রই দাঁড়িয়েছে এবং বৃহত্তর মানবসাধনার পটভূমিতে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা আপনিই ভেঙে পড়েছে। সামাজিক দ্বন্দ্বের ছবি আছে 'যোগাযোগ' মতো উপন্যাসে এবং অন্যত্র, প্রায় সর্বত্রই, সামাজিক শোষণের বাস্তব রূপ আঁকবার চেয়ে নিহিত মানব-বোধ বা মনুষ্যত্বের আইডিয়াকে বা আইডিয়ার সংঘর্ষকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। শরৎচন্দ্র এই নীতিধর্মকে যাচাই ক'রে, ব্যক্তিহৃদযে নীতিধর্মেব শাসন বা শোষণের প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে, ব্যক্তির বিদ্রোহকে সমাজের সামনে প্রশ্নেব আকারে দাঁড করিয়েছেন। সমাজের যারা শিকাব—বিধবা, পতিতা, এবং নিচুতলার মানুষ—তাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল প্রবল সহানুভূতি। এই নিম্নশ্রেণী-চেতনার পরিপোষণে কিছু কিছু রুশ ও ফরাসী উপন্যাস এবং কিছু ইংরেজী উপন্যাস—বিশেষ ক'রে ডিকেন্স্-এর প্রভাব কাজ করেছে বলে মনে হয়। বিধবার সমস্যা বঙ্কিম এনেছেন, রবীন্দ্রনাথও এনেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে ভালোবাসার জন্য বিধবারা শাস্তি পেয়েছে। বিধবার ভালোবাসাব নিরপেক্ষ বিচার রবীন্দ্রনাথও করেছেন। বিনোদিনীর রুদ্ধ প্রেমতৃষ্ণা ও আত্মবতিব স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে উপন্যাসে নতুন মনোবিকলনাত্মক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু সমাজশাসনে বিধবা বা পতিতার (পতিতার সমস্যা শরৎচন্দ্রই প্রধানতঃ এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে এবং পরে প্রভাতকুমারের 'কাশীবাসিনী' গল্পে তার সূত্রপাত দেখতে পাই) ভালোবাসাটাই শুধু শ্রদ্ধেয় নয়, তার শোষিত ব্যক্তিত্ব এই ভালোবাসা প্রকাশ করে উচিত কাজই করেছে, কেনই বা করবে না—এমন একটা আবেগরক্তিম অভিমান শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিকে প্রবল ও প্রকাশ্য ক'রে পাঠকের মন জয় করেছে। হয়তো শরৎচন্দ্রের বিধবারা সবাই সুখী হয় নি, কিন্তু তাদের প্রবল সমর্থনে লেখকের যে তীব্র অভিমান প্রকাশ পেয়েছে তাতেই তাদের জগৎ পাঠকের ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আর একটি দিকে শরৎচন্দ্র গল্প-উপন্যাসের

ভিত্তিকে ব্যাপক করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক পটভূমির আলোচনায় দেখেছি, ব্রিটিশ আমলে শিল্পায়ন-চেষ্টা শুরু হলেও আমাদের দেশ মূলতঃ পল্লীপ্রধান এবং কৃষি-নির্ভর। বঙ্কিমের উপন্যাসে এই পল্লীগ্রামকে নানা বর্ণনায় পেয়েছি। দূর অতীতের পল্লীগ্রাম বা জনবিরল প্রাকৃতিক ভূমিও তাঁর গল্পকাহিনীর পট তৈরি করেছে। 'বিষবৃক্ষে'র 'গোবিন্দপুরে' গ্রামজীবনের সামগ্রিক ছবি পেয়েছি। অন্যত্র কিন্তু পল্লীর পটভূমি গৌণ। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবিতে অংশত পল্লীগ্রামের পটভূমি পাই। অন্য সব উপন্যাসেই শহর-জীবনের প্রাধান্য। অথচ বহু বাঙালী শহরবাসী বা শহরমুখী হলেও তখন অধিকাংশ বাঙালীই ছিল পল্লীবাসী। শহরবাসীদের সঙ্গে স্বগ্রাম ও পল্লী-অঞ্চলের যোগাযোগও ছিল যথেষ্ট। এ যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ঘটেছিল। এবং তার ফলে অসাধাবণ কতকগুলি ছোটগল্পে বাঙলাদেশের পল্লীজীবন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পল্লীজীবনেব ছবি এবং কিছু চরিত্র ছাডা তাঁর গল্পে পল্লীজীবনের গভীরতর সমস্যার ছাপ কমই পডেছে। 'শাস্তি'ব মতো পল্লীশিষ্ট পল্লীজীবন-সম্পৃক্ত চরিত্র ও সমস্যা-সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ খুব কম গল্পেই করেছেন। কিন্তু পল্লী-জীবনের নিরাপত্তা, নির্জনতা, জীবনসংগ্রামে অপেক্ষাকৃত মৃদু চাপ, প্রাকৃতিক স্নিগ্ধ মাধুর্য যেমন বাঙালী ভোলেনি, তেমনি ভোলে নি তার দলাদলি, নীচতা, আদর্শের ভণ্ডামি, মূর্খ সারল্য, কামনাবাসনার লোলুপ প্রবৃত্তি এবং জমিদারি ব্যবস্থাব শোষণ ও নির্যাতন। এই 'পল্লীসংস্কৃতি' বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সমানভাবে বর্তমান ছিল। শরৎচন্দ্র এই পল্লীব ঘোর-না কাটা শিক্ষিত বাঙালীর সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব, চরিত্রহীনের কিছু অংশ, গৃহদাহের কিছু অংশ, বিহারেব পল্লী-পটে লেখা। দেবদাস, বডদিদি, চন্দ্রনাথ, পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, বিপ্রদাস ইত্যাদির চরিত্র ও পরিবেশ প্রধানতঃ পল্লীকেন্দ্রিক। বিরাজ বৌ, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ ইত্যাদি বিখ্যাত গল্পের বিষয় জমিদাব শ্রেণীব শোষণ। বামুনের মেয়ে, পণ্ডিতমশাই, অভাগীর স্বর্গ গল্পে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ শ্রেণীর লাঞ্ছনা আবেগে ও সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের ছবিও পাই পল্লীসমাজ, মহেশ এবং শ্রীকান্ত পর্বে। শেষ পর্বের সাহিত্যরচনায় শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পরিচয়ও দিয়েছেন। শ্রমিকের দাবি মেনেছেন পথের দাবিতে। কৃষকসমাজের স্বীকৃতি রয়েছে দেনাপাওনা ও মহেশ-এ। কাজেই তারাশঙ্কর ও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের গল্প-উপন্যাস রচনার আগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার অনেক দিকই (খুব গভীর ভাবে না হলেও) শরৎচন্দ্রের

গল্প-উপন্যাসে আভাসিত হয়েছে। শহর ও গ্রামজীবনের মোটামুটি একটা ভারসাম্য শরৎচন্দ্রের মধ্যে আছে।

কল্লোলের লেখকদের রচনায় শাহরিক সমস্যারই বেশি প্রকাশ দেখি। শরৎচন্দ্র-পরবর্তী কালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় শহরজীবনের ছবি থাকলেও মূলতঃ গ্রামজীবনকেই নির্ভর করতে দেখেছি। বিভূতিভূষণের লেখায় গ্রামপ্রীতি ও নিসর্গপ্রীতি একাত্ম। শহরজীবনের জটিল বৈচিত্র্যের বৈপরীত্যে যেন গ্রাম্য সারল্য, নির্জনতা ও গভীর আধ্যাত্মিকতাকে তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেতে দেখি। তাবাশঙ্কর গ্রামসমাজের শিল্পী। জমিদার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রম-নির্ভর মানুষের ছবি পাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে। 'কল্লোল'-এ তাঁর আবির্ভাব। কল্লোলের মানসিকতা মুখ্যতঃ শহুরে হলেও সম্পূর্ণ গ্রাম-বিচ্ছিন্ন ছিল না। গ্রাম্যজীবন-নির্ভর কবিতা ও গল্পকাহিনী 'কল্লোলে' বেরোতো। দীনেশরঞ্জন ও জসিম-উদ্দিনের বহু গল্প-কবিতা 'কল্লোলে'ই বেরিয়েছে। গ্রাম্যসাহিত্য-সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনাও বেরিয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুখ্যতঃ নতুন কালের নাগরিক সমাজ-সমস্যাকেই 'কল্লোল' প্রকাশ করেছিল। তাই তারাশঙ্করের সঙ্গে 'কল্লোলে'র সম্পর্ক স্থায়ী হয় নি। গোটা গ্রামসমাজের যৌথজীবনের শিল্পরূপই তাঁর গল্পে উপন্যাসে চোখে পড়ে। বিশেষ ক'রে জমিদারী গৌরব ও নতুন শিল্পায়ন, দৈবনির্ভরতা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব, শাস্ত্রশিক্ষা ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ কালান্তরের সংঘর্ষ তারাশঙ্করের রচনার মুখ্য উপাদান। আর আছে জমিদারদের সমৃদ্ধি ও সম্ভোগ-তৃষ্ণা, উদার ন্যায়নীতি, ধর্মবিশ্বাস, পূর্বগৌরববোধ ও গৌরবরক্ষার ট্র্যাজিক পরিণতি। জলসাঘর, রায়বাড়ি, জবানবন্দী, একরাত্রি, আরোগ্য, বন্দিনী কমলা, রাজা রানী ও প্রজা, রাজপুত্র, কালিন্দী, ইত্যাদি গল্প-উপন্যাস জমিদারী ইতিহাসের ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও অবক্ষয়কে প্রকট করেছে। কালিন্দীর মধ্যে ভূমিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন, নতুন ব্যবস্থার উদ্ভব, পুরোনো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে নতুন অর্থ নৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ইতিহাস স্পষ্ট। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামের দেবু ঘোষ পুরোনো সমাজব্যবস্থার শাসনযন্ত্রে ভাঙন লক্ষ্য করেছে। সুপ্ত সমাজশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা সে করেছে। কালিন্দীর মতো এই উপন্যাস-দুটিতেও দেখি, গ্রামের চাষীরা চক্রান্তে পড়ে নিঃস্ব ও ভূমিহীন হয়ে কলকারখানার নতুন জীবন শুরু করেছে। কালিন্দী, গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামের পূর্বে চৈতালী ঘূর্ণিতেও গোষ্ঠ ও দামিনীর জীবনে ভূমি থেকে উৎখাত চাষীর জীবনের অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছিল। পরে হাঁসুলিবাঁকের

উপকথাতেও কাহারদের জীবনে প্রাচীন নেতৃত্ব ও নবীন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে, কাহারদের পুরোনো ঐতিহ্য ধীরে ধীরে নষ্ট হতে চলেছে। বনওয়ারীর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কাহারদের গায়ে কারখানর বাতাস লেগেছে। প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা এসেছে। তার ওপব কালের পবিবর্তনে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধে তারা শিল্পাঞ্চলে এসে নিজেদের ঐতিহ্যকে নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশেব সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সোশ্যাল মবিলিটি বা শ্রেণীগত সচলতাব ছবি তাবাশঙ্কবেব উপন্যাসেই প্রথম ব্যাপক ভাবে চোখে পড়ে। তা ছাড়া লোকসংস্কৃতিকে উপন্যাস-কাহিনীর উপজীব্য করে সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তাবাশঙ্করই যে প্রথম উপন্যাস-শিল্পকে পৌঁছে দিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২

অর্থনৈতিক যুগপরিবর্তনের চিহ্ন তারাশঙ্করের উপন্যাস কাহিনীর বিশেষ নাটকীয় গুণ হলেও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ও বৈচিত্র্য প্রমাণও বহুক্ষেত্রে তাঁব গল্প-উপন্যাসগুলিব দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এনেছে, মানবিক-মহত্ত্বেব ভিত্তি তৈরি করেছে, আদর্শবাদিতার আভাস দিয়েছে এবং অনেক সময়েই স্বদেশ ও স্বকালের প্রবক্তারূপে চরিত্রগুলিকে ব্যাপকতর পটভূমিকায় পাওয়া গেছে। তারাশঙ্করের কৈশোবস্মৃতিতে এই রাজনৈতিক আন্দোলন ও দেশপ্রেমের কতকগুলি ব্যক্তি-আদর্শ কাজ করছিল। কৈশোরস্মৃতিতে তিনি বলেছেন: '১৯১১।১২ সাল। তখন বাঙলা দেশে ছেলেদের কল্পনায় সার্থক জীবন ভাবতে গেলেই তিনটি স্বর্ণসিংহাসন ভেসে উঠত। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র আর কিশোর ক্ষুদিরাম।' (পৃষ্ঠা ৪) তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার থেমেছে। কংগ্রেসে বামপন্থী-চরমপন্থীদের বিবাদ চলেছে। বিপ্লবী কার্যকলাপও সমানভাবে সক্রিয়। পরে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসন-সংস্কারের চেষ্টা হলো। ১৯১৯ সালে ভারত সংস্কার আইন হলো। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক অত্যাচার চরমে উঠল। জালিয়ানওয়ালাবাগের দুঃখের স্মৃতি নিয়েই অমৃতসর কংগ্রেস বসলো। পরের বছর খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গান্ধীজি মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক আন্দোলনে টেনে আনলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। আত্মনির্ভরশীলতার আদর্শে দেশ ও সমাজকে বুঝবার ও গঠন করবার চেষ্টা চললো। তারাশঙ্কর এই সময় থেকেই প্রত্যক্ষ দেশসেবার অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকে পুষ্ট করেন। 'পাষাণপুরী' তাঁর গোড়ার দিকের

উপন্যাস। জেলের নিরানন্দ পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের কয়েদীর জীবন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। দেশের অভ্যস্ত পরিবেশে এদের অনেকেই মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছে। মাঝে মাঝে কারুর মধ্যে মনুষ্যত্বের চকিত স্ফুরণ দেখা যায় মাত্র। কিন্তু অনশনব্রতে মৃত্যুবরণকারী নরুই একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বে জেলের অমানুষিক পরিবেশে মানব-মহিমার ক্ষণিক স্পর্শ এনেছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে আদর্শ 'সার্থক জীবন'-কল্পনাই প্রেরণাস্থল বলে মনে হয়। ধাত্রীদেবতায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও আদর্শরূপের প্রকাশ হয়েছে শিবনাথেব চরিত্রে। পিসীমাব দৃঢ় চরিত্র ও জমিদাবী গর্ব তাকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও জমিদারীব মধ্যে সে নিজের জীবনকে সীমিত রাখতে পারে নি মায়েব চরিত্রপ্রভাবে। মাযের আত্মমর্যাদাবোধ, দেশপ্রেম, সুরুচি ও সহনশীলতা ও 'আনন্দমঠে'র আদর্শ সঞ্চার তাকে স্বদেশকে খুঁজতে প্রেরণা দিযেছে গ্রামের মানুষেব মধ্যে, শহরের মানুষের মধ্যে। জমিদারীব অবক্ষয় ও রামরতনেব সর্বস্বত্যাগ তাকে জমিদারী-বিষয়ে মোহমুক্ত করেছে। সমস্ত মানুষের সঙ্গে আত্মযোগেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব এই বিশ্বাস তাব জেগেছে। মহামারীর সমযে সেবার সুযোগ পেযে শিবনাথ দেশেব দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও শোষণের রূপ দেখেছে। সংগঠন শক্তির প্রতি তাব আস্থা জেগেছে, স্থৈর্য এসেছে চরিত্রে। এই সেবাব মধ্য দিয়েই বৈপ্লবিক কর্মসাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, এবং বৈপ্লবিক কর্মপন্থার অমানুষিক হত্যাকাণ্ড তাকে ওই পথে এগোতে দেয় নি। বরং সংগঠনাত্মক কর্মপদ্ধতিতে দেশের জনজীবনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাই তার বড হলো। এক্ষেত্রে কিছুকাল আগেকাব বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে (১৯০৮) ভেদ-হিংসার পথ ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংগঠনাত্মক আহ্বান-বাণী এবং পরবর্তীকালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের জাতীয় অভ্যুত্থানেব আদর্শ শিবনাথ চবিত্র-গঠনে লেখককে প্রভাবিত করেছে। শিবনাথ তাই অসহযোগে যোগ দিয়েছে। দেশ ও মানুষকে সে একাত্ম দেখেছে।

কাজেই এই রাজনৈতিক চেতনা তাবাশঙ্কবের কাছে দেশ গঠনের চেতনা। সে চেতনায় অতীত ও বর্তমান সমাজব্যবস্থার অভিজ্ঞতা অনিবার্যভাবে কাজ করেছে। তারই ফলে গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে একটি সামগ্রিক গ্রামীণ সমাজচিত্রকে তুলে ধরবার চেষ্টা দেখা যায়। এবং সেইজন্যই গ্রামজীবনের বিপর্যয় ও চাষীদের অসহায়তার মধ্যেও দেবু ঘোষকে কল্যাণকর শক্তির প্রতীকরূপে দেখি। লক্ষ্যভ্রষ্ট

গ্রাম্য সমাজজীবনে অপরিহার্য বণিক্‌ধর্মিতা যে অনিশ্চয়তা এনেছে, দেবুর কণ্ঠে তারই প্রতিবাদ শুনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের ছবি পাই 'মন্বন্তর' এবং 'ঝড় ও ঝরা পাতা' বই দুটিতে। মন্বন্তরে বোমাবর্ষণভীত বিমূঢ় কলকাতাব ছবি আছে। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট মানুষের মিছিল, রেশনব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারুণ দুর্গতি, গান্ধীজির অনশন উপলক্ষ্যে দেশের উদ্বেগ ইত্যাদি চলতি কালের ছবি ধরা আছে, কিছুটা সাংবাদিক-সুলভ মনোবৃত্তিতে। তবে এই সংবাদ-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এক যুগেব অবসান এবং নতুন যুগের শুভকামনা ও অধ্যাত্মবিশ্বাসকেও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। তবে এখানে গ্রামজীবনের ছকে বংশধারায় সংস্কারগত-ভাবে বিকাবলক্ষণের প্রকাশ লেখকেব নাগরিক সমস্যার প্রতি অগভীর ঔৎসুক্যই প্রমাণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, লেখক স্বক্ষেত্র থেকে সবে এসে চলতি শহরজীবনকে সাংবাদিকেব ভঙ্গিতে আনতে পাবেন বডজোর। তাঁর মূল সমস্যার ছক গ্রামেও যা, শহরেও তাই।

(আজাদ হিন্দ ফৌজেব নাযক বসিদ আলীর মুক্তির দাবিতে (১৯৪৩) যে উত্তেজনা দেখা দিযেছিল তাতে আর কিছু না হোক রাজনৈতিক চেতনা যে সম্প্রসারিত হয়েছিল তার প্রমাণ গোপেনের জীবনে, তার মেয়ে নেবুর মৃত্যুবরণে এবং কানুব পবিবর্তনে প্রকাশ পেয়েছে। মনে বাখতে হবে, ইতিপূর্বেই (১৯৪২। ফ্যাশিস্তবিরোধী লেখক সম্মেলনে তাবাশঙ্কর সভাপতি হয়েছেন। লেখক-সঙ্ঘেব দপ্তবে তাঁর যাতায়াত চলেছে। কিন্তু বিদেশী কম্যুনিষ্ট লেখকদের সম্পর্কে (আরাগঁ এবং রোজাব গারোদির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার কথা চিন্মোহন স্নেহানবীশ বলেছেন।) আলোচনায় তাঁর অনীহা এসে যায়। দেশের বাজনৈতিক পবিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা দেশীয় পদ্ধতিতেই করতে হবে এমন একটা মনোভাব তাঁর গড়ে ওঠে। তবু ফ্যাশিস্তবিরোধী লেখকসঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা ছিল। ১৯৪৫ পর্যন্ত দেখি, তারাশঙ্কর লেখক-সঙ্ঘের সভাপতির ভাষণ দিয়ে নব-উদ্বুদ্ধ গণচেতনায় আস্থা রেখেছেন। কিন্তু মার্কসবাদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে—ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিকে তিনি বাস্তব-সম্মত বলে মানতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত। মানবিক প্রেমের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে তিনি ছাডতে পারেন নি। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী-কাল নিয়ে লেখা উপন্যাস 'কালান্তরে'র মধ্যে বামপন্থী-চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অহিংস

সপ্রেম সাধনার সমান্তরাল প্রকাশে দ্বিতীয় চিন্তাটিরই প্রাধান্য দেখি। কিন্তু এই দুটি চিন্তাই আরোপিত তত্ত্বের মতো। কাহিনীর সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত নয়।

পরবর্তীকালে রচিত (অন্ততঃ ১৯৬০ পর্যন্ত লেখা) গল্প-উপন্যাসগুলিতে সমকাল ছায়া ফেলেছে বটে, তবে তেমন প্রকটভাবে নয়। দেশ ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ, চরিত্রসৃষ্টি, নৈতিক সমস্যা ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস 'বিচারক', 'সপ্তপদী', 'বাধা', 'উত্তরায়ণ', 'মহাশ্বেতা', 'যোগভ্রষ্ট' ইত্যাদিতে চিহ্নিত হয়েছে।

ষাটের দশকের প্রথম দিকে জওহরলালের প্রধানমন্ত্রিত্বে কংগ্রেসের সমাজবাদী স্বপ্ন কিছুটা কার্যকর করার চেষ্টা দেখা গেলেও মূলতঃ ব্যর্থ হলো। জওহরলালের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের স্বপ্নকে বামপন্থীরা 'বুর্জোয়ার স্বপ্ন' বলে উড়িয়ে দিলেন। তেলেঙ্গানার হিংসাত্মক কৃষিবিপ্লব নেহরুকে কম্যুনিষ্টদের আদর্শ সম্পর্কে রীতিমতো সন্দিহান করে তুললো। পশ্চিমী লিবারালিজ্‌ম্ আর গান্ধীবাদের প্রভাব নেহরুর মনে হিংসাত্মক-পদ্ধতিতে বিরাগ এনেছিল। কিন্তু বিরাগ আনলেও ব্যবসায়িক শ্রেণীর আধিপত্য এবং মালিক-শ্রমিকের পার্থক্যকে দূর করবার কোনো সক্রিয় কর্ম-পদ্ধতি তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসে মধ্যে দেখা দেয় নি। তবু, চীন আক্রমণ-সত্ত্বেও নেহরুর ব্যক্তিত্ব কংগ্রেসকে কিছুটা সংহত করে রেখেছিল। অন্য দিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির অবস্থা কিছুটা উন্নত দেখা গেল ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে। নেহরুর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যস্থতায় কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীরা সংহত ছিল। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের বামপন্থী-মনোভাবের প্রতি বেশি ঝুঁকলেন। তরুণ-তুর্কীরাও তাঁর দলে। শেষপর্যন্ত ১৯৬৯-এ কংগ্রেস ভাগ হযে গেল। ইন্দিরা-গোষ্ঠী পরিপূর্ণ সমাজবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে নিজেদের ঘোষণা করলেন। নিজলিঙ্গাপ্পা-পাতিল-অতুল্য ঘোষের প্রবীণ গোষ্ঠীকে তাঁরা আদর্শগতভাবে গোঁড়া বলে রায় দিলেন। এদিকে চৈনিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে রুশপন্থী ও চীনপন্থী ভাগ হয়ে গেল। কেরালা ও পশ্চিম বাঙলায় চীনপন্থী সি. পি. এম-এর সমর্থক বেশি দেখা গেল। অবশ্য সর্বভারতীয়-ক্ষেত্রে রুশপন্থী সি. পি. আই-এর প্রাধান্য বজায় রইল। ১৯৬৭-র নির্বাচনে পশ্চিম বাঙলায় সি. পি. আই-এর চেয়ে সি. পি. এম. বেশি স্থান পেল বিধান সভায়। কংগ্রেস-বিরোধী বিভিন্ন দল মিলে যুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট তৈরি করলো। নভেম্বরেই এই মন্ত্রিসভার পতন হলো। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট সরকার আবার মন্ত্রিত্ব পেল। সি. পি. এম. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে প্রাধান্য পেল।

পার্টির নেতারা শাসনযন্ত্রের ভেতরে থেকেই শ্রমিক ও কৃষক সমাজে নিজেদের সমর্থন বাড়িয়ে মার্কসীয় সমাজবাদের প্রতিষ্ঠায় মন দিলেন। সি. পি. আই-এর সঙ্গে আপোষমীমাংসার নানা চেষ্টা হলো, কিন্তু ফল হলো না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পার্টি দলীয় জনমত বৃদ্ধির জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। আর্থিক শোষণে ক্লান্ত, দরিদ্র, উদ্বাস্তুময় এই পশ্চিম বাঙলায় দলীয় সংঘর্ষ অনিবার্য হলো। জনজীবনে নিরাপত্তা রইল না। ১৯৫২ সালের মার্চে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন হলো মূলতঃ এই দলীয় সংঘর্ষকে কেন্দ্র ক'রে। ওদিকে নবোদ্ভূত সি. পি. আই (এম এল.) পার্লামেণ্টারি প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে নির্বাচন বয়কট করলো। সি. পি এম এই নীতিকে লেনিন-নীতি-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। দেশে খুন জখম হত্যার লীলা চলতে লাগলো। এই অস্থির পরিবেশ কিন্তু সমকালের সাহিত্যকে খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করে নি। দুচারজন লেখকের রচনায় এই অস্থির জীবন চিত্রিত হয়েছে। বোধ হয় সমরেশ বসু, গৌরকিশোর ঘোষ এবং অসীম রায় এই অস্থির অবাজক চিত্রকে কিছুটা সার্থকভাবে উপন্যাসে ফুটিয়েছেন। 'সুতপার তপস্যা' বইটিতে তারাশঙ্কর এই বিচিত্র দলের বিকাশ, দলীয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং জনজীবনের বিপর্যয়কে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছেন। মহৎ দুঃখের মুখোমুখি এনে চরিত্রগুলিকে সত্যসন্ধানের ব্যাকুলতায় জীবন্ত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'সুতপার তপস্যা'র পরিণতি অস্পষ্ট থেকে গেছে।

অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তানের ওপর পশ্চিমপাকিস্তানের অন্যায় অত্যাচার রূপ নিল মুজিবের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। প্রচণ্ড সংগ্রামে বহু রক্তক্ষয় ক'রে তার স্বাধীনতা এলো। ভারতীয় সমর্থনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ লাগলো। ঢাকার পতন হলো। বাঙলা দেশ স্বাধীন হলো। তারাশঙ্কর এই স্বাধীনতা সংগ্রামকেও রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন 'একটি কালো মেয়ের কথায়'। কিন্তু প্রচলিত টাইপ চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত এর কাহিনী-বিন্যাস সংহত হয়নি। অনেকটা 'মন্বন্তরে'র মতো রিপোর্টাজ হয়ে গেছে।

৩

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিভূ হয়েও তারাশঙ্কর দেশসেবার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রায় ষাট বছরের ইতিহাসকে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে ধরে রেখেছেন সেই 'চৈতালি

ঘূর্ণী'-'পাষাণ পুরী'র আমল থেকে '১৯৭১' পর্যন্ত। কিন্তু দেশ-কাল সম্পর্কে তাঁর প্রচুব অভিজ্ঞতা (বিদেশ-ভ্রমণও যে অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ছিল) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কতকগুলি বাঁধা ছকে প্রকাশিত হয়েছে। জমিদারীর সৎ আদর্শ দেখিয়েছেন সমাজসেবার মধ্য দিয়ে। 'কালিন্দী' ও 'ধাত্রী দেবতা'র মধ্যে তার প্রমাণ মিলবে। জমিদারের অত্যাচার দেখিয়েছেন 'জলসাঘরে' 'রায় বাড়ি'তে, 'জবানবন্দী'তে, 'রাজা, রানী ও প্রজা', 'রাজপুত্র' ইত্যাদি গল্পে। কিন্তু জমিদারী প্রথার বিলোপেও হাহাকারই ফুটেছে বেশি। অত্যাচারী জমিদাররা যেন ট্র্যাজিক হিরোর মতো নানা গুণে ভূষিত হযেও কোনো একটি দোষে বা প্রতিকূল ব্যবসায়িক শ্রেণীব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায পরাস্ত হবার আগে শেষ মানবমহিমার শিখাটি জ্বেলে দিয়ে গেছেন। যেখানে গরিব চাষী জমিদারের অত্যাচারেব শিকার হয়েছে সেখানেও শিল্পাঞ্চলে তার আশ্রয় গ্রহণ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয ('চৈতালিঘূর্ণি')। শিল্পাঞ্চলেব তরুণ নেতৃত্ব দিশাহারা হয়ে যন্ত্রসভ্যতার মধ্যে সফল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সে স্বপ্ন স্পষ্ট নয়। নতুন কালের বৈজ্ঞানিক মনোভাব যেখানে প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত সেখানেও বৈজ্ঞানিক মনোভাবেব প্রতীক চরিত্র ('আবোগ্যনিকেতনে'ব প্রদ্যোৎ ডাক্তার) প্রাচীনের সহিষ্ণুতার কাছে, মৃত্যুর স্বরূপ-সন্ধানের কাছে নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। এই প্রাচীন বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও আভিজাত্য নানা রূপে আমরা রাবণেশ্বর, বিশ্বম্ভর, সীতাবাম কিংবা বনোয়াবী চবিত্রের মধ্যেও দেখেছি।

নগরজীবন নিয়ে অথবা নাগরিক মানুষের সমস্যা নিয়ে তারাশঙ্কর যে সব গল্প-উপন্যাস লিখেছেন সেখানে সমকাল তার ছাযা ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যাটা নগরকেন্দ্রিক হযে ওঠে নি। নাগবিক মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যার কাহিনী তাঁর উপজীব্য নয়। সেখানেও, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, দুঃখ থেকে মুক্তির সাধনা, পাপ-স্বীকারের চেষ্টা ('বিচারক' উপন্যাস), মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিব উন্মোচন ('কান্না', 'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি' গল্প দুটি স্মরণীয) লক্ষ্য করি। হিংসাশ্রয়ী বাজনীতির পিছনে তারাশঙ্কব খোঁজেন রাজনীতির মত-পার্থক্যজনিত দাম্পত্যবিচ্ছেদ (সুতপার তপস্যা)। এই ধরণের সত্য-সন্ধানে নাগবিক সমস্যাব মূলানুগামী হওয়া যায় না। তারাশঙ্কর তাই নগব-কেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন। তাঁর অর্থ নৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা, নৈতিক চেতনা পরস্পর কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হয়নি।

কিন্তু তারাশঙ্কর স্বক্ষেত্রে অনেকখানি স্ফূর্ত মনে হয়। সে ক্ষেত্রটি হলো দেশের ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনী রচনায়—যে বাঙলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব পাশাপাশি রয়েছে, যে দেশের লোকসমাজে নানা সংস্কার, কিংবদন্তী, বিশ্বাস, অধ্যাত্ম-সাধনা অদ্ভুত নাটকীয় জীবনকে উৎসারিত করছে। এবং এই ক্ষেত্রে লেখক যতই পশ্চাৎপবাযণ মনোভাবের প্রমাণ দিন না কেন, এটুকু তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সমসাময়িক দেশ-কাল যেমন সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রেরণাস্বরূপ, তেমনি ঐতিহ্যও সৃষ্টির নাড়ি-স্পন্দনে উপলব্ধি করা যায়। রাজনৈতিক চেতনাকে যেমন তিনি বহুক্ষেত্রে আরোপিত আদর্শের মতো কাহিনীর মধ্যে জুড়ে বাঁধা ছকে ফেলে দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কোনো আরোপিত আদর্শ তাঁর অভিজ্ঞতাকে কৃত্রিম করতে পাবেনি। দেশেব ইতিহাস তো শুধু রাজনৈতিক ঘটনাবলী নয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের নানা সমস্যা এবং বিভিন্ন ধর্ম ও লোকসংস্কৃতিব উদ্ভব ও বিকাশেব সমন্বিত রূপই হলো ইতিহাস। তারাশঙ্কব বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাব শিল্পী ঠিকই। কিন্তু শিল্পী হিসাবে ওই ইতিহাসেব সার্থক রূপকার নন। ধর্ম ও লোকসংস্কৃতি—যা বাইরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পবিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে—সেই সংস্কৃতি তাঁর হাতে যতটা সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস ততটা সার্থক রূপ পায় নি। এ ক্ষেত্রেও তারাশঙ্কবের বচনাশৈথিল্য ও নাটকীয়তা প্রকট ঠিকই, তবু লোককথার রূপকাব হিসাবে ওই ত্রুটিগুলি যেন ওই উপকথা বা কাহিনীর স্বভাবধর্মেব মতো মনে হয়। 'কবি', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যাব কাহিনী' কিংবা 'অবণ্যবহ্নি'র মতো উপন্যাস লোকধর্ম-কথার শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ বলে স্বীকৃতি পাবে এবং বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের রচনার কোনো পূর্ব-নিদর্শন তাঁকে প্রেরণা দেয নি বলেই এগুলির সাফল্য আরও বিস্ময়কর। 'রাধা' উপন্যাসটিও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তবে 'রাধা'র মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী কাহিনীব অন্তর্জীবন বা অন্তর্নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তবু বাঙালীর ধর্মচেতনার বিবর্তনও যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে—শুধু ঐতিহাসিক নামী চরিত্র নয়—এই সত্য এই উপন্যাসেও প্রকাশিত।

এই লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যেব প্রতি আকর্ষণ সাধারণভাবে দুটি স্পষ্ট ধারণায় প্রকাশিত হয়েছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। একদিকে তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনাকে আশ্রয় করে, অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর লোক-জীবনের বলিষ্ঠ জীবনধর্মকে আশ্রয়

করে (যেমন ডোম, কাহার, বেদে, সাঁওতাল ইত্যাদির জীবনকে আশ্রয় ক'রে)। 'রাইকমলে'র মধ্যে হিন্দুসমাজদুর্লভ স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা ও সূক্ষ্মকলাচর্চার পারদর্শিতা, চারিত্রিক ঔদার্য ও গৌরব চমৎকারভাবে প্রকাশিত হলেও বৈষ্ণব প্রণয়ের অপার্থিবতার সূক্ষ্ম সৌরভ পদাবলীর সুরে বাঁধা বলেই সাধারণ বৈষ্ণব-মানুষের পক্ষে একটু বিসদৃশ ও অতিরঞ্জিত মনে হয়। তবু বলবো, এই বৈষ্ণব জীবনগাথার প্রকাশ নিবিড় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি এবং কোনো বহিরাগত আদর্শের আরোপে তা আড়ষ্ট নয়। প্রথম জীবনের গল্প 'রসকলি' ও পরবর্তীকালের 'প্রসাদমালা' এই বৈষ্ণব ঐতিহ্যের নিবিড় সংযোগে স্পষ্ট। 'রসকলি'র মধ্যে রাইকমলের আভাস আছে। যাই হোক, এই দুই গল্পের নায়িকারা বাস্তবজীবনে প্রেমে আঘাত পেলেও বৃহত্তর প্রেমের আস্বাদ পেয়ে তৃপ্তি পেয়েছে। 'স্বর্গমর্ত' উপন্যাসের ব্রজদাসীও বাস্তবজীবনে আঘাত পাবার পর পরের সন্তান দুলালকে কাছে টেনে নিয়ে নিবিড় ও মহৎ বাৎসল্যে দিব্য আনন্দের স্পর্শ পেয়েছে। 'রাইকমল' কিছুটা ভাবালু, 'স্বর্গমর্ত' কিছুটা অপ্রয়োজনীয় রকমের জটিল। অভাবকে অতিক্রম ক'রে প্রাপ্তির আনন্দ এবং বিচ্ছেদজয়ী পূর্ণতার আভাস তারাশঙ্করকে বুদ্ধিদীপ্ত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার বদলে বিশ্বাস-নির্ভর অধ্যাত্ম-সাধনার দিকেই টেনে নিয়ে গেছে।

মৃত্যুকে জয় করবার যে সাধনা তান্ত্রিক পদ্ধতির মূল কথা, সে-সাধনাও তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করেছে। 'প্রতিধ্বনি' গল্পের রসরাজ পাগলের শোকাহত মৃত্যু-জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে পূর্ণতা-প্রাপ্তির সাধনায় এই পদ্ধতির প্রভাব রয়েছে। কিন্তু তান্ত্রিক আদর্শ কতটা গ্রহণীয় সে বিষয়ে লেখকের সংশয় আছে। প্রমাণ 'খড়্গ' গল্প। হৃদয়ধর্ম পেষণ করে বলিদানে পুণ্যসঞ্চয় করার চেষ্টায় ছেত্তা কর্মকার সন্তুষ্ট হয় নি। আরও প্রমাণ 'চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস' কিংবা 'ছলনাময়ী' গল্প। 'চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাসে'র তান্ত্রিকোচিত নির্মম অনাসক্তি মানুষের অর্থলোলুপতাকে নষ্ট করতে পারেনি। 'ছলনাময়ী'তে কলিয়ারির ম্যানেজারের সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় শবসাধনা, জামাতাকে হত্যা, বিধবা কন্যার কথা মনে করে শবসাধনা, মানবধর্মের সঙ্গে আচারপ্রধান ধর্মের দ্বন্দ্ব অনেকটা রাবীন্দ্রিক মানবধর্মের স্মারক। ধর্মসাধনার নামে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ বলেই লেখকের মনে হয়েছে। তার বদলে সংসারের সীমানায় মানবিক প্রেমে ঈশ্বর-প্রেমের সন্ধান— অর্থাৎ বৈষ্ণব আদর্শই তারাশঙ্করের বেশী অভিপ্রেত মনে হয়। কাজেই শাক্ত

পদ্ধতির মধ্যে যে অভাববোধ রয়েছে তা পূরণ করেছেন বৈষ্ণব প্রেমের নিবিড় আনন্দ প্রাপ্তিতে।

কিন্তু বৈষ্ণব ও শাক্ত ছাড়া অন্য যে-সব লৌকিক সমাজজীবন তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়, সেখানে একদিকে যেমন তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি মানুষের উদ্বেল আবেগের প্রতি তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পৌবাণিক সংস্কৃতির প্রভাব সমাজেব নিম্নস্তব পর্যন্ত কী ভাবে প্রসারিত তার প্রমাণ 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল। নিম্নশ্রেণীর সমাজে যে বিকৃতরুচির পরিবেশ থাকে তার থেকেই নিতাই তার কবিত্বশক্তিকে কিছুটা সুরুচি ও সৌকুমার্যে উন্নীত করেছে। নিবিড বাস্তব অভিজ্ঞতাই তার গানে গুঞ্জরিত হয়। অন্যান্য মেযে পুরুষে মিলে যে পবিবেশ গড়েছে, তাতে গতিশীল জীবনযাত্রার ক্ষণিকতা ও স্বার্থপরতার সঙ্গে নির্বন্ধন আনন্দের উচ্ছ্বাস ও পারিবারিক মাযামোহ মিশেছে। বসনের চরিত্রে উদ্দাম প্রবৃত্তি ও ভোগস্পৃহার সঙ্গে আত্মধিক্কার ও প্রেমের একনিষ্ঠা ওই পরিবেশে খাপ খেয়েছে সুন্দবভাবে। কোনো সাহিত্যিক আদর্শ আরোপের চেষ্টা নেই 'রাইকমলে'ব মতো। ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাই-এর সম্পর্ক আঞ্চলিক প্রাকৃতিক সিম্বলে চমৎকারভাবে ব্যঞ্জনা পেয়েছে। নিতাইযের হীনজাতিমন্যতা, কবিসুলভ আভিজাত্য ও অতৃপ্তিবোধ চমৎকারভাবে সমন্বিত। 'পঞ্চপুত্তলী' উপন্যাসে নীচকুলে জন্ম মৃৎশিল্পী মলিনের মধ্যেও নিতাইযের মতো প্রেম ও শিল্পানুবাগের মিশ্রণ চোখে পড়ে। তবে নিতাইযের প্যাশ্যান কিছুটা শান্ত ও মধুর, মলিনের প্যাশ্যান তীব্র ও উত্তেজিত। তবে শেষপর্যন্ত নিতাই যেমন মহৎ উপলব্ধির আনন্দ পেযেছে, মলিনও তেমনি তার সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও তীব্র কামনাকে ঈশ্বর-ব্যাকুলতায উন্নীত করতে পেরেছে। মানবিক আবেগকে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তায় সংযত না করে ঐশ্বরিক অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদে ঝুঁকেছেন তারাশঙ্কব।

'হাঁসুলিবাঁকেব উপকথা' যদিও তারাশঙ্করের নির্দিষ্ট ছকে (ছক বলতে প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্ব, শিল্পাহত কৃষি-নির্ভর জীবনের ছবি ইত্যাদি বোঝাচ্ছি) পড়ে, তবু কাহারদের পটভূমি অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। আঞ্চলিক শব্দ, উচ্চারণ ও প্রবাদ-প্রবচনের প্রযোগে কিছুটা আডষ্টতা এলেও বলবো জীবন্ত। লেখায় কৌশলের অভাব আছে, পুনরাবৃত্তি আছে, প্রসঙ্গে আসতে দীর্ঘ সময় লেগেছে, তবু অভিজ্ঞতার নৈকট্য ও প্রাচুর্যে কাহারদের প্রবৃত্তি-তাড়িত অলৌকিক ভয়ভীত লোকজীবনকে লেখক যেন নখদর্পণে দেখছেন। নতুন শিল্পায়নের ফলে ঐতিহ্যচালিত কাহার-

সমাজের ভাঙন এসেছে, যুদ্ধের পরিবেশে কাহাবদের জীবিকান্বেষণে শিল্পমুখীনতা এসেছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের সংস্কৃতিগত অবলুপ্তি ঘটেছে। সেই প্যাশান-দীপ্ত মানুষগুলিকে হারিয়ে শিল্পীর যেন ক্ষোভের সীমা নেই। যে নাটকীয়তা তারাশঙ্করের অনেক গল্প-উপন্যাসের ত্রুটি সে নাটকীয়তা এই নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্যাশানে যেন রক্তের মতো মিশিয়ে দিয়েছেন লেখক। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' একটি লৌকিক সমাজের আমূল বিস্তার ও বিপর্যয়ের বৃহৎ ছবি। নিয়তির হাতে জীবনের এই নির্মম দুর্জ্ঞেয় বিচার জীবনকেই দুরূহ, অনায়ত্ত ও ব্যাপক করে তুলেছে।

এইরকম প্রবৃত্তি-তাড়িত লৌকিক জীবনরহস্যের আর একটি প্রমাণ 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী'। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র নায়কেরা কাহার, এখানকার নায়ক-নায়িকারা বেদে। হাঁসুলিবাঁকে যেমন হিন্দু সমাজের গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা কাহারদের জীবন থেকে বিচ্ছুরিত, 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তেও হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর আর একটি জাতি—বেদেদের সংস্কার-বিশ্বাস দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির বলে উদ্‌ঘাটিত। হাঁসুলিবাঁকের পবিবেশ যেমন তথ্যঘন, এখানকার পরিবেশেও সেই ঘনত্ব আছে। হাঁসুলিবাঁকের তুলনায় প্রকবণগত শৈথিল্যও এখানে কম। নদীমাতৃক সর্পসঙ্কুল বাঙলাদেশে যে কারণে মনসাপূজা প্রচলিত হয়েছে, সেই কারণে বিষবৈদ্য বেদে-জীবনে জটিল বিধিনিষেধ এবং অন্ধবিশ্বাসের আবেগ সমন্বিত হয়েছে। বেদেদের সাঁতালি-গ্রাম সাপের বিষনিঃশ্বাসে এবং অলৌকিক বিশ্বাস-কল্পনায় ও নিয়তিবাদের মিশ্রণে যেন এক মধ্যযুগীয় জগৎ। বেদেরা যেমন হিন্দু সমাজ-বহির্ভূত হয়েও হিন্দুসমাজ-লগ্ন, তেমনি তাদের বিশ্বাসের জগৎ আর্যধর্ম থেকে পৃথক হয়েও আর্য পুরাণ-কল্পনা ও উদ্ভট কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। দলপতি শিব-বেদে তাদের লৌকিক সমাজের জীবননীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নাগিনীকন্যা তাদের দৈবী-সন্তোষ-অসন্তোষের অলৌকিক তত্ত্বটি ধ্যানে প্রকাশ করে। এই দুই ব্যক্তিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বেদেদের সমাজে চিরকাল আবর্তিত হচ্ছে। শির-বেদের অলৌকিক শক্তি নেই। কিন্তু নাগিনীকন্যার মধ্যে দৈবশক্তি আছে, দিব্যদৃষ্টি আছে। বেদেদের সমাজ-জীবন তারই শক্তিতে চালিত হয়। উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেদেদের সমাজজীবনকে গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ করেছে। নাগিনীকন্যার যৌনকমনার জ্বালা তাকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে এবং এক তরুণ বেদের প্রতি আসক্তি তার ব্রতচ্যুতি ঘটিয়েছে। অন্যদিকে শিরবেদে তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে নাগদন্তের আঘাতে মৃত্যুবরণ

করেছে। শেষ পর্যন্ত নাগিনীকন্যার ব্রত ছেড়ে এক মুসলমান বেদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। তার পরবর্তী নাগিনীকন্যাও প্রেমে পড়ে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সর্পদংশনে প্রাণ হারিয়েছে। তার ব্যর্থ প্রেমিক শিববেদেকে হত্যা করে সাঁতালি গ্রাম থেকে সমস্ত বেদেদের উদ্বাস্তু করে তাড়িয়েছে। নাগিনীর আচার-আচরণ, তার লাস্যভঙ্গিমা, মানবী-নাগিনীর সমন্বয় অত্যন্ত প্রত্যক্ষবৎ মনে হয়। যে কালনাগিনী লখিন্দরকে বিষকন্যার ছদ্মবেশ ধরে প্রতারিত করেছিল সেই যেন নাগিনীকন্যার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। পৌরাণিক কল্পনা ও ধর্মসংস্কার প্রবল কল্পনাশক্তির বলে প্রাণময় হয়েছে। হিংস্র সাপিনীর মধ্যে মাতৃত্বের স্নেহরস ও দেবীত্বের ভক্তিরস যে মিশেছিল তাতে সাপিনী-মানবীর এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। হিজলবিলের হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য এবং অরণ্যের মধ্যেকার প্রাণীদের সংস্কার ও সংকেতময় গতিবিধি এই নাগিনীকন্যাকে এক উপযুক্ত পরিবেশে একাত্ম করেছে। নাগিনীকন্যার ক্রিয়া-কলাপ দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। লেখকের কল্পনা বলে সেই নাগিনীকন্যার গুহ্যতত্ত্ব স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। শুধু কল্পনাশক্তি নয়, অন্তর্দৃষ্টিও সমান দক্ষতায় সক্রিয়। প্রাচীন জমিদার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবান তারাশঙ্কর যে অনেক বেশী ঐতিহ্যমুখী তা যেমন দেশ-কাল-চেতনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, তেমনি ঐতিহ্যপরম্পরাগত লৌকিক জীবন ও ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় তিনি যে অনেক বেশী সহজ-দক্ষতা রাখেন তাও বুঝতে দেরি হয় না। মনে হয়, উপন্যাস নয়,—কাহিনী, উপকথা বা রূপকথার এক অদ্ভুত স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে ছত্রে ছত্রে। মনে হয়, উপন্যাস-পূর্ব যুগের মানবিক প্যাখ্যানের কোনো ভুলে-যাওয়া নাটকীয় নিবিড় জীবনরসময় কাহিনীর জাল বুনছেন তারাশঙ্কর। এই কারণেই পরবর্তীকালে নগর-পটভূমি নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখতে গিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে যখন লিখলেন 'অরণ্য বহ্নি', তখনই আবার তাঁকে সহজ হতে দেখা গেল। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র কবিরাজ শিবরাম সেন তাঁর আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের মুখ থেকে যে-কথাগুলি শুনেছিলেন, তারাশঙ্করের শিল্পীমনের ধাতুগত প্রবণতা যেন সেইদিকেই। ধূর্জটি কবিরাজ শিবরামকে বলেছিলেন :

বেদেদের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করি কেন জান? আর, আমার মমতাই বা অত গাঢ় কেন জান? ওরা হল ভূতকালের মানুষ।—জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আচারে ব্যবহারে, রীতিতে-নীতিতে, পানে-ভোজনে, বাক্যে-ভঙ্গিতে, পরিচ্ছদে-প্রসাধনে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু যারা নাকি

আবণ্যক, তারা প্রতিবারই প্রতিটি বিপ্লবের সময়েই গভীরতর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তাদের আরণ্য প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখলে। সেই কারণেই এরা সেই ভূতকালের মানুষই থেকে গিয়েছে।

শুধু বেদে কেন, ডোম-বাগদি-কাহার-সাঁওতাল-বেদে এই সবই দ্রুত বিলীয়মান লোকসংস্কৃতির মানুষ। আর এই মানুষদের স্বধর্ম-বিকৃতির মধ্যে জীবনের যে স্ফূর্তি ছিল তাই তারাশঙ্করকে গাঢ় মমতায় টেনেছে। এই স্ফূর্তি বিলীয়মান উচ্চশ্রেণীর জমিদারদের মধ্যেও তারাশঙ্কর দেখেছেন। এই অতীতজীবন-স্ফূর্তিকে তারাশঙ্কর যতখানি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, দেশ-কালের পরিবর্তনে নানা বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী পরিবর্তনকে (দেশপ্রেম, নতুন সমাজব্যবস্থার আদর্শ, সামাজিক জটিলতা, নাগরিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি) ততখানি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি বলেই (কৃষি-নির্ভর জীবনযাত্রায় অর্থনৈতিক বিপ্লব হয়েছে বুঝেও বিদ্রোহের মধ্যে নতুন কালকে দেখান নি।) বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছকে সেই সমস্যাগুলি গল্প-উপন্যাসে বাঁধা পড়েছে। দেশ-কালের পরিবর্তন তাঁকে যতখানি উত্তেজিত করেছে ততখানি শৈল্পিক নিবাসক্তি দেয় নি। বরং সেই পরিবর্তনের উচ্চরোলের গভীরে যে অতীত সংস্কৃতির নানা স্থানিক বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে বা দ্রুত বিলীন হতে চলেছে, তাকেই তারাশঙ্কর গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন।

———

তারাশঙ্করের লোকসংস্কৃতি চেতনা ঃ দুটি উপন্যাস

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

সর্প-অভিপ্রায় (Snake Motif) সমস্ত পৃথিবীর একটি অতিপ্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়, পৃথিবীর বহু আদিবাসীর মধ্যে সর্প-অভিপ্রায় আছে। পৃথিবীর অনেক আদিম উপজাতির মধ্যে সর্প-সম্পর্কিত উপকথা, ইতিকথা নানারকম ধর্মীয় উপাসনা, আদিম-বিশ্বাস, সর্প-সম্পর্কিত ঔষধাদি ও সাহিত্য প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষে সর্পপূজার উদ্ভব সম্পর্কে গবেষক মহলে গবেষণার অন্ত নাই। জে, ফার্‌গুসন Tree and Serpent Worship নামক বইতে বলেছেন যে, সর্পপূজা সর্বপ্রথম ভারতের বাইরে তুরানীয় জাতির মধ্যে প্রবর্তিত হয়, তারপর তুরানীয় জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ ক'রে সর্পপূজা প্রবর্তন করে। সর্পপূজার সঙ্গে আর্যজাতির কোন মৌলিক সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তী যুগে আর্যদের মধ্যে এরই প্রভাবে সর্পপূজার প্রচলন হয়। অনেকে মনে করেন, ভারতীয় নাগগণ একটি বিশেষ জাতি, যারা সর্পকে জাতীয় অভিজ্ঞান (totem) রূপে ব্যবহার করতো। সর্প ও নাগকে একার্থবাচক শব্দ বলেও অনেকে মনে করেন না। তাঁদের মতে, নাগ বলতে সম্ভবতঃ গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ জাতীয় কোন উপজাতিকে বোঝাতো এবং সর্প বলতে প্রকৃত প্রাণীটিকে বোঝাতো। নিত্য স্নানের তর্পণ-মন্ত্রটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্‌সরসোঽসুরাঃ/ক্রূরাঃ সর্পা সুপর্ণশ্চ/তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ। দেখা যাচ্ছে, এখানে নাগকে যক্ষ গন্ধর্ব অপ্সরা ইত্যাদির সঙ্গে উল্লেখ করে সর্পকে 'ক্রূর' বিশেষণ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে নাগ একটি আর্যবিরোধী জাতি—আর্যদের সঙ্গে সর্বদা বিবাদে মত্ত। তখনও আর্য-সমাজে সর্প-পূজা ছিলনা বললেও চলে। এর পরবর্তী কালে আর্যেতর সমাজ থেকে জীবিত সর্প পূজার স্বতন্ত্র ধারাটি, খুব সম্ভবত নাগ ও সর্প এই দুইটি শব্দের

অর্থসাদৃশ্যের জন্য নাগজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে এসে মিলিত হয়, সমাজে নাগপূজার প্রবর্তন হয়। মহাভারতোক্ত নাগজাতির অধিপতি বাসুকি সর্পরাজরূপে পূজা পেতে আরম্ভ করেন এবং নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারু মুনির পত্নী বাঙলা-দেশে সর্পদেবী মনসায় রূপান্তরিত হন। একজন গবেষকের মতে, নাগ বলতে সরীসৃপ তো দূরের কথা, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিশেষতঃ তক্ষশীলা অঞ্চলের এক জাতীয় লোককে বোঝায়। এই সব জাতি সর্পফণাকে অভিজ্ঞান (totem)-রূপে ব্যবহার করতো বলে এদের নাগরূপে পরিচয় দেওয়া হত। এসব কারণেই মনে হয়, ভারতীয় সর্পপূজার মূলে কোন বহির্ভারতীয় প্রভাব নেই। সর্প গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা দুই-ই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং এদেশে সর্পের আধিক্য চিরকালই মানুষের ভীতি ও পূজার পাত্ররূপে ব্যবহৃত। জীবিত সর্পের পূজা দিয়েই এদেশে সর্পপূজার সূত্রপাত হয়।

আর্যদের সমাজে স্ত্রী দেবতার বিশেষ স্থান নেই। ভারতীয় প্রাগ্-আর্য-সভ্যতা থেকে মাতৃকাপূজার কাল এবং বাঙলার আর্যেতর ধর্মোদ্ভূত মাতৃপূজারই অন্যতম বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মনসাদেবীর কল্পনায়। পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাঙলা-দেশে এবং দক্ষিণ-ভারতের বহুজায়গায় আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ কার্যকর নয়। তাই বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতে মাতৃকা পূজার ব্যাপক প্রচলন। আর্য প্রভাবিত উত্তর ভারতের সর্বত্র সর্পকে পুরুষ দেবতা নাগরাজ, বাসুকিরূপে পূজা করলেও বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীসর্প দেবতারূপেই পূজিত। আর জীবিত সর্পের পূজার পরবর্তী অবস্থাই বিশেষ কোনো বৃক্ষকে সর্পাধিষ্ঠিত বিবেচনা করে সেই বৃক্ষের পূজা। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক, কারণ উভয়েই উর্বরতা-শক্তির প্রতীক। দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে মাটি অথবা প্রস্তরনির্মিত নাগমূর্তি স্থাপন করে অপুত্রক নারীরা ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করে। এতে বৃক্ষের ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা Fertility cult-এর সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশে মনসাবৃক্ষের মাধ্যমে মনসা পূজার প্রথা বৃক্ষোপাসনারই পরিচয় উপস্থিত করে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্রগ্রন্থ 'সাধনমালা'তে জাঙ্গুলী দেবীর পূজার উপকরণ ও তার মন্ত্রগুলি বিচার ক'রে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন যে, দেবী জাঙ্গুলীর সঙ্গে বাঙলার সর্পদেবী মনসা বা বিষহরীর সাদৃশ্য আছে। বাঙলার আর্যপূর্ব সভ্যতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার নিবিড় ঐক্য ছিল বলেই মনে হয়। সে জন্য বাঙলার সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মত দাক্ষিণাত্যেও বিভিন্ন নামীয় সর্পদেবীর অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। 'জাঙ্গুলী' শব্দটি যেমন সম্ভবতঃ

আর্যেতর শব্দ 'জঙ্গল' বা বন থেকে উদ্ভূত, সর্পদেবীর নামও আর্যেতর ভাষা থেকে উদ্ভূত।

বাঙলাদেশে সর্প-অভিপ্রায় আদিম বিশ্বাসজাত। সর্পদেবী মনসা বাংলাদেশে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পূজিত লৌকিকদেবী। সর্প সম্পর্কে বহু লৌকিক বিশ্বাস, ব্রতকথা, উপকথা, ইতিকথা বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে। তারাশঙ্করের নাগিনী-কন্যার কাহিনীর সর্বত্র এই সর্পসম্পর্কিত কাহিনী, উপকাহিনী, বিশ্বাস, সংস্কার, লৌকিক ও অতিলৌকিক কথা পরিব্যাপ্ত। তারাশঙ্কর কল্লোল যুগের লেখক। এ যুগের লেখকদেব অন্যতম অভিপ্রায ছিল, একেবাবে সমাজের নীচু স্তরে যে অসংখ্য মানুষেব জীবন প্রবহমান, যে সংস্কার-কুসংস্কার, যে আদিম বিশ্বাসের মধ্যে তারা জীবন আতবাহিত কবে তার সবটুকু তুলে ধরতে হবে সাহিত্যের মধ্যে। তাবাশঙ্কর এই জীবন ও মানুষকে দেখেছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে, ঘনিষ্ঠ ভাবে। ফলে তাদের জীবনকে তুলে ধবেছেন গণদেবতায়, কবিতে, হাঁসুলীবাঁকের উপকথায, নাগিনী কন্যার কাহিনীতে। হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম-শালুকেব বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিযে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কালীদহের কালীনাগ কালোঠাকুরের দণ্ড মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে।

এরই তীবে বাস করে বেদের দল, কিন্তু সাধারণ মল বা মাঝি বেদে নয়। সাঁতালীব বিষবেদে। ওই হিজল বিলের ধারে ভাগীরথীব চরভূমির ঘাসবন ঝাউবন দেবদারু গাছের সারির আড়ালে ওই হাউবমুখী নালার ঘাট থেকে চলে গেছে একফালি সরু পথ, দুদিকে ঘাসবন, মাঝখানে পায়ে পায়ে রচা পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ওই বিষ-বেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে বিষহরি মাযের 'আন' অর্থাৎ স্থান পর্যন্ত। এই সাঁতালী গ্রামের বিষবেদেদের লৌকিক জীবনের নানা কথা, উপকথা, ইতিকথা, বিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কারের কাহিনী রচনা করেছেন তারাশঙ্কর এই উপাখ্যানে।

উপন্যাসটির শুরু হয়েছে চাঁদ বেনে ও সাঁওতালী পাহাড়ের ধন্বন্তরির বন্ধুত্ব ও মন্ত্রশক্তির কাহিনী দিয়ে। তারাশঙ্কর মন্ত্রশক্তি (Magic Power)-কে এক অপূর্ব ছন্দে গেঁথে উপস্থিত করেছেন : জয় বিষহরি গ ! জয় বিষহরি/চাঁদো বেনে দণ্ড দিল। তোমার কৃপায় তরি গ ! চম্পাই নগরের ধারে/সাঁতালী পাহাড় গ। ধন্বন্তরির মন্ত্রে বাঁধা সীমেনা তাহার গ ! বিরিখ্যে ময়ূর বৈসে/গত্তে গত্তে

নেউল গ। বিষবৈন্ত বৈসে হেতায় বাণ্ডলা বাউল গ !' ধন্বন্তরি সাঁতালী পাহাড়ের সীমানায় সীমানায় গণ্ডী কেটে দিয়েছিলেন। ভূত পেরেত পিশাচ রাক্ষস ডাইন ডাকিনী বিষধর সেখানে ঢুকতে পারত না। বিশেষ করে বিষধর, নাগ-নাগিনী বিচ্ছু-বিছা, পোকা-মাকড়, ভিমরুল বোলতা—এরা ঢুকলে, কি সীমানার মধ্যে পা দিলে, নিশ্চিত মরণ ছিল—ময়ূরে নেউলে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলত। ধন্বন্তরি পৃথিবীর গাছপালা লতাপাতা বনফুল খুঁজে সাতসমুদ্দুরের তলা থেকে, স্বর্গলোকের ধন্বন্তরির বাগান থেকে পেয়েছিলেন যত বিষঘনী অর্থাৎ বিষঘ্ন গাছ-গাছড়া [দ্রঃ—নাগিনীকন্যার কাহিনী, ২য় সং পৃঃ ১৯]। মনসা-চাঁদ সদাগরের প্রচলিত সাহিত্যিক কাহিনীটি যা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বিশেষ সুসংস্কৃতভাবে প্রকাশিত, তারই একটি লৌকিক ইতিকথা (Legend) এখানে তারাশঙ্কব সুন্দর-ভাবে উপস্থিত করেছেন হিজলের তীরে বসবাসকারী বিষবেদেদের কাহিনীতে।

সর্প সম্পর্কিত নানা মন্ত্রমূলক ছড়া ও গান আছে এই উপাখ্যানে। যেমন : (১) এবাব নাগিনী নাগ ধরলে গুণগুণিয়ে—ঘুমপাডানী গানের মত বিষছডানী গান—বাসুকী দোলায় মাথা দোলে চরাচরয়ে—/তুই ঢল্ ঢলে পডরে। অনন্ত উগারেন সুধা তাই হলাহল রে—/ও তুই ঢল্ ঢলে পড়রে।/সে সুধা ধরে কণ্ঠে ভোলা মহেশ্বর রে— তুই ঢল্।লে পড়রে/ভোলার চক্ষু ঢুলু ঢুলু অঙ্গ টলমল রে—/তুই ঢল্ ঢলে পড়রে/অনন্ত শয্যায শুযে ঘুমান ঈশ্বর রে—তুই ঢল্ ঢলে পডরে [পৃঃ ৩০]।

ভাদ্রের শেষে নাগ-পঞ্চমীর দিন বিষবেদেরা মা মনসার গান গায আর অতীত দিনের পুরাকথাকে (Myth) স্মরণ করে। তুমড়ি বাঁশির একঘেয়ে শব্দের সঙ্গে বিষম ঢাকি বাজে, তার সঙ্গে শব্দ ওঠে ঝনাৎ ঝনাৎ—এক বিচিত্র ধাতব ঝঙ্কার :

লাচো লাচো কাল নাগিনী কন্যে গ। অ—গ
দুম্বু আমার সোনা হইল তু মাণিকের জন্যে গ। অ—গ
কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধার মন উদাসী গ! অ—গ
কালীদহে কালনাগিনী উমল জলে ভাসে গ। অ—গ
মোহন বংশীধারীর আমার নয়ন মন ভোলে গ!
ঝাঁপ দিল কালো কানাই রাধা রাধা বলে গ! অ—গ
কালোবরণ কালনাগিনী কালো চাঁদের পাশে গ। অ—গ
কালীদহের জলে যুগল নীলকমল ভাসে গ! অ—গ (পৃঃ ৩৯)

সাঁতালীর বিষবেদেদের মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাস: কালনাগিনী শির বেদেকে কথা দিয়েছিল যে সে কন্যা হয়ে তাদের ঘরে জন্মাবে। আজও সে বাক্যের অন্যথা হয়নি। পাঁচ বৎসর বয়সের আগে সর্পাঘাতে বিধবা হয় যে কন্যা তার দিকে সকল বেদের চোখ গিয়ে পড়ে। তারপর থেকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ষোল বছরের মধ্যে কিছু লক্ষণ ফুটলে তার বিয়ে হয়, আর না ফুটলে পুরানো নাগিনী কন্যেকে মরতে হয়, আর নতুন নাগিনীকন্যা তার স্থান নেয়। একজন শির-বেদের আমলে দু-তিন জন নাগিনীকন্যার আমল পার হযে যায়। বিষহরির পূজায় এই পুরানো স্মৃতি গীতরূপে উপস্থিত হয়:

ও আমার সাতজন্মের বাপ গ—তোরে দিছি বাক্ গ।
তোরে ছেড়্যা যাইলে আমার মুণ্ডে পড়বে বাজ গ! অ—গ!
এ ঘোর সঙ্কটে তুমি রাখলে আমার মানো গ। অ—গ।
জন্ম জন্ম তোমার ঘরে হইব আমি কন্যে গ।
তোমাব বাঁশির তালে তালে নাচব হেল্যা-দুল্যা গ। অ—গ।
আমার গরল হইবে সুধা তুমি বাবা ছুল্যে গ! অ—গ।
তোমার বংশ তোমার ঝাঁপি হইল আমার ঘর গ। অ—গ।
তুমি না করিলে পব হইব না মুই পর গ। [পৃঃ ৪০]

লৌকিক সংস্কার—বিষবেদেদের সংস্কার—'শিযাল ডাকবার আগে মেয়েরা ঘরকে যেতে না পারলি ঘরে লিবে না, জাতে ঠেলবে'। এ সম্পর্কে প্রচলিত ছড়া:

শিযাল ডাকিলি পরে বেদেরা না লিবে ঘরে
অভাগিনীর যাবে জাতিকুল। [পৃঃ ৬০]

'নরে নাগে বাস হয় না'—এই প্রবাদ সম্পর্কিত উপকথাটি উপন্যাসে তারাশঙ্কর সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন: 'মর্ত্তে থাকে বণিক বুড়ো, যত ধনী তত কৃপণ। বাড়ীতে আছে গিন্নী, বেটা আর বেটার বউ। আর আছে সিন্দুকে ধন, খামারে ধান, ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গাই। শ্যামলী ধবলী বুধি মঙ্গলার পাল। সেই পাল চরায় পাড়ার বাউরী ছেলে, বণিক বুড়োর রাখাল ছোঁড়া। কৃপণ বণিক বুড়োর ঘরে রাঁধুনী নাই, বেটার বউকে ভাত রান্না করতে হয়। বউটি যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী, কিন্তু শিশুকালে মা-বাপ হারিয়েছে, সাতকুলে

কেউ নাই। নাই বলেই বণিক বুড়োর চাপ বউয়ের উপর বেশী, তাকে দিয়েই করায় রাঁধুনীর কাজ, ঝিয়ের কাজ। বউ রাঁধে, শ্বশুরকে স্বামীকে খাওয়ায়, নিজে খায়, রাখাল ছোঁড়ার ভাত নিয়ে বসে থাকে।

রাখাল ছোঁড়া গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে, গরুগুলি চরে বেড়ায়, সে কখনও গাছতলায় বসে বাঁশি বাজায়, কখনও বা গাছেব ডালে দোল খায়, কখনও ঘুমায়, আর কখনও আম জাম কুল পেড়ে কোঁচড ভর্তি করে নিয়ে আসে। একদিন গাছের তলায় দেখে ছুটি ডিম। ভাবি সুন্দর ডিম। রাখালেব বড সাধ হল ডিম ছুটি পুডিয়ে খাবে। ডিম ছুটি খুঁটে বেঁধে নিয়ে এল, বণিক-বউকে দিল— বউ গ, বউ ঠাকুরুণ, ডিম ছুটি আমাকে পুডিযে দিয়ো।

বউ ঠাকরণ ডিম ছুটি হাতে নিযে পোডাতে গিয়ে ও পোডাতে পারলে না। ভারি ভাল লাগলো। আহা, কোন জীবের ডিম, এর মধ্যে আছে তাদের সন্তান, আহা, ডিম ছুটি সে এককোণে একটি টুকুই ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে। তার বদলে ছুটি কাঁঠাল-বিচি পুডিয়ে রাখালকে দিলে, নে, খা।'

তারপর সে ডিম ছুটি থেকে কিভাবে ছুটি নাগশিশু বেরিয়ে এলো, কিভাবে বউটির কৃপায় ও স্নেহে বড হয়ে উঠলো, ভাইবোনের সম্পর্ক পাতালো, পাতালপুরে ফিরে গেলো, এবং পরে দিদিকে পাতালপুরীতে নিযে গেল, এবং সবশেষে প্রমাণ হলো, কিভাবে নরে-নাগে বসবাস হয না। এই উপকথাটিতে যে-সব অভিপ্রায় (Motif) লক্ষ্য কবা গেছে তার মধ্যে সর্প-অভিপ্রায় ও নিষেধ-অভিপ্রায়টিই বিশেষভাবে প্রধান হয়ে উঠেছে। মা বিষহবি বলেছিলেন—'মা, নাগলোকে এলো, ছুধ নাড ছুধ চাড়, সহস্র নাগের সেবা কর, সব দিক পানে চেয়ো, শুধু দক্ষিণ দিক পানে চেয়ো না।' [পৃঃ ৯৯]

বাঙলাদেশের রূপকথার মধ্যে এই নিষেধ-অভিপ্রাযটি সর্বত্র স্পষ্ট হয়েছে সর্প-মূলক ব্রতকথাটির মধ্যে।

জডি-বুটির ওপব বিষবেদেব অসম্ভব বিশ্বাস। এই জড়ি-বুটির মধ্যে যে দ্রব্যগুণ আছে তার দ্বারা সে বিষধর ভয়ঙ্কর সর্পকেও বশীভূত করে, সর্পাঘাতে মৃত জীবকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনে। জড়ি-বুটি সম্পর্কিত লৌকিক বিশ্বাসগুলি এই উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাগিনীকন্যা শবলা যখন একটা শেকড়ের টুকরো কৃতজ্ঞতাবশতঃ শিবনাথ-এর হাতে দিয়েছিল তখন শিবনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, সেটি কিসের মূল? তখন বেদের মেয়ে শবলা এই

শেকড়ের দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত যে অলৌকিক বিশ্বাসের উপকথাটি শুনিয়েছিল সেটি হচ্ছে এই : 'বেদেকুলের গুপ্তবিদ্যা এতো পেকাশ করতে নিষেধ আছে, মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে বললে—যদি বিশ্বাস কর ধরম ভাই, তবে বুলি শোন। এ যে কি গাছ তার নাম আমবাও জানি না। বেদেরা বলে—সেই যখন সাঁতালী পাহাড থেকে বেদেরা ভাসল নৌকাতে, তকুন ওই কালনাগিনী-কন্যে যে আভবণ অঙ্গে পব্যা নেচেছিলো, তাথেই একটুক্‌রো মূল ছিল লেগে। সাঁতালী ছাডলো বেদেবা, সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরির বিদ্যা চাঁদো বেনের অভিশাপ পেয়ে হল বিস্মবণ। নতুন বিদ্যা দিলেন মা বিষহরি। এখুন ধন্বন্তরির বিদ্যার ওই মূলটুকুই কন্যাব আভরণে লেগে সঙ্গে এল, তাই পুতলে শিরবেদে নতুন সাঁতালী গাঁয়ে হিজলবিলেব কুলে। গাছ আছে, শিকড নিয়া ওযুধ করি; কিন্তু নাম তো জানিনা ধবম ভাই। আর ই গাছ সাঁতালী ছাড়া তো আর কুথাও নাই পিথিবীতে। তাহলে তুমাকে নাম বলব, কি গাছ চিনাযে দিব কি কর্যা কও? এইটি তুমি রাখ, লাগ যদি ডংশন করে আর সি ডংশনের পিছাতে যদি দেবরোষ কি ব্রহ্মরোষ না থাকে তবে ইযার একরতি জলে বেঁট্যা গোলমরিচের সাথে খাওযাইয়া দিবা, পরাণডা যদি তিল পবিমাণ থাকে, তবে সে পরাণকে ফিবতে হবে, হাসতে হবে, এক পহবেব মধ্যে মবার মত মনিষি চোখ মেলে চাইবে।' [পৃঃ ১০১-১০২]

এছাডাও আছে নাগিনীকন্যা-সম্পর্কিত নানা উপকাহিনী, উপকথা, নানা লৌকিক বিশ্বাস। মধ্যরাতে যখন শেযাল ডাকে, কালো বাদুড উডে যায়, পেঁচা ডানা ঝাপটায—'এই ক্ষণটিতে নাগিনীকন্যার অন্তরেব মধ্যে কালনাগিনী-স্বরূপ নিয়ে জেগে ওঠে, নিত্যই ওঠে। কিন্তু বিছানার খুঁট ধরে দাঁতে দাঁত টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকতে হয় নাগিনীকন্যাকে। এই নিয়ম।'

[পৃঃ ১১৯]

'তারপর যখন হাপরের মত হাঁপায় বুকের ভিতরটা, তখন উঠে বসতে হয়। চুল এলিযে থাকলে চুল বেঁধে নিতে হয়, এঁটে সেঁটে নতুন ক'বে কষে কাপড় পরতে হয়। বিষহরির নাম জপ করতে হয, তারপর আবাব শোয়। নাগিনী-কন্যার অন্তরের নাগিনী তখন চোয়াল টিপে ধবা নাগিনীর মত হার মানে, তখন সে খোজে ঝাঁপি, অন্তরের ঝাঁপিতে ঢুকে নিস্তেজ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। তা না করে যদি নাগিনীকন্যে বিছানা ছেড়ে ওঠে, বাইরে বেরিয়ে

আসে তবে তার সর্বনাশ হয়। ··জন দুই তিন পাগল হয়ে গিয়েছিল। জন চারেকের হয়েছিল চরম সর্বনাশ। সর্বনাশীরা ফিরলো ধর্ম বিসর্জন দিয়ে।'

[পৃঃ ১১৯—১২১]

কিংবা : 'নাগিনীকন্যাদের প্রবৃত্তি যখন উগ্র হয়ে ওঠে, তখন তারা উন্মাদিনীর মত নিশীথ রাত্রে ঘুরে বেড়ায় হিজল ঘাসবনে। কখনও বাঘের হাতে জীবন যায়, কখনও হাউরমুখীর খালে শিকার-প্রতীক্ষমান কুমীর অতর্কিতে পায়ে ধরে টেনে নেয়, নিশীথ রাতে হিজলের কুলে শুধু একটা আর্ত চিৎকার জেগে ওঠে। আবার কোন নাগিনীকন্যা শোনে বাঁশীর সুর। দূরে হিজলেব মাঠে চাষীরা কুঁড়ে বেঁধে থাকে, মহিষ গরুর বাথান দিয়ে থাকে সেথের ঘোষেরা, তারাই বাঁশী বাজায়। সে বাঁশী শুনে নাগিনীকন্যা এগিয়ে যায়, সুরের পথ ধরে। শবলা বলেছিলো— তার থেক্যা বড সর্বনাশ আর হয় না, ধরম ভাই। সেই হইল মা বিষহরির অভিশাপ। তাতে হয় পরাণটা যায় না হয ধরম যায, জাতি যায, কুল যায়।'

[পৃঃ ২২৮]

নাগিনীকন্যাদের দেহের ভেতর থেকে চাঁপা ফুলের বাস বেরোয় এবং তার সঙ্গে সর্প মিলনের চাঁপা ফুলের বাস ওঠে। 'ঘরটা যেন ভর‍্যা যায় ভাই, মুই থরথর কর‍্যা কাঁপতে থাকি। প্রেথম যেদিন বাসটা নাকে ঢুকলো ভাই, সেদিন মুই যেন পাগল হয্যা গেছিলাম। ঠিক তখুন রাত দুপুর।·'

ঠিক সেই মধ্যরাত্রির লগ্নটিতে নাগিনীকন্যা যদি জেগে থাকে, তবে তাকে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে মনে মনে মা বিষহরিকে ডাকতে হয়। ওই লগ্ন নাগিনীকন্যার বুকে নিশির নেশা জাগিয়ে তোলে। কুহক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে—এই বেদেদের বিশ্বাস। [পৃ. ২২৮]

তারপরই শুরু হয়েছে চাঁপা ফুল সম্পর্কিত রূপকথার কাহিনীটি। 'কাহিনীতে আছে—নদীর জলে ভেসে যায় সোনার চাঁপা ফুল। রাজা পণ করেছেন, ওই চাঁপার গাছ তাঁকে যে এনে দেবে তাকেই দেবেন তাঁর নন্দিনীকে। রাজনন্দিনী রয়েছেন সাতমহলার শেষ মহলায়, মহলায় মহলায় পাহারা দেয় হাজার প্রহরী। রাজপুত্র আসে—তারা কন্যাকে দেখে, তারপর চলে যায় তারা নদীর কুলে কুলে; কোথায় কোন কুলে আছে সোনার চাঁপা গাছ। চলে—চলে—তারপর তারা হারিয়ে যায়, পিছনের পথ মুছে যায়। সোনার চাঁপার গাছ যে পাবে খুঁজে সেই পাবে ফিরবার পথ।' [পৃ. ২৩০] ঔপন্যাসিক এখানে রূপকথার অভিপ্রায়ে লৌকিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

নাগিনীকন্যা সম্পর্কিত আর একটি লৌকিক বিশ্বাস : নাগিনীকন্যা যদি ভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে, সে যদি ঘর-সংসার বাঁধে, সে যদি তার জাতি ধর্ম সব ত্যাগ করে, তবে মা বিষহরির অভিশাপ গিয়ে পড়ে তার মাতৃত্বের ওপর। সন্তান কোলে এলেই তার নাগিনী-স্বভাব জেগে ওঠে। নাগিনী যেমন নিজের সন্তান ভক্ষণ করে, নাগিনীকন্যা তেমনই সন্তান হত্যা করে। [পৃঃ ২৫৩]

নাগিনীকন্যা সম্পর্কিত এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কাহিনী কিভাবে তাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার জীবন্ত পরিচয় আছে শবলা ও পিঙ্গলার মর্মান্তিক জীবনের দুঃখময় পরিসমাপ্তিতে। এই ধরনের নানা সংস্কার তাদের জীবনকে কিভাবে বেঁধে রেখেছে তার পরিচয় আছে এই উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে। বাঙলাদেশের ভ্রাম্যমান বেদে-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শাখা সাপুড়ে-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস, জীবন-সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা কি ক'রে এত জীবন্ত করে তুলেছেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, তারাশঙ্করের আগে লৌকিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে জীবন-সংগ্রামের চিত্র বাঙলা উপন্যাসে খুব বেশী ফুটে ওঠেনি। মোটামুটিভাবে বাঙলা উপন্যাসের কালান্তরটিকে যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলাদেশের জমিদারতন্ত্র ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র প্রতিফলিত, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উনিশ শতকের ব্রাহ্ম-সমাজ-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে উঠেছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মূলতঃ নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও কিছু অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, মান-অভিমানের কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে – তবে তারাশঙ্করে এসেই প্রথম দেখা যাবে, বাঙলাদেশের প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ অবহেলিত নিষ্পেষিত গ্রামীণ মানুষের জীবন-সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যে মানুষ 'একান্তভাবে আঞ্চলিক', যুগযুগান্তের অশিক্ষা কুসংস্কারের অন্ধকারে সম্পূর্ণ 'আদিম ও অনাবৃত', চরমতম দারিদ্র্যের মাঝখানে যারা বাঁচাবার চেষ্টা করছে, সেই সব লোকজীবনের কিছু কিছু জীবন-সংগ্রামের চিত্রই তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' এই ধরনেরই একটি সার্থক উপন্যাস যার মধ্যে আছে এমন একটি সম্প্রদায়ের কাহিনী—যেখানে হিজলের বনে মা মনসার আটন, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড-ফুঁক, জড়ি-বুটি, নাগকন্যার নানা অলৌকিক বিশ্বাসের অন্ধকারে বিচিত্র কামনা-বাসনার আনাগোনা—আর এসব নিয়েই পিঙ্গলা-শবলার মত অসংখ্য মানুষের জীবন-সংগ্রামের চিত্র।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বিংশ শতকের সংগ্রামী-লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

দুটি উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) স্মরণীয়। এই উপন্যাস দুটিতে তারাশঙ্করের পূর্বেই আঞ্চলিক জীবন-চর্চা, লোকায়ত সংস্কার, লৌকিক জীবনবোধকে কেন্দ্র করে দরিদ্রতম মানুষের বাঁচা-মরার সংগ্রামকে উপস্থিত করা হয়েছে। তারাশঙ্করের প্রথম আঞ্চলিক চেতনা রাইকমল ১৯৩৫-এ প্রকাশিত হলেও তাঁর ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী(১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪২), হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (১৯৪৭) এবং নাগিনীকন্যার কাহিনী (১৯৫১)-তে তা আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত। আসলে লোকবৃত্তের ধারণার মধ্যে তারাশঙ্করের জীবনবোধটি তৈরী হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত দুটি উপন্যাসে লোকায়ত জীবনের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন-সংগ্রামের কাহিনীকে উপস্থিত করা হয়েছে।

॥ দুই ॥

প্রত্যেক জাতিব বা সমাজের একটা জীবনীশক্তি থাকে, যার মধ্য দিয়ে সে প্রাণরস আহরণ করে থাকে এবং যুগযুগান্ত ধরে টিকে থাকবার চেষ্টা কবে। নানা ঝড়ঝঞ্ঝা প্রাকৃতিক নানা দুর্বিপাক অভাব-অনটন মহামারী-দুর্ভিক্ষকে অগ্রাহ্য করে তারা বেঁচে থাকবার চেষ্টা কবেছে। হাঁসুলীবাঁকের কাহারজাতের জীবনীশক্তি হচ্ছে তাদের লৌকিক বিশ্বাসগুলি, যা তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, টিকিয়ে রেখেছে যুগান্তর ধরে নানা বিপত্তির মধ্য দিয়ে। তাদের জীবনের উত্থান-পতন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দারিদ্র্য সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে এই লৌকিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার।

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলীবাঁক—বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভবা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলার সোনাব হাঁসুলী, নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলীবাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি, লাট জাঙলের অন্তর্গত। সেই হাঁসুলীবাঁকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কে শিস দিচ্ছে রাত্রে। দেবতা কি যক্ষ, কি বক্ষ বোঝা যাচ্ছে না, সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষ কবে কাহারেরা। মোটকথা এদেশে—এই হাঁসুলীবাঁকের মানুষের কাছে এই শিস দেওয়াব ব্যাপাব আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে। এখন তাদের ধারণা ব্রহ্মদৈত্যতলার কর্তা কোন কারণে এবার রুষ্ট হয়েছেন। হয়তো বা তিনি ওই বেলবন ও শ্যাওড়া জঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে নদীব ধারে ধারে চলে যাচ্ছেন—এ শিস দিয়ে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে চলেছেন অধিবাসীদের, এ নিয়ে তাদের জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ঘবে ঘরে কুলুঙ্গীতে সিঁদুর মাখিয়ে পয়সাও তুলেছে তারা, 'লুতুন' পুজো দেবে।

হাঁসুলীবাঁকের মানুষ এসব কুসংস্কার আর লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে এবং তাদের জীবনীশক্তিও তৈরী হয়েছে, তাই তারা মজলিসে বসে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জেনেছে পানুর খুঁতো পাঁঠাটি চৌধুরী এবার

বেহ্মদত্যিতলায় কত্তার পুজোয় উচ্ছুগো করেছে। শুনে সুচাঁদ বুড়ী হাঁসুলীবাঁকে কত্তাবাবার পুরাকথা (myth) শুরু করেছে, 'সে অনেক দিন আগে, তখন আমরা হই নাই, বাবার কাছে গল্প শুনেছি। দুপুরবেলা ভাসতে লাগল কোপাই। রাত এক পহর হতে হতে—তু-ফা-ন।' তারপব সেই অন্ধকার ঘুরঘুট্টির মধ্যে কি করে নৌকা এসে লাগলো। বাবার থান থেকে কিভাবে কত্তাবাবা বেরিয়ে এলো এই ন্যাড়ামাথা ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরণে লাল কাপড, পায়ে খড়ম। তারপরে কিভাবে সাহেব মেম ঘুরন চাকিতে ভেসে গেল, এবং চৌধুরীমশাই বেঁচে গেল। তারপর থেকেই হাঁসুলীবাঁকের এইখানেই কত্তাবাবার অধিষ্ঠান।

এদের জীবনে এই সব বিশ্বাসের প্রতি আকর্ষণ কিরূপ তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সুচাঁদের পুরাকথার উপর আসরের বর্ণনায় :

'প্যাঁচাগুলো কর্কশ চেরা গলায় চীৎকার করে উডে যাচ্ছে। বাদুড় উড়ছে—পাখসাটের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে।...এরই মধ্যে সুচাঁদের এই গল্পে সেই বেলবন ও শ্যাওড়াবনের কর্তার মাহাত্ম্য, তার সেই গেরুয়া-পরা ন্যাড়া-মাথা রুদ্রাক্ষ ও ধবধবে পৈতেধারী চেহারার বর্ণনা শুনে এবং সেই কর্তার কাছে কুকুরে-ধরা পাঁঠা দেওযার অপরাধেব কথা মিলিয়ে সকলে একেবারে নিদারুণ ভয়ে আড়ষ্ট পঙ্গু হযে গেল।'

হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবনে ঘেরা আলো-আঁধারির মধ্যে বাঁশবেদে গ্রাম। সেই গ্রামের সুচাঁদ বুড়ী। এ বুড়ী গ্রামের সমস্ত ব্যাপাবের একটা মাথা। তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটা ব্রতকথা লেখক উপস্থিত করেছেন : গাঁয়ে ছিল এক নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত করত, ধর্মকর্ম করত, গাঁয়ের লোকের দুঃখে দুঃখ করেই তার ছিল সুখ। কারও দুঃখে কাঁদতে না পেলে বুড়ী পশু-পক্ষীর দুঃখ খুঁজে বেড়াত। এমন দিনের সকালে বসে ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বলত—কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আশ্মি মিটছে, মহাবনে হাড়ী মরেছে, তার গলা ধরে কেঁদে আসি। এই সুচাঁদ বুড়ীই করালীর সাপ মারার পর আবিষ্কার করেছে সাপটি বাহন, এবং চিৎকার করে উঠেছে :

'ওরে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে! ওরই মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে ভ্রমন করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে, দহের মাথায় বাবা-ঠাকুরের শিমুলগাছের কোটরে সুখে নিদ্রে যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পরশু দেখেছি রে।' এরপর আর আবিষ্কারের কিছু থাকে না। বাবাঠাকুরের শিমুলগাছ দহের

মাথায় প্রাচীনতম বনস্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক শিস দেওয়া বিচিত্র-বর্ণ বিষধর যখন থাকত, তখন বাবাঠাকুরের আশ্রিত তাঁর বাহন—এতে সন্দেহ কোথায়। সমবেত কাহারপাড়ার নরনারী শিউরে উঠবেন, মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠলো—হেই মা রে! এই অলৌকিক বিশ্বাসই হাঁসুলীবাঁকের লোকজীবনের উৎসস্থল। তাদের এইসব বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্য দিয়েই যুগযুগান্তর অতিবাহিত হয়েছে। তাই পূজা দিয়েছে আরও ভক্তিমন্ত হয়ে আরো উপকরণের দ্বারা সজ্জিত করে বাবাঠাকুরের থানে। তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবনের মানুষ। হিন্দু-সমাজের উচ্চবর্ণের দেবতার পাশাপাশি যে সব লৌকিক দেবতার অবস্থান আছে তা তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে জানতেন। আর জানতেন বলেই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন লৌকিক দেবপূজার :

'ড্যাং—ড্যাং—ড্যাং—ড্যাডং—ড্যাডং— ড্যাডং—এর-র-র······বাবাঠাকুরের তলায় ভোরবেলায় ঝুঁকিঝকি থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকি ভোরের বাজনা ধুমুল বাজাতে শুরু কবলে। ববিবার অমাবস্যা—ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পূজো হবে। ফুলে-বেলপাতায, তেলে-সিঁদুরে, ধূপে-প্রদীপে, আতপে-চিনিতে, দুধে-রম্ভায অর্থাৎ কলায, মদে-মাসে, কাপডে-দক্ষিণায় সমারোহ করে পূজো।' [পৃঃ ৬৪]

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় বাঁশবনের আদ্যিকালের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে সেখানকার মানুষের অনেক লৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কাহিনী—

'বাঁশবনে দপদপিয়ে অর্থাৎ দপদপ করে জ্বলে বেডায় পেত্যা অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির চিলের মত ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমুলের মাথা থেকে। বাঁশবনে ক্যাঁ—ক্যাক ক্যাঁ—ক্যাক ডাক ওঠে। কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায়—গেছোপত্নী কি কোন ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে—সেটা উঠে যাচ্ছে উপরে।' [পৃঃ ১২৬]

এই সব কুসংস্কার আর লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আছে নানা পালা-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়েই জীবনপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের :

হাঁসুলীবাঁকের কাহারেরা তারই মধ্যে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে কত্তাঠাকুরের নাম নিয়ে কোনমতে জটলা পাকিয়ে বসে থাকে। ছেলে-ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্র মাসে

ভাদু-ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা-দশভুজার পূজায় গায় পাঁচালী, কার্তিক থেকে মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত শীত—তখনও গান-বাজনার আসর আসে ঢিমিয়ে, চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের বোলানের গানের পালা।

আধুনিক জীবনের সঙ্গে কাহারদের জীবনের কোন যোগ নেই। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই এক লৌকিক জীবনধারা যে সদা প্রবহমান এ উপন্যাসে তার প্রমাণ আছে। বনওযারী ভাবছে: 'কোথা কোন্ 'খ্যাশে' সাত সমুদ্দুর তেরো 'নদী' পারে কে কবছে কাব সঙ্গে যুদ্ধ, এখানে চডবে ধানের দর, চালের দর, আলু গুড কলাই তবিতবকাবিব দর।...তবে কাহাবপাডা হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবনের মধ্যে যাবা ছাযার ঘেবায় বাস করে, তাদের ভাবনা নাই।' [পৃঃ ১৩০]

যুদ্ধ তাদের জীবনে খুব একটা আলোড়ন আনতে না পারলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গানে প্রকাশ করেছে—

সাযেব লোকের লেগেছে লডাই
ষাঁডের লডাইযে মবে উল্‌খাগোডাই—
ও হায, মরিব মোরাই উল্‌খাগোডাই। [পৃঃ ১৩৩]

অসংখ্য ঘেঁটু গান রচনা হচ্ছে—

(১) তাই ঘুণাঘুণ—বাজে নাগরী—
ননদিনীব শাসনে,—চরণের নূপুর থামিতে চায না।
ঘরে থাকিতে মনো চায না। ও—তাই—তাই ঘুণাঘুণ।

(২) হায় কলিকালে, কতই দেখালে—
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতিবাড বাডিল যারা তাদের ভেঙে পাড়ো। [পৃঃ ১৩৫]

(৩) বিচার নাহিক বাবা পূরিল পাপের ভারা
সাঁজের পিদীপ বলো ফুঁদিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের এ কি লীলা সন্‌হে বেলাতে

মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় হায কি গলাগলি
কত হাসিখুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি !
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সমজে দেখালে
হায কলিকালে— [পৃঃ ১৩৬]

'অচোটা মাটি'কে অর্থাৎ কুমারী ভূমিকে প্রথম কর্ষণ করতে গেলে পূজা করতে হয় —এটি একটি লৌকিক বিশ্বাস। এই লোকবিশ্বাসটি আজও বাংলার সাধারণ মানুষ কিভাবে বহন করে চলেছে তাব চিহ্ন আছে এই উপন্যাসে :

'বনওয়ারী এসে হাঁটুগেড়ে ব'সে প্রণাম করলে 'আচোটা মাটি'কে অর্থাৎ কুমারী ভূমিকে। মনে মনে বললে—তোমাব অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মাজ্জনা করছি, সেবা করছি তোমার, তুমি ফসল দিয়ো। আমার ঘরে অচলা হয়ে থেকো। তারপর সে কোঁচড থেকে খুলে সেখানে নামিয়ে দিলে— বাবাঠাকুরের পূজার ফুল।'

আর একটি লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র :

সে তুলে নিলে একটি গোল নুড়ি। নুডিটার কালো গায়ের মাঝখানে গোল সাদা দাগ · ঠিক পৈতের মত। বল্লে দেখ্। তারপর তুলে দেখালে একটা টুকরো অসুরেব কাঁডি। ঠিক গাছের গুঁডির মত চেহারা, এগুলিকে সুচাঁদ বলে —অসুরের কাঁডি। অর্থাৎ অসুরের হাড জ'মে পাথব হযে গেছে। দেবতারা অসুর মেরেছিলেন, তাদেরই হাড। এসব কাহাবদের পিতৃপুরুষের কথা। কিন্তু বনওয়ারীদের আমলে ওসব বিশ্বাস চলে গিযেছে।

সকল বুড়ার আদি বুড়া, সকল দেবতার বড় দেবতা—বাবা বুড়াশিব, বাবা কালারুদ্দ্। বেলতলার বাবাঠাকুর, কাহারদের দেবতা। তাঁরও দেবতা বাবা কালারুদ্দ্। ধর্মবঞ্জ—যে ধম্মরাজ—তাবও বড বাবা কালরুদ্র। বাবা কাল-রুদ্রের প্রধান ভক্ত চিরকাল হয় নীচজাতের লোক। সেই আদ্যিকালের বাণ গোঁসাইযের কাল থেকে। এ প্রসঙ্গে একটি লোককথা (Folk tale) চলে আসছে বহুকাল থেকে। সুচাঁদ পিসী বাণ-গোঁসাইয়ের কাহিনী বলে :

'বাণ-গোঁসাই ছিল ছোটজাতের রাজা, কিন্তু ভোলা মহেশর কালারুদ্দের ভক্ত। মদ খেত, মাংস খেত, কিন্তু বাবার চরণে ফুল দিতে, গাজনে সন্ন্যেস করতে কখনও ভুলত না। সন্ন্যেস ক'রে আগুনের আঙানের ওপর বসে বাবাকে ডাকত। লোহার কাঁটার শয্যেতে শয়েন করত, সোনা রূপো হীরে মানিকের

গয়না ছেড়ে মড়ার হাড়ের মালা গলায় পরত। কিবা 'আত্তি' কিবা দিন গাল বাজিয়ে বম্—বম্ করত, বাবার নামগান করত। শিবোহে—শিবোহে—শিবোহে।' বাবার দয়াও তার উপর খুব। পিথিমীর 'আজা-আজড়া' থেকে দেবতারা পর্যন্ত বাণ-গোঁসাইয়ের সঙ্গে এঁটে উঠত না। গোঁসাইয়ের একশো পরিবার। একটিমাত্র সন্তান—তাও কন্যে; কন্যের নাম 'রোধা' অর্থাৎ উষা। সেই রোধাকে দেখে নারায়ণের নাতির মন টলল। নারায়ণের নাতি একদিন লুকিয়ে ঢুকল বাণ-গোঁসাইয়ের বাড়ীতে রোধাবতীর ঘরে। বাণ-গোঁসাই জানতে পেরে বলে—কাটব নাবায়ণের নাতিকে। নারায়ণের আসন টলল, মুকুট নড়ল। নারায়ণ বললেন, নারদ, আসন কেনে টলে, মুকুট কেনে লড়ে, গুণে দেখতো? নারদ খড়ি পেতে গুণে বললেন বিবরণ। নারায়ণ ছুটে এলেন, গোঁসাইযের বাড়ীতে হানা দিলেন। অ্যাই লেগে গেল লড়াই।

পিথিমী টলমল করতে লাগল। জলে আগুন লাগল, মাটির বুক ফেটে জল উঠতে লাগল, আকাশের তারা খসে পড়ল, দিষ্টি গেল দিষ্টি গেল রব উঠল। নারায়ণ 'চক্ক' দিয়ে কেটে ফেললেন বাণ-গোঁসাইয়ের হাত পা। তবু গোঁসাই হারে না, মরে না, মরে আবার বাঁচে। তখন এলেন বাবা কালরুদ্দু। কালারুদ্দু আর নাবাযণ—হরি আর হব, হরি-হরের মিলন হ'ল। বাবা কালারুদ্দু মাঝে পড়ে রোধাবতীব সঙ্গে নারায়ণেব নাতির বিয়ে দিযে দিলেন। হরি বললেন বাণ-গোঁসাইকে—তোমাকে আমি বর দোব। তোমার কাটা হাত-পা জোড়া লাগবে, তোমাকে পিথিমীর আজা করে দোব। বাণ-গোঁসাই বললেন—না কাটা হাত-পা আমি চাইনা। আজাও আমি হব না। বর যদি দেবে তো বর দাও, বাবা কালরুদ্দুর সাথে আমারও যেন পূজা হয়। আমার জাত জ্ঞাত পেজা সজ্জন ছাডা বাবাব গাজনের ভক্ত যেন কেউ না হয়। হরি-হর দুজনেই বললেন—তথাস্তু। সেই জন্যেই তো গোঁসাইয়ের হাত-পা নাই, কেবল আছে ধড় অর্থাৎ শরীরটা আর মুণ্ডু।

সেই কারণেই বাণ-গোঁসাই আজ কালরুদ্দের ভক্তদেবতা। আগে বাণ-গোঁসাইয়ের পুজো হবে, তবে বাবা পূজো নেবেন। [পৃ. ১৭৫]

গাজন ইত্যাদি লৌকিক ও পালপার্বণগুলি গ্রাম্য মানুষের জীবনের ওপর কি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে তার পরিচয় আছে এই উপন্যাসে। গাজনের বর্ণনা :

'বড় বড ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বকপক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো কুশো ডাঁটির মাথার চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁসি বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মোঁ-মোঁ করে বাবা কালারুদ্দের থান, 'পাটাগনে অর্থাৎ পাটা অঙ্গণে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের দণ্ড, গলায 'উতুরী' অর্থাৎ উত্তরীয়, পরনে গেরুযা কাপড়, কপালে সিঁদুরেব ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'তিপুস্তক', রুখুচুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায ধেই-ধেই করে নাচে।' (পৃঃ ২০১)

গাজন শেষের বর্ণনা :

'বছরের প্রথমদিন—গাজন শেষ হ'ল। শিব চল্‌লেন জলশযানে কালীদহের তলায, গোটা বছবটি থাকবেন সেথায, আবার উঠবেন বছরের শেষে গাজনের একমাস আগে আগামী চৈত্রেব শুভদিন অর্থাৎ পযলা। বলবেন—সূর্য হে, চন্দ্র হে, আমি উঠলাম—বছর শেষ কব। শিব জলশযানে যাচ্ছেন,—সেই মিছিল চলেছে জঙ্গলের কালারুদ্দের তলা থেকে বাঁশবাদির কাহার পাড়া হয়ে হাঁসুলীবাঁকের কালীদহে। প্রথমে চলেছে ঢাক, কাঁসি, শিঙে, বাদ্যভাণ্ড, তারপর চলেছে সঙ। সঙ হ'ল বাবাব ভূত প্রেত দানা দৈত্যের দল।'

উৎসব আর গান—এই হচ্ছে হাঁসুলীবাঁকের কাহারদেব জীবনের আনন্দ। কাজে-কর্মে ধর্মে সমস্ত কিছুতেই তাদেব গান। তাই ঘোষমশাই-এর বাংলা কুঠির চাল ছাইতে ছাইতে গান ধরেছে পাগল :

ও সাযেব আস্তা বাঁধালে
হায কলিকালে
কালে কালে সাযেব এসে আস্তা বাঁধালে

ছেলেরা ধুয়ো গাইলে—

ছ মাসেব পথ কলের গাডী দণ্ডে চালালে
ও সায়েব আস্তা—

ঝপাঝপ খড উঠছে, ছুঁডছে নীচে থেকে। বিচিত্র কৌশলে উপরে চালে বসে বারুয়রা বাঁ হাতে ধরছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। পাশে গাদা করে রাখছে। বাঁখারিতে বাঁখারিতে বাবুই দড়ির বাঁধন দিচ্ছে, ঠুকছে, তারপর কোমর থেকে কাটারি বা কাস্তে খুলে দড়ি কেটে আবার সেটা কোমরে গুঁজছে।
পাগল গেয়ে চলেছে ঘেঁটুর গান—

লাল মুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ
ছাশ বিছাশ থেকে এল দলে দলে লোক
—ও সায়েব আস্তা—
ও সায়েব বাঁধালে-কাহার-কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে কত বাবুলোক।
ও সাহেব আস্তা— (পৃঃ ২২৭)

আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে রেল গাড়ীর প্রবর্তন হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, অর্থনীতিতে যে আঘাত এনেছে—তার ছবি আছে এই ঘেঁটু গানটিতে। কারখানার আকর্ষণ করালীর মত কাহার পাড়ার আরো যুবককে প্রলুব্ধ করেছে। প্রাচীন-পন্থীরা ভীত সন্ত্রস্ত। পাগলের আর একটি ঘেঁটু গানে তাও ফুটে উঠেছে :

জাতি যায় ধরম যায় মেলেছো কারখানা
ও পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।
মেয়েরা ও পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে
লক্ষ্মীরে চঞ্চল করে অলক্ষ্মীর কারখানা
ও-পথে হেঁটো না মাণিক কত্তাবাবার মানা। (পৃঃ ২৩০)

'পাল্কীর গান' বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত। আগেই বলা হয়েছে, হাসুলীবাঁকের উপকথায় কাহারদের কাজের পিছনে পিছনে সঙ্গীতও এগিয়ে চলে। বিয়ের সঙ্গে দুটি পাল্কী যখন চলে, তখন কার পাল্কী আগে যাবে, 'বরের না কনের, তার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। 'পাল্কী বহনের গান'-এর একটি সুন্দর বর্ণনার কথা এখানে বলা যায়, যার থেকে একথাই প্রমাণ হয়, বাঙলাদেশের গ্রাম্য জীবনে সাধারণ নিম্নস্তরের জাতের মধ্যে লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী। যেমন :

'বনওয়ারীর পাল্কীতে বনওয়ারী আছে আর আছে সেই পাগল কাহার, পাল্কীর আগের ডাণ্ডায় প্রথমেই আছে পাগল। সে হাঁসুলীবাকের কাহার পাড়ার আদ্দিকালের গান গাইতে গাইতে এসেছে। গান গাইতে পাগলের জুড়ি নাই, পাগল গেয়েছে—

—সরাসরি ভাল পথে—
পিছন ওয়ালারা হেঁকেছে-প্লো-হিঁ।
—জোর পায়ে চলিব—
—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ—
—আরও জোর কদমে—
—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ-প্লোহিঁ

পাগল হাসতে হাসতে সুর কবে এবার বলে—

—বরেবো পাল্কী, প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ! পড়িল পিছনে—
—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ।
—আগে চলে লক্ষ্মী—
—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ
—পিছে-এস নারায়ণ
—হেঁইযো-হুঁশিয়ার
—প্লো-হিঁ
—পাশ কর পাল্কী—
—প্লো-হিঁ
—কর্তার হুকুমত—
—প্লো-হিঁ
—গিন্নির পাল্কী পিছনে পড়িল—
—প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—' (পৃঃ ১৫৩)

সংস্কারের বাঁশবন এবং জৈবকামনার আদিমকালের আপনি জন্মানো বট-অশত্থ-শিমুল-শিরীষ গাছের ঘন বনের ছায়ার তলায় ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্য ইত্যাদি অলৌকিক জীবেদের সর্বদা আনাগোনা। একটি দৃষ্টান্ত—

'বনওয়ারী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ঘূর্ণিটা তাদের অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলেছে। অদূরেই আটপৌরে পাড়ার বটগাছটা। ঘূর্ণিটা এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডের গায়ে খুব ঘুরপাক খেয়ে থেমে গেল। গাছের পল্লবে পল্লবে চঞ্চলতা জেগে উঠল।

বনওয়ারী কাঁপতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝেছে বসন। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—বা-বাওড়? অর্থাৎ ভূত?' (পৃঃ ২৮৭)

কেবল হাঁসুলীবাঁকের কাহাররা কেন, বাঙলাদেশের বহু গ্রাম্যমানুষ এই সব কুসংস্কার আর আদিম বিশ্বাস নিয়েই আজীবন বেঁচে রয়েছে। বনওয়ারী মৃত কাল নন্দীর প্রেতাত্মার কথা আরও ভাবছে :

'আটপৌরে পাড়ার বটগাছটাব তলায সে দাঁড়িয়ে আছে। ডালে দোল দিচ্ছে। হয়তো দোল খাচ্ছে। গভীব রাত্রে জ্যোৎস্নার মধ্যে সে নিশ্চয এগিয়ে আসবে—বনওয়ারীর ঘবের দিকে। বাঁশবাঁদির বাঁশবন এবং গাছপালার ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার সাদাগুল-ছাপ গায়ে মেখে ঝবাপাতাব উপর পা ফেলে শব্দ তুলে এসে দাড়াবে তার ঘবেব পিছনে। টুপটাপ ক'রে ঢেলা ফেলে দেবে ইশারা। আরও গভীর বাত্রে বনওযারী উঠছে না দেখে গুনগুন করে গান গাইবে, তারপব ভোবের আকাশে শুকতাবা উঠলে সে ফিবে যাবে বাঁশবনের ভিতব দিযে, কোপাইযেব ধাবে ধাবে—কত্তাব দহে নামবে, সেখান থেকে উঠে আবার আসবে বটতলায়।' (পৃঃ ১৯১)

হাঁসুলীবাঁকেব উপকথার কালো বউয়েব প্রেতযোনি তো অলীক নয। পিতৃ-পুরুষের কথার মধ্যে ওরা আছে, তারা চোখে দেখেছে, ঘরের কোনে বাঁশবনের তলায, হাঁসুলীবাঁকের মাঠে, জলাব পাশে—কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘবেব চালে বসে পা ঝুলিযে দেয, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে বেডায়। এ ছাড়া আছে ভুলো, যে দিক ভুলিয়ে নিযে যায বিপথে—অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে। আরও আছে 'নিশি'—রাত্রে কেউ কাউকে ডাকবার কথা থাকলে, নিশি এসে তার রূপ ধবে অবিকল তারই কণ্ঠস্বরে ডাকে। সেও নিয়ে যায় ওই অপঘাত মৃত্যুর পথে। এই সব প্রেতাত্মা মাযা অথবা হিংসার বশে ঘুরে বেডায় বাঁশবাদির ছায়ার ছায়ায়, কোপাইয়ের কূলে কূলে, ঘনপল্লব গাছের আড়ালে আড়ালে, হাঁসুলীবাঁকেব মাঠে মাঠে। হাঁসুলীবাঁকেব অলৌকিক জগতের পরিধি বহু বিস্তৃত—আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, প্রেতলোক থেকে পবলোক পর্যন্ত। আর এই সব লৌকিক বিশ্বাস আব সংস্কারে বাঙলাদেশে গা ভাসিয়ে চলেছে সাধারণ মানুষ। এই হচ্ছে তাদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি যা তাদের প্রতিদিনের জীবনকে পরিচালিত কবে দিয়ে চলেছে। তাই বাঁশবাদির আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ি সুচাঁদ আক্ষেপ করে বলে, কীভাবে নয়ানের বাবার বাবা চুরি করতে গিয়ে গেরস্তের ছুঁড়ে-দেওয়া থালা কপালে গেঁথে মরে ভূত হয়েছিল। সুচাঁদের ভাষায় :—

'মা, দিন আত ঘরের সাঙায়, না হয়তো বাড়ীর পাঁদাড়ে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকতেন। লোকে ভয়ে টটরস্ত।' [পৃঃ ২৯৩]

তারপর কিভাবে ভূত ছেলে ভুলাতো, কোপাই থেকে জল এনে দিতো, রাজবাড়ীর ভোজের খাদ্য দ্রব্য এনে দিত তাব এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছে সুচাঁদ পিসি। এই হল হাঁসুলীবাঁকেব সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা। তবে মানুষের জীবনেব মত ভূতেদেরও পরিবর্তন হয়েছে, ওই সুচাঁদই সেকথা আক্ষেপ কবে বলে। আজকালকার ছেলেছোকরারা বন্দুক, লাঠি সোটা নিয়ে পরীক্ষা কববে ভূতেদেব। সুচাঁদেব ভাষায়:

'তাঁদের কি গরজ? কেনে তাঁরা এই সব ঝামেলায় থাকবেন? তার চেয়ে দূরে দূরান্তরে নদীর ধারে হাঁসুলীবাঁকের মাঠে দিব্যি থাকেন, শোশানের হাড়-গোড় নিয়ে বাঘি বাজান, সাধ গেলে নদীতে বিলে মাছ ধরেন, চিতের আগুন লুফে খেলা করেন, গাছেব মাথা থেকে হুস করে ভেসে চলে যান উগাছে।' [পৃঃ ২৯৪] সুচাঁদ বলে—হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, পাগল বাঁধে হাঁসুলীবাঁকের ছড়া পাচালী:

হাসুলীবাঁকেব বনওযারী—যাই বলিহাবী
বাঁধিল নতুন ঘর দক্ষিণ দুযাবী।
সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরিরে মরি।

কিংবা

অন্ধকারেব ভাবনা কেনে হায়রে
অন্ধকাবেই পবাণ পাখী সেই দ্যাশেতে যায় রে।
চোথ মুদিলেই হায় বোশনাই এই আছে এই নাইরে।

অর্থনৈতিক জীবনে হাঁসুলীবাঁকেব মানুষ যতই বিপর্যস্ত হোক না কেন পাল-পার্বণ ব্রত উৎসব নাচ ও গান ভবিয়ে বেখেছে তাদের লৌকিক জীবনকে। হাঁসুলীবাঁকেব উপকথায 'পিথিমীব' সব জায়গার মতই আষাঢ় যায়, শাওন যায়, ভাদ্র আসে, শাওন শেষ হলে খেযাল হয, ক্ষেতে রোয়ার কাজ শেষ হ'ল। বোযা শেষ হলে বাবাঠাকুরকে প্রণাম কবে আর আয়োজন কুরে বাবাঠাকুর-তলায় ইদপূজোর। ইঁদ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষায় জল দিলেন, তার স্বর্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীব এক অংশ পাঠিয়ে দিলেন 'ভোম মণ্ডলে' অথাৎ ভূমণ্ডলে। ইঁদ পুজোর ব্যবস্থা কবেন জমিদার, খেটে খুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়, মাতব্বর করেন জয়ঙালের জোতদার মণ্ডল মহাশযেরা। জমিদার দেন পাঁঠা, বাতাসা,

মণ্ডা, মুড়কী, দক্ষিণে তুআনা, মণ্ডল মহাশয়েরা পাঁঠার চরণ অর্থাৎ ঠ্যাঙ বৃত্তি পান, বাতাসা-মণ্ডার প্রসাদ পান ; কাহারেরা শেষ পর্যন্ত বসে থাকে। ইঁদ পুজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিশের থানটিতে বেদী বাঁধে। জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পূজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর পূজাতে কাহারপাড়ার 'অঙ-খেলার' চব্বিশ প্রহর থাকে, সে মাতনের হিসেব-নিকেশ নাই।

ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরী করে লতায় পাতায় ফুল সাজিয়ে, আকণ্ঠ মদ খেয়ে পুরুষেরা মিলে গান করে আর নাচ। রাত্রে ঘুমাতে নেই, নাচতে হয়, গাইতে হয় —'জাগরণ' হল বিধি। 'পিতিপুরুষের' কাল থেকে দেবতার হুকুম অঙের গান— 'অঙে'র খেলা—যার যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, কান শুনলে দেখতে যাবেনা, ওই দিনেব সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলবে।

কাহার সর্দার বনওয়ারী ছোকবাদেব হুকুম দিযেছে, তুলে আন বেবাক-পুকুবের পদ্ম আর শালুক ফুল। পাগলও হাজিব হয়েছে ঐ দিনটিতে মাথায আট-দশটা ডাঁটি সুদ্ধ শালুক ফুল জডিয়ে মাঝখানে একটা কাঁচা কালফুল গুঁজে বুডো ছোকরা গান গাইতে গাইতে হাঁসুলীবাঁকে ফিরেছে—

কোন ঘাটেতে লাগিয়েছ ও আমাব ভাঁজো সখি হে
আমি তোমায় দেখতে পেছিনা।
তাইতো তোমায় খুঁজতে এলাম হঁসুলীবই বাঁকে—
বাঁশবনের কাল বনে লুকায়েছ কোন ফাঁকে।
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
আ-ভা চরণে তোমার লুটিযে পডিগা
ও আমার ভাঁজো সাথি হে। (পৃঃ ৩৭০)

পাগল ঢোলবাজনায় বোল তুলেছে—'কাজকান' 'পাটকান' থাক্ থাক্ থাক্ থাক্। নাচ না কেনে মেয়েরা, নাচ না কেনে গো। চল, কোপাইয়ের ঘাট থেকে ঘট ভরে আনি, নে পাঁচ 'আকুডি'র সবা মাথায নে। পাঁচ 'আকুড়ি' অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুরা। আবার সঙ্গে সঙ্গে গান উঠেছে, :

'ভাজো লো সুন্দরী মাটি লো সরা
ভাজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।

আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিব,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব,
পঞ্চ আকুতি আমার ধরলো ধরা।' [পৃঃ ৩৭১]

পরিশেষে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে : 'গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ইতিহাস নহে, উপকথা। ইহার জীবনযাত্রা অতিপ্রকৃতের ঘনকুহেলিকা-মণ্ডিত। পৌরাণিক কল্পনা অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তী ও অতীতের ঘটনা, প্রতিফলিত জীবন-দর্শন—এ সমস্তই প্রাত্যহিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট।'

তারাশঙ্করের আগে ও পরে

বীরেন্দ্র দত্ত

(রবীন্দ্র-উত্তর পর্বে তারাশঙ্কর স্বয়ং-লেখকের স্ব-কাল নির্মিত অতি মজবুত এক স্তম্ভ। তারাশঙ্করেব তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, সপ্রাণ দৃষ্টি সমকালেব মানুষ-জীবন-প্রকৃতিতে স্থির নিবদ্ধ, কিন্তু তাঁর দুই হাত দুই দিকে সবল প্রসারিত। এক হাত প্রাক্কালকে ছুঁয়ে আছে, শুধু তা-ই নয়, প্রাক্কালের সূত্রে হাতেব ছাযা ভারতীয় অতীতের কয়েকটি প্রান্ত স্পর্শ কবতে উৎসুক, আব এক হাত উত্তরকালে ক্রম-প্রসারণে বলবান। শিল্পী তারাশঙ্কর সমস্ত প্রান্তীয় বা সীমিত শক্তি নিয়েও এক ক্লাসিক ব্যক্তিত্বে অভিনন্দন-যোগ্য।

একজন শিল্পীকে 'total man' হিসেবে ধরতে গেলে তাব প্রাক্কাল, সমকাল ও উত্তরকাল এই তিনের সমবায অবশ্যই প্রযোজন, প্রাক্‌কালেব কথা উঠলে স্বভাবতই 'প্রভাবে'র কথা এসে পড়ে, উত্তরকালের প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে আসে 'প্রভাবিত করা'ব কথা।) কিন্তু তা কোন ক্রমেই যেমন অস্বীকার কবার নয়, তেমনি কারো পক্ষেই অসম্মানেব নয়। কারোর দ্বারা প্রভাবিত লেখক ছোট হয়ে যান না, পরবর্তী কাউকে প্রভাবিত কবলে সেই লেখক বৈষ্ণবদের আখড়ায় মূল বৈষ্ণবী হয়ে ভক্তকুলের মোহদৃষ্টিব শিকাব মাত্রও হন না। সাহিত্যশিল্পের ধারায় প্রভাব একটি সুস্থ চিন্তা-ক্রম—যা ব্যক্তিকে নয়, একটি দেশেব সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধাবাকে সূত্রবদ্ধ করার সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে, তাতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও ছোট হয়ে যান নি। ববং প্রভাবের মধ্য দিয়ে শিল্পচেতনায সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সূত্রটি স্পষ্ট করে গেছেন, আবার প্রভাবকে অতিক্রম করার নতুন সাহসে স্থিতও হতে পেরেছেন। তেমনি তারাশঙ্করে প্রভাব বা অনুজদের ওপব তারাশঙ্করের সচেতন অনুভূতি বরং স্বভাবী পাঠকরা সুস্থ মনেই অভিনন্দিত করবেন।

আমার বর্তমান আলোচনায তারাশঙ্করের 'আগে ও পরে' বলতে প্রাক্‌কাল ও উত্তরকাল বোঝাতে চাই, আর তারাশঙ্কর স্ব-কালে তো সমকালের বৈশিষ্ট্যেই উজ্জ্বল। এক তরুণ তারাশঙ্কর লেখক হিসেবে যখন প্রথম চারপাশের উতরোল আলো-বাতাসে চোখ মেললেন, তখন তাঁর চোখে সমকালের সাহিত্যের ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের আলো নানারঙে প্রতিফলিত ও প্রতিসারিত হয়, লেখক-

ব্যক্তিত্বের বিস্ময়-মোহিত চকিত জন্ম-মুহূর্তে তারাশঙ্কর প্রেরণা, তীব্র বাসনা, উদ্বেগ-আবেগ—সব কিছুর রস সঞ্চয় করেছেন সমকালের সম বা কম-বেশী বয়সের লেখকদেব কাছ থেকেই। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর স্পষ্ট করে তা জানিয়েও গেছেন।

কংগ্রেসের কাজে তারাশঙ্কর তখন সিউড়ীতে এক উকীলের বাসায়, রাতে নির্ঘুম সহাযহীন অস্বস্তিব মধ্যে হাতে পান পুবনো একটি 'কালিকলম' পত্রিকা—তেরশ চৌত্রিশ সালেব জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। যেন বা অলৌকিক ঈশ্বর-প্রেরিত গোপন বার্তা। সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতার বর্ণনা,—'আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটি লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

'পোনাঘাট পেরিযে', লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র।

পড়ে গেলাম গল্পটি, বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ বসমাদকতায় মন মদির হযে গেল। মশকের গানে বা দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পাবল না।

ওল্টালাম পাতা। আবাব পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনিভাবে কলমের ডগায় অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওযা যায়। ...ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব।'

সমকালেব এই দুই লেখক তাঁকে প্রভাবিত করেনি, দিয়েছে প্রথম লেখার ও লেখক হওয়ার প্রেরণা। বীরভূমেব আঞ্চলিক জীবন নিযে লেখা গল্প কিন্তু শৈলজানন্দের ওই 'বেনামী বন্দর'। 'জনি ও টনি'—নয়, তবু সমকালের এক লেখকের গল্পের আয়নায শিল্পীর আত্মা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এক আত্ম-আবিষ্কৃত আর্তপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে চিনেছিল। সমকালের এক লেখক আর এক লেখককে কোন্ এক অলৌকিক ইশারায শিল্পীর সুপ্ত আত্মায় দীপ-শলাকা জ্বেলে দেয়।

শিল্পী তারাশঙ্করের আবির্ভাব এমনি আকস্মিক, 'রসকলি' আর 'হারানো সুর'—এই দুটি গল্প নিয়ে তারাশঙ্কর 'কল্লোলে' দেখা দিলেন। শিল্পীর প্রকাশ-সংকটের প্রাথমিক পর্বের অবসান ঘটে এইভাবে। কিন্তু শুধু সমকালের বিশেষ কোনো লেখা বা লেখক নন, সমকালটিই ক্রমশ তারাশঙ্করকে শিল্পী 'হয়ে ওঠা'র পথে বার বার ধাক্কা দিয়ে কাঁপাতে থাকে। সুসম বিকাশের পথে প্রয়োজনীয় রসদ যোগায় অক্লান্ত।

এককথায় কল্লোলের কালের রঙ যা তরুণ লেখকরা মশালের মত লেখনীতে ধরেছিলেন, তা সবুজ বা রক্তিম নয়, তা ছিল সংশয়, অবিশ্বাস, ঐতিহ্যের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো অনীহা, বিভ্রান্তি, মূল্যহীনতা, শিল্পিত অথচ প্রত্যক্ষ যৌন ভাব-ভাবনায় ধূসর—পীতবর্ণ, অস্থিরচিত্ততা, বিষণ্ণ ব্যর্থতাবোধ সব মিলিয়ে একটা 'পেসিমিজ্‌ম্‌' তারাশঙ্করের সমকালের শিল্প-মঞ্চকে ধূসর পাদপ্রদীপে স্তিমিত করে তুলেছিল। তারাশঙ্কর এর মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখেননি, আশ্রয় চান নি, এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বিভ্রান্তও হননি। তারাশঙ্কর কল্লোলের লেখক, কিন্তু কল্লোলের শিল্পী নন। 'আমি বিদ্রোহের ছিলাম না।'—বলেছেন তাবাশঙ্কর তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' আত্মকথায়—'বর্তমান ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য কবে শূন্যবাদেব মধ্যে জীবনকে শেষ করাব কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয়নি, আমাব রচনার সমাপ্তি-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে এ-কথা বোধ হয় স্পষ্ট ধবা পড়ে, আমার মনে ভেঙে গড়াব গভীর স্বপ্ন ছিল।'

এই তারাশঙ্কর তাই আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে, শিল্প-ব্যক্তিত্বের ছাযা-কাযাব স্বরাজ্যে স্বরাট্ হয়ে উঠলেন। সমকাল তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে লেখার, শিল্পনীতি গ্রহণ করার ও গড়ার রসদ ও অভিজ্ঞতাব যোগান দিয়েছে, দেয়নি সেকালের কল্লোল-কেন্দ্রিক কিছু তরুণের বোম্যান্টিক লোভন অভীপ্সার কাছে নতি স্বীকারেব নিঃশর্ত মানস-আর্তি। সমকালে সচেতন থেকেই তারাশঙ্কব স্ব-কাল রচনা ক'বে তারই মধ্যে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন।

তারাশঙ্কর বলেছেন 'মানুষের ওপব বিশ্বাস হারানো পাপ'। এই ঘোষণা তাঁর উপন্যাস ছোটগল্পের রক্ত মাংস মজ্জা, তাঁর মন, প্রাণ, আত্মা, তাঁর শিল্পের দলিল, এককথায় সুস্থ জীবনেব মৌরুসী পাট্টা। 'মানব্য' বা মানবিকতা মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ কবিতা, মানুষে মানুষে বন্ধন, আবার মুক্তিও। এ কবিতা 'Eternal feeling', Eternal Truth'। এরই সূত্রে তারাশঙ্কর প্রাক্-কাল ও উত্তরকালের সঙ্গে সংযোগ রচনা করে গেছেন। তারাশঙ্কর বিশ শতকের মানুষ। এই বিশ শতকেই সারা বিশ্বে মানবতা বা 'মানব্য' নিয়ে নানান তাত্ত্বিক তর্ক হয়ে গেছে। একজন নাৎসী দার্শনিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, মানুষ হল পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাসিলাস। আলবেয়র কামু বলেছেন, আমি মানবতায় বিশ্বাস করি, মানুষে আমার বিশ্বাস নেই! এই রকম সব বিচিত্র ভিন্নমুখী চিন্তার স্রোত-প্রতিস্রোতে বিশ শতকের বিশ্ব 'মানব্য'-এর ব্যথায় যখন ক্লান্ত, তখন প্রাচীন ভারতবাসীর মত 'শুনহ' মানুষ ভাই, সবার

উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এর সমান স্বরে সোচ্চার হয়েছেন তারাশঙ্কর। 'কল্লোল'-কেন্দ্রিক নেতিবাদী জীবনপ্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের প্রত্যয় পাঠকদের প্রতীতিকে ভবিষ্যৎ জীবনভাবনায় প্রোজ্জ্বল করে।

তারাশঙ্করের প্রাক্‌কালে বাঙলা সাহিত্যে তিন জ্যোতিষ্ক—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। তারাশঙ্করের আগেব এই তিন ব্যক্তিত্ব তারাশঙ্করে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। অনেকটা আধুনিক সাহিত্যের গোমুখ থেকে তিন সন্নিকট ঝর্ণা মিলিত হয়ে নদীর রূপ পেয়েছে তারাশঙ্করে। এ নদী নিজের বেগে প্রতিবেগ সৃষ্টি করে বহতা হয়েছে বটে, কিন্তু বাঁধা আছে সেই ত্রিস্রোত ঝর্ণার জলের সঙ্গে। তারাশঙ্কর পূর্ব-সাহিত্যেব ও পূর্বসূরী সাহিত্যিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তিত্ব নন।

'আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা' প্রবন্ধে তারাশঙ্কর স্পষ্ট করে বলেছেন তাঁর ওপর বঙ্কিমের প্রভাবের কথা। বলেছেন, কপালকুণ্ডলা পড়ার পর যেন-বা তাঁর শিল্পী-আত্মায় এক নব উদ্বোধনের ঘটনা ঘটেছিল। কি করে তা সম্ভব হয়? আসলে তারাশঙ্কর বঙ্কিম প্রভাবিত লেখক। বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা আয়নায় বিম্বিত আপন প্রতিকৃতির মত। তাবাশঙ্করের সমস্ত লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের অশরীবী উপস্থিতি নামাবলীব মত ছাপা হয়ে আছে।

অবশ্যই তারাশঙ্করের নায়ক-প্রকল্প সম্পর্কে এমন কথা আদৌ অস্বীকার করা যায় না। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব 'বেদে' উপন্যাসের নায়ক বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বহু নায়কের ছাযা তাঁর বর্ণিত নাযকে নেই, থাকলে সমকালের শিল্পচেতনার সঙ্গে তাঁর মমত্ববোধে খুশী হতাম। আছে গণদেবতাব দেবু ঘোষ, কালিন্দীর অহীন, উত্তবাযণের প্রবীর, ধাত্রীদেবতার শিবনাথ—ইত্যাদির মত বড় বড়, প্রাচীন শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বে মোড়া 'অভিজাত' নায়ক। মধ্যবিত্ত অথচ অতি-অভিজাত এইসব নায়ক-প্রকল্প বঙ্কিমচন্দ্রকে তো মনে করিয়ে দেয়ই, সেই সঙ্গে কখনো-কখনো রবীন্দ্রনাথকেও। তারাশঙ্কব কল্লোলেব নেতিবাচক জীবনভাবনা থেকে সরে এসে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পংক্তিতে নিজেকে বসিয়েছেন।

শুধু চরিত্র নয়, কাহিনী রচনায, পরিবেশ-সৃজনে, ঘটনা সাজানোয় তারাশঙ্কর বঙ্কিমকে ভোলেননি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একাধিক উপন্যাসে মেলোড্রামাকে কাজে লাগিযেছেন। উপন্যাসের উন্মেষ ও বিকাশ-লগ্নে এ ছাড়া বোধহয় গত্যন্তর ছিল না। এ সবই ওই উপন্যাসের নীতিতে সুসমঞ্জস। তারাশঙ্কর বঙ্কিমী মেলোড্রামাকে ভোলেন নি। কালিন্দী থেকে উত্তরায়ণ, মঞ্জরী অপেরা—সর্বত্র

নানাভাবে তা ধরা পড়ে। বঙ্কিমের ভাষা বাদ দিয়ে গঠন ও আবহের প্রভাব তারাশঙ্করে অনস্বীকার্য।

আবার শরৎচন্দ্রও তারাশঙ্করকে নানাসূত্রে প্রভাবিত করেন। একান্তভাবে বাঙালী জীবন-পিপাসাকে রূপায়িত করার প্রয়াস ছিল শরৎচন্দ্রের। নিয়েছিলেন নর-নারীর হৃদয়, মন, সেন্টিমেন্ট। সমাজের গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে তাঁকে এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথে যা ছিল অনন্য, বিস্ময়কর বোধ, বুদ্ধি ও স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের মিশ্রণ, শরৎচন্দ্রে তা আসে অতি সাধারণ প্রত্যক্ষ গ্রামীণ বাস্তবচিত্রে। তারাশঙ্কর তাকে আরো জীবন্ত, প্রত্যক্ষ, ব্যাপক ও জীবননিষ্ঠ করে তোলেন। এর প্রেরণার মুখে শরৎচন্দ্র। 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'রাইকমল' রচনায় এর প্রমাণ মেলে।

তারাশঙ্করকে আঞ্চলিক জীবনের চিত্রকর বলে সম্মানিত করা হয়। এই সূত্রেও শরৎচন্দ্র স্মরণীয়। হুগলী জেলার গ্রামীণ রূপ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আছে, কিন্তু 'আঞ্চলিক' এই অভিধায় তার মূল্যায়ন অবান্তর। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। শরৎচন্দ্র আঞ্চলিক নন, কিন্তু বঙ্কিম বাদে রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পে যে অঞ্চলের ও আঞ্চলিক জীবনের অস্পষ্ট ঘ্রাণ মেলে, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে কমললতা-প্রসঙ্গ তার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মায়, আর সেই সূত্রেই আসে তারাশঙ্করের 'রসকলি' ও 'রাইকমল' রচনাদুটির আঞ্চলিক ভাব-ভাবনা, হৃদয়-সংবাদ, তার নিবিড় আপনত্ব।

বস্তুত তারাশঙ্করের 'আঞ্চলিক' অভিধা অ-যথার্থ নয়। তবে 'কয়লা কুঠি'র গল্প-লেখক শৈলজানন্দের সচেতন অনুসৃতি থাকলেও এই অঞ্চল-ভাবনা তারাশঙ্করের মজ্জাগত। তিনি জন্ম, কর্ম, মর্ম—এই তিন সূত্রে লাভপুর, বীরভূম অঞ্চলের মানুষ। এই অঞ্চল সম্পর্কে তারাশঙ্করের নিজস্ব কথা রাইকমল উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে—'এ দেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব, কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই', অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ।' এই দেশে মানুষ হয়েছেন তারাশঙ্কর। আর লেখার সময় বৈষ্ণবীয় জীবন ভাবনায় শরৎচন্দ্রের কমললতার ভাবনা তাঁকে অবশ্যই নানাভাবে ধরে রাখে। তবে শরৎচন্দ্রের থেকে তারাশঙ্কর সেই জীবনেরই পূর্ণারতি করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'বোষ্টমী' গল্পে তাঁর বৈষ্ণব ভাবনাকে আনন্দী ও তার গোপালের সম্পর্কের মধ্যে নিজস্ব বিশেষ ভাব-দর্শনে এঁকেছেন, শরৎচন্দ্র কমললতায়

দিয়েছেন সত্যিকারের বৈষ্ণবীয় পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও রসমূর্তি। তারাশঙ্করের 'রসকলি' ও 'হারানো সুর' গল্পে, রাইকমল উপন্যাসে সেই বৈষ্ণব ভাবনার অনুসরণ থাকলেও মঞ্জরী-পুলিনের সম্পর্ককে আর এক আত্মিক প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আঞ্চলিক জীবন, তার স্বভাব, মানুষ—সব কিছুতেই যে শিল্পের বিশ্বাস্যতা তার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে বিবিক্ত নয়।

অর্থাৎ তারাশঙ্করের প্রাক্-কাল তাবাশঙ্করকে 'হয়ে-ওঠা'য় সাহায্য করেছে। কিন্তু উত্তবকাল? প্রসঙ্গটা আঞ্চলিক সাহিত্য ধবেই আনা যাক। কল্লোলের কালে শৈলজানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের সঙ্গে তারাশঙ্কর পাশাপাশি থেকে যে আঞ্চলিক সাহিত্যেব জন্ম দিয়ে গেছেন, তার বেগ-প্রতিবেগে উদ্দীপ্ত হযে আবও একাধিক অঞ্চল জীবনের ছবি রঙিন ও বিচিত্র বর্ণেব হয়ে ওঠে উত্তর কালের লেখকদেব হাতে। 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলি বাঁকেব উপকথা'র মত অঞ্চল-জীবনের এক বলিষ্ঠ রূপকারকে নিশ্চযই অতিক্রম করার ক্ষমতা এঁদের আছে কিনা সন্দেহ থেকে যায়, তবু তারাশঙ্কবের উত্তরকালে বসে সমরেশ বসু তাঁব 'বি টি রোডের ধারে', বা 'গঙ্গা' উপন্যাসে, সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁব 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' যে সব অঞ্চলেব ছবি এঁকেছেন, তারও উল্লেখ বাঙলা সাহিত্য ধাবায থাকেই। তারাশঙ্করে যার সার্থক পবিণতি, উত্তরকালের লেখকদের মধ্যে তাবই শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি।

তারাশঙ্করেব প্রাক্-কালের সঙ্গে উত্তরকালের যোগ কোথাও স্থূল, কোথাও বা সূক্ষ্ম সূত্রে চিহ্নিত। কোথাও বিষযে, কোথাও বা উপন্যাসেব বক্তব্যে, আবার কোথাও উপন্যাসের প্যাটার্ণ রচনায। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে যে জমিদার শ্রেণীব সঙ্গে নতুন ধরনেব অথবান মানুষের ব্যক্তিত্বেব, আত্ম-অভিমানের বিবোধেব ভাব অতি সূক্ষ্মতায উপস্থাপিত, বিপ্রদাস-মধুসূদন দুটি চরিত্রের দুই প্রান্তিক মেরুবলয়ে যার সংঘর্ষের সংকট—তার স্পষ্ট রূপ শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করে এসেছে সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর দ্বন্দ্বাভাসে—'জলসাঘরে'—'কালিন্দী'তেও। আব এই ধারা তাবাশঙ্করেব উত্তরকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে আরও স্পষ্ট হয়ে সাময়িকভাবে থামে বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলামে।'

উপন্যাসের ভাষায, কাহিনী-গঠনে তারাশঙ্কর কথনো বা নাটকীয়তাকে অতি প্রাধান্য দিয়েছেন। নাট্যরস তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, আর এই সূত্রেই এসেছে 'মেলোড্রামা'। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক

একসময়ে তাঁর 'সুবর্ণরেখা' ছবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মেলোড্রামা একাধিকবার তিনি ব্যবহার করতে রাজি—যদি দর্শকরা নেন শুধু নয়, তাকে সেই পরিবেশে যথার্থ শিল্পসম্মতভাবে প্রয়োগ করা যায়, প্রয়োজন হয় তবেই। তারাশঙ্কর তাঁর সমস্ত উপন্যাসে নাটক, নাটকীয়তা ও মেলোড্রামাকে বঙ্কিম-ভাবনার অনুস্মৃতি ও অনুস্মৃতিতে প্রয়োগ করেছেন, কাব্য ও নাটক থাকার জন্যই উপন্যাসের প্যাটার্ণ হয়েছে 'এক যে ছিল রাজপুত্র' ধরনের গল্প বলার। লোককথা আর রূপকথা তারাশঙ্করের শিল্প-অঙ্গে জড়ানো।

শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্রের মত তারাশঙ্কর বর্ণনায় অতি বিস্তারকে লাগাম টেনে ধরার পক্ষপাতী নন। নাকি সেই শিল্প-ক্ষমতা তাঁর ছিল না? সন্দিগ্ধ সমালোচকের এরকম সন্দেহ দেখা দিলে অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। আপাতত সে কথা থাক, শুধু আমার কথা হল, বঙ্কিমের মতো, বা একেবারে শরৎচন্দ্রের আদলে তারাশঙ্কর বর্ণনায়, গদ্যের ভাষায় বিস্তার ঘটিয়েছেন। বঙ্কিমের ছিল গভীর জটিল মনস্তত্বের অনুবর্তী বর্ণনা ও বিস্তার, তারাশঙ্করের ক্ষমতা নিশ্চয়ই সেই শিল্পী-সংযমের সংলগ্ন নয়। প্রাক্-কালের শরৎচন্দ্র যে তারাশঙ্করকে গদ্যের ভাবনায়, বর্ণনার মোহে প্রভাবিত করেছিলেন, 'মেলা', 'যাদুকরী' গল্পে তার প্রমাণ আছে, প্রমাণ আছে 'ধাত্রীদেবতা' ও অন্যান্য উপন্যাসেও।

অন্য এক ব্যাপারেও তারাশঙ্কর বঙ্কিমকে ভুলতে পারেননি। তারাশঙ্কর মানুষটি গ্রামীণ, 'ম্যাটার অব দি সয়েল'-এর কথা চিন্তা করেই তাঁর লেখনী হয়েছিল অস্ত্র। লোককথা তাঁর সমস্ত উপন্যাসে গ্রাম-স্পর্শে দীপিত হযে আছে। এই লোক-কথায় তিনি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে নিশ্চয়ই প্রাগ্রসব, কিন্তু তার মধ্যে মিশিয়েছেন 'ইন্‌ডিভিজুযাল'। এই ব্যক্তিমনস্কতা কিন্তু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ পাঠেরই ফল। প্রাক্‌কাল অতিক্রমণেব পর তারাশঙ্কর স্ব-স্বভাবে দেশজ ঐতিহ্য প্রীতির সঙ্গে ব্যক্তিমনস্কতা সম্পৃক্ত করে উপন্যাসে গল্পে আরও এক নতুন মিলনকথা শুনিয়েছেন—যা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে থাকার কথা নয। লোকজীবনের বলবান্ অস্তিত্বের আত্মিক অভিজ্ঞতা মিলিত হয়েছে বলেই তারাশঙ্কর নিজস্বতা আনতে পেরেছেন। সমকাল ও উত্তরকাল থেকে এই স্বাতন্ত্র্যে শিল্পী তারাশঙ্কর এক অভিনন্দিন ব্যক্তিত্ব।

প্রাক্‌কাল তারাশঙ্করকে যত শাখা প্রশাখায় জড়িয়ে ধরে আছে, সমকাল ও উত্তরকাল তা নয়। অর্থাৎ প্রাক্‌কালের লেখকদের কাছে তারাশঙ্কর শিল্পে

ও সিদ্ধান্তে যতখানি গভীর-প্রোথিত, সমকাল ও উত্তরকালের সঙ্গে সম্পর্কে তত নয়। যেমন রোম্যান্সধর্মী, আবেগপ্রাণ রূপকথার ধাঁচে গল্প বলার মাধ্যমেই তিনি গল্প উপন্যাসের দেহকে চকিত করেছেন, তেমনি এনেছেন বঙ্কিমী নীতিবোধ ও আদর্শবাদের গ্রামীণ অথচ প্রখব উত্তাপ। জীবনদর্শনের কথা, নীতির কথা, পাপ-পুণ্যের কথা, সমস্ত বৈষম্যের শেষে এক ধরনের শান্তিবচন উচ্চারণের প্রশান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার যে প্রয়াস তারাশঙ্করে আছে, তা তো বঙ্কিমের মতই। ধাত্রীদেবতার 'শিবনাথে', 'কবি'র নিতাই কবিয়ালে, উত্তরায়ণের 'প্রবীরে'র মধ্যে বা 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দুর শেষতম জীবনাচরণে আমরা বঙ্কিমকে দেখি। কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল বুঝি বা নানাখানা হয়ে, বা কপালকুণ্ডলার অথবা বিষবৃক্ষের সেই অলৌকিক স্বপ্নকথা যেন বিশ শতকের আবহাওয়ায় পরিশীলিত হয়ে তারাশঙ্করে রূপ পেয়েছে। তারাশঙ্কর নিজেই আত্মকথায় যা বলেছেন, তাই ঠিক। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর-স্বভাবকে বিস্মৃত হতে পারেননি।

নেতিবাদী জীবনভাবনাকে সামগ্রিকভাবে স্বীকার করেই যদি তিনি জীবনের আস্তিক্য চেতনায় স্থিত হতেন, তাহলে শিল্পের বিষয় ও প্যাটার্ণে তারাশঙ্কর অন্য শিল্পী হয়ে উঠতেন। তা হয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতকাংশে অন্যান্যরা। তারাশঙ্কর শিল্পীবোধের জন্মলগ্নের আস্তিক্যের শঙ্খধ্বনি করেছেন, জীবন সম্পর্কে আস্তিক্য ধ্যান ও ধারণা যখন রক্তের কণিকায় জড়িয়ে যায়, তখন নীতির কথা, পাপ পুণ্যবোধ, সব কিছুর শেষে এক শোভন সুন্দর মিলন ভাবনা দেখা দেবেই। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য জীবনে'র এক জায়গায় বলেছেন, 'বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না'।

এই আন্তরিক মন্তব্যটুকুতেই তারাশঙ্করকে চেনা যায়। সমকালের প্রধান 'শূন্য'কে তিনি উপেক্ষা, অস্বীকার করেছিলেন, বা করতে চেয়েছেন শিল্পে। এই অস্বীকৃতি তাঁকে আর এক স্বীকৃতির জগতে বিচরণে সাহায্য করেছে। যা কিছু স্থিত, স্থির, পূর্বানুবৃত্ত, শান্তির বা স্বস্তির—তাকেই তখন আপন করেছেন। তাই উনিশ শতকের বঙ্কিম হয়েছেন আপন, দুই শতকের বিশাল মানুষ রবীন্দ্রনাথও হয়েছেন আপন, এমনকি গদ্য ভাবনায়ও লোকজীবনের অবলম্বনে শরৎচন্দ্রকেও করেছেন আদর্শ। তাঁর বুকের গভীরে মর্মের মমতায় স্থান পায়নি অন্তরঙের সমকাল। তাই উত্তরকাল—যা সমকালের সংশয়, নেতিবাদ, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, যন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা নিয়েই আর এক আসনে উজ্জ্বল হয়েছে—তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরস্থরী আছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কতকাংশে সমরেশ বসু। কাব্যে জীবানন্দ দাশ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও উত্তরস্থরী খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু তাবাশঙ্করের উত্তরকাল, উত্তরস্থরী শূন্যেই থেকে যাবে হয়ত। বহু আচবিত বাঙলা গদ্য দীর্ঘদিন তাঁর 'ন্যারেটিভ স্টাইলে' মুখবন্ধ কবে থেকেছে। সাম্প্রতিক কাল তাকে বর্জন ক'রে নতুন কথায় উচ্চকিত হতে চায, সেখানেই তার সার্থকতা খোঁজে। উপন্যাসের এই 'ন্যারেটিভ স্টাইল' ঐতিহ্য ও রক্ষণশীলতার ধর্মে ও মর্মে তাবাশঙ্কবে প্রকট। এর থেকে মুক্তিব দিনে তাবাশঙ্করেব গদ্য কতটা মনে থাকবে, চিন্তার বিষয়। ভয়ঙ্কর উৎকেন্দ্রিক মননক্রিযাব কালে তাঁব বিষয-স্থত্রেব সঙ্গে সংযোগ প্রসঙ্গ না হয় বাদই দিলাম।

———

তারাশঙ্কর-প্রসঙ্গ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

মানুষের প্রতিদিনের জীবনকে এবং কল্পনাশ্রিত আদর্শলোকের কাহিনীকে উপন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কোনোটি আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দেয়, কোনোটি বা বাস্তব অভিজ্ঞতার বাইরেই রয়ে যায়। কিন্তু বাইরে থেকে গেলেও উপন্যাসে তার প্রবেশাধিকার কখনো বাধাগ্রস্ত হয় না। অভিজ্ঞতার কাহিনীই হোক, আর বাস্তব-অস্তিত্বহীন কল্পলোকের কাহিনী হোক, লেখার গুণে এবং লেখকের ব্যক্তিগত জীবনতত্ত্বের প্রভাবে যে-কোনো কাহিনীই কথাসাহিত্যে সৃষ্টিরূপ লাভ করতে পারে। অবশ্য সে কাহিনী ও চরিত্র কোন কোন সময়ে অতি নিপুণ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি থেকে জন্মাতে পারে, কোথাও-বা একটা বিশাল পটভূমিকায় বিচিত্র নরনারীর শোভাযাত্রায় পরিণত হতে পারে। কখনো গীতিরসের পুলক-মূর্চ্ছনা, কোথাও নাটকীয় অনিবার্যতা, কোথাও-বা মহাকাব্যের মতো দিগন্তব্যাপী বিরাট মহিমায়-উন্নীত একপ্রকার জীবনচিত্র উপন্যাসের কলেবর নির্মাণ করতে পারে। ঘটনা-বিবৃতি, চরিত্র-বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও মনোবিকার, সমাজ ও সমাজঘটিত জীবনের বহিরঙ্গ, আবার এ সমস্তের অতিরিক্ত এক ধরনের রহস্যময় প্রতীকের ব্যঞ্জনা ও লেখকের চৈতন্যস্রোত কাহিনী ও চরিত্রকে এমনভাবে উপস্থাপিত করে যে, বক্তব্যের মধ্যে যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য চৈতন্যের গভীরে নেমে গেলে অসঙ্গতির মধ্যেও সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একালের কথাসাহিত্যে সেই চেষ্টা চলেছে নানাদেশে ও নানা সামাজিক পরিবেশে। তারাশঙ্কর এই সমস্ত আপাত-অদ্ভুত ও উদ্ভট ব্যাপার নিয়ে আদৌ চিন্তিত হননি, মানুষের যে-জীবন অভিজ্ঞতায় ধরা যায়, যার বিকাশ ও পরিণাম কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যানের অপেক্ষা রাখে না, তারাশঙ্কর নানা পরিবেশে সেই জীবনকেই প্লট ও চরিত্রের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে চোখ মেলে চাইলেই যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করা যায় তারাশঙ্কর সেই জীবনকেই অবলম্বন করেছেন। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'রাধা', 'গন্নাবেগম'—এ-সব গল্পকাহিনী যতোই বিচিত্র ও

অদ্ভুত হোক না, এর নরনারী আমাদেরই অতিপরিচিত। কেউ কেউ হয়তো ইতিহাসের ছায়াধূসর পরিবেশে কিছু রহস্যময়, কিন্তু তারা তাদের বিচিত্র জীবন ও ক্রিয়াকর্ম সত্ত্বেও আমাদের প্রতীতিকে আঘাত করে না। আমাদের কৌতূহল যতোদূর যেতে পারে তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি ততোদূরই গেছে। শুধু বিলীয়মান গ্রামজীবন বা ভগ্নপক্ষ ভূস্বামী সম্প্রদায় নয়, সমকালীন সামাজিক জীবন তারাশঙ্করকে বিচিত্র পথে নিয়ে গেছে। তাঁর উপন্যাসগুলি তাই তাঁর সমকালের মধ্যে আবর্তিত, কিন্তু অতীতের সঙ্গে তার যোগসূত্রটিও দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু একটি বিশেষ দিক তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তিনি খুব খুঁটিনাটি ছোটখাট details-এর মধ্যে যেতে চান না। একপ্রকার বিশালতাবোধ তাঁকে রহস্যময় অঙ্গুলিসঙ্কেতে দূরে-দূরান্তরে নিয়ে গেছে। (উপন্যাস আসলে মহাকাব্যেরই আধুনিক বংশধর। তবে তাব যাত্রা মাটির দিকে, আকাশের পানে উধাও নয়। এককালে কাহিনীকেন্দ্রিক মহাকাব্যে কতো অদ্ভুত ঘটনা, চরিত্র, কাহিনী থাকত। বিশাল তার বিস্তার, বিচিত্র তার সমারোহ। ক্রমে কালের পরিবর্তন হল, গল্পরসের প্রতি আকর্ষণ পাঠকের রইল, কিন্তু তার পরিবেশ বদলে গেল। একালের কাহিনী আব ছন্দে রচিত হল না, সুর করে পডা হল না, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত শ্রোতার দল অদ্ভুত কাহিনী শোনার জন্য ভিড করে এল না। এ আখ্যান গদ্যে লেখা, এ-কাহিনী আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে নেওয়া, এর ভাবভঙ্গিমা স্বভাবকেই অনুসরণ করে গডে উঠেছে।

২

মহাকাব্যে যে বিশালতাবোধ লক্ষ্য করা যায়, একালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি প্রধানতঃ ইতিহাসের রোমান্টিক পরিবেশ বেছে নিয়েছিলেন এই বিশালতার দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। কল্পনার অকৃপণ সহযোগিতা ব্যতীত ইতিহাসের পটে এই দেশকালের সুবিপুল প্রসার সৃষ্টি করা যায় না। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম' পর্যন্ত যে-কোনো ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে স্বাদের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য থাকলেও ইতিহাসের স্বল্পতা-পরিচিত কাহিনীকে কল্পনার সাহায্যে যে কতটা দৈর্ঘ্য ও গভীরতা দেওয়া যায়, তা তাঁর এই উপন্যাসগুলি থেকেই বোঝা যাবে। এই বিশালতাবোধের স্বল্পতা যে বিশাল কাহিনীকেও কথাসাহিত্যে কতটা সংকুচিত, ভীরু ও দুর্বল

করে তোলে তার বড়ো রকমের দৃষ্টান্ত রমেশচন্দ্রের তিনখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস —'বঙ্গবিজেতা', 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' এবং প্রতাপচন্দ্র ঘোষের দুইখণ্ডে সমাপ্ত 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'। ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনা-বিবৃতি ও অনুসন্ধানে দুজনই তন্নিষ্ঠ ছিলেন এবং বিশাল পটভূমিকা বেছে নেওয়াতেও তাঁদের বিচক্ষণতাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রে যে বিশালতাবোধ সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্যকে ছাড়িয়ে উঠেছে, এঁদের মস্ত বড়ো কাহিনীতে তা হতে পারেনি। কারণ একথা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত যে, বিশালতা বলতে শুধু পটভূমিকার বিপুল প্রসার নয়। ঘটনার কুশীলবগণ প্রতিদিনের ধূমাঙ্কিত গ্লানি ছাড়িয়ে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের তুঙ্গলোকে না উঠলে উপন্যাসের ভাবগত বিশালতা ফুটে উঠতে পারে না। ইতিহাসকে অবলম্বন করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপন্যাস ফেঁদেছিলেন, কিন্তু তাও একই কারণে ব্যর্থ হয়েছে। একালেও কোনো কোনো ঔপন্যাসিক দূরকালের ইতিহাস নির্বাচিত করেছেন, কিন্তু মহাকাব্যোচিত বিশালতা সম্পর্কে তাঁদের অনেকেরই কোনো ধারণা নেই বলে এসব জল্পনা নিতান্তই বালক-ভুলানো ব্যাপারে পর্যবসিত হচ্ছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ঐতিহাসিক রস' নাম দিয়েছেন এবং যাকে 'মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ' বলেছেন সেই বিশালতাবোধ শুধু একালের বাংলা উপন্যাসে কেন, পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসেও বড়ো-একটা পাওয়া যায় না। এই বোধ সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক রোমান্সে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে তিনি ব্যক্তিগত প্রবণতার সীমা-বদ্ধতা ছাড়িয়ে এমন একটা বৃহৎ ভূমি থেকে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যে "তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে, দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-শুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।" এখানে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, অতীতচারী দূরাস্তৃত ঐতিহাসিক রণরঙ্গমুখর ঘটনা ও চরিত্রেই ইতিহাস রস অর্থাৎ কালের বিশালতা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু লেখকের সমসাময়িক ঘটনা, পরিবেশ ও চরিত্রও যে পুরাতন কালের ঐতিহাসিক রোমান্সের মাত্রা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশালতা-বোধের দিকে ফেরাতে পারে তার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, বর্তমান শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মধ্যেই সেই বিশালতাবোধ একটা যুগের সমগ্র সমাজজীবনকে অনেকটা প্রকাশ করতে পেরেছে। অবশ্য এর কাহিনীগ্রন্থনে ও চরিত্রবিন্যাসে কবি রবীন্দ্রনাথের

কবিমানসের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে, অনেক সময়ে কবি এসে ঔপন্যাসিকের কলম কেড়ে নিয়েছেন, তা হলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপন্যাসের পরিচয় নিয়ে আজও মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথই এই উপন্যাসে ভারতাত্মার যথার্থ স্বরূপ অবধারণ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য সে সব ধারণা কোন রাজনৈতিক নেতার তারস্বরে চেঁচানো ভারতমাতার উজ্জীবন-সঙ্গীত নয়। সেকালে এবং একালেও রাজনৈতিক গগনের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও 'কালাপাহাড়'-গণ একচক্ষু হরিণের মতো শুধু রাজনৈতিক সত্তার দিকেই নিহিতদৃষ্টি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উত্তেজক রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করেও তার তীব্র আলোকে পথ হারিয়ে ফেলেননি। তিনি উত্তেজনার নগদ-বিদায় পরিত্যাগ কবে এবং স্থিতধী হয়ে গোরার মানসবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমকালীন ভারতের বিশালতাকেই চিহ্নিত করেছেন। শবৎচন্দ্রও প্রায় এই সময়ে আবির্ভূত হন। বক্তব্যের মধ্যে রমণীয়তা এবং চরিত্রের মধ্যে গল্পবসের আশ্চর্য যাদুশক্তি সঞ্চার করে শবৎচন্দ্র অতি সহজেই বাঙালী পাঠকেব হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। বিশালতাবোধ নয়, হৃদয়বোধেব প্লাবনে তিনি বাঙালী পাঠকের সমগ্র সত্তা প্লাবিত করে ফেলেছেন। 'পথের দাবি', 'শেষ-প্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাসে' সেই বিশালতাবোধ শিল্পরূপে সার্থক হতে পারত। কিন্তু সহজিয়া আবেগ এবং মানববেদনার প্রতি নির্বাধ সহানুভূতির অতিবেক তাঁকে বিশাল মহাকাব্য বচনায বাধা দিয়েছে। 'পথের দাবি'তে সন্ত্রাসবাদের রোমান্স তাঁকে তরল আবেগের জলাভূমিতে টেনে নিয়ে গেছে, কর্মোদ্যমের শিলাচত্বরে স্থাপন কবতে পারেনি। 'শেষপ্রশ্নে' নবীন ভারত ও প্রথাগত ভারতবোধেব সংঘর্ষ থেকে বিশাল সামাজিক ইতিহাস নতুন রূপ ধারণ করতে পারত। কিন্তু এখানেও তিনি উদ্বেগ ও উত্তেজনাব হাতে নিজের শিল্পবুদ্ধিকে ছেড়ে দিয়ে শুষ্ক একতরফা তর্কের কচ্‌কচিতে বুদ্ধিজীবী উপন্যাসের আদর্শ সৃষ্টি কবতে চেয়েছিলেন। 'বিপ্রদাস' তাঁর শেষ দিককার রচনা, সুতরাং গোধূলির গেরুযা রং এব অঙ্গে অঙ্গে। তিনি যদি মহাকাব্য-সৃষ্টির মতো বিশালতাবোধের দ্বারা নিযন্ত্রিত হতেন তাহলে এ উপন্যাসে অসম নর-নারীর মন-বিনিময়ের অসম জল্পনা ছেড়ে তিনি সুপরিসব প্রাঙ্গণে ভাব-দ্বন্দ্বে নেমে আসতে পারতেন। মানবিক বাস্তব আবেগের রোমাণ্টিক মূর্তি, মানবনির্যাতনের সকরুণ মর্মপীডা, নিষ্প্রাণ ও নিঃস্পৃহ আসনের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক আশঙ্কার দ্বন্দ্ব, স্নেহপ্রেমপ্রীতির ঘরোয়া আবেগ-তরঙ্গ—শরৎচন্দ্র মানবজীবন বলতে প্রধানতঃ এটাই বুঝেছিলেন। তাঁর দু-একটি উপন্যাসের

কোথাও কোথাও হার্ডি-সুলভ নিয়তির গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে ; কিন্তু তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাধারণ পাঠকের কাছে বাংলাদেশের সমাজ ও পবিবারের একটি আবেগ-ময় মানবিক রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছিল। অর্ধ-শতাব্দী আগে জন্মালে তিনি দ্বিতীয তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায হতে পারতেন। সে যাই হোক, দেশকাল-পবিব্যাপ্ত বিশাল সৌধ নির্মাণও তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল না। তিনি বঞ্চিত নরনারীর অশ্রুবেদনাময় মূর্তি অঙ্কন কবতে চেয়েছিলেন, তাতেই ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা।

৩

শবৎচন্দ্রের পব 'কল্লোল' গোষ্ঠীব কোন কোন কথাসাহিত্যিক বাংলা উপন্যাসেব রূপান্তব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তব যুবোপে আশাভঙ্গের ইতিহাস চূডান্ত আকার লাভ করেছে। মানুষের আদর্শ, মনোবল ও মূল্যবোধ ভেঙে পডেছে, তাব কালো ছাযা নামল পশ্চিমের গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কাব্য-কবিতায। অবশ্য আমাদের দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্থ-নৈতিক মন্দা শ্রেণীবিশেষকে শঙ্কিত কবলেও জাতি বা মূল্যবোধে তেমন কোনো হানিকর চিড ধরাতে পারেনি। সুতরাং পশ্চিমে সমাজ, অর্থনীতি ও চারিত্রিক নীতি সংক্রান্ত হট্টগোল, এদেশে ততটা প্রত্যক্ষীভূত না হলেও ও-দেশের সাহিত্য ও নীতির এই বিভ্রাট আমাদের অর্থাৎ নব্যবাঙালী কবি ও কথাকারদের আকৃষ্ট করল। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকেও কিঞ্চিৎ বিচলিত করেছিল। পশ্চিমের এই বিকাবের অকারণ নকল করাকে রবীন্দ্রনাথ নিন্দাই কবেছিলেন। তাঁর বক্তব্যটি ধাবালো ও তির্যক, কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত-সঙ্গত। তিনি নকলকারী নবীন বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে এই অল্পোক্ত মন্তব্য করেছিলেন, "ভারত-সাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায় 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন ?' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাট যে ঘিরেছে।' ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ওইটেই বাহাদুরি।' অর্থনৈতিক তত্ত্বভিত্তিক শ্রেণীসংগ্রাম, মানুষের অন্তরবাসী লিবিডোর নিঃশব্দ পদচারণা, ড্রইংরুম-বদ্ধ রুগ্‌ণ রোমান্টিকতার অশরীরী বিলাস —এগুলি রবীন্দ্র-উত্তরকালীন কথাসাহিত্যকে প্লাবিত করে ফেলল। বলা বাহুল্য, এর অনেকটাই পশ্চিম থেকে আগত গল্প-উপন্যাসের প্রভাবে গড়ে উঠেছে।

এর কিছু স্বয়মাগত, কিছু-বা অনুকরণজাত এবং এই দাসমনোবৃত্তিসুলভ পশ্চিমের অনুকরণ কখনোই সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিরস স্পষ্ট কথার এইটি হচ্ছে গুহ্য কারণ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পর উপন্যাসের কালান্তর ঘটালেন তারাশঙ্কর। শরৎচন্দ্র এবং অতি-আধুনিকদের মাঝখানে অবস্থান করে তিনি বাংলার কথাসাহিত্যের মানদণ্ড ধারণ করলেন। বাংলা উপন্যাসের যে বিশাল স্রোত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে তার পরে কিছু শিথিল হয়ে পড়েছিল, তারাশঙ্করের রুক্ষ কঠোর লেখনীস্পর্শে আবার তার নতুন ক্ষেত্রে নবরূপে উজ্জীবন হল। শরৎচন্দ্রের ভাবাবেগ-ব্যাকুল অশ্রুবেদনার আতিশয্য তখন বাংলার পাঠকসমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, তাকে স্থিতধী চেতনার কঠিন মৃত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত করা তখন সহজ ছিল না। কিন্তু তারাশঙ্কর এই সর্বগ্রাসী আবেগের মহাক্ষুধা থেকে আত্মরক্ষা করে এবং কিছুটা পাশ কাটিয়ে দেশ ও কালের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও জীবনের নতুন রূপ ফুটিয়ে তুললেন। তখনকার কালসচেতন ইতিহাস ও পরিবেশ-সচেতন সমাজের কথা স্মরণ করলে দেখা যাবে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই এক সমাজ ভেঙে পড়ছে, তার স্বপ্ন, সংস্কার, সীমাবদ্ধ জীবনের সদাসন্তুষ্ট পরিবেশ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর এক দিকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অনাহূত অতিথির বজ্রনিনাদ শোনা যাচ্ছে। এই দুই মানসিকতার দ্বন্দ্বকে তারাশঙ্কর দুই ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বরূপে দেখাতে চেয়েছেন। দেশ, কাল, সমাজ ও জীবনের বিশাল প্রান্তরে তিনি নরনারীকে স্থাপন করেছেন। সুতরাং তাঁর কথাগ্রন্থগুলিকে কিছুতেই দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রাহর সুখপাঠ্য গ্রন্থরূপে নির্দেশ করা যায় না। অথবা তাঁর রচনায় চিত্তগুহাবাসী শৃঙ্খলিত 'লিবিডো'র বিকৃত কামনা ও পঙ্কোল্লাস সৃষ্টি করেনি। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'— যে-কোনো উপন্যাস থেকেই দেখা যাবে, তিনি কীভাবে সমসাময়িক যুগ ও জীবনকে বিশেষ ভাবরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাচীন ও পুরাতন মহাকাব্যের মন ও মেজাজের সঙ্গে তাঁর চিত্তধর্মের যেন কোনো-এক আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। মহাকাব্য যেমন দেশকালের অতীত মানবগোষ্ঠীর মানসিক ইতিবৃত্তের দলিলস্বরূপ গ্রহণীয়, তেমনি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে সীমাবদ্ধ সমাজ পরিবেশে সেই বিশাল ইতিহাসকে স্বীকার করতে হবে। তাঁর এই কয়েকটি উপন্যাসের কোন কোনটি প্রধান চরিত্র বৃহৎ পরিবেশে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা-সফলতা নিয়ে যেন মহাকাব্যের প্রান্ত ছুঁয়ে গেছে।

৪

একালে কোনো কোনো উচ্চাশী কথাকার পশ্চিমের 'এপিক নভেলের' ধাঁচে বাংলা উপন্যাসেও সেই ধরণধারণ চালু করতে চেয়েছেন। কিন্তু ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলেই কিছু শিল্পসৃষ্টির অধিকার জন্মায় না। চাই প্রতিভা, অর্থাৎ সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা, আর তার সঙ্গে দেশকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, গান্ধীপন্থী সংঘাত, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, দেশবিভাগ, যুদ্ধ প্রভৃতি যে-কোনো বিষয়ই বিশাল উপন্যাসের উপযুক্ত পটভূমি হতে পারত। একমাত্র তারাশঙ্করই এই পটভূমিকার কিছু কিছু নিজ উপন্যাসে অনেকটা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। হয়তো আরও কেউ কেউ এই সমস্ত উপাদান যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই কথাসাহিত্যের কলেবর নির্মাণ করেছেন। কিন্তু যে বিশালতাবোধ থাকলে কথাসাহিত্যও মহাকাব্যের মতো সমগ্র জাতিচেতনাকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে পারে, এঁদের নিপুণ রচনাকৌশল সত্ত্বেও শুধু সেই বিশালতাবোধের অভাব বা স্বল্পতার জন্য শিল্পকর্মগুলি সুন্দর হয়েছে, কিন্তু মহাকাব্যের বা শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির সীমাহীন চেতনায় পৌঁছতে পারেনি। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র মধ্যে যেন সেই মহাকাব্যের বিশালতা, আর্য চেতনার দ্যুলোক-ভূলোক-সঞ্চারী অভিযান অনেকটা প্রত্যক্ষ করা যায়। একালের এপিক নভেল লিখিয়েরা যুগধর্মবশতঃ নিজ নিজ ব্যক্তিগত ভাব ও মননের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এঁদের বেশ মস্ত মাপের উপন্যাসেও সেই মহাকাব্যোচিত বিশালতা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত চিন্তার রোমন্থন আর যাই হোক এপিকধর্মী হতে পারে না। কিন্তু তারাশঙ্কর যথার্থই গল্পে মানবভাগ্যকে মহাকাব্যের বিশাল, ব্যাপক ও গভীরতার মধ্যে স্থাপন করেছেন। যা নিপুণ, তীক্ষ্ণ, সূচীমুখ, বিশ্লেষণধর্মী—তা আমাদের আনন্দ দেয় বটে; কিন্তু সে আনন্দ তাজমহল দর্শকের আনন্দ। নগাধিরাজের বিস্ময়-স্তব্ধ বিরাটত্ব সৃষ্টি করতে গেলে তারাশঙ্করের মতো পেশীবহুল ভাস্করের প্রয়োজন।

অবশ্য কোন কোন পাঠক বলতে পারেন, তারাশঙ্করের উপন্যাস আঙ্গিকের দিক থেকে কোথাও কোথাও কিছু শিথিল। তাই সমালোচক বলেছেন, "অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি।" গ্রাম্যজীবনের বিনষ্টিপ্রাপ্ত যে রূপ এবং প্রাণাবেগ তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তা ঠিক বটে। কিন্তু তাঁকে কোনো দিক দিয়েই 'গ্রাম্য জীবনের

চারণকবি' বলা যায় না। প্রতিদিনের গ্রাম্যজীবনকে রোমান্স ও সৌন্দর্যভোগের দৃষ্টি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা, বা গতায়ু গ্রাম্যজীবনের গৌরব স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করাই বোধ হয় গ্রাম্যজীবনের চারণকবির উদ্দেশ্য। কিন্তু তারাশঙ্কর কি শুধু গ্রাম্যজীবনের সুলভ ভাবাবেগে-উদ্বেল রোমান্টিক আখ্যান লিখেছেন? এই নেতিবাচক মন্তব্যের দ্বাবা তারাশঙ্করেব প্রতিভার যথাযথ পরিমাপ করা যায় না। গ্রাম জনপদের সুখদুঃখ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বাজনৈতিক ঝড-ঝঞ্ঝা—এসব তাঁর উপন্যাসে একটা বড়ো *motif*, এবং এইগুলিই তাঁর উপন্যাসে বিশালতা সঞ্চারে সার্থক হযেছে। মনস্তত্ত্বেব, নির্জ্ঞান চেতনার তমোগহ্বরে তিনি অনেক সময়ে প্রবেশ করতে চাননি, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর 'লিবিডো'র ভূত তাঁর স্কন্ধে কোনোদিন ভব কবেনি। তিনি মোপাসাঁব মতো মানুষকে শুধু একটা বলিষ্ঠ শবারী জীব বলে ভাবতে পাবেননি, বা প্রকৃতিবাদী জোলাব মতো নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষেব দেহদশাধীন বিকারকে ছিঁডে ছিঁডে দেখবার ও দেখাবাব প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁব কথাগ্রন্থগুলির পবিবেশ যেমন বিশাল, পাত্র পাত্রীও তেমনি দুরধিগম্য জীবনবহস্যেব অন্তবালে ডুব দিযেছে। এইখানে পুবাতন মহাকবিদের সঙ্গে তাঁব প্রধান পার্থক্য। পুবাতনী ও পৌবাণিকী মহাকাব্যেব বিশাল পরিসবে যে চবিত্রগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিযে এসেছে, তাদের অন্তর্লোকের অন্ধকাব দূরীকরণে সেকালের মহাকবিরা বিশেষ চেষ্টা কবেননি। কারণ মহাকাব্য মানুষের অন্তর্জীবনেব ইতিহাস নয়, মানবসমাজ ও সভ্যতার বাইরের ইতিহাসই সেকালেব মহাকাব্যের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয ছিল। কিন্তু একালেব কথাসাহিত্যিকেরা চরিত্রগুলির অন্তর্জীবনেই সন্ধানী আলোক নিক্ষেপে অধিকতর তৎপর, দেশ-সমাজ-পরিবেশ অনেক সমযে যেন উপবি-পাওনা। বিশেষতঃ দুই বিশ্বযুদ্ধেব মধ্যবর্তী পাশ্চাত্য উপন্যাসের মধ্যে যেভাবে চেতনাপ্রবাহেব বক্রতা ও বৈচিত্র্য ফুটে উঠছে, তাতে মনে হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো উপন্যাস থেকে ঘটনা গ্রন্থন বা প্লট-নির্মিতি উবে যাবে। ধারাবাহিক অর্থাৎ কার্যকারণাত্মক চরিত্রেব বিবর্তন ও পরিণামও ক্রমে ক্রমে মনোগহনের দুরধিগম্য জটিল অরণ্যানীতে হারিয়ে যাবে। সে যাই হোক, তারাশঙ্কর মনেব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের প্রতি উদাসীন না হলেও শুধু তার উপরই কথাগ্রন্থের একমাত্র ভিত্তি করেননি। একটা বিশাল দেশকাল এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে-ওঠা চরিত্রের বিষণ্ণ পরিণতি তারাশঙ্করের উপন্যাসে যেন শরীরী মূর্তিতে হাজির হয।

কেউ কেউ বলবেন, তারাশঙ্করের সৃষ্টির মধ্যে পেশীবহুল শক্তির প্রকাশ যতটা হয়েছে, আঙ্গিক বা কলাকৃতির ততটা নৈপুণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এবিষয়ে বোধহয় স্থিরভাবে ভেবে দেখবার সময় হয়েছে যে, কলাকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্যের ঝকঝকে পালিশ, অথবা জীবনের একটা বিশাল ও গভীর রূপ, কোনটি কথা-সাহিত্যে অধিকতর স্পৃহণীয়। ভারতচন্দ্র না মুকুন্দরাম, গোবিন্দদাস না জ্ঞানদাস, অসকার ওয়াইল্ড না হার্ডি—কে মানবচিত্তে অধিকতর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, রুচিভেদে এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হতে পারে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, আঙ্গিকের নৈপুণ্য কোথাও কোথাও অবহেলিত হলেও যদি রচনার মধ্যে জীবনের গভীর প্রত্যয় ও ব্যাপ্তি ফুটে ওঠে, তবে সেই সাহিত্যই অপার বিস্ময় হয়ে দেখা দেয়। তারাশঙ্কর সেই বিশাল বিস্ময়রসের শিল্পী, যা উপন্যাসকে মহাকাব্যের তুঙ্গ শীর্ষে তুলে ধরে।

একালের বাংলা উপন্যাসের বিচিত্র রূপকল্প শিল্পীদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। তারাশঙ্কর চলে গেছেন, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্য নিষ্ফলা হয়ে যায়নি। সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক, আত্মিক—নানা দিকে লেখকদের লেখনী ধাবিত হয়েছে। প্রকাশভঙ্গিমার নানা বৈচিত্র্য, জীবনকে দেখা ও ফুটিয়ে তোলার কত বিস্ময়কর পন্থা বাংলা উপন্যাসকে নতুন সৃষ্টির দিকে নিয়ে চলেছে। এইজন্য তারাশঙ্করের অবসানেও বাংলা উপন্যাসের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। অবশ্য তারাশঙ্করের কথা-গ্রন্থগুলির সঙ্গে একালের নবীন-প্রবীণ কথাসাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাসের তুলনা করলে মাঝে মাঝে মনে হয়, সাম্প্রতিক উপন্যাসের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ ও সঞ্চরণ সত্ত্বেও উত্তর-তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিকেরা মানুষের জীবনজিজ্ঞাসাকে কোনো উৎকট আকাঙ্ক্ষার সংকটরূপে এখনও শিল্পের আকার দিতে পারেননি। এখনকার দেশ-কাল-পাত্র তাঁদের চেতনাকে এমন ভাবে আবিষ্ট করেছে যে, তাঁদের অনেকেই সে সম্মোহিত পরিবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। তারাশঙ্কর দেখেছেন অহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী গোপনচারী হিংসা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নীতিবোধের পশ্চাদপসরণ—তবু এ সমসাময়িকতাকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি তার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। এই উত্তরণ-শক্তি একালের প্রতিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিকের মধ্যে বড়ো-একটা দেখা যায় না। দিগন্তসঞ্চারী বিশালতা একালের উপন্যাসে কতটা শিল্পরূপ পেয়েছে তা ভাবীকালের পাঠক বিবেচনা করবেন। শুধু সসংকোচে বলতে পারি,

তারাশঙ্করের অঙ্কিত দেশকালপাত্রের মধ্যে যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি আছে, ইদানীন্তন কালের কথাসাহিত্যের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য ও সমাজমানসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি থাকলেও তার মধ্যে তারাশঙ্করের শক্ত হাতের স্পর্শ, যাকে আমরা এপিক-রস বলতে পারি, তার স্বাদ কচিৎ পাওয়া যায়। একালের খণ্ড খর্ব বিক্ষিপ্ততার যুগেও যে গদ্যে মহাকাব্যের বিশালতা, গাম্ভীর্য ও গভীরতা সৃষ্টি করা যায়, তারাশঙ্করের কয়েকখানি উপন্যাস তার দৃষ্টান্তস্থল।
